সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা

মো. আনিস-আর-রেজা

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
ই-মেইল : bengali@du.ac.bd

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-9667222
E-mail : bengali@du.ac.bd

১২ নভেম্বর ২০২৩

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মো. আনিস-আর-রেজা কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত *সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা (Role of Bongio Musalman-Shahitto-Patrika in Contemporary Society and Literature)* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রিপ্রাপ্তি কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ-অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলবৃত্তি) নেই।

ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম)

অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে উপস্থাপিত *সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা (Role of Bongio Musalman-Shahitto-Patrika in Contemporary Society and Literature)* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলবৃত্তি) নেই।

(মো. আনিস-আর-রেজা)
পিএইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩০
শিক্ষাবর্ষ : ২০২২-২০২৩ (পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে **'সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা'** শীর্ষক আমার পিএইচ ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনায় আমার তত্ত্বাবধায়ক নিয়ত তাগিদ, কার্যকর পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর আন্তরিক পরিচর্যার কারণেই শেষাবধি এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। একই বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রফেসর ড. সৈয়দ আজিজুল হক সেমিনারসহ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে গবেষণার বিষয়ে আমাকে প্রথম আগ্রহী করে তোলেন আমার শিক্ষক ও এম.ফিল তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. হাবিব আর রহমান। তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইয়াহ্ইয়া মান্নান, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ ফজলুর রহমান, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মীর হুমায়ুন কবীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন বন্ধুবর ড. আবদুল বাছিরের প্রশাসনিক সহযোগিতাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অফিস সহকারী প্রয়াত সাঈদ ভাইয়ের সহযোগিতার কথা মনে পড়ছে। তিনি, বর্তমান বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং পিএইচ ডি শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, খুলনার উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি, খুলনা বিভাগীয় গণ-গ্রন্থাগার। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* সবগুলো সংখ্যার নিখুত প্রতিলিপি বাংলা একাডেমির পত্রিকা শাখা থেকে সংগ্রহ করার ফলে আমার গবেষণায় নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে। খুলনার উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান শ্যামল দেবনাথের সহযোগিতায় দুর্লভ বই-পত্রিকা ব্যবহারের ফলে অনেক তথ্য-উপাত্ত হাতের কাছে এসেছে। বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা শাহ সিদ্দিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারিবৃন্দ, 'বাতিঘরে'র সিদ্দিক, 'তক্ষশিলা'র সেলিম, 'বিদিত'র মিন্টু বই-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কলকাতা থেকে প্রয়োজনীয় বই-পত্রিকা নিজ হাতে বহন করে এনে আমার গবেষণার আগ্রহকে অব্যাহত রাখতে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী মোস্তফা শাহিদ, হামিদ কায়সার, ব্রজলাল কলেজের সহপাঠী-বন্ধু সোহেল আলম, আমার ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষক তপন শীল এবং প্রতিবেশী আশরাফ মামা। তাঁদের সবার সহযোগিতায় আমি ধন্য।

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা এবং আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনার বাংলা বিভাগের বর্তমান ও সাবেক সহকর্মী-শিক্ষকবৃন্দের বিভাগীয় কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতার ফলে আমার গবেষণা-প্রকল্পকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। ব্রজলাল কলেজ বাংলা বিভাগের সেমিনার সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আব্দুল আউয়াল হোসেন দিনরাত পরিশ্রম করে অভিসন্দর্ভ মুদ্রণ করায় আমি ভীষণ উপকৃত হয়েছি। তার এই পরিশ্রম ভুলবার নয়। বাংলা বিভাগের অফিস সহকারী নারায়ণ চন্দ্র নয়ন, রবিউল ইসলাম ও আযম খান কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ শফিকুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে। তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে সৌজন্যতা দেখালে খুব কমই বলা হয়।

এই গবেষণা-প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে আমি আমার পিতাকে হারিয়েছি। তারও আগে আমি আমার সব সৃষ্টিশীল কাজের প্রেরণাদায়ী গর্ভধারিনী মাকে হারিয়েছিলাম। গবেষণার শেষে এসে এক ভাইকেও হারালাম। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি প্রতিনিয়ত আমার গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন। আমার সহধর্মিনী সাংসারিক নানা কাজের সুন্দর সমন্বয় করে আমাকে হাসিমুখে উদ্দীপিত করেছেন অভিসন্দর্ভ রচনায়। আমার কন্যা-পুত্র-বোন-ভাই ও অন্যান্য নিকটজনের নীরব প্রেরণা আমার গবেষণা-প্রকল্প বাস্তবায়নে উজ্জীবিত রেখেছিল। সবার প্রতি আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

গবেষক : মো. আনিস-আর-রেজা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার সার-সংক্ষেপ

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন মুসলিম চিন্তকের উদ্যোগে ও উৎসাহে গঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি। অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় ১৯১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সমিতির কার্যকরী সভার সিদ্ধান্তক্রমে এর মুখপত্র হিসেবে একই বছরের এপ্রিল মাসে (১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে) আত্মপ্রকাশ করে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত ছিল পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশকাল। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে সাহিত্য-পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সহকারী সম্পাদক হলেও মুজফফর আহমদকে (কমরেড) পত্রিকা প্রকাশনা ও বিপণনের বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করতে হতো।

বাঙালি মুসলমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সাধনায় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সুদূরসঞ্চারী প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমকালীন জনজীবন পরিসরে পত্রিকার ভূমিকা ও অবদান অনুসন্ধানের আগ্রহ থেকেই আমার এই গবেষণা-প্রকল্প।

সমকালীন জীবনে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজকে সার্বিকভাবে সচেতন করার প্রথম যুগান্তকারী সাহিত্যিক প্রয়াস হিসেবে পত্রিকাটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতাসহ অনেক মুসলিম লেখকের প্রাথমিক পর্যায়ের লেখা এবং সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি-প্রতিষ্ঠা মূলত পত্রিকাটি ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে; যারা সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভূত অবদান রাখেন এবং পরবর্তীতে খ্যাতিমান হন।

কয়েকজন অমুসলিম লেখকের প্রথম রচনাও এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাসহ সর্বমোট ৪৩ জন অমুসলিম লেখকের রচনা প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

সাহিত্য-পত্রিকার বিষয়বৈচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, কবিতা, কথিকা, সংগীত, ছোটগল্প, অণুগল্প, কৌতুক, রম্যরচনা, ঐতিহাসিক নাটক, একাঙ্কিকা, শিশুতোষ রচনা, দীর্ঘ অভিভাষণ, সমাজ ও বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের চিত্র, হিন্দু, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম, অজ্ঞেয়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, ভ্রমণকাহিনি, ইংরেজি-ফরাসি-রাশিয়ান, সংস্কৃত-উর্দু-ফার্সি, আরবি-ফারসি-তুর্কি ভাষায় লেখা সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুবাদ, অর্থনীতি-শিল্প, জীবনী, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, মাতৃভাষা বিতর্ক, সাম্প্রদায়িক উত্তরাধিকার, গ্রন্থ ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক নানাবিধ রচনা প্রকাশিত হয়েছে এ-পত্রিকায়। আমার গবেষণাকর্মের নির্মোহ মূল্যায়নের প্রয়োজনে অভিসন্দর্ভে এসব রচনা আলোচিত হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি'। এই অধ্যায়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের আলোকে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির চালচিত্রের সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনাকাল থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত 'বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনার ধারা' দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার বিষয়' শিরোনামে যথাক্রমে সমাজ ও ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সাহিত্যকর্ম, ভাষা পৃথক চারটি পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'উপসংহার' অংশে বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী চারটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের সারাৎসার।

সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার বর্ষভিত্তিক সূচিপত্র'।

গবেষকের নাম : মো. আনিস-আর-রেজা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩০
শিক্ষাবর্ষ : ২০২২-২০২৩ (পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	১-৮
প্রথম অধ্যায় : সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি	৯-২৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা (১৮৩১-১৯০০)	২৫-৪৭
তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা (১৯০১-১৯৩০)	৪৮-৫৯
চতুর্থ অধ্যায় : বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার বিষয়	৬০-৩৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজ ও ধর্ম	৬১-১১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১১২-২৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সাহিত্য	২৫৮-৩৭৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ভাষা	৩৭৫-৩৮৬
উপসংহার	৩৮৭-৩৮৯
গ্রন্থপঞ্জি	৩৯০-৩৯৮
বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা: সূচিপত্র	৩৯৯-৪১১

প্রস্তাবনা

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িকপত্রের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে-অর্থে সাহিত্যের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ লালনক্ষেত্র সাময়িকপত্র। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশের ধারায় সাময়িকপত্রই হয়ে ওঠে অন্যতম প্রধান বাহন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রতিফলনও প্রথম পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন সাময়িকপত্রের পাতায়।সমাজ ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্র তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িকপত্রেই যে প্রতিফলিত হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা মাসিক *দিগদর্শন* প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ইংরেজ মিশনারি, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)। পরের মাসেই তিনি বের করেন সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ*। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্মেষপর্বে এ-দুটি পত্রিকার অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্পর্শে এসে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুজনকথিত যে জাগরণ ঘটে, তারও অন্যতম বাহন হয়েছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র। ইংরেজ আমলে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় হিন্দু সমাজ বরাবরই মুসলিম সমাজ থেকে এগিয়ে ছিল। ফলে খ্রিস্টান মিশনারিদের পর বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের অধিকাংশই প্রকাশ করেছিলেন হিন্দু সমাজনেতা, সম্পাদক ও প্রকাশকগণ। রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) পৃষ্ঠপোষকতায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮১৮ সালের ১৪ মে থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রথম খাঁটি ভারতীয় সাপ্তাহিক *বাঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশ পায়।[১] এর ঠিক ১৩ বছর পরই প্রকাশিত হয় প্রথম মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র *সমাচার সভারাজেন্দ্র* (১৮৩১)। এর সম্পাদক ছিলেন শেখ আলীমুল্লাহ। এটি ছিল বাংলা-ফারসি দ্বিভাষিক পত্রিকা। এই সময়ের অন্যান্য পত্রিকার মতো এর আয়ুষ্কালও ছিল স্বল্প। ১৮৩২ সালে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[২] এগুলি মূলত ছিল সাময়িকপত্র। এতে সাহিত্যের উপাদান ছিল না বললেই চলে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) সম্পাদিত সংবাদপত্র *সংবাদ প্রভাকর* ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এ-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সত্যিকার অর্থে বাংলা সাহিত্যের বীজ রোপিত হতে শুরু করে। এর পরের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা ছিল *তত্ত্ববোধিনী* (১৮৪৩)। অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) সম্পাদনায় 'বাংলা গদ্যের ও সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের অভ্যুদয়ের সৃষ্টিকারী মাসিক পত্রিকা *তত্ত্ববোধিনী*।[৩] *তত্ত্ববোধিনী*র পরে *বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৫১, সম্পাদক: রাজেন্দ্রলাল মিত্র), *মাসিক পত্রিকা* (১৮৫৪, সম্পাদক: প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার) ছিল উল্লেখযোগ্য সাহিত্যধর্মী পত্রিকা।

---

১ তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস (১৭৮০-১৯৪৭)*, পত্রভারতী, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩৭

২ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত : ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১০

৩ সন্দীপ দত্ত, *বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত* (১৮১৮-১৮৯৯), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২১

১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহ পত্র-পত্রিকার জগতে ভিন্নতর গুরুত্ব নিয়ে আসে। এ-সময়ে প্রকাশিত পত্রিকায় সাহিত্যাশ্রয়ী নানাবিধ বিষয় থাকলেও রাজনীতি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। সিপাহি বিদ্রোহ এবং ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজি পত্রিকা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৪-১৮৬১) *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* (১৮৫৩) বাংলা পত্রিকার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উল্লেখ্য, সিপাহি বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিংয়ের (১৮২২-১৮৬২) আমলে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৮৫৭ সালের ২৩ জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। রংপুরের *রঙ্গপুর বার্তাবহ* (১৮৪৭)-সহ বেশ কিছু পত্রিকা তখন বন্ধ (১৮৫৯ সালে) হয়ে যায়।[১] এই সময়ে ভিন্নভাষার বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষিক পত্রিকা *সমাচার সুধাবর্ষণ* (১৮৫৪)-এর সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনের ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়গ নেমে আসে।[২] সমকালের আরেকটি পত্রিকা *সোমপ্রকাশে* (১৮৫৮) 'বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনা ও রাজনৈতিক বিষয়'[৩] স্থান পেতে থাকে, এর সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৬)। শুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা বিশেষভাবে এ সময় থেকে লক্ষ করা যায়।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *বঙ্গদর্শন* এবং ১৮৭৪ সালে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) *আজিজন নেহার* প্রকাশনার মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় হিন্দু-মুসলমানের যুগপৎ ধারাবাহিক যাত্রা লক্ষ করা যায়। জনপ্রিয়তা ও মানগত বিষয় বিবেচনায় এনে *আজিজন নেহার*কেই মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র সাধনার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করা চলে।[৪] বাংলা সাহিত্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা *বঙ্গদর্শন।* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* প্রথম 'যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা'ও বলা যায়। 'সাহিত্যের আদর্শের মান অক্ষুণ্ন রেখে সমাজ, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি সব বিষয়ের আলোচনাতে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা *ভারতী (১৮৭২)*-ও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছে'।[৫]*ভারতী*র পর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা ছিল *সাধনা* (১৮৯১)।[৬] সংরক্ষণের উপযোগী ও মানসম্মত সাহিত্যপত্র ছিল এটি। *আজিজন নেহার* ছাড়াও বাঙালি মুসলমান কর্তৃক এই কালে বহু সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তবে এসব পত্রিকার আয়ু দীর্ঘ ছিল না এবং এগুলো সমাজে প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়নি। ১৮৮৯ সালে 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' (সম্পাদক: শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য) নামক অমুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার পাশাপাশি মুসলিম সম্পাদিত *সুধাকর*-এর প্রকাশকাল থেকে মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকাসমূহ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। বিশ শতকের মুসলমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকা বাঙালি সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাতে যেন একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়।[৭] এই সময়কালে বিশুদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা হলো: *কোহিনূর* (সম্পাদক: রওশন আলী চৌধুরী, মাসিক ১৮৯৮, ১৯০৩, ১৯১১), *নবনূর (*সম্পাদক: সৈয়দ এমদাদ আলী, মাসিক-১৯০৩), *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*

---

১ রথীন চক্রবর্তী, *মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর*, নাট্যচিন্তা, কলকাতা ২০১২, পৃ. ২১

২ স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, *১৮৫৭-র বিদ্রোহ: সমকালীন বাংলা ও বাঙালি*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ২০১১, পৃ. ৫১

৩ ইসরাইল খান, *সাময়িকপত্র ও সমাজগঠন: বাংলাদেশের পরিস্থিতি*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ৮৬

৪ আবুল আহসান চৌধুরী, *সাহিত্যের রূপকার: পুনর্বিচারের অবলোকন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ১৪

৫ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *হাতের মুঠোয় পঞ্চাশ বছরের ভারতী*, *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ: সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, পারুল বই, কলকাতা ২০১৭, পৃ. ১১৪

৬ *বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৭ হাবিব রহমান, *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, কথা প্রকাশ, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ১৫

(সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ত্রৈমাসিক-১৯১৮), *সওগাত* (সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মাসিক-১৯১৮, সাপ্তাহিক-১৯২৮), *মোসলেম ভারত* (সম্পাদক: মোজাম্মেল হক, *মাসিক-১৯২০), ধূমকেতু* (সম্পাদক: কাজী নজরুল ইসলাম, *১৯২২), শিখা (*সম্পাদক: আবুল হুসেন, *১৯২৬), মোহাম্মদী* (সম্পাদক: মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাসিক-১৯২৭), *জাগরণ* (সম্পাদক: এম. আহমদ আলী, মাসিক-১৯২৮), *জয়তী* (সম্পাদক: আবদুল কাদির, মাসিক-১৯৩০) ও *বুলবুল* (সম্পাদক: হবীবুল্লাহ বাহার, চতুর্মাসিক-১৯৩৩, ত্রৈমাসিক-১৯৩৪, মাসিক-১৯৩৬)। সংবাদ পরিবেশনা ছাড়াও মুসলিম সম্পাদিত বাংলা পত্রিকাসমূহের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মপ্রচার, সমাজসেবা ও সমাজসংস্কার। কিছু কিছু পত্রিকা অবশ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছিল।[১] *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছেন :

> *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* (১৯১৮-১৯২৩) ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এই পত্রিকায় সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, তার আবেগ ছিল ধর্মীয় নয়, মানবীয়।[২]

একটি জাতি বা সম্প্রদায়কে চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক গুণমানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানও পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাঙালি সমাজকে চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধিদানের প্রয়োজনে শিক্ষিত ও সচেতন মুসলিম জনশ্রেণি তাই গড়ে তোলে *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (১৮৯৩)*; এবং পরিষদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (১৮৯৪)। এই সংগঠন ও পত্রিকার অনুকরণে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন মুসলিম চিন্তকের উদ্যোগে ও উৎসাহে গঠিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি*। অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় ১৯১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সমিতির কার্যকরী সভার সিদ্ধান্তক্রমে এর মুখপত্র হিসেবে একই বছরের এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। পত্রিকা পরিচালনা করার জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), সম্পাদক দুজন –মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৮৫-১৯৭৬), সদস্য তিনজন–মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমেদ (১৮৬২-১৯৩৩), মঈন উদ্‌দীন হুসায়ন (১৮৯০-১৯৬৮), মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত প্রতিবর্ষে পত্রিকাটির চারটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৬ জুন ১৯১৮, প্রকাশক মৌলবী আর. লোহানী, প্রকাশের স্থান ৪৭/২ মির্জাপুর স্ট্রিট কলকাতা। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)। তৃতীয় সংখ্যা থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মুজফ্‌ফর আহমদ। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব নেন (ডা.) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের শিক্ষকরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ফলে চতুর্থ বর্ষ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের ওপর। পত্রিকার সহকারী

---

১ ইমরান হোসেন ও সুনীল কান্তি দে সম্পাদিত, *ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০১, পৃ. নয়-দশ

২ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রতিভাস সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৩২০

সম্পাদক হলেও মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব ও প্রচারের কাজটি বহুলাংশে করতেন। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার মুদ্রণ ১০০০ কপি হলেও প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হয় ১৫০০ কপি, সেগুলো নিঃশেষিত হলে মুজফ্‌ফর আহমদ ৩৬৪ কপি পুনর্মুদ্রণ করেন। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয় ২০০০ কপি, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ২২০০ কপি।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* যাত্রা শুরু করে। সমিতির চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই এর মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*-এর সভ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন এরকম একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো সে প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

> ১৯১০ সালে আমি বিএ পাস করি, ঐ সময় কলকাতায় কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী আহমদ আলী, মঈন উদ্‌দীন হুসায়ন প্রভৃতি। সকলের মধ্যে জ্বলন্ত উৎসাহী ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। আমরা কয়েকজন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এর সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমাদের সাহিত্যিক দারিদ্র্যের দরুন আমরা বড় লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত।[১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিঃসন্দেহে 'আমাদের' বলতে বাঙালি মুসলমানদের বুঝিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে সার্বিকভাবে সচেতন করার প্রয়াস হিসেবে তাই গঠিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* এবং তাঁদের চিন্তাধারার সাহিত্যিক প্রতিফলনের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*।

সমকালে বাঙালি মুসলমানের রচিত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান সমাজের পরিচয় যে খুব বেশি ছিল তা বলা যাবে না। এ অজ্ঞতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণের একটা প্রয়াস হিসেবে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* সূচনা হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* সহকারী সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন:

> *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির* মারফতে বাঙালিদের সামনে বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের সামনে মুসলিম সভ্যতার নানান দিক তুলে ধরা হবে, এটাই ছিল সমিতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। মুসলমানদের নিকট থেকে অনেক বাঙালি হিন্দু তাই চাইতেন। সাধারণত শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা মুসলিম সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। বাঙালি মুসলমানরাও যে খুব বেশী জানতেন তাও নয়। বাংলার মুসলমান পরিবারের বিশেষ রীতিনীতি ও চালচলন সম্বন্ধে প্রতিবেশী হিন্দুদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। ডক্টর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী একদিন আমার নিকট একথা স্বীকার করেছিলেন।[২]

---

১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, মাহে নও, ১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৫, পৃ. ৩৩

২ মুজফ্‌ফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯)*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২১

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬২-১৯৩৫) ছিলেন একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) প্রধান সহকর্মী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের চর্চা, আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র ও ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, নবি-রসুল-খলিফা-পির-দরবেশদের জীবনী রচনা, মুসলমান সাহিত্যিকদের জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ প্রদান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ইত্যাদি *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির* উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত আত্মপরিচয় ও নবজাগরণের স্পৃহা থেকেই *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করত।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি ছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় অগ্রণী প্রথম সুগঠিত মুসলিম প্রতিষ্ঠান। সমিতি গঠনের সাত বছর পর *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে মোট সাতটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে তৃতীয় সম্মেলন চট্টগ্রামে, চতুর্থ সম্মেলন বসিরহাটে এবং অবশিষ্ট সম্মেলনসমূহ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনের সভাপতি এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক পঠিত দীর্ঘকায় সমৃদ্ধ অভিভাষণ প্রকাশিত হতো *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*। শুধু অভিভাষণ প্রকাশই নয়, ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি মুসলমানদের পরিচয় করিয়ে দেয়াই যে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য, তা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উল্লেখিত হয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পাদক 'নিবেদন' পাতায় তুলে ধরেন নিম্নোক্ত বক্তব্য :

> এই উন্নতির যুগে সকলেই উন্নতির পথে খরবেগে ধাবিত হইতেছে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে উন্নত হইতে হইবে। জাতির উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক। প্রথমতঃ আমরা চাই আমাদের গুপ্ত অথচ গৌরবময় সুদৃঢ় ভিত্তি পুনরায় লোক চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া তাহার উপর বর্তমানের বিরাট, বিশাল, উদার, উন্নত ও মহিমময় সৌধ রচনা করিতে। আমরা চাই আমাদের সেই বিস্মৃত অতীতের আদর্শে মহান সুষমায় অপরূপ গৌরব অমর কীর্ত্তিগাথা বাংলা-বীণার সুরে গাহিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা, ভাবের উদ্দীপনা কর্মেও প্রেরণা আনিতে। তাই চাই *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। দ্বিতীয়তঃ আমরা চাই বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস। বাংলায় কত পীরের আস্তানা, কত ভগ্নস্তূপ, কত প্রাচীন পুঁথি তাদের অতীত কাহিনী বলিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আমরা চাই সেই সকল কাহিনী শুনিতে ও শুনাইতে, তাই চাই বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। তৃতীয়তঃ আমরা চাই আমাদের ঘরের ভালো জিনিসগুলির বিষয়ে আমাদের প্রতিবেশীদিগকে জানাইয়া তাহাদের মন হইতে আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা দূর করিতে। আমরা চাই নাটক, উপন্যাস, কবিতা দ্বারা আমাদের পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে; আমরা চাই ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িতে, তাই-চাই বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। চতুর্থতঃ আমরা চাই এই সমস্ত অসার গ্রন্থকে সমালোচনার দ্বারা দূর করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করতঃ সৎ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে। পঞ্চমতঃ আমরা চাই নীরব সাহিত্যিকের কণ্ঠস্বর ফুটাইতে। তাই চাই *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*।[১]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সর্বমোট ২২টি সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এতে কবিতা ও গল্পের পাশাপাশি প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধ বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আবার ইতিহাস-

---

১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'নিবেদন : সম্পাদক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ১

ঐতিহ্যবিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো সর্বাধিক। বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পত্রিকাটিতে কবিতা, গল্প, গাথা, কথিকা, অভিভাষণ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলাম ধর্ম, বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান, অধ্যাত্মবাদ, অর্থনীতি, অনুবাদ, মাতৃভাষাবিষয়ক বিতর্ক, জীবনকাহিনি, ভ্রমণকাহিনি, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে।

সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে বাঙালি মুসলমানের আলোচিত প্রসঙ্গ ছিল কেবল ধর্ম ও সমাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন কিছু সাহিত্য-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেগুলো একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা ও ধর্মপ্রচারকে প্রাধান্য দেয়। তবে সময়ের পরিক্রমায় একসময় বিশুদ্ধ সাহিত্য-সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটে, যার সূচনা হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র মধ্য দিয়ে। পত্রিকাটির মাধ্যমে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সাহিত্যিক নবজাগরণ শুরু হয়।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পূর্বে *নবনূর* (১৯০৩), *কোহিনুর* (১৯০৩) ছিল মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত *সাময়িক-পত্রিকা*র পথপ্রদর্শক। তবে এর পূর্বে *আহমদী* (১৮৮৬), *মিহির* (১৮৯২), *প্রচারক* (১৮৯৯), *ইসলাম-প্রচারক* (১৮৯৯) নামক আরো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত পত্রিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের শ্রীবিধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। কয়েকটি পত্রিকার নামকরণেও এর বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'জাতীয় সাহিত্যে'র বিস্তারিত রূপরেখা প্রদান করা হয়, যাতে ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, সৌভ্রাতৃত্ব, মানবতাবোধ প্রভৃতিকে জাতীয় সাহিত্যের উপাদানরূপে গণ্য করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাহিত্য-পত্রিকা তার অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল।

সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তু ছিল লক্ষণীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা, পুস্তক-পরিচয়, বিতর্ক সব মিলিয়ে এটি একটি সত্যিকারের সাহিত্য-পত্রিকা হয়ে উঠতে পেরেছিল। তবে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ছিল বৈচিত্র্যময় ও বেশ মানসম্পন্ন। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি, হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রচেষ্টা, নারী-প্রগতি, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা, গ্রন্থালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল সাহিত্য-পত্রিকার পাতা। বাঙালি নবীন মুসলমান লেখকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোনো শাখা অবলম্বন করে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন।

মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, তারও শুরু এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগ পত্রিকাটিকে ঘিরে নতুন মাত্রা পায়। পত্রিকার পাতায় ঘোষণা দিয়ে অনেক সময় প্রবন্ধ আহবান করা হতো। প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি বড়ো অংশব্যাপী প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন হিন্দু-মুসলমান মানসভাবনা। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এছাড়া সাহিত্য-পত্রিকায় ১৩১ টি ছড়া ও কবিতা প্রকাশিত হয়, যেগুলোর মধ্যে বেশকিছু কবিতা সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, ফারসি কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছিল।

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা সাধারণত ৮০ থেকে ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হতো। সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি ছিল প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, যেটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৪০। তখনকার পত্রিকাসমূহের রীতি অনুযায়ী, একই

বর্ষে প্রকাশিত পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যায় ধারাবাহিকতা রক্ষিত হতো। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য হয়েছিল।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকসহ অনেক লেখকের পত্রিকায় প্রকাশিত নামের সঙ্গে অন্যত্র ব্যবহৃত নামের বানানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজন খ্যাতিমান লেখকের নাম সাহিত্য-পত্রিকায় প্রথমদিকে যে বানানে ছাপা হতো, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়েছে। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মোজাফ্‌ফর আহমদ, আবুল হোসায়ন বা আবুল হোসেন, আবদুল কাদের, সফিয়া খাতুন, ইব্রাহিম খাঁ বা এব্রাহীম খাঁ প্রমুখ লেখকের নামের ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা গেছে। সাহিত্য-পত্রিকার বাইরে তাঁরা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুজফ্‌ফর আহমদ, আবুল হুসেন, সুফিয়া খাতুন, ইব্‌রাহীম খাঁ নামে পরবর্তীকালে পরিচিতি পেয়েছেন। আরো পরে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাজনীতিবিদ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ নামে তাঁদের পরিচয় সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান সাহিত্য-পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ডাক্তার লুৎফর রহমান নামে পরিচিতি পান। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মিসেস আর. এস হোসেন নামে সাহিত্য-পত্রিকায় লিখতেন, যিনি বেগম রোকেয়া নামে বিশেষ পরিচিত। মাখন গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন লেখক পূর্ণ নামে এবং সংক্ষিপ্ত নামে (শ্রীমা) আলাদা প্রবন্ধ লিখেছেন সাহিত্য-পত্রিকায়। আবুল মনসুর আহমদ আলীর একটি গল্প 'প্রতিদান' সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তার নামের 'আলী' অংশটি বর্জিত হয়। একইভাবে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের নামের 'মোহাম্মদ' শব্দটি পরবর্তীকালে বাদ দেয়া হয়। ও. আলি ও মোহাম্মদ কে. চাঁদ নামে সাহিত্য-পত্রিকার দুজন লেখকের পূর্ণনাম আমরা জেনেছি যথাক্রমে ওসমান আলি ও মোহাম্মদ করমচাঁদ। আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) নামের দুজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একই নামের এই দুই ব্যক্তির প্রথম জন বিশিষ্ট শিক্ষাচিন্তক, সমাজসেবক ও সিলেটের কৃতী সন্তান ছিলেন। দ্বিতীয় জন চট্টগ্রামের সন্তান, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক, সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্বেষণকারী হিসেবে সুপরিচিত। আমাদের লেখায় সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদের নামের পূর্বে 'মৌলবী' এবং হিন্দু লেখদের নামের পূর্বে 'শ্রী' থাকলে তা বর্জন করা হয়েছে। তবে পেশা, উপাধি বা ডিগ্রিজ্ঞাপক শব্দাবলি থাকলে তা বর্জন করা হয়নি।

এবার সাহিত্য-পত্রিকায় ছদ্মনামের ব্যবহার প্রসঙ্গে আসা যাক। আসল নাম অথবা ছদ্মনাম যেকোনো একটি লেখায় একটি নামই ব্যবহার করেছেন সাহিত্য-পত্রিকার অনেক লেখক। লক্ষণীয় বিষয়, ছদ্মনামে যাঁরাই লিখেছেন, তাঁদের আসল নামের লেখাও প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-পত্রিকায়। মুজফ্‌ফর আহমদ, ইবরাহীম খাঁ, ডা. লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদের ছদ্মনাম যথাক্রমে দ্বৈপায়ন, খাজা, উড়োপাখি, এম. আনসারী, আবদুল্লাহ আল আজাদ। তাঁদের বেশকিছু লেখা ছদ্ম পরিচয়েই প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-পত্রিকার পাতায়। একমাত্র ব্যতিক্রম, 'নছরু' ছদ্মনামে একটি মাত্র কবিতার (তীর ও সঙ্গীত) লেখক এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী। যাঁর আসল নামের কোনো লেখা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার গৌরবজনক অবদানের কথা ১০০ বছর পূর্তির পূর্বে কোনো বাঙালি (হিন্দু বা মুসলমান) গবেষক বা ঐতিহাসিক বিস্তারিতভাবে বলেননি। কেউ কেউ বলেছেন বিচ্ছিন্নভাবে,

অতর্কিতে কোনো সমকালীন সমিতি বা সাহিত্যের বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ এসে যাওয়ার ফলে। একথা ঠিক যে, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির যাত্রা শুরু হয়েছিল এটির মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* প্রকাশের ৬ বছর আগে এবং ধীর লয়ে হলেও সমিতি ১৯৪২ পর্যন্ত অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল। কিন্তু পত্রিকার আয়ু ছিল একাদিক্রমে ছয় বছর। সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্য-সমিতি প্রসঙ্গ, সম্মেলনের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় থাকবে, আলোচিত-বিশ্লেষিত হবে এটা খুব স্বাভাবিক ছিল। সাহিত্য-সমিতি ও সাহিত্য-পত্রিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি' এবং ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' বাঙালি মুসলমানের দুটি সারস্বত প্রতিষ্ঠান, যা অখণ্ড বাংলা তথা ভারতে ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে কমবেশি আলোচিত ছিল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র (১৯২০) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনীষীবৃন্দ এবং ৪৭ পরবর্তী সময়ে ঢাকার গুরুত্ব (পূর্ব পাকিস্তান, পরে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে) বিবেচনায় সেই শহরের সংগঠন হিসেবে পরবর্তী সময়ে বেশি আলোচনায় আসে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রভাব বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যাপক ছিল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা (১৯২৭) পত্রিকার বার্ষিক মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও 'সমাজ' ও 'পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কারণে সেকাল থেকে এখনো সমানভাবে আলোচনা-গবেষণার বিষয়বস্তু হয়। 'শিখা'র তুলনায় 'সাহিত্য-পত্রিকা' সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনায় অনেক বেশি হলেও এবং ঢাকা-কলকাতায় পুরোপুরি দুষ্প্রাপ্য না হলেও কয়েকবছর আগেও এর কোনো নির্বাচিত বা স্মারক সংকলন বের হয়নি। 'শিখা'র কয়েকবছর পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'বুলবুল (১৯৩৩)-এর নির্বাচিত সংকলনও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশিত হওয়া এখন সময়ের দাবি।

আমরা শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র প্রতিটি সংখ্যা অনুসন্ধান করে প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করি। এসব রচনা সমসায়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও উক্ত বিষয়নির্ভর গ্রন্থাবলির মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃহৎ-বঙ্গে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে কোনো মুসলিম নেতার আবির্ভাব ঘটেনি, যেমনটা ঘটেছিল হিন্দু সমাজে। মুসলমান সমাজের বোধোদয় হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে; সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পরবর্তী পর্যায়ে। ১৭৫৭ সালে পলাশি প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনের পর মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, ইংরেজদের সহযোগিতা ও প্রশাসনযন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি থেকে বিরত থাকলেও সিপাহি বিদ্রোহের ভয়ংকর পরিণতির পর তারা আত্মসমীক্ষা ও আত্মোপলব্ধিতে জেগে ওঠে এবং স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়। এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় শুরুতেই বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) নেতৃত্বে। অবশ্য ভারতের মুসলিম সমাজে শিক্ষা আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয় স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮) নেতৃত্বে, যার ধারাবাহিকতায় সূচিত হয় আবদুল লতিফের শিক্ষা আন্দোলন। স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার জন্য 'আলীগড় হাই স্কুল (১৮৭৫)' ও 'আলীগড় কলেজ' (১৮৭৭) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সর্বভারতীয় মোহামেডান এডুকেশন্যাল করফারেন্স'। এর শাখা কলকাতায় স্থাপিত হয় ১৯০৩ সালে যা বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়া পর্যন্ত (১৯১১) কার্যকর থাকে। উনিশ শতকে বাংলার নেতা নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ঐরূপ কোনো স্কুল-কলেজ বা শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ-প্রসঙ্গে একজন গবেষকের বক্তব্য :

> বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুদশকের বাংলার মুসলিম সমাজ স্থানীয় ও বহির্বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহে সংঘটিত ঘটনাবলীর কারণে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। তবে তা ছিল দ্বিমুখী। মুসলিম নেতৃত্বের একটি প্রভাবশালী অংশের আগ্রহ ছিল বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অন্য একটি অংশের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রিটিশ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া। এই সময়ে ভারতে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মুসলিম নেতৃত্বের নমনীয় মনোভাবের কারণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রয়াসী নেতৃত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[১]

ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে বিচার করলে অবশ্য দেখা যাবে, স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বচেতনা বা স্বাজাত্যবোধ হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ভেতরেই ছিল অত্যন্ত প্রখর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা রাজনারায়ণ বসু যেমন 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রমাণে ব্যগ্র ছিলেন, সৈয়দ আমীর আলীর 'দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম' (১৮৯১) রচনার উদ্দেশ্যও ছিল 'ধর্মের ইতিহাসে ইসলামের স্থান প্রতিপন্ন করা'।[২] ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার পরের বছরই তৈরি হয় ন্যাশনাল মহামেডান

---

১ মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী, *বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯

২ সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, ড. রশিদুল আলম অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৪৫-২৭৭

অ্যাসোসিয়েশন। উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এইসব উদ্‌যোগের প্রেরণা ছিল স্বধর্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, এবং উভয় ক্ষেত্রেই এই চেতনার উৎস ছিল বিদেশি শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা। এই চেতনাকে ঠিক সাম্প্রদায়িক বলা চলে না; কারণ স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস থাকলেও পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ তখনও প্রকাশ পায়নি। ইংরেজদের আগমনের সূত্র ধরে কালক্রমে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে।[১] রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু সমাজই তাঁদের কাজের 'প্রধান ক্ষেত্র' হবে; কিন্তু 'মুসলমান ও ভারতবাসী অপরাপর জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দেব।' তিনি 'মহা হিন্দুসমিতি' গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন : মুসলমানদিগের যেমন নামে জাতীয় সভা, ভারত প্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদের নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রযোজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপে প্রয়োজন হিন্দুদিগের আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম সম্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।[২] রাজনারায়ণ বসু এই কথা বলেছেন ১৮৬৬ সালে। এর এক দশক পরে আমীর আলী যখন স্বধর্মের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করলেন, 'অ-মুসলিম সহযাত্রীদের' কথা উল্লেখ করতে তাঁরও ভুল হলো না।[৩]

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে সংঘটিত দুটি ঘটনা বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এর একটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ, অপরটি তুর্কি নেতা মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্মার্না থেকে গ্রিক সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়ন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমান সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর লর্ড কার্জন ভারতের ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় পদে সমাসীন হন এবং ১৯০১ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরের কোর্ট-কাছারিতে উড়িয়া ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষা চালু করার বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে বলা হয়, সম্বলপুরের ভাষা উড়িয়া রাখতে হলে এলাকটিকে বাংলা প্রদেশের উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ফলে ১৯০২ সালে কার্জন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাথে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি উত্থাপন করতে বলেন। তখন প্রদেশ হিসেবে বাংলার বিশালত্বের বিষয়টি উঠে আসে এবং সমগ্র উড়িষ্যাকে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। উল্লেখ্য ১৯০৩ সালে সমগ্র বাংলা প্রদেশের আয়তন ছিল এক লক্ষ উননব্বই হাজার বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি আশি লাখ। তদনুযায়ী তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত সরকার ঐ বছরের ডিসেম্বরে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা প্রদেশ বিষয়ক আদেশ দেন। বাংলার সরকার চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলোকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যাস্ত করার প্রস্তাব পেশ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও কিছুটা রদবদল করে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে। ১৯০৩ সালে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি

---

১ মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৯

২ যোগেশচন্দ্র বাগল, *রাজনারায়ণ বসু, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৩ খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৩১

গণ-অসন্তোষের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি আসতে থকে। মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করে। 'দি মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকা ১৯০৪ সালের ৯ জানুয়ারি এর সম্পাদকীয়তে এ বিভক্তির সমালোচনা করে। 'সেন্টাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সভায় এই বিভক্তির বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে। এ সভায় বরিশালের জমিদার মীর মোতাহার হোসেন, বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য চট্টগ্রামের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং 'দি মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হামিদ বক্তব্য রাখেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড কার্জন পুনরায় প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যস্ত করেন। নতুন পুনর্বিন্যাসে প্রস্তাবিত প্রদেশে সম্পূর্ণ আসাম ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির পূর্বাঞ্চল থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে ত্রিপুরাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে ছয় হাজার পাঁচশ চল্লিশ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট এ প্রদেশের নাম রাখা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম। লোকসংখ্যা হিসেব করা হয় তিন কোটি দশ লাখ, তন্মধ্যে এক কোটি আশি লাখ মুসলমান এবং এক কোটি বিশ লাখ হিন্দু। ঢাকাকে রাজধানী ও চট্টগ্রামকে দ্বিতীয় সদর দফতর করা হয়। ভারত সচিবের অনুমোদন নিয়ে এ বিভক্তি ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কার্যকর হয়। ১৯০৩ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গবিভক্তিকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই বিরোধিতা করলেও ১৯০৫ সারের সংশোধিত বিভক্তিকে পূর্ববঙ্গের লোকেরা স্বাগত জানায়, বিশেষত মুসলমানদের একটি বড় অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশের কথা বিবেচনা করে এ বিভক্তিকে অভিনন্দন জানায়।[১] যদিও অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থকগণ ও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানগণ বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থার কথা যাঁরা চিন্তা করেছেন, তাঁরা সকলেই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের এই বঙ্গবিভাগকে স্বাগত না জানিয়ে পারেননি। এঁরা ছিলেন বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই কালে মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[২] ফলে অভিজাত সমাজ উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে নেতৃত্ব হারায়।

১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ এবং এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, তুরস্কের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি, ১৯১৬ সালে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি'র দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা, আবার ১৯২৮ সালের 'নেহরু রিপোর্টে' মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিত করা ইত্যাদি ঘটনাবলি মুসলিম সমাজ-মানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[৩] এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন ঘটতে থাকে। শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে। অপরদিকে হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী আন্দোলনকে মুসলমানরা মনে করে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছে। পূর্ববাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ধীরে ধীরে বঙ্গভঙ্গ একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়। অপরদিকে কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন স্বদেশী ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনকে কেন্দ্র করে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের নতুন গর্ভনর ব্যাডফিল্ড ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫) আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের আন্দোলন ও হস্তক্ষেপের কারণে তা ব্যর্থ হয়। এর প্রতিবাদে ফুলার পদত্যাগ করেন এবং তা যথাসময়ে

---

১ *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৬

২ *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯

৩ *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

গৃহীত হয়। পরবর্তী গর্ভনর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৮৫৮-১৯৪৪) দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গভঙ্গ রদ ত্বরান্বিত করে ১৯১১ সালে তা কার্যকর হয়।[১] ফলে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারীদের মধ্যে হতাশা নেমে আসে।

বঙ্গভঙ্গ ধারণার আগেই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকমনস্ক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব লক্ষণীয়। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম বাংলার মুসলিম সমাজের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯০৫ সাল থেকেই বাঙালি মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। পরবর্তীকালে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো প্রবল হয়ে ওঠে, যার পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের ভারতবিভাজন ও ভৌগোলিকভাবে বাংলার বিভক্তি। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজে গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তন সূচনায় মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাময়িক ও সাহিত্য পত্রিকা বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের আলোচিত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* এই সময়কালের মধ্যে, ১৯১৮ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের শেষদিকের বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলিতে 'জাতীয় ভাব জাগ্রত করতে হবে, অনৈক্য দূর করতে হবে, স্বদেশানুরাগ উদ্রিক্ত করতে হবে' এরকম প্রধান আহবান দেখা যায়।[২] ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ যখন মহামেডান লিটাররি সোসাইটি গঠন করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যও একই ছিল। তিনি মুসলমান সমাজের নানা ধরনের কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা জনিত ত্রুটি দূর করতে উদ্যোগী হন, এবং জন্যে স্ব-সমাজকে ইংরেজি ও হিন্দু-সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট অংশের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে আবদুল লতিফ লিখেছেন :

> Being fully aware of the prejudice and exclusiveness of the Mahomedan community, and anxious to Imbue its members with a desire to interest themselves in Western learing and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representa- tives of English and Hindoo Society.[৩]

আবদুল লতিফ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর উন্নতির জন্যে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি গ্রহণ করতে যে আপত্তি করেননি তা তাঁর এই বক্তব্যসূত্রে অনুধাবন করা যায়।[৪]

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ভেদবুদ্ধি তেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। তখনকার হিন্দু-মুসলমান চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কর্তব্য ছিল স্বধর্মের শুদ্ধতা রক্ষা, লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার ও অতীত গৌরবের ইতিহাস-নির্মাণ। যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করছেন, হিন্দুসমাজ হলো একটি 'জাতীয় ভাব', যার একটা শাশ্বত ঐতিহ্য আছে, এই ভাবের আশ্রয়েই তিনি ভারতীয় জাতি গঠনের কথা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

২ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৩য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ২০১৫, পৃ. ৬৫-৬৬

৩ আবদুল লতিফ, উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ২০০৭, পৃ. ৩২৯

৪ সন্দীপ সন্দ্যোপাধ্যায়, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু সম্পাদিত, *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা ২০০০, পৃ. ১৪৬

ভাবেন। তাঁর সেই জাতিকল্পনায় মুসলমানদেরও তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চান, কারণ 'ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন।'[১] *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়ারেসী সম্পত্তি' নামক প্রবন্ধে এরকম ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়। এমনকি মুসলমান-বিদ্বেষী বলে যে বঙ্কিমচন্দ্র এত নিন্দিত হয়েছেন, তাঁর লক্ষ্যও কিন্তু মুসলমান-নিন্দা নয়। বঙ্কিমের উদ্বেগের প্রধান কারণ তিনি মনে করেন, হিন্দুধর্মের অধঃপতন হয়েছে, 'আর্যধর্মের' মৃত্যু হয়ে হিন্দুধর্ম 'ম্লেচ্ছর হিন্দুধর্মে' পরিণত হয়েছে।[২] অতএব সেই প্রাচীন এবং প্রকৃত হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হলো তাঁর লক্ষ্য। বঙ্কিমও বিশ্বাস করতেন 'পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব' থাকা উচিত নয়।[৩]

উনিশ শতকের ষাটের দশকে হিন্দ ধর্মাবলম্বীরা জাতীয় চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) আয়োজন করেন। সংকীর্ণ চিন্তাচেতনা থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেরিয়ে আসার সদিচ্ছা থেকে হিন্দুমেলার নাম 'ভারত মেলা' দেওয়ার প্রস্তাব করেন যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)। তিনি বলেন :

> আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন 'সংকীর্ণ' ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দুমেলা নাম না দিয়া ভারতমেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। ... আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহবান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহ- বিচ্ছেদ ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।[৪]

হিন্দুমেলা উপলক্ষে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত সন্তান' গানে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথাও ছিল; আরও পরে সরলা দেবীর গানে 'বন্দেমাতরম্‌'-এর পাশে শোনা যায় 'আল্লাহু আকবর'-ও। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'ভারতসভা'র নাম তাঁরা ইচ্ছে করেই ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' রেখেছিলেন, যাতে সংগঠনটি 'সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র' হয়ে উঠতে পারে।[৫]

বিশ শতকের সূচনা হয় উনিশ শতকের জাগরণের ধারাবাহিকতায় হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংগ্রামের জের ধরে। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। এসময় বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়ো। এতে হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। বিশ শতকের প্রথম দশকের সবচেয়ে উত্তেজক বিষয় ছিল স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের সম্পৃক্ততা বেশি থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান জনগোষ্ঠী এতে সমর্থন দেয়, অনেকে সম্পৃক্তও হয়। স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল

---

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *সামাজিক প্রবন্ধ*, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, প্রথম প্রকাশ, ১৮৯২, পৃ. ৫ ও ১২

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ' [দ্বিতীয় বারের ইংরেজি 'বিজ্ঞাপন'], *বঙ্কিম রচনাবলী (২)*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্পাদনা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৫০-১৫১

৩ *বঙ্কিম রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৭১, পৃ.৮৮৫ উদ্ধৃত, বিশ শতকের বাঙালি সমাজ, প্রাগুক্ত

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, *তৃতীয় খণ্ড*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২১

৫ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *জাতি যেদিন গঠন পথে*, ভূপেন্দ্রনাথ দাস অনূদিত, *ভারতসভা* ,১৯৭৭, পৃ. ৬৫-৬৬

বিদেশি, বিশেষ করে বিলেতি পণ্য বর্জন করা। এতদ্বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমর্থনও কম ছিল না। সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত একজন মুসলিম লেখকের বক্তব্য এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য :

> ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী শাড়ী পরিত্যাগ করি, বিলাতী বডিজ, সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডি সু পায়ে হুচট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব।[১]

আবদুল লতিফ বা আমীর আলীর সংগঠন সবসময় নামের আগে 'মহামেডান' পরিচয়টি দিয়ে মুসলমানদের সংগঠিত করে। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের একটা বড়ো অংশ কংগ্রেস তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। মুসলমান পুনরুত্থানবাদীরা সতর্কভাবে সেই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। আমীর আলী ইলবার্ট বিল আন্দোলনে (১৮৮৩) যোগ দেননি;[২] তাঁর অনুগামীদের তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতেও নিষেধ করেছিলেন। এরপরও অবশ্য ১৮৯০ সালেই কংগ্রেসে মুসলমান সদস্য-সংখ্যা হয়েছিল ১৫৬।[৩] কংগ্রেসের মতাদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব থাকলেও কংগ্রেস কখনোই ঘোষিত হিন্দু সংগঠন ছিল না, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বরং বারবার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাই বলা হয়েছে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৮৮৬) সময় 'সোমপ্রকাশ' সেইরকম একদিনের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল যেদিন 'হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক পিতামাতার পুত্র বলিয়া গৌরব করিবেন।'[৪]

মুসলমানরা সেই গৌরবের যেমন শরিক হতে চেয়েছে তেমনি বিশ্ব মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি আকর্ষণও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাই ১৮৭৭ সালে রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধের সময় কলকাতার অভিজাত মুসলমান-সমাজ তুরস্কের সমর্থনে প্রচার-অনুষ্ঠান এবং অর্থসংগ্রহের উদ্‌যোগও নিয়েছিল।[৫] এর ২৭ বছর পরে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও জাপানকে সমর্থন করেছিল একটা বৃহত্তর চেতনা অর্থাৎ প্রাচ্য জাতীয়তাবোধ থেকে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কীভাবে পৃথক জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে, সে বিষয়ে বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) লিখেছেন :

> বাংলাদেশে যখন ধীরে ধীরে ইংরেজিশিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় তখন থেকে আমরা দেখেছি, জাতীয়তাবোধের নবজাগরণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের কণ্ঠে 'হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্বে'র সুরই ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হতে থাকে। তার সঙ্গে 'নব্য হিন্দু ধর্মের আন্দোলন'ও যুক্ত হয়। তার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলার মুসলমানরা তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি দাবি-দাওয়া স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা করতে আরম্ভ করেন এবং ব্রিটিশ শাসকরাও কৌশলে তাকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে চালনা করেন।[৬]

---

১ খায়রুন্নেসা খাতুন, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর*, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২, উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১ম খন্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬৪

২ সুমিত সরকার, *স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল*, পি.পি. এইচ, ১৯৭৩, পৃ. ৪১৭

৩ *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২-৪৭৩

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

৫ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১ম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬, ১৬৭-৬৯

৬ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

১৮৩৭ সাল থেকে আদালতে ফার্সির জায়গায় ইংরজি ভাষা চালু হওয়ায় মুসলমানদের নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ না নিয়ে আবার বাংলা ভাষাকেও ঘৃণায় পরিহার করে তারা নিজেদের আরও বিপন্ন করে তুলেছিল। আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের এরূপ অনীহার জন্যে ঔপনিবেশিক শাসকদের পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সরকার বিশেষ 'মেধাবৃত্তি' মঞ্জুর করে এরপর ১৮৭০-র দশক থেকে মুসলমান শিক্ষা প্রসারের জন্য 'বিশেষ সুবিধাদানের' ('স্পেশাল অ্যাসিসটেন্স') নীতিও গৃহীত হয়। মক্তব-মাদ্রাসাকে সরকারি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসা, মুসলমান অফিসার নিয়োগ, ছাত্রদের জন্য বিশেষ ভাতা ইত্যাদি ব্যবস্থা ওই নীতির মধ্যে ছিল।[১] কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমান ছাত্রদের অর্ধেক বেতন বা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ১৮৮০-র দশকের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।[২] উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানরা যে তখনও পিছিয়ে ছিল, তার জন্যে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতাই ছিল প্রধানত দায়ী। ক্রমে বাঙালি মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলিও এই অভিযোগে সরব হয়ে ওঠে। ১৮৯৯ সালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় মুসলমান সমাজের পশ্চাদগামিতার জন্য দায়ী করা হয় নেতাদের 'অদূরদর্শিতা'কে, আর ১৯০১ সালে 'প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এরকম একটি ছড়া :

'দেখিছ না হিন্দুগণ
পেয়েছে কি উচ্চাসন
পড়িতেছে রাজভাষা
করি প্রাণপণ।
ইহাই তো উন্নতির প্রধান কারণ।'[৩]

মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেও এইভাবে আধুনিক শিক্ষার দাবি উঠছিল। ১৯০৪ সালে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় স্বীকার করে নেওয়া হয় : 'ইংরাজী শিক্ষায় ঔদাসীন্যবশত আমরা ইংরাজ রাজত্বের রাজনীতিক অধিকারে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছি।' এবং এর জন্য সমালোচনা করা হয় মৌলভী আর আলেম সমাজকেও।[৪] হিন্দুদের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র মতো ক্ষুদ্র হলেও কিছু বিকল্প প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। মুসলমানরা কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে কিছু গড়ে তুলতে পারেননি। মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার বেশি কিছু তাঁদের সামনে ছিল না।[৫] অনেক সময় সে-সুযোগও থাকত না। শিক্ষা বলতে মনে করা হতো, পুণ্য অর্জনের জন্য কোরান পাঠ। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য'-ই ছিল সে-সময়কার মুসলমান সমাজের 'দুর্দশার' অন্যতম কারণ।[৬]

তবে অনুকূল সরকারি নীতির সুবাদে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই মুসলমান সমাজে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ১৮৮২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যার হার ২৩ শতাংশ

---

১ স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২০৯

২ অপর্ণাবসু, *দ্য গ্রোথ অফ এডুকেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, ১৯৭৪, পৃ.১৫৭, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৩ উদ্ধৃত, সাময়িকপত্রে *জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৪ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮,১৩৮

৫ রফিউদ্দীন আহমেদ, *দ্য বেঙ্গলী মুসলিমস : এ কোয়েস্ট ফর আইডেনটিটি*, অক্সফোর্ড, ১৯৮১, পৃ.১৩৮, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৬ মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী*, জেনারেল বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১,৭৮

থেকে বেড়ে হয়েছিল ৪৩ শতাংশ। মিড্ল ইংলিশ স্কুলে এই বৃদ্ধির হার ছিল দ্বিগুণেরও বেশি-১৩% থেকে বেড়ে ৩৪%।[১] ১৯০১ সালে ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা স্বীকার করে : 'ধীরে ধীরে সমাজে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিতেছে–বৎসরের পর বৎসর মাদ্রাসা পাশ মৌলবী ও কলেজ পাশ গ্র্যাজুয়েটের ফলে সমাজ পুষ্ট হইতেছে।'[২] ১৮৮০-র দশকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ ভাতা এবং চাকরিতে অধিক প্রার্থী নিয়োগের নীতিও গৃহীত হয়েছিল।[৩] এর ফলে মুসলমানরা যে খুব বেশি করে চাকরি পাচ্ছিলেন, তা অবশ্য নয়। উচ্চশিক্ষা তখনও ছিল উচ্চবর্ণ হিন্দুর দখলে। ১৯০৩ সালে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৩৪৩ জন মুন্সেফের মধ্যে মুসলমান কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১৮, হাইকোর্টের ২১৫ জন উকিলের মধ্যে মুসলমান আছেন ১১জন। ৫২৯ জন জেলা হাকিমের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ৭৬, আর জেলা জজের পদে কোন মুসলমানই নেই।[৪]

বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ তখনও যথেষ্ট পিছিয়ে থাকলেও তাদের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের নীতি গৃহীত হওয়ায় হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হয় যখন মুসলমানরা ক্রমে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী এবং স্বতন্ত্র পরীক্ষা ব্যবস্থার দাবি তুললেন এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাকে তাঁদের অধিকার বলে ঘোষণা করতে চাইলেন।[৫] চাকরিবাকরির অবস্থা তখন এমনিতেই ভালো ছিল না। ১৮৮১ সালে গ্র্যাজুয়েটদের ৫০ শতাংশই ছিল বেকার।[৬] উচ্চশিক্ষার ওপর কর বসানো নিয়েও হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। এ-অবস্থায় মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধার নীতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটা বিভাজনরেখা টেনে দিল। হিন্দুদের থেকে বলা হলো, মুসলমানরা নিজেদের দোষেই পিছিয়ে পড়েছেন; সুতরাং বিশেষ সহায়তা তারা দাবি করতে পারেন না।[৭]

প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু অগ্রগতি হলেও উচ্চশিক্ষায় মুসলমানরা আরও অনেকদিন পিছিয়ে ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে উচ্চবিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ।[৮] নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অবস্থাও ছিল একইরকম। উচ্চশিক্ষার প্রসার আশানুরূপ না হলেও একটি ভূমিস্বত্ত্ববান মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুসলমান সমাজের ভেতর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল এক প্রখর স্বাতন্ত্র্যচেতনাও। বিশ শতকের প্রথম পর্বের মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলিতে তাই মাঝেমাঝেই অভিযোগ শোনা যায়, মুসলমানরা আচার-আচরণ-কৃষ্টিতে বড় বেশি হিন্দু-ঘেঁষা হয়ে আছে। তারা মনসা-শীতলা-ষষ্ঠীকে পুজো দেয়, কালীর কাছে পাঁঠা মানত করে।[৯] ১৯০০ সালে 'ইসলাম প্রচারক' দুঃখ করে লিখেছিল, ইংরেজি আর বাংলা শিক্ষা করে মুসলমানরা 'ধর্ম্মকর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতেছে। মুহম্মদের নাম কজন জানে; অথচ 'তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম অনেকের কণ্ঠস্থ।' শিক্ষার এই হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের অভিযোগ আরও

---

১ রফিউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত
২ *জীবন ও জনমত*, পৃ. ১৫৪
৩ রফিউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০-১৪১, ১৫৮-৫৯, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত
৪ *জীবন ও জনমত*, পৃ. ২৭৬
৫ রফিউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৭, ১৫৫
৬ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৭ *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮
৮ অপর্ণা বসু, *এডুকেশন অ্যান্ড মুসলিম সেপারেটিজম*, বি আর নন্দ সম্পাদিত, *এসেস ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি*, অক্সফোর্ড, ১৯৮০, পৃ. ২২৪-২৫, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত
৯ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে।[১] আপত্তি উঠে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, কারণ সেগুলিতে হিন্দুধর্ম-পুরাণের কথাই থাকে, আর থাকে যবননিন্দা। ১৯০১ সালে প্রকাশিত মনোমোহন গোস্বামী 'রোশিনারা' নামে যে নাটকটি লেখেন এটিই দ্বিতীয় সংস্করণে 'শিবাজী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ভূমিকায় লেখক পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, 'মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির উদ্দেশ্য।' এ নাটকটি পরিপূর্ণভাবে মুসলিম বিদ্বেষে ভর্তি। কয়েকবছর পর হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় একই নাট্যকার 'পৃথ্বীরাজ' নাটকে লেখেন : 'হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন' এ জাতীয় রচনা থেকে 'উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের চিত্র পাওয়া যায়।'[২] ১৯০৯ সালে 'বাসনা' পত্রিকার অভিযোগ ছিল, 'পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান ধর্মনেতা বা নবাব-বাদশার কথা তেমন গুরুত্ব পায় না।' ১৯১৬ সালে 'আল এসলামে' মন্তব্য করা হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করে মুসলমান ছাত্ররা শুধু জানে–মুসলমান হলো নিতান্ত 'অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর জাতি।'[৩]

মুসলমান সমাজের এই ক্ষোভ অসংগত নয়। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে হিন্দু ইতিহাসচর্চায় মুসলমান শাসনকাল সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে অপমানসূচক উক্তি থাকত। তবে সে আমলের প্রচলিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা করে দেখা যায়, স্কুলের পড়ার বইতে অন্তত মুসলমান-বিদ্বেষ তেমন প্রকাশ পেত না, এমনকি আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও বিশেষ কটূক্তি পাওয়া যায় না।[৪] তবু মুসলমান শাসকবর্গের নিন্দা সে-আমলের হিন্দু ইতিহাসচর্চায় যেভাবে বর্ণিত গিয়েছিল, তাতে মুসলমান পত্রিকাগুলির অভিযোগকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে যখন রাজনীতি তেমন জমে ওঠেনি, মুসলিম লীগও গড়ে ওঠেনি, তখন এরকম কিছু উত্তেজনাকর বিষয় নিয়েই বিভেদের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে।

উত্তর ভারতে ১৮৮০-র দশকে স্বামী দয়ানন্দর নেতৃত্বে গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ বাংলাতেও এসে লেগেছিল। গ্রামে-গ্রামে গো-হত্যা বিরোধী প্রচার চালানো হয়; হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের দিয়ে শপথ করিয়ে নেয় যে, তারা গরু জবাই করবে না। অন্যদিকে আঞ্জুমান সংগঠনগুলি গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালিয়ে মুসলমানদের গো-হত্যায় প্ররোচিত করতে থাকে।[৫] এরই মাঝে মুসলমানদের স্বেচ্ছায় গরু-হত্যা বন্ধ করার আবেদন জানাতে গিয়ে স্ব-সম্প্রদায়ের কোপানলে পড়েন মীর মশাররফ হোসেন।[৬]

এতদিন পর্যন্ত যা ছিল দুই সম্প্রদায়ের উচ্চ আর মধ্যবিত্তের স্বার্থসংঘাত, তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়ে গেল এমন একটি ধর্মীয় বিষয় যা নিম্নবর্গের মানুষকেও উত্তেজিত করে তোলে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩২) প্রচার মুসলমান কৃষক-চৈতন্যকে স্পর্শ করতে পেরেছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল এটা ইজ্জতের বিষয়। দাড়ির ওপর কর বসিয়ে হিন্দু-জমিদার আসলে তাদের ঈমানেই আঘাত

---

১ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, ২৪-২৫, ১৫৩

২ এম আর আখাতার মুকুল, *কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা* (১৭৫৭-১৯০৫), দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪

৩ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫, ৩০-৩২

৪ 'ঐতিহাসিক' পত্রিকা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪০৩, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত

৫ রফিউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩-১৭৮, সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

৬ *মুসলিম সাহিত্য সমাজ; সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

করেছে।[১] বিভিন্ন সংগঠন (আঞ্জুমান) সেই চৈতন্যকেই উদ্বোধিত করতে আরও উগ্র ধরনের প্রচার চালিয়েছিল। ১৮৯৩ সালের একটি সরকারি নির্দেশনামায় প্রকাশ্যে গো-হত্যা বা মৃত গরুর দেহ খোলা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করা প্রায় ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে যায় অনেক মুসলমানের।[২] মসজিদের সামনে অমুসলিমদের বাদ্য-বাজনা বাজানোর বিষয়টিও ক্রমে এইরকম এক বিস্ফোরক এজেন্ডা হয়ে উঠেছিল। ঠিক মসজিদের সামনেই ঢাক বাজাতে না পারলে যেন প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ হচ্ছে না, এইরকম একরোখা মনোভাব দেখাতে থাকে কট্টর হিন্দুরাও। এই পারস্পরিক ধর্মবিরোধী আচরণ বিশের দশকে একাধিক দাঙ্গার উপলক্ষ হয়ে ওঠে। আবু জাফর শামসুদ্দীন দুঃখ করে লিখেছেন, 'তাজিয়ার মিছিল কর্ণবিদারী বাদ্যবাজনা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করত; অথচ হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিমা নিয়ে বাদ্য বাজিয়ে চললেই ... মুসলমানের শরীয়তী ধর্মবোধ উত্তুঙ্গে উঠত।'[৩] একই কথা হিন্দুদের সম্পর্কেও বলা যায়। দুই সম্প্রদায়ই ছিল এ ব্যাপারে সমান উগ্র এবং উদ্ধত।

বিশ শতকের প্রথম ভাগেই দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে শুধু স্বাজাত্যবোধে নয়, সাম্প্রদায়িক চেতনায়। এমন সব বিষয় দাবি বা অধিকার হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের চেতনায় আঘাত করতে পারে। সম্প্রদায়ের জায়গায় এসেছে 'জাতি'র ধারণা।

বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজ যেমন তার অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-প্রভেদকে অগ্রাহ্য করে 'জাতীয় ভাব' 'মানসিক প্রকৃতি' আর 'সমপ্রাকৃতিক আচার প্রণালী'র মতো সাংস্কৃতিক ধারণার আশ্রয়ে হিন্দুত্ব বা হিন্দু জাতির তত্ত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল,[৪] ঠিক একইভাবে অভিজাত মুসলমান সমাজও বিশ্ব ইসলামবাদ অবলম্বন করে এক মুসলমান জাতির ধারণা গড়ে তুলতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।[৫] প্রক্রিয়াটি একই রকমের বা স্বজাতির দুর্বলতার নিন্দা, অপর সম্প্রদায়ের সদ্‌গুণগুলিকে অনুকরণীয় মনে করা আর স্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে অগ্রাহ্য করে এক বৃহত্তর জাতীয় সৌভ্রতৃত্ববোধে সকল স্তরের মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে চাওয়া। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যা শুরু হয়েছিল ১৮৭০-র দশক থেকে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তারই অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যাবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে।

১৮৭৮ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' স্বীকার করেছিল, 'বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতার কারণ' পাওয়া যাবে, তাদের 'সমাজ বন্ধনে'; সোমপ্রকাশ' (১৮৮১) উদ্বিগ্ন ছিল হিন্দু সমাজের ভিতরকার অনৈক্য নিয়ে, তত্ত্ববোধিনীর (১৮০২ শক) আহ্বান ছিল : 'হিন্দুজাতিগণ' 'একমন একপ্রাণ' হয়ে উঠুক।[৬] লক্ষণীয়, একাধিক হিন্দুধর্মের অনৈক্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করতে চাওয়া হচ্ছিল জাতীয়তার আদর্শ দিয়ে।

---

১ এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন গৌতম ভদ্র 'ইমান ও নিশান' গ্রন্থে, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০১৮
২ রফিউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭৮, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫০
৩ আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৮৮৯, পৃ. ১১৫
৪ এই জাতীয় ধারণাগুলো ব্যবহার করেছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, তাঁর 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে (১৯৮২), পৃ.১-২, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮,৩২
৫ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রতিভাস, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৭৫
৬ *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ.১৫৯, ৪র্থ খণ্ড পৃ.৪৭৬, ২য় খণ্ড পৃ. ৩৩৯-৩৪১

ঠিক একই ভঙ্গিতে 'ইসলাম প্রচারক' স্বীকার করে নেয়, মুসলমানদের মধ্যে 'জীবনীশক্তির' বড়ো অভাব রয়েছে (১৯০১); 'নিজেদের বলবীর্য্যের উপর' তাদের আত্মনির্ভরতা নেই (১৯০৩)।[১] এবং সেই প্রার্থিত জীবনীশক্তি বা বলবীর্য জাগ্রত করতে চাওয়া হবে আরব-পারস্য-তুরস্কের গৌরবগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে, হিন্দু এবং খ্রিস্টীয় প্রভাব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যই 'ইসলামের মহিমাকীর্তন, ইসলামের অতীত ইতিহাসের গৌরব প্রচার করবার প্রয়োজন দেখা দিল।' তুর্কি সম্রাটকে নন্দিত করা হলো 'মোস্লেম কুলের ভূষণ' বলে; তুরস্কের জন্য অর্থ সাহায্যের স্লোগান হলো : 'বেহেস্ত অল্প পয়সায় পাওয়া যাইতেছে কদাচ ছাড়িও না।' ১৯১৯ সালেই মওলানা আকরম খাঁ লিখেছিলেন, 'বিশ্বের সকল মুসলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি।' এস. ওয়াজেদ আলির মতো বুদ্ধিজীবীও মনে করেছিলেন, 'আরবী মুসলমানের' জাতীয় ভাষা।[২] ১৯২০-৩০ সালের মধ্যে প্রকাশিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পড়ে দেখা যায়, সেখানেও প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হতো তুরস্ক বা পারস্য নিয়ে একটি করে রচনা।

আপন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য আর শুদ্ধতা রক্ষার চেতনার সঙ্গে জাতির ধারণা মিশে গিয়ে একদিকে একটি পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা আইডিওলজির জন্ম হলো, অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত একটি সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হিসেবে উপস্থিত করলো রাজনীতির মঞ্চে। ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি স্পর্শকাতর বিষয়কে ব্যবহার করো হলো সেই বৈরিতাকে আরও শাণিয়ে তোলার কাজে। রাজনীতিক প্রচার এই সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও স্পষ্ট, প্রকট করে দুই সম্প্রদায়ের যুযুধান মনোভাবকে আরও তীব্র, আক্রমণাত্মক করে তোলে স্বদেশী বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। হিন্দু ভূস্বামীগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে দৃঢ়পতিজ্ঞ ছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ গঠনের মধ্যে মুসলমান মধ্যবিত্ত দেখতে পাচ্ছিল তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ, আর এরই মাঝে ব্রিটিশ শাসকের উৎসাহে গড়ে উঠলো মুসলিম লিগ (১৯০৬)। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫) মুসলিম লিগের নেতৃত্বে আসেন। শিক্ষিত মুসলমানকে চাকরি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাকে উপস্থিত করার লক্ষ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।[৩] মুসলিম লিগের জন্ম সেই প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

১৯১০-র দশকে বিদ্যালয় স্তরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বড়েছিল; ১৯৩০-র দশকের শেষে সর্বস্তরেই বেশ কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। মক্তব-মাদ্রাসাগুলিতে সরকার বেশ মুক্তহস্তে ('ল্যাভিশলি') অনুদান বিতরণ করতে থাকে।[৪] শিক্ষার এই প্রসার মুসলমান মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে। অন্যদিকে মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদানের অব্যাহত নীতি হিন্দুদের ঈর্ষার কারণ হয়। ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে আইন পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিয়ে দুই সম্প্রদায়কে মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৫ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর পর সে-সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়াও উগ্র হতে থাকে। তিরিশের দশকে হিন্দু মহাসভাপন্থী বুদ্ধিজীবী দেবপ্রসাদ ঘোষের মনে হলো, 'বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক

---

১ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫, ১৫০

২ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫, ১৬৭, ১৬৯, ৩২৬, ৩২৭

৩ সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮-৪১৯, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৪ অপর্ণা বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-৩৯, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত

Status এ...অসামান্য উন্নতিসাধন করিয়াছেন' আর তার তুলনায় হিন্দুদের আজ 'পরম দুর্দিন'।[১]দুর্দিনের আরও কারণও খুঁজে পাওয়া গেল। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনাকর প্রসঙ্গ হয়ে উঠল জনসংখ্যা বৃদ্ধির বৈষম্য। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় দেখানো হয়েছিল, ১৮৭২ সালে হিন্দু জনসংখ্যা মুসলমানের চেয়ে চার লক্ষ বেশি ছিল ১৯০১ সালে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে ২৬ লক্ষ বেশি হয়ে গেছে। আর ১৯২১ সালে হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ২ কোটি ১ লক্ষের কিছু কম, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৪ লক্ষ।[২] এরপর ১৯৩০-র দশকে দেবপ্রসাদ ঘোষ দেখালেন, মুসলমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছে আর হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ। হিন্দুর সংখ্যা কমেছে, কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে বর্ধমান বিভাগের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি। মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথাও যে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, সে-কথাও বলেছিলেন দেবপ্রসাদ।[৩]

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমানরা তাদের দুরবস্থার জন্যে ইংরেজ এবং হিন্দু উভয়কেই দায়ী করত। ১৯২০-র দশকের পর দেখা যায়, হিন্দুরা মনে করছে, তাদের বড় দুর্দিন; আর ইংরেজদের সঙ্গে অভিযুক্ত হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সম্প্রদায়ও। হিন্দুরা যে শিক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছিল, তা অবশ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। অথচ এই এজেন্ডাই ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। যার ফলে ১৯২৫ সালে তৈরি হলো 'হিন্দু-মহাসভা'।

স্বদেশী ভাবাদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব থাকলেও মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। স্বদেশী নেতারা বরং বারবারই মুসলমানদের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে আহবান জানিয়েছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে পর্যন্ত বলা হয়েছিল, হিন্দু নেতারা মুসলমানদের এ ব্যাপারে রীতিমতো তোষণ করছেন।[৪]বরং মুসলমান পত্রপত্রিকার ভাষাই তখন ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) বিপর্যয়ের পর 'ইসলাম প্রচারক' লিখেছিল : '২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩ বৎসরে পা দিয়া যমের বাড়ি গিয়াছে।' হিন্দু স্বাদেশিকতাকে বলেছিল হিন্দু দেবদেবীদের মতোই 'প্রাণহীন জড়'।[৫]

সমকালে স্বদেশী আন্দোলনের সহায়করূপে বাংলায় অনেক স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। ফলে বাংলার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হিন্দু সমাজে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ফলে তাঁদের আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য, একটা পর্যায়ে অধিকাংশ মুসলমান তাদের শ্রেণিস্বার্থের বিরুদ্ধ মনে করে এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়, এমনকি চরম বিরুদ্ধতাও প্রকাশ করে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম' সংগীত এবং 'আনন্দমঠ' (১৯৮২) উপন্যাস উদ্দীপকের কাজ করে। কংগ্রেসের জাতীয় সংগীত ও 'বন্দে মাতরম' আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নানা কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে অন্যতম 'বন্দে মাতরম' সংগীত নিষিদ্ধ করে দেয়া। আর মুসলমানদের এক প্রকার সচেতন করে দেয়া হয় যে, এর মধ্যে পৌত্তলিকতা রয়েছে বলে এ গান গাওয়া তাদের পক্ষে অনুচিত।

---

১ দেবপ্রসাদ ঘোষ, *হিন্দু কোন পথে*, স্বদেশবাণী ভবন, কলকাতা ১৯৩৪, পৃ. ৫১-৭৩

২ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *হিন্দু ডুবিল*, কমলা বুক ডিপো, ১৯২৩, পৃ. ৩২-৩৯

৩ দেবপ্রসাদ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩

৪ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, *অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবী মানস*, পৃ.৮৪-৮৫, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৫ *জীবন ও জনমত*, পৃ. ১৯৮-১৯৯ ,২০৭

ফলে ‘বন্দে মাতরম’ সংগীতের প্রতি হিন্দুদের আগ্রহ প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা এর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

সমকালীন মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলনকে ধর্মবিরুদ্ধ আখ্যায়িত করে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় ১৯০৭ সালে প্রকাশিত বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> বর্তমান বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় বিচার আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ। সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রেও আমরা ধর্মানুশাসনের অধীন। ইসলাম ধর্ম কি আদেশ দেয় কাহারও বিদেশীয় জিনিস আগুনে পোড়াইয়া ফেল, পানিতে ডুবাইয়া দাও, ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া নষ্ট কর, কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া উৎসন্ন দাও? ইসলাম ধর্ম কি শিক্ষা দেয় যে, নিজের দেশে বিদেশীর পণ্য দ্রব্য আইসার পথ বন্ধ কর, বিদেশীয় বাণিজ্যের গতিরোধ কর? কখনোই নয়। এরূপ অস্বাভাবিক আদেশ ইসলাম ধর্মে কুত্রাপি নাই – থাকিতেও পারে না। বরং এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা পাপার্জন হয়।[১]

স্বদেশী আন্দোলনকে ‘ধর্মবিরোধিতা’ মনে করার পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকেও মুসলমানরা দূরে সরে রইল। কারণ, এই আন্দোলনকে তারা মনে করেছিল মুসলিম-স্বার্থবিরোধী। ছাত্রসমাজকে দমন করার জন্য স্কুল কলেজে সরকারি তরফ থেকে নানারকম নির্দেশনা পাঠানো হলো। একটি সার্কুলারে বলা হলো, কোনও ইংরেজ বা মুসলমান অভদ্র আচরণের অভিযোগ করলেই গ্রেফতার করা হবে।[২]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), সখারাম গনেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০), নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) প্রবন্ধ রচনা করে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৬১-১৯২৭) প্রমুখ গল্প ও উপন্যাস লিখে বাঙালির চিত্তলোককে বিকশিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে তা হিন্দু বা মুসলিম মানসে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি।[৩]

স্বদেশী আন্দোলনের সহিংসতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন, তিনি এই অমানবিকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক চারিত্র্যসম্পন্ন আন্দোলনকে সমর্থন করতে চাননি। ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরমপন্থীরা বিভক্ত হওয়ার পর সরকারও চরমপন্থীদের সহিংস আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে নেতাদের নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি অসন্তোষ দমনের জন্য বিস্ফোরক আইন, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন, প্রেস আইন, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সভাসমিতি সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি জারি করা হয়। পরিণামে আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্য পথ ছেড়ে গুপ্ত পথ ধরে। এই গুপ্ত আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন নামে।

---

১ এবনে মায়াজ, ‘ভাই মুসলমান জাগ’, *ইসলাম প্রচারক*, ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা মাঘ ১৩১৪, উদ্ধৃত, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ১৬৬

২ চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, ‘বন্দে মাতরম ও স্বদেশী আন্দোলন’, *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৯৫, পৃ. ২৫

৩ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৩০৮-১৩২১)*, বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮

এসময় শিক্ষিত বেকার যুবকদের হতাশাজনিত অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের কৃষক শ্রমিকদের মধ্যেও। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলন তখন আর মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারছিলো না। নতুন, চরম, উগ্র নেতাদের জনপ্রিয়তা তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতদিন মধ্যপন্থীরা নির্ভর করেছিলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর। চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে দিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র ও কৃষক মজুরদের মধ্যে, ব্যাপকতর সামাজিক পরিসরে।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ও বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) আদর্শে, বন্দেমাতরমের শিহরণে, বালগঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) সাংগঠনিক তৎপরতায়, গণেশ-শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে উগ্র স্বাদেশিকতার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও ভাবনার পরিবর্তন করে প্রচার করেছিলেন আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তির মন্ত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। 'বয়কট ইস্যু'-র ফলে ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' এবং 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ'। ক্রমে সারাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিপীড়নের প্রতিবাদে।

এই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনকারী চরমপন্থীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'কেশরি' পত্রিকায় তিলক লিখেছিলেন, 'জাতি হিসেবে আমরা পল্লবিত বৃক্ষ, স্বরাজ তার মূলকাণ্ড, 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' তার শাখা-প্রশাখা।'[১] তাই বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। জনসাধারণকে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন। সংগ্রামের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁরা টেনে আনতে সক্ষম হন মহিলাদেরকেও। প্রচার-প্রচারণায় তাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন অনেক অভিনব পদ্ধতি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য থেকে বাহুবলে ব্রিটিশকে এদেশ থেকে উৎখাত করার অঙ্গীকারও দৃঢ় হয়।

মুসলমানের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবও দানা বাঁধে ১৯১১ থেকে। এসময় বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমিয়ে দেবার জন্য রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বাংলার মুসলমানকে খুশি করার জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়, এবং মুসলমানদের চাকুরির সুযোগ দেয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদের কথা জানা গেলেও দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের কোনও প্রতিবাদ হলো না। কারণ সেক্ষেত্রে অবাঙালি হিন্দুদের আগ্রহ ছিল না। আঞ্চলিকতার স্বার্থে তাতে বরং তাঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

বাংলা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয়ায় বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। একারণে এককালে যে বাংলা সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, সে বাংলার গুরুত্ব কয়েক ধাপ নিচে নেমে যায়। ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই তিন দশকের ব্যবধানে অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য বিস্তার করে বসে।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মুসলিম মধ্যবিত্তের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার আর একটি কারণ ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয়। তুরস্কের সুলতানকে ভারতীয় সুন্নি মুসলমানেরা তাঁদের ধর্মীয় নেতা মনে করতেন। ধর্মীয় টান থেকেই ডা. আনসারীর নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানেরা বলকান যুদ্ধে মেডিকেল টিম প্রেরণ করেছিলেন তুরস্ক বাহিনীর সেবার জন্য। কিন্তু তুরস্কের পরাজয়ের পর ভারতের মুসলমানরাও পরাজয়ের গ্লানি বোধ করতে থাকেন। এরপর থেকে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি ইংরেজবিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে বাসনা জেগেছিল, ইংরেজ শাসনাধীনে এবং তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থায় তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করাতে পারছিল না বিধায় তাঁদের চিত্তে অস্বস্তি ও বিক্ষোভ প্রবল হয়েছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে ১৯০৯ সনে সরকার পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে বরং তাঁদের দাবি জোরদারই হয়েছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যায় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন সমাজব্যবস্থার ধরন ও চেতনার স্তরও পাল্টে যায়। এই যুগেই ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এবং ১৯১৬ সালে মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে বহুল পরিচিত মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ((১৮৭৬-১৯৪৮)), আর কংগ্রেস নেতৃত্বে পিতা মতিলাল নেহেরুর (১৮৬১-১৯৩১) স্থলাভিষিক্ত হন জওহেরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪)।

১৯২০-র দশক থেকে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার ভাষাও তীব্র হতে দেখা যায়। মুসলিম লীগের মদদে মোল্লাসমাজের প্ররোচনাময় প্রচার, স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে কয়েকটি দাঙ্গা, মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ মিলেমিশে এই মতই প্রবল হয়ে উঠল যে, মুসলমানদের যদি একটা নিজস্ব দল থাকে, হিন্দুদেরই বা থাকবে না কেন! প্রস্তাবিত হিন্দু-মহাসভা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছিলেন : 'মুসলমানদের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দিই নি, সে-স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। ... আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে ?' মুসলমানদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং তারা 'ইচ্ছেমতো' হিন্দুদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করছে–এই দুটি বিষয়ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন।[১]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো ধর্মান্তরণও এই সময় একটি উত্তপ্ত তর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। কট্টর ধর্মপন্থীরা এমন ধর্মান্তরণে মদদ দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আর একটি উত্তেজনার বিষয় হলো : বঙ্গে নারী-নির্যাতন। নারী-অপহরণ এবং লাঞ্ছনার ঘটনা এই সময় খুব বেড়ে গিয়েছিল। 'সঞ্জীবনী'-র মতো পত্রিকা প্রচার করে যে, আক্রমণকারীরা প্রধানত মুসলমান। 'প্রবাসী' অবশ্য লিখেছিল, অপহরণকারীদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরাই আছে এবং 'দুষ্ট লোকেদের বাস্তবিক কোন ধর্ম নাই।'[২] শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালার নারী নিগ্রহ'-ও তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নারীরাই নিগৃহীত হচ্ছেন এবং দুর্বৃত্তরা শুধু মুসলমান নায়।[৩]

---

১ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: আনন্দবাজার পত্রিকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৮-২৬০

২ *প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৩৫, আশ্বিন ১৩৩৬, উদ্ধৃত, *বিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৩ পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ, *বাঙ্গালায় নারী নিগ্রহ*, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪ [প্রথম প্রকাশ-১৯৩৬] পৃ. ৭, ১৯

শিক্ষায় হিন্দু প্রভাব নিয়ে মুসলমানের ক্ষোভ বহুকালের। সেই শোধ তারা নিতে শুরু করেছিল ১৯২০-৩০-র দশক থেকেই। মুসলমান লেখকদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক লেখানো হচ্ছিল এবং পাঠ্যবিষয়ে ইসলাম ধর্মতত্ত্বই প্রাধান্য পাচ্ছিল। মক্তব-মাদ্রাসাগুলি হয়ে উঠছিল মুসলিম পুনরুত্থানবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কেন্দ্র।[১] ধর্মচেতনায় সম্পৃক্ত এই শিক্ষার সমালোচনা সওগাতের মতো পত্রিকাতেও পাওয়া যায়।[২] ১৯৪০-র দশকের গোড়ায় মধ্যশিক্ষা বিল নিয়ে দুই সম্প্রদায়ই এক উত্তপ্ত বিতর্কে মেতে ওঠে। হিন্দুদের আশঙ্কা হয়, মুসলিম লীগ সরকারের হাতে শিক্ষার ইসলামিকরণ হয়ে যাবে।

এ সময়ের নেতৃত্বে গান্ধী-জিন্নাহ-নেহেরু সকলেই ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আলোকিত ব্যক্তিত্ব এবং দৃপ্ত সম্মোহনী রাজনৈতিক শক্তির ধারক ও বাহক। এঁদের সঙ্গে ছিলেন বাংলার নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) প্রমুখ। বলকান যুদ্ধ (১৯১২), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০৮-১৮), হোমরুল লীগ-(১৯১৬), লক্ষ্মৌ-চুক্তি (১৯১৬),মন্টেগু- চেম্‌সফোর্ড সংস্কার (১৯১৭) প্রভৃতি একালের রাজনৈতিক উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করে চলছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) সংঘটিত হবার পর সরকার বাধ্য হয়েই রাজকীয় ঘোষণা ও রাউলাট আইন পাস করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত ও তৎসূত্রে অসহযোগ আন্দোলন দেশে নতুন বিপ্লবী ধারার সূচনা করে। আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে ১৯১৭-তে রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ভারতের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন তখন নতুন প্রাণস্পন্দন প্রাপ্ত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় (১৯২১) পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে একযোগে 'স্বরাজ দল' গঠন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)-সহ অনেক যুবনেতা এই রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সনের নির্বাচনে স্বরাজ দলের নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাশ। আবদুল করিম ছিলেন এর উদ্যোক্তা। চুক্তি অনুসারে আইন পরিষদের নির্বাচনে জনসংখ্যানুপাত ও পৃথক নির্বাচন স্বীকৃত হয়। মুসলমানদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ায় এই চুক্তির এবং দেশবন্ধুর অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়। কিন্তু ১৯২৫ সনে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে, কংগ্রেস নেতাদের সংকীর্ণ চিন্তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ রুদ্ধ হয় এবং হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয় পর পর তিনবার। পরবর্তী বছরগুলোতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে জোরদার হয় (হিন্দুদের) আর্য সমাজীদের 'শুদ্ধি' অভিযান এবং বিপরীতে মুসলমানদের 'তাবলিগ' ও 'তানজিম' আন্দোলন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বিপরীতমুখী চিন্তা-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে নগর কলকাতায় ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দিয়ে এই পত্রিকাটি বরাবরই সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে। মুসলমানদের কল্যাণসাধন পত্রিকাটির উদ্দেশ্য হলেও এটি কখনো হিন্দুদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেনি, এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোনো লেখা প্রকাশ করেনি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীর কল্যাণ-কামনাই ছিল পত্রিকাটি প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

---

১ অপর্ণা বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৯

২ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা (১৮৩১-১৯০০)

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ১৮৩১ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ, এ বছরেই (২৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত হয় কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'। বছর দেড়েক চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল সাপ্তাহিক; দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্ট 'বারত্রয়িক' রূপে (সপ্তাহে তিনবার) এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ এর ১৪ জুন এটি দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৩ থেকে পত্রিকাটির একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১] ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ (২৫ ফাল্গুন, ১২৩৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বাঙালি মুসলমান পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। একই বৎসরে স্বল্পকালের ব্যবধানে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' পত্রিকার চরিত্রগত ব্যবধান ছিল বিস্তর। যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্যে 'সংবাদ প্রভাকরে'র উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, 'সমাচার সভারাজেন্দ্রে'র ক্ষেত্রে তা একেবারেই ছিল অনুপস্থিত। শুধুমাত্র সমাচার প্রচার ব্যতীত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'র আর কী নীতি বা উদ্দেশ্য ছিল, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তা বিজ্ঞাপিত করেননি। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ, অর্থাৎ 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' পত্রের প্রথম প্রকাশকাল পর্যন্ত, এই তেরো বৎসরে সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজে রীতিমত সচেতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে।[২] সেক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ ছিল একেবারেই নিস্পৃহ। তবুও উনিশ শতকের প্রারম্ভযুগে, প্রতিকূল এক সমাজপরিবেশে মুসলমান পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এই সংবাদটাই বিস্ময়কর। পত্রিকাটি প্রতি সোমবার ফারসি এবং বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হতো। এটিতৎকালীন প্রগতিশীল ধর্মান্দোলনকে (ব্রাহ্মসভা) সমর্থন না করে বরং গোঁড়া হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলদেরই পক্ষাবলম্বন করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় 'সমাচার চন্দ্রিকা', তিমির নাশক' প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীল পত্রিকায় 'সভারাজেন্দ্র'র সমর্থনসূচক প্রশংসাবাক্য রচিত হয়েছে। 'তিমির নাশক' মন্তব্য করেছে :

> এক্ষণে নতুন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ-ধর্মপক্ষে আছেন।[৩]

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শেখ আলীমুল্লাহ প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন।[৪]

মুসলিম সাময়িকপত্রের সূচনায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিল, এমন কথা বলা চলে না। চরিত্রে খানিকটা রক্ষণশীল হলেও এটি বাঙালি মুসলমানের মুখপত্র হয়ে কাজ করেছিল বলা যায়।মুসলমানদের মতামত, অভাব-অভিযোগ সব এখান থেকেই প্রচারিত হতো। এতদ্বিষয়ে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মন্তব্য এখানে উদ্বৃতিযোগ্য :

---

১ স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (১ম খণ্ড)*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৮

২ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২-৩

৩ 'সমাচার দর্পণ', ২১ জানুয়ারি ১৮৩২, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা,মাঘ ১৪১০, পৃ. ১৮২

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র* (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্যৎ, কলকাতা, মাঘ ১৪১০, পৃ. ৩৯

> বাংলা সাময়িকপত্র সাধনার ইতিহাসে 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের সমসাময়িক একজন বাঙালি নাগরিক মুসলমান সাংবাদিকতার পেশায় সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল হয়েছেন এবং প্রায় চার বৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল মুসলমান পরিচালিত প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক, এ তথ্যই বা কম মূল্যবান কিসে ?[১]

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' দেখে বাঙালি মুসলমান সাংবাদিকতায় উৎসাহবোধ করে।তবে বাংলার চেয়ে ফারসিতে দখল বেশি থাকায় এবং ফারসি ভাষার সঙ্গে নৈকট্য বেশি বোধ করায় তাঁরা ফারসি পত্রিকা বের করতে উদ্যোগী হন।[২]

বাংলা পত্রিকার শুভ সূচনার কয়েক বছরের মধ্যেই (১৮৩৩-১৮৩৫ খ্রি.) বাঙালি মুসলমানের হাত দিয়ে পরপর তিনটি ফারসি কাগজ বের হয়; আইন-ই-সিকান্দার (১৮৩৩-৪০) মাহ-ই-আলম আফরোজ (১৮৩৩-৪১), সুলতান-উল-আখবার (১৮৩৫-৪১)।[৩]

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশের চৌদ্দ বছর পর (১৮৪৬) প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত আরেকটি পত্রিকা হচ্ছে 'জ্ঞানদীপক'; এটি দ্বিভাষিক সাময়িকপত্র। মৌলবী আলী সম্পাদিত পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ আর কিছু জানা যায় না।[৪] পরের বছরে (১৮৪৭) প্রকাশিত 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'কে অনেক গবেষক মুসলমান সম্পাদিত দ্বিতীয় সাময়িকপত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'র বিলুপ্তি ঘটে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই, তারপর থেকে ১৮৪৬ বা ১৮৪৭-এর পূর্বপর্যন্ত মুসলিম সমাজে সাংবাদিকতার উদ্যোগ পরিলক্ষিত যায়নি।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। খ্রিস্টান মিশনারি, রক্ষণশীল হিন্দু, উদারনৈতিক ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মতবিরোধ,বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্যধারা ও পাশ্চাত্য ধারার মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল দ্বন্দ্ব। সতীদাহ প্রথা সরকার কর্তৃক আইনবিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত হয়ে ওঠে সনাতন হিন্দুসমাজ।এসময় সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশ তৈরি হয়, প্রগতিপন্থী ও সনাতনপন্থীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের যে মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয় তার মূলে ছিল সাময়িক পত্রিকা। ১৮৩১-১৮৪৬ পর্বে এই ব্রাহ্ম-খ্রিষ্টান-হিন্দু বাঙালির জনমত সংগঠনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে যে সব পত্রপত্রিকা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'সংবাদ প্রভাকর', ব্রাহ্ম সমাজের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের 'জ্ঞানান্বেষণ'।[৫]

ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্যার সংস্পর্শেসমকালে হিন্দু সমাজে যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটেনি। ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃবর্গের উদ্যোগে অবশ্য গ্রামবাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী জনমতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে সাংবাদিকতার মতো নগরকেন্দ্রিক একটি আধুনিক প্রয়াস সাধন করা সম্ভব ছিল না। তবে তৎকালে সরকারের শিক্ষানীতি

---

১ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

২ সালাউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজচিন্তা ও সমাজ বিবর্তন* (১৮১৮-১৮৩৫), আইসিবি, ঢাকা, এপ্রিল ২০০, পৃ.৮৯

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

৪ কেদারনাথ মজুমদার, *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য*, সম্পাদনা, দিলীপ মজুমদার, তমোরি প্রকাশন, কলকাতা ২০০2 গ্রন্থের নির্ঘণ্টে উল্লেখিত তালিকায় পত্রিকাটির নাম দেখা যায়।

৫ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*,প্রাগুক্ত, পৃ.৯

এবং আদালতের ভাষাসম্পর্কিত নীতিকে কেন্দ্র করে নগর কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া অবশেষে সংহত জনমতের অবয়ব ধারণ করে। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি এক সরকারি প্রস্তাবে ক্যালকাটা মাদ্রাসা থেকে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। দিন কয়েক পরেই (২ ফেব্রুয়ারি১৮৩৫) মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) যে পরিকল্পনা দাখিল করেন তাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে এ কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, কমিটি কর্তৃক আরবি পুস্তকাদি মুদ্রণ অবিলম্বে বন্ধ করা হোক এবং ক্যালকাটা মাদ্রাসা অবলুপ্ত করা হোক। এর ফলে কলকাতার মুসলিম সমাজে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মেকলের প্রস্তাবের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে মুসলিম জনসাধারণ এবং ৮৩১২ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক গণ আবেদনপত্রের মাধ্যমে তা চালু রাখবার প্রার্থনা জানানো হয় গভর্নর জেনারেলের নিকট। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করবার নীতিটিও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অপরদিকে 'সমাচার দর্পণ', 'রিফর্মার', 'এনকোয়েরার', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি সাময়িকপত্র একযোগে দাবি করেছিল যে মফস্বলের আদালতসমূহ থেকে ফারসি ভাষাকে বিলুপ্ত করা হোক। শুধু তাই নয়, এই দাবি উত্থাপন করে কলকাতার ৬৯৪৫ জন হিন্দু অধিবাসীর স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের নিকট প্রেরিত হয়।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' অনুরূপ 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'ও বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র প্রকাশনার একটি বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। প্রতিবেশী সমাজের ব্যাপক সাময়িকপত্র আন্দোলন থেকে প্রেরণা লাভ করেন সেকালের কোনো কোনো উদ্যোগী মুসলিম নাগরিক। ১৮৪৬-এ 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' প্রকাশের পশ্চাতে এ-জাতীয় প্রেরণাই ক্রিয়াশীল ছিল।[১] সমকালীন 'সম্বাদ ভাস্কর', 'Calcutta Review' এবং 'Friend of India' পত্রিকায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্করে'র উল্লেখ রয়েছে। এসব পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে 'জগদুদ্দীপক ভাস্করে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালেরর ১১ জুন।[২] একই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত হয়েছিল পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প। এক অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করে মৌলবি ফরিদউদ্দীন খাঁ জানিয়েছিলেন যে, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি ও উর্দু–এই পাঁচ ভাষায় মুদ্রিত হবে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'। 'সম্বাদ ভাস্কর' জানায় যে, পত্রিকার ইংরেজি নামকরণ হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান সান' আর ফারসি নাম 'দফ্‌ত বেওয়াকেয়াত'। দ্বিভাষিক বা ত্রৈভাষিক সাময়িকপত্রের সংবাদ ইতঃপূর্বে শোনা গেছে, কিন্তু পঞ্চভাষিক সংবাদপত্র পূর্বে বা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হওয়ার নজির নেই। অবশ্যই এই প্রয়াস দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক ছিল। সমকালীন সাময়িকপত্রসমূহ এ প্রসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে। 'ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া' জানায় যে, এই জাতীয় পরিকল্পনা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার।[৩]

'জগদুদ্দীপক ভাস্করের' মুদ্রণ, প্রকাশনা ও সম্পাদনা সংক্রান্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্র মুদ্রিত হতো নিজস্ব মুদ্রণালয় Indian Sun Press থেকে, প্রকাশ করতেন মৌলবি নাসিরউদ্দীন। সম্পাদক কে ছিলেন সে সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সম্পাদক হিসেবে একটি নাম পাওয়া যায় মৌলবি রজব আলি।[৪] মৌলবি ফরিদউদ্দিন আহমদ, মৌলবি নাসিরউদ্দিন কিংবা মৌলবি

---

১ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২ উদ্ধৃত, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩ উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্রোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (১ম খণ্ড), মাঘ ১৪১০, পৃ. ৮৯

৪ *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

রজব আলি–একরম এক বা একাধিক ব্যক্তি 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পরিচালনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা হয়।

দীর্ঘ তেরো-চৌদ্দ বছরের ব্যবধানেফরিদপুর থেকে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত 'ফরিদপুর দর্পণ' (১৮৬১) নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়। সম্পাদক শ্রী আলহেদাদ খাঁ। তবে এটি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি-না তা নিশ্চিত হওয়া যায় না।[১]

তৎকালীন বরিশাল জেলার মাদারীপুরের গোপালপুর গ্রামের সৈয়দ আবদুর রহিম ('ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর' গ্রন্থের রচয়িতা, প্রকাশকাল: ১৮৭০) 'বালারঞ্জিকা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।[২] 'ঢাকা প্রকাশে' (১৬ বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ) এর সমালোচনা বের হয়। এবরম আরো একটি পত্রিকা 'মানিকগঞ্জের অন্তর্বর্তীগ্রাম পারিল থেকে' মৌলবি আনিছউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় পাক্ষিক সাময়িকী 'পারিল বার্ত্তাবহ' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ, পৌষ ১২৮১) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি খুব বেশিদিন টেকেনি।[৩]

উনিশ শতকের প্রধান মুসলমান গদ্য সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশের দুবছরের ব্যবধানে 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হুগলি কলেজের মুসলমান ছাত্রদের সহযোগিতায় তিনি পাক্ষিক পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। যুগসচেতন শিল্পী মশাররফ হোসেন সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পত্রিকা ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পর মে মাসের প্রথম তারিখেই 'এডুকেশন গেজেটে' 'আজীজন নেহার' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় :

> এই পত্রিকা কয়েকজন মুসলমান যুবকের লেখনী বিনির্মুক্ত সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। দেখুন, যে মুসলমানদিগের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা পুনর্ব্বার আত্যন্তিক প্রভায় উদিত হইয়াছে, যাহাদের জন্য অত্যল্পকাল স্বদেশ-প্রতি-নিবৃত্ত ক্যাম্বেল বাহাদুর সুমিষ্ট, সরল, সংস্কৃতালঙ্কৃত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তে শ্রুতিকঠোর হিন্দি-পারসী-কলঙ্কিত আদালতী বাঙ্গালার প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যাম্বেলপ্রিয় মহম্মদীগণ মধুময় বাঙ্গালাভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেবল সমর্থ হইয়াছেন।'[৪]

একইভাবে কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৬-১৮৯৬) পরিচালিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র (১৮৬৩) একটি সংখ্যায় (জুন ১৮৭৪) 'নূতন পুস্তক ও পত্রিকা' শীর্ষক আলোচনায় লেখা হয় :

> 'আজীজন নেহার' মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা। আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখকগণ আমাদিগের পরিচিত, এই ইহাদের নবোদ্যম নহে, তবে সাহস করিয়া পত্রিকা

---

১ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৩৩৩

২ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩২৪

৩ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্র সাধনায় বাঙালি মুসলমান : প্রথম পর্ব*, স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫৯

৪ উদ্বৃত, কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি. ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৩৭

> প্রচার করা নূতন বটে। ইহারা যে গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহা সংসিদ্ধ হইবার যদিও বিস্তর অন্তরায় লক্ষিত হয়। তথাপি 'আজীজন নেহার' দ্বারা তাহার কিছু না কিছুনিবাকৃত হইবে, এইরূপ আশা বিড়ম্বনার বিষয় নহে।ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয় না; এমন কি অনেক আধুনিক লেখকের লিপিচাতুর্য্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি। যাহা হউক আমরা লেখকদিগকে একটি অনুরোধ করিব। এতাদৃশ বৃহৎ সমুদ্র উত্তরণ করিতে হইবে। একটু মৃদুগতি অবলম্বন করিবেন, আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে তাড়াতাড়ি করিয়া শেষে মাঝখানে নিমগ্নও হন।[১]

'আজীজন নেহার' পত্রিকা খুব বেশিদিন চলেনি। তবে এতে প্রকাশিত 'প্রস্তাব' বা প্রবন্ধগুলো যে 'মুসলমান সম্প্রদায়ের' কল্যাণার্থে লিখিত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

'মহাম্মদি আখবার' (১৮৭৭) নামে অর্ধ-সাপ্তাহিক দ্বিভাষী (উর্দু-বাংলা) সাময়িকপত্র কাজী আবদুল খালেকের সম্পাদনায় '২৪ পরগনা জেলার সিয়ালদহ পল্লী' হতে ১৮৭৭ সালের ৪ জুন আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশের ৬ মাস আগে রুশ-তুর্কি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই পত্রিকাটির জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালের ২৯ মার্চ থেকে সাপ্তাহিক আকারে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। রুশ-তুর্কির মধ্যে 'সান স্টেফানো' চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অল্পকাল পরে 'মহাম্মদি আখবার' বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদ প্রচার পত্রিকাটির মৌল প্রেরণা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে পত্রিকাটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। সেকালের দেশি-বিদেশি বিবিধ পত্রিকা থেকে যুদ্ধ সম্পর্কিত খবর, টেলিগ্রামের খবর, হরেক রকমের খবর, বিজ্ঞাপন, ইস্তেহার ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা হতো। পত্রিকাটি সাময়িকপত্রের দায়িত্ব পালন করেছে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারে-কাছে যায়নি। 'মোহাম্মদি ছাপাখানা' নামে সম্পাদকের নিজস্ব প্রেসে এটি মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটির ভাষা আরবি-ফারসি মিশ্রিত। 'সংবাদ প্রভাকর' উক্ত পত্রিকা প্রকাশে যেমন উৎসাহ প্রদান করেছে, তেমনি পত্রিকায় ব্যবহৃত ভাষার সমালোচনাও করেছে। এর জবাবে 'মহাম্মদি আখবারে' লেখা হয় (২০ জুলাই ১৮৭৭) :

> অত্র আখবারের বাঙ্গালা ভাষা কেবল সাধারণ মোসলমানগণের জ্ঞাপন জন্য। কেননা তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং সাধারণ মুসলমানি ভাষা যাহাতে বর্ণশুদ্ধি, স-কার, ন-কার ভেদ এবং সন্ধি আদি কিছুমাত্র নাই, তাহা পূর্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

সাহিত্য ও ভাষা সৃষ্টিতে 'মহাম্মদি আখবার' ব্যর্থ হলেও পত্রিকা হিসেবে এর মৌলিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। তুর্কি সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের চিত্তে আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল পত্রিকাটি। সম্পাদক কাজী আবদুল খালেক নবাব আবদুল লতিফের কাছে থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়।[৩]

১৮৮২-র জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে 'মহামেডান অবজার্ভার' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ছিল 'A weekly newspaper of Politics,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮
২ আবদুল কাদির, 'মহাম্মদি আখবার', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ২১
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯-৩৮০

Literature and Society'। এটি ছাপা হতো কলকাতার উর্দু গাইড প্রেসে। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম কিছুদিন এটি সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে মৌলবী আবদুল হামিদ বিএ এটির স্বত্বাধিকারী হন। ১৮৯৪ এর নভেম্বর মাসের পর তিনি পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট এই পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ পত্রিকাটি প্রচার করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষপাতী ছিল এটি। বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান সমাজ কতখানি সম্ভ্রমের চোখে দেখেন, তাঁর প্রয়াণের পর এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা থেকে তা জানা যায়।[১]

ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে যে মুসলমানরা ছিলেন সমাজের পুরোভাগে, একশো বছর ধরে পিছু হটতে হটতে তাঁরা একেবারে খাদের কিনারায় চলে আসে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষা ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে একতা ও উদ্দীপনা থাকা যে কতোবেশি প্রয়োজন তা বুঝতে পেরেছিল 'মহামেডান অবজার্ভার'। পত্রিকাটির মতে, উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা যদিও খুবই কম, তবুওতাদের এগিয়ে আসতে হবে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়কে আলোর পথ দেখাতে। সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় অনাগ্রহ, সভা-সমিতি গঠনে উৎসাহহীনতা ও সংবাদপত্র পাঠে বাঙালি মুসলমানের অনীহার সমালোচনা করে পত্রিকাটি।[২]

মীর মশাররফর 'গো জীবন' আর নইমুদ্দীনের 'গো কাণ্ড' নিয়ে বিরোধের সময় 'মহামেডান অবজার্ভার' প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়। মশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে নইমুদ্দীনের ভূমিকা পত্রিকাটির ভালো লাগেনি। আইন করে গো-হত্যা বন্ধের বিরুদ্ধে ছিল পত্রিকাটি। কারণ এটি মুসলমানদের প্রধান খাদ্য। তবে একে উপলক্ষ্য করে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মনে আঘাত না করতে পত্রিকাটি মুসলমানদের অনুরোধ জানায়।[৩]

'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪) মাসিক পত্রিকা হিসেবে বাংলা ১২৯১ সনের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের (১৮৩৮-১৯০৮) সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ করে পত্রিকাটি। করটিয়ার 'মাহমুদিয়া যন্ত্রে' মীর আতাহার আলীর উদ্যোগেএটি মুদ্রিত হয়। প্রথম দশ বছর চলার পর এটি মাঝে দু-বছর বন্ধ থাকে, ১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে নবপর্যায়ে এর প্রচার আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্পকাল পরে পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[৪]

'আখবারে এসলামীয়া'র (নবপর্যায়) নামের নিচে লেখা হতো 'উপদেশ, ধর্ম মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত, প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্মিলিত মাসিক পত্রিকা'। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> এসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত প্রেরিত পত্র, নতুন সংবাদ ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে প্রকাশ হইবে।[৫]

---

১ স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, কলকাতা, বুক্‌স ওয়ে, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৭০-৭১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৪ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৫, ১৫

৫ *আখবারে এসলামীয়া*, বৈশাখ ১৩০২, উদ্বৃত, *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষদের জীবনী, পুরাকথা, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে দুটি বিষয় পত্রিকায় গুরুত্ব পেয়েছে সে দুটি হলো: আহলে হাদিস-হানাফি দ্বন্দ্ব এবং গোবধ-গোরক্ষা দ্বন্দ্ব। ঐ সময় আহলে হাদিস মতবাদ ও গোরক্ষা নীতির সমর্থনে 'আহমদী'তে প্রবন্ধ ছাপা হতো। আখবারে এসলামীয়া'য় তার প্রতিবাদ করা হতো। মতামত প্রকাশে 'আখবারে এসলামীয়া' প্রধানত রক্ষণশীলতা এবং 'আহমদী' উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

মোহাম্মদ নইমুদ্দীন স্বয়ং ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হানাফি সম্প্রদায়ের পক্ষে ও আহলে হাদিস বা লা-মজহাবিদের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ধর্মীয় বক্তৃতাতেও এ নীতি অনুসরণ করতেন। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের যেসব প্রভাব মুসলমান সমাজকে কলুষিত করেছিল, তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন তিনি। 'আখবারে এসলামীয়া'র নীতি ব্যাখ্যা করে ড. কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন :

> সাহিত্য চর্চা নয়, ধর্মান্দোলনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শরা শরীয়ৎ সংক্রান্ত রচনাই ছিল পত্রিকার প্রধান অবলম্বন। করটীয়ার বিখ্যাত জমিদার খান পন্নী পরিবারের সাহায্য ও সহানুভূতি এর পেছনে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল।[১]

'আখবারে এসলামীয়া' সম্পর্কে সমকালীন 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় :

> আমরা 'আখবারে এসলামীয়া' নামক পঞ্চমাস বিশিষ্ট মাসিক সহযোগীকে সাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহা কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে। ইহার লেখা প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যাহা হউক আমাদিগের উন্নতি হইবে বলিয়া আজকাল একটু ভরসা হইতেছে। এসলামীয়ার কার্য্যদক্ষতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। (২৭.১০.১৯৮৪)[২]

একই বছর 'মুসলমান' (১৮৮৪) নামক সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন 'ইন্ডিয়ান ইকো' পত্রিকার সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদকে (১৮৬২-১৯৩৩) সম্পাদক করে সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর (২৫ ভাদ্র ১২৯১)।স্বল্পাকৃতির এই পত্রিকাটি প্রতি সোমবার কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এই পত্রিকাটি চা-বাগানের কুলি-কামিনদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের ঘোর বিরোধী ছিল। 'মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা-স্বল্পতায় হতাশা ব্যক্ত করা হয় :

> বঙ্গদেশের অধিবাসী সমষ্টির মধ্যে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৩২ জন। বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণ মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা শতকরা ১৪ জন মাত্র। যদিও গভর্ণমেন্ট সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি অনেক উন্নতি হইয়াছে, তথাপি মুসলমানের উচ্চ শিক্ষা লাভে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। ১৮৭১ এ যত পশ্চাতে ছিলেন, এখন বরং তাহা অপেক্ষাও অধিক পশ্চাতে।[৩]

পত্রিকাটি প্রকাশের তিন-চার মাস পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

---

১ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
২ *মুসলমান বন্ধু*, ২৭.১০.১৮৮৪, উদ্বৃত : *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

'মুসলমান বন্ধু' (১৮৮৪) নামক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালের ১১ আগস্ট সোমবার। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত হতো। এর কার্যসম্পাদক ছিলেন সৈয়দ হাসিবুল হোসেন। পত্রিকাটি শুধু মুসলমান সমাজে সাদরে গৃহীত হয়নি, এর প্রকাশকে অভিনন্দিত করেছে বাংলার বিদ্বৎসমাজ। মুসলমান সমাজের নানা অভাব-অভিযোগের দিকে সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি পত্রিকাটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয়ে নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে। চা-কুলিদের সঙ্গে সাহেবদের অমানবিক ব্যবহার, জেলখানায় কয়েদিদের ওপর নির্যাতন, বিচারক্ষেত্রে সাদা-কালোর বৈষম্যসহ বিভিন্ন নিপীড়নমূলক আইনের কঠোর সমালোচক ছিল পত্রিকাটি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন করা কতটা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে পত্রিকাটি ছিল সন্দিহান। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী এই পত্রিকাটি মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিন্তু মূল্য প্রদানে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান অনীহায় পত্রিকাটি বিপাকে পড়ে যায়। যার ফলে ১৮৮৬ এর আগস্ট মাসের পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি।

তৎকালীন ত্রিপুরা, বর্তমান কুমিল্লা জেলার মহীয়সী নারী নবাব ফয়জুন্নেছার (১৮৩৪-১৯০৩) জনহিতকর কার্যাবলি সম্পর্কে 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকায় (৯.২.১৮৮৫) যে তথ্য প্রদত্ত হয়েছে তা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যায় :

> ত্রিপুরা জিলান্তর্গত লাকশ্যাম গ্রামে স্বদেশ হিতৈষিনী শ্রীমতী ফয়জন্নেছা চৌধুরানী মহোদয়ার জন্মভূমি। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া প্রজাপালন ও কর আদায় সম্বন্ধে অনেকানেক জমীদার অপেক্ষা অনেক প্রশংসনীয়। তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তাহার যশ সৌরভে সমগ্র ভারত আমোদিত। তিনি স্বদেশের উন্নতির জন্য যে যে সৎকার্য্য করিয়াছেন আমরা তাহার তালিকা দিলাম ঃ
>
> ১ম কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় মাসিক ৩২
>
> ২য় "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণের সভায় এককালে ৫০০
>
> ৩য় সুশ্রুত প্রকাশের সাহাযার্থে ১০০
>
> ৪র্থ কতিপয় মাসিক পুরাণাদি গ্রন্থে ১০০০
>
> ৫ম কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার উন্নতিকল্পে ৫০০
>
> ৬ষ্ঠ নিজ জমিদারীতে বার্ষিক ১০০০
>
> ৭ম অসহায়া রমণীদিগকে একেবারে অন্যূন ৩/4 হাজার
>
> ৮ম অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান বার্ষিক ১০০০
>
> ৯ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মোল্লা ফকির, মৌলবী, শিক্ষকদের দৈনিক দাতব্য ২০
>
> ১০ম নিজ বাটির ইংরাজিবঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় মাসিক ৬০
>
> এতভিন্ন আমাদিগকে এই পত্রিকাটির ক্রমোন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।-মুসলমান বন্ধু ৯.২.১৮৮৫[১]

---

১ *মুসলমান বন্ধু*, ৯.২.১৮৮৫, উদ্ধৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, পৃ. ৫৮৩-৫৮৪

সমকালীন 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকার কার্যসম্পাদক হাসিবুল হোসেনের একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করা যায় :

> ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও (আরব কিংবা পারস্যের ন্যায়) শতশত অত্যাশ্চর্য উপন্যাস বিষয়ক, কতিপয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পাদিত, উচ্চদরের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। গত বর্ষের আগষ্ট মাস হইতে চালিত ও আজকাল প্রায় তিন সহস্র বিলি হইতেছে। এ বর্ষের আগষ্টে আকার 'সোমপ্রকাশ' বা 'নববিভাকরের' ন্যায় বর্ধিত। ভারতের অর্ধাঙ্গস্বরূপ মুসলমান সম্প্রদায় কি রূপে ভারতের (কি হিন্দু কি মুসলমান) দুঃখে বা সুখে কাঁদে বা হাসে, তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক; আবার এ নূতন জিনিস পূর্ব্বে কখনও ছিল না। বার মাস নূতন নূতন উপন্যাস পাঠ। মূল্য অগ্রিম না দিলে অদেয়। শ্রী সৈয়দ হাসিবুল হোসেন, কার্য্য সম্পাদক, ভবানীপুর, কলকাতা।[১]

'ইসলাম' (১৮৮৫) নামে একটি ক্ষণজীবী মাসিক সাহিত্যপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এর সম্পাদক ছিলেন একিনউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)[২]

পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী' (১৮৮৬) আত্মপ্রকাশ করে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)। দেলদুয়ারের জমিদার পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী (১৮৫৫-১৯২৬) এ-পত্রিকার সাহায্যদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৯৬ সালে 'আহমদী ও নবরত্ন' নাম গ্রহণ করে এটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এতে অনুমিত হয় 'নবরত্ন' নামে কোন পত্রিকা 'আহমদী'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।[৩] ধর্ম ও সমাজের কথা এই পত্রিকায় প্রাধান্য পেতো। মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'আখবারে এসলামীয়া'র সাথে 'আহমদী'র বিভেদ ও দ্বন্দ্ব ছিল। বিশেষ করে, হানাফী-মোহাম্মদী বাহাস বা তর্ক-বিতর্ক এবং গরু খাওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে রকম তর্ক বিতর্কের নমুনা পাওয়া যায়, তাতে সমাজ ও ধর্মের বৃহত্তর কল্যাণ হতে পারে, এমন কোনো লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না।[৪]

তবে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশের আন্দোলন যখন কলকাতায়ও শুরু হয়নি, তখন টাঙ্গাইলের মতো একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর থেকে একই সময়ে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুকাল পরে মীর মশাররফের 'হিতকরী'ও সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। 'আহমদী'র সাথে যুক্ত 'গজনবী' পরিবার 'পন্নী' পরিবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিল। তাছাড়া মীর মশাররফ হোসেন এর সাথে যুক্ত থাকায় এর উদারনৈতিক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।[৫]

'নব সুধাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাস দেড়েক চালু ছিল। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)।

---

১ *সোম প্রকাশ*, ১০.৮.১৮৮৫ উদ্ধৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯

২ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

৪ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৫ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

পরের বছর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) যশোরের মাগুরা থেকে 'হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। মুন্সী গোলাম কাদেরের সম্পাদনায় পত্রিকাটি সাম্প্রদায়িক মিলনের বাণী প্রচার করে। পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হয়নি।[১]

'ভারতের ভ্রম নিবারণী ত্রৈমাসিক পত্রিকা' (১৮৮৯) নামে মুসলিম সম্পাদিত ও পরিচালিত একটি পত্রিকার তথ্য পাওয়া যায়। তবে বিস্তারিত আর কিছু জানা সম্ভব হয়নি।[২]

১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে 'সুধাকর' নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব বিষয়ের আলোচনাই থাকত। 'নূতন নূতন সংবাদ'ও পত্রিকাটি প্রকাশ করত। পত্রিকাটির গ্রাহকমূল্য বার্ষিক দু-টাকা ধার্য ছিল। মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজউদ্দীন আহমেদ, শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ও প্রতিষ্ঠাতা। কিছুদিন চলার পর সম্পাদনার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন রেয়াজউদ্দীন আহমেদ। ১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমদিকেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল। এই সময় এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল তিন হাজার। ১৮৯৫-এ অন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিহিরে'র সঙ্গে পত্রিকাটি একত্র হয়ে যায়। ১৮৯৫-এর আগষ্ট মাস থেকে এটি 'মিহির ও সুধাকর' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। স্বজাতির হিতচেষ্টায় নিবেদিত এই পত্রিকায় মুসলমান সমাজের খবরই বেশি বের হতো।[৩] পত্রিকা প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থ সাহায্য করেন টাঙ্গাইল, করটিয়া, বর্ধমান, কুসুমগ্রাম, পশ্চিমগাঁও প্রভৃতি স্থানের মুসলমান জমিদারগণ। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম ও সামসুল হুদা এবং জমিদার সৈয়দ হাসান আলী ও নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী।[৪]ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় স্বজাতির দুঃখ দূর করতে পত্রিকাটি ছিল আগ্রহী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনর্থক কুৎসাপ্রচারের প্রতিবাদ করাও ছিল পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য। মুসলমানদের ভাষাচর্চায় উৎসাহী করে তুলতে পত্রিকাটি ছিল সচেষ্ট। এ ব্যাপারে 'হিন্দু সহযোগীদের সাহায্য ও সহানুভূতি' প্রার্থনা করতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। ইসলাম ধর্মের মর্যাদারক্ষায় পত্রিকাটি ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। যে কারণে 'খ্রিষ্টীয় বান্ধব' এর সাথে পত্রিকাটি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে 'গো-হত্যা' সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। 'গো-হত্যা'র সমর্থক এই পত্রিকাটির আচরণে বিরক্ত হয়ে মীর মশাররফ হোসেন এটি নেওয়া বন্ধ করে দেন। 'হিতকরী'তে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তিনি বলেন–'সুধাকর হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বাধাইতে সর্বদা প্রস্তুত।'[৫] ইসলামের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে যে কয়জন সমাজসেবক 'বঙ্গের বিভিন্ন জেলার মুসলমানদের সঙ্গে' পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরাই ছিলেন 'সুধাকরে'র পরিচালক। এ সম্পর্কে কাজী আবদুল মান্নানের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য :

> রাজধানী কোলকাতা শহরে বসে তাঁরা তখনকার মুসলমান সমাজ সম্পর্কে যে সব ভাবনা ভাবতেন তার সঙ্গে সমস্ত বাংলার মুসলমানদের সংযোগ সাধনের প্রয়াস হিসেবেই 'সুধাকর' পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। কাজেই এর দ্বারা : প্রথমত, সারা বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন হয়েছিল,

---

১ ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫০
২ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৪ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
৫ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এবং স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল, তৃতীয়ত, নগরকেন্দ্রিক সংবাদপত্র ও সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।[১]

শেষোক্ত বক্তব্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, 'সুধাকর' সংশ্লিষ্টরা পরবর্তীকালে 'সুধাকর দলের' সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, যা সাময়িকপত্র চর্চার ইতিহাসে এখনো বহুল আলোচিত অধ্যায়।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৮) 'উদ্দেশ্য মহৎ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়। ইবরাহীম খাঁ ছিলেন পত্রিকাটির মুদ্রক ও প্রকাশক। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের ওপর। পত্রিকার উপর লেখা থাকত 'প্রত্যেক মুসলমানেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত'। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১২৯৬-বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য জানিয়ে এই সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :

> সমাজের অধঃপতন দেখিয়া, বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় "উদ্দেশ্য মহৎ" মলিন বেশে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্য মহৎ সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারুক আর না পারুক, কিন্তু সমাজের হিতসাধন করিবে ইহা স্থির নিশ্চয়। সমাজের অনুগ্রহ হইলে অবশ্য সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবে।[২]

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইংরেজ, কংগ্রেস–সবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে 'উদ্দেশ্য মহৎ' এ রচনা প্রকাশিত হয়।

হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বানের কারণে 'ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত' হয়েছে বলে পত্রিকাটি মনে করে। হিন্দু ও ইংরেজের মধ্যে যদি 'কোনরূপ' বিবাদ উপস্থিত হয়, 'তবে মুসলমানদের কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত'–এ প্রশ্ন উত্থাপন করে পত্রিকাটি 'ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস' নামক রচনায়। এ-ব্যাপারে ইংরেজিভাষী খ্রিস্টানদের পক্ষে মুসলমানদের মিলের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে 'উদ্দেশ্য মহৎ' পত্রিকাটি লেখে :

> ইংরেজ খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টীয়ান দিগকে, আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আহলে কেতাব বলিয়া বর্ণনা আছে। কোরাণ শরিফের পূর্ব্বে খোদাতালা যে তিন কেতাব নাজেল (অবতীর্ণ) করিয়াছিলেন, যাহারা সেই তিন কেতাব মতে চলেন। তাহাদিগকে আহলে কেতাব বলে, আমরা শরানুযায়ী আহলে কেতাবের মধ্যে বিবাহ করিতে পারি, এ জগতে বিবাহ সম্বন্ধই প্রধান সম্বন্ধ, বিশেষতঃ পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান এই দুই জাতিই প্রধান, এই দুই জাতির পরস্পর সমকক্ষতা আছে। কোন দেশে মুসলমান রাজা, খৃষ্টীয়ান প্রজা, কোন দেশে খৃষ্টীয়ান রাজা, মুসলমান প্রজা, কোন সময় মুসলমান জয়ী, খৃষ্টীয়ান পরাস্ত, কোন সময়ে খৃষ্টীয়ান জয়ী, মুসলমান পরাস্ত। এই দুই জাতির ন্যায় কোন জাতিই বলবিক্রমে কি অন্য প্রকারে, সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, ও পারিবেও না। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ আমাদের স্বগণ ও সমকক্ষ ব্যক্তি।[৩]

এই পত্রিকাটি ছিল গোঁড়া মুসলিম সমর্থক, এবং কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী। কংগ্রেসের দ্বারা 'মুসলমানদের অনিষ্ট' হবে বলে পত্রিকাটি মনে করত। পত্রিকাটি মুসলিম নামধারী কিছু পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থে মুসলমানের

---

১ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১
২ *উদ্দেশ্য মহৎ*, বৈশাখ ১২৯৬, উদ্বৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না বলে ঘোষণা করে। গো-হত্যা সম্পর্কে 'আহমদী'র সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পর্ক তিক্ত আকার ধারণ করে। তৃতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইবরাহীম খাঁ।[১]

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে (বৈশাখ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) 'গুরুচরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারীর নাম হাকিম নাজাত আলী শাহ্ কাদিরি।[২] পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ আর কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

১২৯৭ সালের ১৫ বৈশাখ (মে ১৮৯০) কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে 'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন মীর মশারফ হোসেন। দ্বিতীয় বর্ষে এটি দশদিন অন্তর 'দশাহিক পত্রিকা' হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণের হিতসাধনের ইচ্ছা নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি তৃতীয় বর্ষে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়। টাঙ্গাইল যাবার কিছুদিন পরে ভাদ্রমাস থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে থাকতে মোসলেমউদ্দীন খাঁ। ১২৯৯ এর শেষের দিকে পত্রিকাাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০৬বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পত্রিকাটি 'নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুত মুসলমানীভাবে' প্রকাশিত হবে বলে একটি বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'হিতকরী' সরকারি দপ্তরে এসে পৌঁছায়। এইকালে পত্রিকাটি আবার পাক্ষিক হিসেবে বেরোতে থাকে। মীর মশাররফ ও এস, কে, এম মহম্মদ রওশন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯০০-খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেও পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অব্যাহত। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ বা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে জ্যোতিপ্রসাদ সান্যাল কিছুদিন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শেষদিকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সমাজ প্রগতি ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পক্ষে জনমত গঠনে 'হিতকরী' পত্রিকাটি সচেষ্ট হয়। জমিদার ও পুলিশের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে 'হিতকরী' ইতস্তত করেনি। পত্রিকাটি ছিল রাজভক্ত এবং কংগ্রেসের সমর্থক। তবে বিলেতি জিনিস বর্জনের জন্য 'বঙ্গবাসী'র প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা উপলব্ধি করে পত্রিকাটি। 'গো-হত্যার' বিরুদ্ধে জনমত পড়ে তুলতে পত্রিকাটি সচেষ্ট হয়। স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে পত্রিকাটিতে বেশ কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়। বাল্যবিবাহের বিরোধী এই পত্রিকাটি 'সহবাস সম্মতি আইন'কে সমর্থন করায় অনেকে ক্ষুব্ধ হন।[৩] হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপড়েন মাঝে মাধ্যে দেখা দেয়, তা নিয়ে বড়ো ধরনের কোনো বিবাদের আশঙকা নেই বলে মনে করতো 'হিতকরী'। যাঁরা নেতৃস্থানীয় (উভয় সম্প্রদায়ের) তাদের মধ্যে'বিবাদের নামও নেই' বরং 'হিতকরী'র বিবেচনায় 'নিষ্কর্মা গোঁড়ারদলই এই বিবাদের মূল'। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নিয়ে হুলস্থুল বাধাবার চেষ্টাকে 'হিতকরী' তে তুলে ধরা হয়, নিন্দাও জানানো হয়:

> যাঁহারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ঐ সকল হিংসাপূর্ণ ভাব, স্বার্থময় আভাষ, কপটতাপূর্ণ উপদেশ যে না বুঝিতেছেন, তাহা নহে। তাই আমরা এখনও বলিতেছি। কোন আশঙকা নাই। বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুভাব নাই।[৪]

---

১ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
২ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯
৪ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা ছাড়াও জমিদার, জোতদার ও নীতিহীন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর সমালোচনায় মুখর ছিল 'হিতকরী'। ড. আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন :

> এ পত্রিকা তখন অত্যাচারী জমিদারবর্গ, জমিদারী, সেরেস্তার ঘুষখোর কর্মচারী, চরিত্রভ্রষ্ট মহকুমা হাকিম, মুনসেফ, দারোগা প্রভৃতির প্রতি খড়গহস্ত ছিল।[১]

উল্লেখযোগ্য যে, মীর মশাররফ হোসেন এ শ্রেণির আমলার ষড়যন্ত্রে এক মানহানির মানলায় জড়িত হয়ে এক মাস কারাভোগ করেন (১৮৯২)।[২] শেষে তাঁর অনুজ ব্যারিষ্টার মীর মোহতেশাম হোসেন এসে তাঁকে কারামুক্ত করেন। 'হিতকরী'তে মীর-ভ্রাতার লন্ডন থেকে প্রেরিত বিবরণমূলক চিঠিপত্র ছাপা হতো। মীর মশাররফের মৃত্যুর পর 'হিতকরী'তেই প্রথম লালন সাঁই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং এই মরমি সাধককে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করা হয় (৩১ অক্টোবর ১৮৯০)। বিদ্যাসাগর-প্রয়াণে এক মুসলিম বালিকার(যিনি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে.ফজলুল হকের বোন) শোক-কবিতা প্রকাশিত হয়। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র আদলে-আদর্শে ও কাঙাল হরিনাথের প্রেরণায় মশাররফ 'হিতকরী' প্রকাশ করেন।[৩]

'ভিষক দর্পণ' চিকিৎসা বিষয়ক একটি মাসিকপত্র ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেও এটি চালু ছিল বলে জানা যায়। এই পত্রিকার লেখক তালিকায় ডাক্তার নীলরতন সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক এম জহিরুদ্দীন আহমদ।[৪] এই সাময়িকপত্রটি সম্বন্ধেআর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র ১২৯৮)কলকাতা থেকে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)। প্রথম সংখ্যার সূচনায় সম্পাদক বলেন :

> পরম দয়াময় খোদাওয়ান্দ করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা 'ইসলাম প্রচারক' প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। 'ইসলাম প্রচারক' যাহাতে ইসলাম প্রচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে যত্ন চেষ্টার ক্রুটি হইবে না।[৫]

তৃতীয় সংখ্যা থেকে 'ইসলাম প্রচারক' মুসলমানদের ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে।

প্রথম থেকেই পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। প্রথম বছরে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ–এই চারটি ছাড়া আর কোনোও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এটি নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। নবপর্যায়ে পত্রিকাটি এগারো বছর চলেছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ছাপা হতো না। ইংরেজ শাসনের সমর্থক

---

১ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত. পৃ. ২৬-৩৩

২ প্রাগুক্ত. পৃ. ৩১

৩ আবুল আহসান চৌধুরী, 'হিতকরী', *মাসিক উত্তরাধিকার*, নবপর্যায়ে ৭৩ তম সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মুদ্রণকাল মার্চ ২০১৮, শ্রাবণ ১৮২২ সংখ্যা, পৃ. ৩৯, ৪০

৪ *জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

৫ সম্পাদক, *ইসলাম প্রচারক*, উদ্ধৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

এই পত্রিকাটি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেয়া উচিত নয় বলে মনে করতো। স্বদেশী আন্দোলনকে পত্রিকাটি প্রীতির চোখে দেখেনি। সামাজিক কোনো কোনো বিষয়ে (যেমন বিধবাবিবাহ ও পণপ্রথা) পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট উদার, আবার দু-একটি ক্ষেত্রে খুবই রক্ষণশীল। 'মিহির ও সুধাকর'-এ থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও অভিনীত নাটকের আলোচনা শুরু করলে 'ইসলাম প্রচারক' কঠোরভাষায় তাকে ধিক্কার জানায়। বিধবাবিবাহের সমর্থন ও পণপ্রথার বিরোধিতা করে 'ইসলাম প্রচারক'-এ যে লেখাটি প্রকাশিত হয়, সেটি থেকে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) যখন দিল্লি থেকে বাংলায় আসেন, তখন তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে বাঙালি মুসলমানদের মতিগতি ফেরানোর চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও, মুসলিম পরিবারে অল্পবয়সী বিধবার সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলার মুসলমান পরিবারগুলিতে চার থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী বিধবার সংখ্যা সতেরো লক্ষেরও বেশি। বিধবাবিবাহে মুসলমান সমাজের অনাগ্রহ 'ইসলাম প্রচারক'-এর ভালো লাগেনি। পত্রিকাটি জানায় :

> যে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ইসলামধর্ম্মে কঠোর আদেশ রহিয়াছে, সেই বিধবাবিবাহও ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক স্থল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গার পরপার হইতে সুদূর হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত এই বিশাল ভুভাগের মুসলমানসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। এ কার্য্যকে তাঁহারা নিতান্ত (হীন) ও বংশ মর্য্যাদার বিনাশক বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ধীরে ধীরে বিধবাবিবাহ প্রথা মুসলমান সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।[১]

এতো গেলো বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে পত্রিকার ভাষ্য। বিবাহে পণপ্রথারূপ ব্যাধি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে 'ইসলাম প্রচারক'। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার প্রভাবে সৈয়দ, পাঠান, মোগলরা নিজেদেরকে অন্য মুসলমানদের চেয়ে উন্নত স্তরের মানুষ ভাবতে থাকেন। এঁদের কারণে ইসলামে নিন্দিত পণপ্রথা মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দেয়, এজন্য অনেক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের বিয়ে হতো না। ১৮৮০ থেকে 'জাতীয় মহম্মদীয়ানা সভা'র সম্পাদক 'অনারেবল সৈয়দ আমীর খাঁ বাহাদুর এই সামাজিক কুরীতি নিবারণে' সচেষ্ট হন। বিবাহে পণগ্রহণ করাকে 'সমাজ কালিমা' হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে 'ইসলাম প্রচারক'।[২]

বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম সমাজের অনীহা ও স্ববিরোধিতা নিয়েসমকালীন অন্যান্য পত্রিকার মতো 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায়ও লেখালেখি হয়।মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অভিজাত সন্তানদের অবহেলা দেখে বিশ শতকের সূচনায় আক্ষেপের সুরে তাফেরউদ্দীন আহমদ নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখেন:

> বাঙ্গালাই বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা। বঙ্গীয় হিন্দুগণ পরম যত্নে মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছে। দুঃখের কথা বঙ্গীয় মুসলমানগণ মাতৃভাষার আলোচনায় একেবারে নিরুদ্যম। বাঙ্গালা তাহাদের মাতৃভাষা, ইহা তাহারা জানিয়াও জানেন না। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে কিঞ্চিন্মাত্র সময়ও অতিবাহিত করেন না। হায়

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

> বাঙ্গালা ভাষা। কেবল হিন্দুর অর্চ্চনাতেই তুমি গৌরবিনী, মুসলমানগণ তোমার সেবায় বিরত। তুমি যে তাঁহাদেরও মাতৃস্বরূপিনী। ইহা তাহারা একবার মনেও করেন না।[১]

বলা যায়, এর কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা অনেকটাই বদলে যায়। এটি বোঝা যায় শেখ আবদুর রহিমের হজরত মুহম্মদের 'জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, তাঁর নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি থেকে :

> আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি প্রথমবার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালীন বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল না।[২]

'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা দুই পর্বে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পর্যায় নিয়ে প্রায় তেরো বছর চালু ছিল, সেই হিসেবে সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় একে দীর্ঘায়ু সাময়িকপত্র বলা যায়। এতে প্রকাশিত গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির রচনাগুলোকে আমরা প্রধানত সাতটি ভাগে ভাগ করতে পারি: প্রথমত,ধর্মমূলক রচনা। এসবের মধ্যে ছিল কিছু মৌলিক রচনা আর কিছু অনুবাদ। যেমন, 'ইসলাম দর্শন', 'ইসলামের ভবিষ্যৎ', 'ইসলাম ও মিশন', 'তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ', 'মহাপুরুষ', এমাম গাজ্জালী (রহ) কৃত 'এহইয়া-অল-উলুমের বঙ্গানুবাদ' প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, মহাপুরুষগণের জীবনী, যেমন, 'মরতজা চরিত্র' 'পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ', 'মহাকবি সাদীর জীবনী', 'আবুল ফজল আল্লামী', 'মহর্ষি জোন্নুন মিসরী', সমসাময়িককালের প্রতিভাবানদের জীবনী, যেমন 'মৌলবী নৈমুদ্দিন সাহেবের জীবনী', 'বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের জীবনী' প্রভৃতি। তৃতীয়ত, মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী। যেমন, 'চীনে ইসলাম', 'আল মামুন', 'নূরজাহান বেগম', 'জেরুজালেম', 'হজরত ওমরের (রা) প্রজা বৎসলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা', 'নহরে জোবেদা', 'সম্রাট আওরঙ্গজেব' প্রভৃতি। চতুর্থত, মুসলমানদের অতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ। যেমন, 'সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জানচর্চ্চা ও সুধীমণ্ডলী', 'ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান', 'বোগদাদ চিত্র', 'আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার' প্রভৃতি। পঞ্চমত, সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার ওপর লিখিত প্রবন্ধ। যেমন, 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা', 'আমাদের কর্ত্তব্য', 'উন্নতির উপায় কি', 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব', 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির উপর ভীষণ অত্যাচার', 'বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান' প্রভৃতি। ষষ্ঠত, বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের লেখায় মুসলিম বিদ্বেষের প্রতিবাদ। যেমন, 'ইসলামের শিরে আঘাত', 'বঙ্গ সাহিত্যের মুণ্ডপাত', 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' প্রভৃতি। সপ্তমত, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। যেমন, 'ইঞ্জীল কেতাব',' প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে', 'প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে?' প্রভৃতি। এছাড়া পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় থাকতো 'জাতীয় ধর্ম্ম সংবাদ', প্রাপ্ত পুস্তকাদির সমালোচনা এবং মাঝে মাঝে বঙ্গীয় প্রদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, ইসলাম মিশন প্রভৃতি সংগঠনের কার্যবিবরণী।[৩]

গবেষক ওয়াকিল আহমদ বলেছেন :

---

১ 'বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান', *ইসলাম প্রচারক*, মাঘ ১৩০৯, উদ্ধৃত, 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২ শেখ আবদুর রহিম, 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন', *হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনচরিত ও ধর্মনীতি*, (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ কলকাতা), প্রথম আবিষ্কার প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৮, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ঢাকা পৃ. xiii

৩ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১-২৭২

> 'ইসলাম প্রচারকে'র পথ ও মতের প্রকৃতি যাই হোক, রেয়াজুদ্দীন ও তাঁর সহযোগীগণ এ উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিলেন যাকে 'ইসলাম প্রচারক গোষ্ঠী' নাম দেয়া যায়।[১]

সংবাদপত্রের মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ করাই ছিল ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি রেয়াজুদ্দীনের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। 'মুসলমান', 'নব সুধাকর', 'সুধাকর', 'সোলতান', 'নবযুগ', 'রায়তবন্ধু' ইত্যাদি নানা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও যে পত্রিকাটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সেটি 'ইসলাম প্রচারক'।[২] ড. ওয়াকিল আহমদ ঠিকই বলেছেন :

> বাংলার মুসলমানদের সাংবাদিকতায় রেয়াজুদ্দীনের দান ছিল হিন্দু সমাজের সাংবাদিকতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমতুল্য। এরকম একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন টিকে থাকার পেছনে দানশীল ও শিক্ষানুরাগীহোমনাবাদের (কুমিল্লা, তৎকালীন ত্রিপুরা) জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী এবং কাঁকিনার জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর অবদানকেও অস্বীকার করা যায় না।[৩]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'মিহির' নামে "বিবিধ বিষয়িনী" একটি মাসিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন শেখ আবদুর রহিম। কবিতা, সাহিত্যালোচনা, ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সমালোচনা প্রভৃতি নানা ধরনের লেখা বের হতো এ-পত্রিকায়। তবে পত্রিকাটির মূল ঝোঁক ছিল ইতিহাস ও সাহিত্যালোচনার দিকে। সমকালে পত্রিকাটি বেশ সুনাম অর্জন করে। 'মিহির' এর প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। 'সময়' ও 'হিতবাদী' – এই কালের দুটি প্রধান সংবাদপত্রই এর ভাষার প্রশংসা করে। ১৮৯৩-এর জুলাই সংখ্যাটি প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক মুসলমানী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হয় 'মিহির'। 'সাপ্তাহিক মিহির'-এর ১৮৯৪ সালের ২১ ডিসেম্বর সংখ্যাটি থেকে এর লেখকদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে আছেন সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, আবদুস সোবহান, মৌলবী মহম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।[৪]

পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র বাগচী, মধুসূদন সরকার, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বসু ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই ১৮৯৩ 'চতুর্মাস্য' সংখ্যায় 'মিহির' ঘোষণা করে, 'মিহির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা নহে', 'মিহির সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র'। 'ইসলাম প্রচারক' থেকে 'মিহিরে'র এখানেই মৌলিক পার্থক্য।[৫]

'মিহির' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলোকে মোটামুটি নয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, ঐতিহাসিক রচনা যেমন 'সুরিয়া বিজয়'; ঐতিহাসিক মুহাপুরুষদের কীর্তি ও জীবনী–যেমন, 'এমাম আবু হানিফা', 'হজরত আলীর প্রবচনাবলী' প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িককালের ব্যক্তিদের জীবনী–যেমন, 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। তৃতীয়ত, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ–যেমন, 'হাড়োয়া', 'নারিকেলবাড়িয়া', 'কাজীপাড়া'

---

১ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

২ স্বপন বসু, 'মোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীন আহমদ এর চিন্তাচেতনার জগৎ', *পরিকথা*, ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মে ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ১০১

৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫-৩৮৭

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮

প্রভৃতি। চতুর্থত, দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা–যেমন, 'জড় জগৎ ও মনুষ্য সমাজ', 'মানব চরিত্র', 'আরবীয় দর্শন শাস্ত্র' প্রভৃতি। পঞ্চমত, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রচনা–যেমন, 'প্রাকৃতিক নিয়মের একটি বিশেষ বিধি', 'সাময়িক ও সংক্রামক সর্দ্দি', 'রোগী চিকিৎসক সম্বন্ধ' প্রভৃতি। ষষ্ঠত, গল্প বা উপন্যাস জাতীয় রচনা–যেমন, 'আলহামরা', 'আলহামরা নির্মাণ', 'কুমার-অল-কামেল' প্রভৃতি। সপ্তমত, অনুবাদ জাতীয় রচনা–যেমন, 'শাহনামা', 'জননীর প্রতিকৃতি দর্শনে' প্রভৃতি। অষ্টমত, খণ্ড কবিতা–যেমন, 'স্বপ্ন ও মিহির', 'কোকিল' প্রভৃতি। নবমত, সাহিত্য সমালোচনা–যেমন, 'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম'। এছাড়া পত্রিকার 'সমালোচনা' বিভাগে সমকালে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র পত্রিকার উপর আলোচনা করা হতো।[১]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে কলকাতা থেকে 'হাফেজ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর ১৮৯৭-এর জানুয়ারি মাসে 'বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র' হিসেবে 'হাফেজ পুনঃপ্রকাশিত হয়। ভোগবিলাসে নিমজ্জিত বঙ্গীয় মুসলমানদের 'পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত' করার লক্ষ্য নিয়ে শেখ আবদুর রহিম পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করেন। নবজীবনপ্রাপ্ত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে ফজলে রাব্বির 'The origin of the Musalmans of Bengal' -এর অনুবাদ 'বাঙ্গালার মুসলমান' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক। টালার দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা মীর মশাররফের 'টালা অভিনয়' নাটকটি এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছয়টি সংখ্যা বেরোনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০২ সালের শেষদিকে এটি পুনঃপ্রকাশের কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।[২]

'হাফেজ'-এর প্রকাশ ঘটেছিল 'মুসলমানদের একমাত্র সাহিত্য পত্রিকারূপে'। পত্রিকার লেখক মীর মশাররফ ছাড়াও ছিলেন মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, শেখ ওসমান আলী বি.এল এবং সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম নিজে। 'হাফেজ' পত্রিকায় কোনো অমুসলিম লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়নি।

'হাফেজ'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে মীর মশাররফের ঐতিহাসিক কাহিনিমূলক রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান 'তহমিনা' বেরিয়েছিল। 'শাহ্নামা'য় সোহরাব-রুস্তমের যে কাহিনি তা ছিল এই উপন্যাসের প্রধান উপাদান।

'হাফেজে' প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন 'সভ্যতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা', 'শাহনামা', 'মুসলমানের গতকালীন শিক্ষা', 'মুসলমানের সাহিত্যে আধিপত্য', 'ইসলামে বিদ্যার গৌরব', 'মামুনের সময় বিজ্ঞান চর্চ্চা' এবং কবিতাবলি–যেমন, 'রমজান', 'আদর্শ প্রেমিক' ইত্যাদিতে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস, মুসলিম সাধকদের ধর্মভক্তি, ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান ও সুমহান শিক্ষাকে তুলে ধরার চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। স্বীয় ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকলেও পরধর্ম বা প্রতিবেশীর প্রতি তাঁদের কোনো বিদ্বেষ ছিল না।[৩]

১ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
২ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩ *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-২০

১৮৯৫-এর মাঝামাঝি 'মিহির' ও 'সুধাকর' এই দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা একত্র হয়ে 'মিহির ও সুধাকর' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'সুধাকর' ১৮৯০ সালে এবং 'মিহির' ১৮৯৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজের এই প্রতিনিধিপত্রটি 'রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' বলে নিজের পরিচয় দিত। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন শেখ আবদুর রহিম।প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে পত্রিকাটি মুসলমান সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। ১৮৯৬-এর মে মাসের মধ্যে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা আড়াই হাজারে পৌঁছে যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। এই সময় পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন বসিরহাটের সৈয়দ ওসমান আলী এবং মৌলবী রেয়াজুদ্দীন আহমদ। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য পত্রিকাটি ছিল সচেষ্ট। স্বজাতির উন্নয়নে জমিদারদের উদাসীনতায় পত্রিকাটি বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিদেশে কুলি চালানের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার।

জমিদারদের অত্যাচার, হিন্দুদের কথিত মুসলমান নির্যাতন, ভারতবাসীর সুখ-সুবিধা সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতার কঠোর সমালোচক ছিল পত্রিকাটি। কংগ্রেসকে 'মিহির ও সুধাকর' প্রীতির চোখে দেখত না। রাজভক্ত এই পত্রিকাটি 'বুয়র যুদ্ধে' ইংরেজদের জয় কামনা করে। মুসলিমপ্রীতি থাকলেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিল পত্রিকাটি। সমকালীন 'বাসনা' পত্রিকায় 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার প্রশংসা করে লেখা হয় :

> 'মিহির ও সুধাকর' কলিকাতা ২৯নং মির জাফরের লেন হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক সাহেব সেখ আবদুর রহিম। কাগজখানি সাপ্তাহিক। রয়াল ৪ ফরমা আকারের মুসলমানদিগের মুখপত্র। লেখাও বেশ হৃদয়গ্রাহী, আমরা পত্রিকার উন্নতি কামনা করি।[১]

'মিহির ও সুধাকরে'র ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণের সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) 'মাতৃভাষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন :

> মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে, হিন্দু আচার ব্যবহার, শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে; তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিত নহে।[২]

'মিহির ও সুধাকর' ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) পত্রিকার আর্থিক সাহায্য যোগাতেন। এর বিষয় ছিল বিচিত্র ধরনের। সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি উপন্যাস, অবিশ্বাস্য কাহিনি, খণ্ডকবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, রসরচনা, জীবন-কথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞানতত্ত্ব, বাণিজ্য বার্তা, নাট্যালোচনা, পুস্তক-পুস্তিকা সমালোচনা প্রভৃতি পরিবেশিত হতো।[৩]

'মিহির ও সুধাকরের' একটি সংখ্যায় পত্রিকার ২৯ জন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়, তাঁরা হলেন, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ বিএল, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আবদুল হক সাত্তার, মকবুল আলী বিএ, আবদুল হামিদ খাঁ, নঈমুদ্দীন, তসলিমুদ্দীন আহমদবিএল, রেয়াজ অল

---

১ *বাসনা*, মাঘ ১৩০২, উদ্ধৃত,*উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

২ দীনেশচন্দ্র সেন, 'মাতৃভাষা', *মিহির ও সুধাকর*, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০, উদ্ধৃত,*আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

৩ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

দিন আহমদ, হেমায়েতউদ্দিন আহমদ বিএল, গোলাম সারওয়ার, মহম্মদ ইয়াকুব, আমানতুল্লা, আহমদ হোসেন, তহমিদউদ্দিন আহমদ, মহম্মদ হবিবর রহমান, আবদুল মাজেদ খা চৌধুরী, হাকিম আবদুল লতিফ, মহাম্মদ আবুল হোসেন, শেখ আবদুস সোবহান, মহাম্মদ সামসুজ্জোহা বিএ, হাকিম শরিয়তুল্ল্যা, মহাম্মদ জিয়াউন্নবি বিএ ও তাইমুর আহম্মদ।[১]

বিশিষ্ট সম্পাদক ও কবি আবদুল কাদির লিখেছেন :

> বাংলার মুসলমানকে জ্ঞানে ও ত্যাগে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে সমৃদ্ধবান ও সংঘবদ্ধ করে তোলার জন্য 'মিহির ও সুধাকরের' পরিচালক ও লেখকগণ অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন। ফলে অচিরকাল মধ্যেই সমাজ-মানস জাগরণের যাদুমন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।[২]

'কোহিনুর' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুলাই, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে)। প্রথমে এটি কিঞ্চিদধিক এক বছর চালু থাকে। ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, অনিয়মিতভাবে তিন বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তৃতীয় পর্যায়ে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। বছরখানেক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পত্রিকাটি ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল বলে জানা যায়। প্রথমে এটি কুষ্টিয়ায়, পরে পাংশায় (বর্তমানে বাংলাদেশের রাজবাড়ী জেলায়) এবং শেষে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয। এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই) তিন পর্যায়েরই সম্পাদক ছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে 'কোহিনুরে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে লেখা হতো 'বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে' প্রকাশিত। পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের নিবেদন' ও 'আমাদের কথা'–এই দুটি অংশে পত্রিকার উদ্দেশ্য, সংগঠন ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্পাদক নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩] পত্রিকা পরিচালনার জন্য গঠিত হয় 'কোহিনুর পরিচালক সমিতি'। চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হলেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 'আত্মীয়তা বদ্ধমূল করাই যে 'কোহিনুরে'র সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য, প্রথম সংখ্যাতেই তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। উভয় সম্প্রদায়ের লেখকই পত্রিকাটিকে পরিপুষ্ট করতে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে আবদুল করিম, মুনশী মেহেরউল্লা, শেখ জমিরুদ্দিন, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, মোজাম্মেল হক, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, ওসমান আলীর মতো মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যেমন আছেন, তেমনই আছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সতীশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ চক্রবর্তীর মতো মান্যজন। পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিমুখী, মুসলমান সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সচেতন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলাকে পরিপুষ্ট করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো পত্রিকাটি। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী স্থাপনে এতখানি তৎপরতা উনিশ শতকের খুব কম পত্রিকাই দেখিয়েছে। তারপরও পাঠকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পায়নি পত্রিকাটি। 'কোহিনুরে'র প্রথম সংখ্যা তিন হাজার ছাপা হলেও, ভাদ্র মাসে মুদ্রণ সংখ্যা পাঁচশোয় নেমে আসে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০৬-এর বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। পরের সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩০৬) ত্রৈমাসিক

১ *মিহির ও সুধাকর*, ১০ কার্তিক ১৩০২, উদ্ধৃত,*বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
২ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০-৩৯১

হিসেবে প্রকাশ করতে বাধ্য হন সম্পাদক। ১৩০৭-বঙ্গাব্দে 'কোহিনুর' এর একটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। অনিয়মিতভাবে হলেও ১৩২২ পর্যন্ত পত্রিকাটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৩০৫-১৩২২ বঙ্গাব্দ সময়-পরিধিতে পত্রিকাটির মোট ৫৯টি সংখ্যা বেরিয়েছিল।[১]

'কোহিনুর' সূচনায় দাবি করেছিল, 'বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখকগণকে একত্রিত ও একসূত্রে গ্রথিত' করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা 'কোহিনুর'কে অবলম্বন করে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন লেখায় সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। গোপালচন্দ্রের 'সংস্কার ও সংস্কারক', মশাররফের 'সৎপ্রসঙ্গ', যদুনাথের 'হিন্দু-মুসলমান', সতীশচন্দ্রের 'হিন্দু ও মুসলমান', দক্ষিণারঞ্জনের 'হিন্দু-মুসলমান', কিশোরী মোহনের 'সম্প্রীতি', ওসমান আলীর 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতায় এই মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে।

এই সময়ের 'সাধারণী', 'সময়', 'আহমদী', 'চারুমিহির', 'বীণাপাণি', 'স্বদেশী', 'এডুকেশন গেজেট', 'নব্যভারত', 'শিক্ষা পরিচয়', 'কোহিনুর' এই পত্রিকাগুলি হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ১৩০৫-এর আশ্বিনে 'কোহিনুরে' প্রকাশিত 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক একটি লেখায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয় :

> ভাই হিন্দু ও মুসলমান! আমরা ভূমিষ্ট হইয়া যে জন্মভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, যে জন্মভূমির প্রদত্ত ধন ধান্যে জীবনরক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছি, যে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতেছি, সেই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য প্রাণপণে সকলেরই কি যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত নহে।[২]

১৩১২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কোহিনুরে' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় লেখেন:

আমার বক্ষের লেখা মম শত অপরাধ
তুমি মুছ সুকুমার করে
তব হৃদি বহ্নি আমি অশ্রু দিয়া নিবাইব
আমি ক্ষমি, তুমি ক্ষমো মোরে।[৩]

মীর মশাররফের 'নিয়তি কি অবনতি', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', মোজাম্মেল হকের 'তাপস-কাহিনী' প্রভৃতি 'কোহিনুর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সবদিক বিচার করে বলা যায়, 'কোহিনুর' একটি অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পত্রিকার সম্পাদক (আষাঢ় ১৩০৫) এতদ্বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখেন :

---

১ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫
২ উদ্বৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৩ উদ্বৃত, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

> সুখের বিষয়, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ না করিলে, জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। মুসলমানগণ এখন ভ্রান্তির মোহান্ধকার দূর করিয়া এবং আলস্য–শয্যা পরিত্যাগ করতঃ ধীরে ধীরে সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন।[১]

সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরীর এই প্রত্যাশা ফলবতী হয়েছিল।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (জানুয়ারি ১৮৯৯) টাঙ্গাইলের কয়েকজন জমিদারের অর্থানুকূল্যে মধু মিয়া (ময়েজউদ্দিন আহমদ) কলকাতা থেকে 'প্রচারক' নামে বিবিধ বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। ইসলামধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচার ও মুসলমানসমাজের হিতসাধন ছিল পত্রিকাটির লক্ষ্য। মধু মিয়া সম্পাদিত এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই ধর্মবিষয়ক আলোচনা স্থান পেত, ধর্মীয় বিতর্কেও পত্রিকাটি ছিল আগ্রহী।

ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ পত্রিকাটি উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করতো, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হলেও মধুমিয়া যে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তা পত্রিকার ঘোষিত একটি নীতি থেকে বোঝা যায়, 'হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকত্ব ও হৃদয়ের বিভিন্নতা যতদূর সাধ্য মোচন করিতে চেষ্টা করিব।' পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানমুখী ছিল না। কলিকাতায় প্লেগ মহামারী আকারে আত্মপ্রকাশ করলে পত্রিকাটি লেখে :

> আমাদের বিশ্বাস, কলিকাতায় যে প্লেগ হইতেছে উহা প্লেগ নয় – খোদাতায়ালার শাস্তি।[২]

কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনি পত্রিকাটিতে স্থান পেতো। রাজভক্ত এই পত্রিকাটি কংগ্রেসকে প্রীতির চোখে দেখত না। এটি কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান মনে করতো। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যাটি বেরোনোর পর পত্রিকাটি হাওড়ার বেতড়ে স্থানান্তরিত হয়। অনিয়মিতভাবে ১৩০৯ সালের চৈত্র পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৩]

'প্রচারকে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে কোরানের একটি 'আয়াতে'র বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হতো : 'যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহা প্রচার কর।' নিজ বিশ্বাস থেকে পত্রিকাখানি খ্রিস্টান পাদরি ও লা-মজহাবিদের বিরুদ্ধে মসি চালনা করে। এটি রক্ষণশীল মনোভাবের বশবর্তী হয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক ধর্ম ব্যাখ্যারও বিরোধিতা করে। সৈয়দ আহমদের কোরানের ব্যাখ্যা 'নাস্তিকতাভাবে' লিখিত বলে মন্তব্য করা হয়।[৪]

ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার সপক্ষেও 'প্রচারক' প্রচার করে। ধর্মচিন্তা, রক্ষণশীলতা ও সমাজচিন্তায় সংস্কারমুক্তির বিরোধিতা 'প্রচারকে' লক্ষ্য করা যায়। ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার ও অতীত গৌরবকীর্তন দ্বারা সমাজকে জাগানোর প্রয়াস এখানেও বিদ্যমান ছিল। সমাজকথা, ধর্মকথা প্রাধান্য পেলেও 'প্রচারকে' সাহিত্যকথাও উপেক্ষিত হয়নি। শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ', 'মানসিংহ' ও 'লায়লী মজনু', মতিয়র রহমান খানের 'নব কুমুদ' ধারাবাহিকভাবে এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ওসমান আলী, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখের কয়েকটি কবিতা 'প্রচারকে' প্রকাশিত হয়।

---

১ *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩০৫, উদ্ধৃত,*বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২
২ *প্রচারক*, মাঘ ১৩০৫, উদ্ধৃত,*মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫
৩ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৪ *প্রচারক*, আশ্বিন ১৩০৭, উদ্ধৃত,*বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা ও উন্নতমানের রচনার জন্য ‘প্রচারক’ সেকালের সাময়িকপত্রের নিকট থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। সমকালীন ‘সময়’ পত্রিকার ৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সংখ্যায় বলা হয় :

> মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছেন, ইহা কম আহলাদের বিষয় নহে। ‘প্রচারকে’র ভাষায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।[১]

সমকালীন আরেকটি অমুসলিম সম্পাদিত ‘বঙ্গভূমি’ পত্রিকার ৭ ফাল্গুন ১৩০৭ সংখ্যায় লেখা হয় :

> আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা যে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করেন, ইহা আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্য ও জাতীয় একতার সোপান বলিতে হইবে। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সুপাঠ্য।[২]

‘প্রচারক’ সম্পাদক মধু মিয়ার সম্পাদনায় ‘ইসলাম’ (বৈশাখ ১৩০৭) ও ‘মধুমিয়া’ (কার্তিক ১৩০৬) নামে আরো দুখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দুখানির আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী।[৩]

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ ১৩০৭) ‘নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী’ মাসিক পত্রিকা ‘লহরী’ শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়। মোজাম্মেল হক সম্পাদিত এই পত্রিকাটি শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হলেও ছাপা হতো কলকাতায়। মোজাম্মেল হক ছাড়াও ইসমাইল হোসেন সিরাজী, তোফাজ্জল হোসেন, জীবনকৃষ্ণ দত্তসহ অনেকের কবিতা এখানে প্রকাশিত হতো।[৪] আত্মগত ভাব-কল্পনাকে আশ্রয় করে আধুনিক খণ্ড কবিতা ‘লহরী’তে প্রকাশিত হয়। সমকালীন সামাজিক সমস্যা এবং তৎসঙ্গে অতীতের গৌরব ও মহিমা কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। সমকালীন ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় ‘লহরী’র আত্মপ্রকাশের পর একটি পরিচিতি বেরিয়েছিল, কথাগুলো নিম্নরূপ :

> লহরী ১৩০৭ বৈশাখ। ১ম খণ্ড ও ৯ম সংখ্যা, শ্রী মোজাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা। এই সূচী দেখিলাম—মঙ্গলাচরণ, ইসলাম, একটি ফুল বিষাদ-লহরী (ওসমান পাশার মৃত্যু শ্রবণে), বিশ্ব প্রেমবর্ষ, নববর্ষ। এই খানি “নানা বিষয়িণী কবিতা-প্রকাশিনী সমালোচনা মাসিক পত্রিকা”। আগাগোড়া পদ্য। দুই একটা সংখ্যা না দেখিলে কিছু বলিব না। সমালোচনাটাও কি পদ্যে হইবে? বেশ হইবে। আমরা দেখিবার জন্য ব্যাকুল রহিলাম কিন্তু পত্রিকার বিশেষণটা দেখিয়া আমাদের একটা বিশেষ্য মনে পড়িয়া গেল। বিশেষ্য না সর্ব্বনাম? সেটী কিন্তু একটি বাবাজির নাম।[৫]

‘লহরী’র আয়ু এক বছর পূর্ণ হয়নি, অনিয়মিতভাবে ১০টি সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।[৬]

‘নূর অল ইমান সমাজ’-এর মুখপত্র হিসেবে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুন ১৯০০) রাজশাহী থেকে ‘নূর অল ইমান’ নামে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শিরোভাগে লেখা থাকত ‘নূর অল ইমান

১ উদ্ধৃত, *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
২ প্রাগুক্ত
৩ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৪ *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৫ *পূর্ণিমা*, আশ্বিন ১৩০৭, উদ্ধৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪
৬ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত।' তবে, সম্পাদনার সব দায়িত্ব সামলাতে হতো মোহাম্মদ ইউসুফ আলীকে। পত্রিকার উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :

> বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে কতগুলি হানিকর দোষ প্রবেশ করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বকালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল, কোন কোন গুণের জন্য তাহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন 'নূর অল ইমান' তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন। ... কি কি দোষ মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে তাহাও 'নূর অল ইমান' দেখাইবে। কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, 'নূর-অল ইমান' তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে।[১]

পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে এর ভাষা ও বর্ণবিন্যাস নিয়ে সাধারণের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে পত্রিকাটি তার বক্তব্য জানায়। অনিয়মিতভাবে চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'নূর অল ইমানে'র লেখকগণের মধ্যে ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাগুলিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় সুর ছিল উদ্দীপনামূলক ও আশাব্যঞ্জক।[২]

১৯০০ সালের মধ্যে 'ইসলাম রবি' নামের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম জানা যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই স্বল্পায়ু পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মুজিবর রহমান খাঁ (১৮৭৩-১৯৪০)। পত্রিকাটি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সূচনাপর্ব থেকে উনিশ শতকের শেষবর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার অসংখ্য নাম থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংবলিত পত্রিকাগুলি উল্লেখিত হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানে এই পত্রিকাগুলির অবদান ছিল অসামান্য।

---

১ উদ্ধৃত, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
২ *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা (১৯০১-১৯৩০)

উনিশ শতকের প্রায় মধ্যপর্যায় থেকে বাঙালি মুসলমান শিক্ষায়, জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হলেও তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। যুগন্ধর মুসলিম চিন্তানায়করা স্বজাতি ও স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনায় সর্বাংশে নিবেদিত হলেও পশ্চাৎপন্থী উপদ্রবী গোষ্ঠীও ছিল সক্রিয়। সাময়িকপত্রের মাধ্যমে মুসলিম লেখকেরা স্বজাতিকে নানাভাবে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। মুসলিম সমাজ যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করুক, প্রশাসনযন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হোক, স্বজাতির কল্যাণ সাধন করুক এটিই ছিল সাময়িকপত্র প্রকাশের লক্ষ্য। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় এক শতাব্দীকাল (১৭৫৭-১৮৫৭) পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানের পক্ষে আশানুরূপ উন্নতিসাধন বিদ্যমান নানা বাস্তবতায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উনিশ শতকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনের বয়ানে তা স্পষ্ট। বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) প্রভৃতি যুগান্তকারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে বৃহৎ-বঙ্গের জনজীবনে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়। এই পর্যায়ে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ও স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানে পূর্বাপেক্ষা আরও সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতার অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছে এ-পর্বে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে।

বিশ শতকের শুরু থেকে যেসব বাঙালি মুসলমান চিন্তাজীবী সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা, সংবাদপত্র প্রকাশনা ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩), মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩৮-১৯০৮), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), নওশের আলী খান ইউসফজী (১৮৬৪-১৯২৪), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মুজিবর রহমান খাঁ (১৮৬৯-১৯৪০) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩২), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০), কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭৩), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) প্রমুখ।

এই সময়কালের পত্রপত্রিকার সংগঠক ও সম্পাদকেরা ধর্মীয় চেতনাকে সম্বল করে বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম সমাজকর্মী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যাঁরা প্রধানত মৌলবি-মওলানা-মুন্সি শ্রেণিভুক্ত, যাঁদের মানসভূমি মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি-উর্দুর পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল, তাঁরাই স্বভাবতই মুসলিম সাময়িকপত্র প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আবার গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগও ছিল ঘনিষ্ঠ । বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনার প্রক্রিয়ায় এঁরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা প্রথম দুই দশকে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তাই ১৯২০ সালের পূর্বে 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মোহাম্মদী' সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ কিংবা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যতীত তেমন উল্লেখযোগ্য আধুনিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

এই পর্যায়ে অবিভক্ত বাংলার সমস্ত কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। অধিকাংশ পত্রিকা তাই প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। তবে কলকাতার বাইরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলা শহর, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও (ফরিদপুর রাজবাড়ীর পাংশা, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া, রংপুরের কাকিনা, টাঙ্গাইলের করটিয়া ও দেলদুয়ার, মানিকগঞ্জের পারিল ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগাম থেকে প্রকাশিত প্রথম নারী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'আন্নেসা' (১৯২১)-র সম্পাদনায় ছিলেন প্রথম মুসলিম নারী সম্পাদক সফিয়া খাতুন (১৮৯০)। তাঁর অনেক লেখা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*য় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনার প্রয়াস একদিকে উড়িষ্যার কটক, অন্যদিকে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।'কোহিনুর' পত্রিকার প্রচার সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়। এতৎসত্ত্বেও পত্রিকার প্রচার সংখ্যা মোটেও আশানুরূপ ছিল না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 'ইসলাম প্রচারক', 'আল-এসলাম', 'ছোলতান,'ধুমকেতু' ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রিকা। 'ইসলাম প্রচারক', 'আল-এসলাম'পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রধানত ধর্মপ্রচারক-বক্তা ও কর্মীর কল্যাণে। বঙ্গ-আসামের গ্রামে গ্রামে এঁরা ওয়াজ করতেন, সেই সাথে ধর্মবিষয়ক পত্রপত্রিকার প্রচার করতেন। এসকল পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধিতে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রচুর অবদান রয়েছে।

১৯২০-৩০ এর দশকে রাজনীতির প্রতি সর্বসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই রাজনীতি সরকারবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নির্ভর ছিল, যার প্রভাব বিশেষভাবে পত্রপত্রিকায় পড়তে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে 'নবযুগ' (১৯২০, সম্পাদক: কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমেদ), 'ছোলতান' (১৯২৩, সম্পাদক: মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী), 'দৈনিক সেবক' (১৯২১, সম্পাদক: মোহাম্মদ আকরম খাঁ), 'মোসলেম জগৎ' (১৯২২, সম্পাদক: আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী) ইত্যাদি পত্রিকার নাম করা যায়। অপরপক্ষে 'মোসলেম দর্পণ' (১৯২৫, সম্পাদক: হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী), 'রওশন হেদায়েৎ' (১৯২৪, সম্পাদক: মোহাম্মদ ইবরাহীম) ইত্যাদি পত্রিকা ছিল সরকারের সমর্থক এবং সক্রিয়ভাবেই স্বরাজ, খিলাফত ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী। এই দশকে নারীমুক্তি ও নারীর অধিকারের স্বার্থে প্রকাশিত হয় 'আন্নেসা' (১৯২১, সম্পাদক: বেগম সফিয়া খাতুন), 'নারীশক্তি' (১৯২২, সম্পাদক: ডাক্তার লুৎফর রহমান) পত্রিকা। আর

শিশু-কিশোর পত্রিকা ছিল 'আঙ্গুর' (১৯২০, সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), 'শিশু সওগাত' (১৯২২, সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন) 'মকতব' (১৯২০, সম্পাদক: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন), 'জমজম' (১৯৩০, সম্পাদক: মঈনউদ্দীন হোসায়ন) ইত্যাদি। এভাবে বিচিত্র আয়োজনে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেকালের বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা।

স্বল্পায়ু সাময়িকপত্র 'ছোলতান', 'ধূমকেতু' তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল সমকালীন রাজনীতির চিত্র তুলে ধরার জন্যে। 'ছোলতান' ছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র। অতএব আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা সহজেই পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। নজরুলের 'ধূমকেতু' সকল রাজনৈতিক প্রস্তাব বর্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল। তখনকার মানুষের প্রাণের দাবি পত্রিকাটি যথার্থভাবে পূরণ করতে পেরেছিল, যার ফলে রাতারাতি 'ধূমকেতু' বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'ধূমকেতু'র বিষয়বস্তু ও রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন গবেষক লিখেছেন :

> ধূমকেতু সাহিত্যপত্র নয়। আধুনিক কালের সংবাদপত্রের ন্যায় এ পত্রে সাহিত্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভাগ ছিল না। পত্রিকাটিতে সারথি (সম্পাদক: নজরুল) ব্যতীত অন্যের প্রকাশিত রচনা-গল্প, কবিতা ইত্যাদি যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল না। মাত্র সাড়ে চার মাস আয়ুষ্কালের এ পত্রিকায় অনেক বিখ্যাত লেখকের হাতে খড়ি হয় – যাঁরা পরবর্তীকালে হন স্বনামধন্য। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ধূমকেতুতে লেখার সময় তাঁরা পরিপক্ক হয়ে ওঠেননি।[১]

এই সময়কালে একটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'দ্য মুসলমান' (সম্পাদক: মুজিবর রহমান খাঁ) পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে ১৯০৬ সাল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ত্রিশ বছর সাপ্তাহিক, বারত্রয়িক ও দৈনিক রূপে পত্রিকাটি টিকে ছিল। এর কারণ বাঙালি মুসলিম সম্পাদকের নিষ্ঠা, সততা আর আত্মত্যাগ। ১৯২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে 'দ্য মুসলমান'-এর গ্রাহক সংখ্যা ১৯০০ হয়েছিল। আন্দোলনের সঙ্গে মুজিবর রহমানের নিবিড় সম্পর্কের কারণে তাঁকেসহ আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার করে এক বছরের সশ্রম কারদণ্ড দেয়া হয়। ১৯২৬ সালের ৬ ডিসেম্বর 'দ্য মুসলমান'-এর বিংশতিতম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় 'The History of `The Musalman' Record of A Twenty Years Strugle : The Hardship of A Muslim Journalist in Bengal'শিরোনামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালের কোনো এক সময় বিখ্যাত 'দ্য মুসলমান' বন্ধ হয়ে যায়।[২]

সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকপত্রসমূহ সাধারণত মুসলিম জাগরণের নিমিত্তেই প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম রচিত সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানো। 'নবনূর' (১৯০৩) এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এরকম কথাই বলা হয় :

---

১ এস এম লুৎফর রহমান, *ধূমকেতু ও তাঁর সারথি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ২০৪
২ মিলন দত্ত, *মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'*, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৪২-৪৩

> আমরা দেখিতেছি মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনের অবসান একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ...পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।[১]

মুসলিম পত্র-পত্রিকার এ ধারা পুরো তিরিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

উনিশ শতকে মুসলিম সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত কিছু হাতে গোনা সাহিত্য পত্রিকা পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বলা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশক ছিল মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। ইতঃপূর্বে কিছু পত্রিকা নতুন প্রাণশক্তি ও জীবনভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, এর সঙ্গে যুক্ত হলো 'ছোলতান' (১৯০১), 'নবনূর' (১৯০৩), 'বাসনা' (১৯০৮), 'মাসিক মোহাম্মদী' (১৯০৮) প্রভৃতি। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', তারপর প্রকাশিত হয় 'সওগাত' (১৯১৮, সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন)। 'সওগাতে'র ধারায় উদারনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন হিসেবে (১৯২৫), 'অভিযান' (১৯২৬), 'শিখা' (১৯২৭), 'জাগরণ' (১৯২৮), 'সঞ্চয়' (১৯২৮), 'জয়তী' (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকার নাম উচ্চারিত হয়।[২] এই সময়ের আরেকটি সাহিত্যপত্র 'বঙ্গনূর' (১৯১৯, সম্পাদক : শেখ হবিবর রহমান)। এর আত্মপ্রকাশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে :

> বাঙালি মুসলিম সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূর করিয়া তাঁহাদের জাতীয় জীবন সাহিত্যরসে অভিষিক্ত ও দেহমন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।[৩]

এই সময়ের সাহিত্যপত্র 'মোসলেম ভারত' (১৯২০, সম্পাদক : মোজাম্মেল হক), 'সাহিত্যিক' (১৯২৭, সম্পাদক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা) এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সাহিত্য পত্রিকা 'মোহাম্মদী' (১৯০৩, সম্পাদক: মোহাম্মদ আকরম খাঁ) থেকে 'নওরোজ' (সম্পাদক: মোহাম্মদ আফজাল-উল হক) পর্যন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশনার উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করে যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠা এনে দেওয়া। এসময়ের মুসলিম সম্পাদক-লেখকদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭-২০১৮) বলেন :

> বাংলার মুসলমানদের জন্য 'মুসলমানত্বের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাময়িকপত্রসমূহ কদাপি সঙ্কীর্ণতার চোরাবালিতে পতিত হয়নি। সম্পাদক-লেখকগণ এক্ষেত্রে বিস্ময়কর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। উপরোক্ত প্রয়াসের সাথে তাঁরা মুসলমানের স্বদেশ পরিচয়, তার মাতৃভাষা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করবার সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই পরিচয় তার বাঙালিত্বের পরিচয়। বস্তুত তৎকালীন সম্পাদক-লেখকগণ 'মুসলমানত্ব' আর 'বাঙালিত্ব' – এ দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের কল্পনা করেন নি, কখনো বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তার প্রতিবাদ করেছেন।[৪]

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ.৬

২ লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.২২৫-২৫৮

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত

ইসলাম ধর্মানুসারী বাঙালি জাতির অতীত পরিচয় যেমনই হোক, বর্তমানে তাদের স্বদেশ ও মাতৃভাষার পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে সমকালীন মুসলিম পত্র-পত্রিকা। ১৯০৯ সালে 'বাসনা' পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লেখা হয় :

> আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল দেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে আরব, পারসি অথবা আফগান জাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারেন না। ... যে দেশে আমরা সাত শত বৎসর কাল বাস করিতেছি, সে দেশকে যদি আমরা এখনো স্বদেশ জ্ঞান না করি, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ?[১]

মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা নিয়ে প্রথম থেকেই পত্রপত্রিকায় এ ধরনের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* এতদ্বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিত হয়, যথাস্থানে তা আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে মাতৃভূমি-মাতৃভাষার চেতনার বস্তুত কোনো বিরোধ নেই, সমকালীন অনেক পত্রিকায় সেটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।। ১৯২৯ সালের 'সওগাতে' নুরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫) লিখেছেন :

> সর্বক্ষণ এই ভাবটা আমাদের অন্তরে পোষণ করতে হবে যে-'বাঙ্গালী' শব্দের ওপর আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুর যে পরিমাণ অধিকার, তার চেয়ে আমাদের দাবী অনেকাংশে বেশি। অর্থাৎ কি না প্রকৃত বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে হলে, হিন্দুর চেয়ে আমরাই বরং দু'পা এগিয়ে যাব। আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার যে-ভারতের অর্ধেক সংখ্যক মোসলমান আমরা এই বাঙ্গালা মায়েরই সন্তান। ... পুরুষানুক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে বাঙ্গালা দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, আর এই বাঙ্গালা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙ্গালী না হয়ে আমরা অপর কোন একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের ত কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্ত চির-তমসাচ্ছন্ন গহবর মধ্যে পতনই অবশ্যম্ভাবী।[২]

একদিকে ধর্মীয় চেতনা ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ এবং অপরপক্ষে বিশের দশকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি–সম্ভবত এসব কারণে বাঙালি মুসলিম মানসে প্রশ্ন আর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা মায়ের এক সন্তান হিসেবে মুসলমানদের দাবি এবং অপর সন্তান হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলিম চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে দেখা যায়। বর্ণিত কালের সাময়িকপত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টি অতি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ধর্মীয় কলহের কারণে বাঙালি মুসলিম জনমতের উদ্ভব হওয়া প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেন:

> হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব থেকে মুসলিম জনগণকে মুক্ত করা। ইতোমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে চাকরি- ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রশ্ন ক্রমেই প্রকট হয়ে দেখাদেয়। যুগপৎ ভাষায়-সাহিত্যে হিন্দুত্বের প্রাবল্য, বিশেষত কাব্যে- নাটকে- উপন্যাসের মুসলমান প্রসঙ্গে হেয়

---

১ প্রাগুক্ত

২ নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, 'আমাদের কাজ', *সওগাত*, আষাঢ় ১৩৩৬, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, উদ্ধৃত : জীবন ও জনমত (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, ১৩৬

দৃষ্টি তার মনে স্বভাবতই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই পটভূমিতে সাম্প্রদায়িকসংকটের বীজোদ্গম। তবে লক্ষণীয় যে, আপন সমাজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মুসলমানসম্পাদিত পত্রপত্রিকা ক্বচিৎ চরম হিন্দু-বিদ্বেষ বা অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার পোষকতা করেছে। ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, পক্ষান্তরে প্রধানত হিন্দু- মুসলমান সৌহার্দ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১]

হিন্দু সম্পাদিত অনেক প্রগতিশীল পত্রিকার ক্ষেত্রেও এটি দুর্লভ ছিল না। রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সমকালীন 'প্রবাসী' (১৯০১) পত্রিকাও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেনি। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক আবুল ফজল জানান :

মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রবাসীর তখন খুব নাম-ডাক। সম্পাদক রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র যুক্তিপূর্ণ আলোচনারও খুব সুনাম তখন। ... মাঝে মাঝে বিবিধ প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বিরূপ সব মন্তব্য হতো। এরকম দু'একটি মন্তব্যের আমি জবাবও দিয়েছিলাম। আমার এরূপ এক জবাব বা প্রতিবাদ ১৩৩২ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়' এ নামে ছাপা হয়েছিল।[২]

বর্তমান শতকের মুসলিম সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র 'নবনূর', 'বাসনা', 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'সওগাত', 'বঙ্গনূর', 'মোসলেম ভারত', 'শিখা', 'নওরোজ', 'মোয়াজ্জিন', 'জয়তী' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বন্ধন দৃঢ়তর করা। বিশের দশকের জনপ্রিয় রাজনৈতিক মুখপত্র 'ধূমকেতু', 'ছোলতান' হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ববন্ধন সম্পাদনে নেতৃত্ব প্রদান করে। অন্যদিকে 'আল-এসলাম' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক পত্রিকাও আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মিলনের বাণী প্রচার করে। ১৩২৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'আল-এসলামে' এস. এম. আকবর উদ্দীন বলেন :

তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, তোমার এক ধর্ম্ম, আমার এক ধর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তোমায় আমায় কি বন্ধুত্ব হইতে পারে না? তুমি আমি কি ভাই-ভাই হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি না? ... আমরাও বলি আমরা একই মায়ের সন্তান, যুগ-যুগান্তর অবধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী অবধি একই দেশে, একই শস্য, ভক্ষণ করিয়া, একই বাতাসের নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া একই আকাশের তলে, সমভাবে সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া করিয়া আসিতেছি। তাই বলে আমাদের একতা, একপ্রাণতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।[৩]

এরকম 'একপ্রাণতা' হওয়ার আহবান ঘোষিত হয়েছে মুসলমান সম্পাদিত আরো অনেক পত্রিকায়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে পারি, যেগুলির মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। 'হিন্দু-মুসলমান' নামাঙ্কিত শিরোনাম নিয়ে এক বা একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে মুসলমান সম্পাদিত এসব পত্রিকায়। পত্রিকাগুলোর নাম এবং রচনাগুলোর শিরোনাম ও লেখকদের নাম হচ্ছে : 'নবনূর' (হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি–যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত), (হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব – জীবেন্দ্র কুমার দত্ত), 'বঙ্গনূর' (হিন্দু-মোসলমানের মিলনের অন্তরায় – মোহাম্মদ আবদুল হাকিম), 'মোসলেম ভারত' (হিন্দু-মুসলমানদিগের গৃহবিচ্ছেদের শান্তি – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর),

---

১ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২ আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ১৭১-১৭২
৩ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

'সহচর' (হিন্দু-মুসলমান – সম্পাদকীয়), 'আহমদী' (হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায় – আবুল হাসেম খান চৌধুরী), 'সৌরভ' (হিন্দু-মুসলমান – ডা.নলিনাক্ষ সান্যাল), 'সবুজ পল্লী' (হিন্দু মুসলমান – ডা. বিপিন চন্দ্র পাল), 'গণবাণী' (হিন্দু মুসলমান – কাজী নজরুল ইসলাম), 'মাসিক মোহাম্মদী'(হিন্দু ও মুসলমান – অক্ষয় কুমার নন্দী)।[১] এসব রচনার লেখকদের মধ্যে মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিমদের সংখ্যাই বেশি, যাঁদের লেখা অকৃপণভাবে মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এসব রচনার মূল্য এখনো নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এগুলির মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ জাফর আলী সম্পাদিত 'সবুজ পল্লী' (১৯২৬) নামক সাময়িকপত্রের প্রথম সংখ্যায় ডা. বিপিনচন্দ্র পাল 'হিন্দু-মুসলমান' নামক রচনায় লেখেন :

> আমরা কিন্তু শুনতে পাই ক্রমেই দেশের অজ্ঞ অন্ধকারে শিক্ষার আলোক বাড়ায়ে দেওয়া হতেছে, কিন্তু জানি না কেমন শিক্ষা যে শিক্ষা সৌহার্দ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। স্বীকার করি মুসলমানরা এসেছে ভারতের গণ্ডির অনেকখানি ব্যবধান হতে, তাদের আচার নিয়ম নিষ্ঠা হিন্দু হতে অনেকখানি পৃথক কিন্তু তাই বলে কি আজও ভারতের ধূলি-কণার সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক বদ্ধ-পরিকর হয় নাই? আজও কি হিন্দুর সাথে তাদের প্রাণের ব্যবসা খোলার সময় আসে নাই? আজও কি একজনকে দেখে অপরের অন্ধকারের বিষাক্ত শাণিত ছুরিকা জ্ঞানে আতঁকে উঠতে হবে।[২]

আহমদী সম্প্রদায়ের মুখপত্ররূপে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আহমদী' পত্রিকায়ও (১৯২৫, সম্পাদক : গোলাম সামদানী ও দৌলত আহমদ খান) হিন্দুদের ও হিন্দু মন্দিরের ওপর যাতে কোনো প্রকার হিংসাশ্রয়ী ঘটনা না ঘটে, সেজন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে মূল ফারসিতে লিখিত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 'হুকুমনামা' থেকে যে মূলানুগ অনুবাদ 'আহমদী'তে ছাপা হয়, তা তুলে ধরা হলো :

> প্রজার মঙ্গলের জন্য স্বাভাবিক দয়াগুণে প্রণোদিত হইয়া সকলের অবগতির জন্য আমরা এতদ্বারা এই ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া আদেশ করিতেছি যে, আমাদের উচ্চ নীচ সকল প্রিয় প্রজাই শান্তির সহিত পরস্পর একতাসূত্রে বাস করিবে এবং ইসলামী শরিয়ত অনুসারে আমরা এতদ্বারা আদেশ করিতেছি যে, হিন্দুদের মন্দির ও পৌত্তলিক উপাসনালয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা হইবে। এবং যেহেতু ইদানীং আমাদের গোচরীভূত করা হইয়াছে যে,কতিপয় লোক আমাদের বারানসীধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সহিত অপমানজনক ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে এবং ব্রাহ্মণগণকে তাহাদের প্রাচীন নায্য-উপাসনা প্রণালীতে বাধা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছে; এবং যেহেতু ইহাও আমাদের গোচরীভূত করা হইয়াছে যে, এই সমস্ত উপকথার ফলে তাহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব এখন আমরা এই ফরমান জারী করিতেছি এবং ইহা আমাদের সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জানাইয়া দেওয়া হউক যে, এই ফরমান জারী হইবার তারিখ হইতে কোন ব্রাহ্মণকে যেন তাহার উপাসনায় কষ্ট দেওয়া না হয়, কোন হিন্দু মন্দিরে যেন বাধা প্রদান করা না হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ শান্তির সহিত বাস করিয়া আমাদের সৌভাগ্য সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুক।[৩]

---

১ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংহতি লাঙল গণবাণী*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪১

২ *সবুজ পল্লী*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, উদ্ধৃত, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, *মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি*, পুথিপত্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৮

৩ *আহমদী*, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩২, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

মুসলিম শাসকদের দ্বারা অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধানসহ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমানাধিকার প্রদানের প্রসঙ্গটি সমকালে অনেক মুসলিম সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল।

ঢাকা ও কলকাতার বাইরে মফস্বল শহর থেকে রুচিসম্মত পত্রিকাও যে সমকালে বের হতো, তার একটি উদাহরণ 'বাসনা' পত্রিকা। ১৯০৬ সালে মফস্বল শহর রংপুরের কাকিনা থেকে শেখ ফজলল করিমের (১৮৮৩-১৯৩৬) সম্পাদনায় 'বাসনা' নামক উন্নতমানের একটি মাসিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। 'বাসনা' পুরোপুরি একটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল। তবে পত্রিকাটিকে সেকালে মুসলিম সমাজের মুখপত্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়। মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ও তাঁদের শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার চর্চা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে 'বাসনা'র ভূমিকা ছিল অনন্য। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রগতিবিমুখ মুসলমান সমাজের অধঃপতিত অবস্থা সকলকে অবহিত করা এবং জাতীয় উন্নতি বিধানে সমাজকে অনুপ্রেরণা দান করা ছিল এ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'বাসনা' হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পত্রিকা ছিল। পত্রিকার প্রত্যেক লেখকই তাঁদের স্বপ্ন, সমাজ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'বাসনা'র প্রকাশিত সংখ্যাগুলো ছিল বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্যময়।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মুসলিম সাহিত্যিকদের মনোজগতেও একটা ধাক্কা লাগে। এ সময়ে কয়েকটি বিখ্যাত সাময়িকপত্র বন্ধ হয়ে যায়। মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) এই পরিস্থিতিতে লিখেছিলেন :

> কুক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য গগনের ভাস্কর 'নবনূর' এর জীবন দায়িনী হৈমচ্ছটা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই হইতে এই যে দিনে দিনে 'একে একে নিবিছে দেউটী' – তাহা আর জ্বলিল না। তারপর হাস্য প্রভাসিত 'সুধাকর' পুঞ্জ পুঞ্জ কাদম্বিনীর অন্তরালে লুকায়িত হইয়াছে, শক্তি শেখর 'সোলতান' নির্বাসিত ও সমাহিত হইয়াছে, বাস বিলাসিত 'বাসনা'র কোমল মধুর দাম আতপ তাপে আরো শুকাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে যে অবসাদের অন্ধকার বঙ্গীয় মুসলিম গগন ঘিরিয়া কালরাত্রির সৃজন করিয়াছে, তাহার মোহ ও আবেশ, জড়তা ও সুপ্তি, বিষের ন্যায় সাহিত্যিককে নিঃসঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে। কুঞ্জকাননের কলকণ্ঠ কোকিলের স্বর লহরী শুদ্ধ হইয়াছে। – বঙ্গীয় মোসলেমের যে সাহিত্যকানন আজ বিচিত্র – সমৃদ্ধ দেখিতে আশা করিয়াছিলাম, তাহা কোন দোষে এত শীঘ্র শুষ্কহইয়া গেল? জানি না, মুসলমান সাহিত্যিক ও লেখকগণ কি কারণে এত শীঘ্র সাহিত্য সাধনা পরিত্যাগ করিয়া – আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন ও আত্মগোপন করিয়াছেন।[১]

'প্রবাসী', 'ভারতী', 'কোহিনুর', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মুসলিম-অমুসলিম পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখে যাঁরা কল্যাণ সাধন করতে পারতেন, তাঁরা নিষ্ক্রিয় থেকে 'ঘোরতর পাপ' এবং 'অমার্জনীয় অপরাধ' করেছেন বলে মন্তব্য করে এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁদেরকে, মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হবার উদাত্ত আহবান

---

১ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখক', *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩১৮, উদ্ধৃত : *মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭০, পৃ. ১৮

জানিয়েছিলেন। কারণ, ‘চিরদিন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় এবং সাধনায় জাতি উঠিয়াছে, এখনও উঠিবে।’[১]

এই ধরনের আক্ষেপোক্তি ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য সংবলিত লেখার পর মুসলিম সমাজ অকস্মাৎ যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। মুসলমান সমাজে আশ্চর্যজনক এক পরিবর্তনের লক্ষণ সূচিত হলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুসলিম সমাজের উদ্যোগে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলো, যেগুলো বিষয়ের অভিনবত্বে ও ভাষিক ঐশ্বর্যে প্রশংসনীয়।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করায় মুসলমানদের হীনম্মন্যতা দূরীভূত হতে আরম্ভ করলো। এই দশকেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধানতম নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ এবং অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) বাঙালি মুসলমানের সামনে মেধার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে তাঁদের উজ্জীবিত করে তুললেন। মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর, ১৮৬০-১৯৩৩), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭), মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, সৈয়দ এমদাদ আলী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা, ১৮৮৫-১৯৭৬), ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪), এস. ওয়াজেদ আলি, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯০-১৯৬২), প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন এবং পশ্চাৎপদ মুসলমানদের প্রতি অগ্রবর্তী সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন। নজরুলের কবিতা, হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), শামসুন নাহার (১৯০৮-১৯৬৪) প্রমুখের রচনা প্রকাশ করে কল্লোলগোষ্ঠী তাঁদের স্বীকৃতি দেন। আবার নজরুলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি প্রদান করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের অনেক মুসলিম লেখকদের অগ্রগমন ও সুদৃঢ় অবস্থানকে জানান দেন। এর কয়েকবছর পরে, আরও অগ্রসর হয়ে আরো বলার সাহস হলো, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানরা আর পিছিয়ে নন। এ উদ্যমে সহায়তা করলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। কালের অন্ধকার আবর্ত থেকে মধ্যযুগের মুসলিম রচিত পুথিসাহিত্য উদ্ধার করে তিনি প্রমাণ করেছেন – জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মুসলিম সমাজ কখনোই পিছিয়ে ছিলেন না। মুসলমান রচিত এসব সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়ার জন্য যেসব সাহিত্যপত্র সেকালে ভূমিকা পালন করেছিল সেগুলো হচ্ছে : ‘মোসলেম হিতৈষী’ (সাপ্তাহিকপত্র, ১৯১১-২১), ‘ইসলাম আভা’ (ময়মনসিংহ, ১৯১৩), ‘আল এসলাম’ (১৯১৫-২১), ‘আহলে হাদিস’ (১৯১৫), ‘ইসলাম দর্শন’ (১৯১৬), ‘মসজেদ’ (১৯১৭), ‘বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা’ (১৯১৮-২৩), ‘সওগাত’ (১৯১৮-২১, ১৯২৬-১৯৭৬), ‘সাধনা’ (১৯১৯-২৩), ‘বঙ্গনূর’ (১৯১৯-২১), ‘নূর’ (১৯২০), ‘আঙ্গুর’ (১৯২০), ‘ইসলাম দর্শন’ (১৯২০-২৬), ‘মোসলেম ভারত’ (১৯২০-২২), ‘শিক্ষক’ (১৯২০-২৩), ‘নবযুগ’ (১৯২০-২১), ‘দেবর্ষি দরবার’ (১৯২০-২২) প্রভৃতি পত্রিকা।

---

১ প্রাগুক্ত

এগুলোর কয়েকটি ধর্মীয় আদর্শের প্রচারক, গোঁড়া রক্ষণশীল আদর্শের সমর্থক, আবার কতকগুলো সরকার বিরোধী এবং কৃষক মজুরদের সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত। ১৯০১ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়কালে অন্তত ১০৮টি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলিতে মুসলিম সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়।[১]

লক্ষণীয় যে, বিশ শতকের সূচনায় যাঁরা জড়তাকে সম্বল করে পত্রিকা প্রকাশের জগতে ছিলেন পিছনের সারিতে, কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁরা 'নবযুগে'র মতো সমাজতান্ত্রিক আদর্শানুগ একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব দেখালেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'দৈনিক সেবক' এবং সরকার বিরোধী রচনার জন্য এই পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর একই সম্পাদকের নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক মোহাম্মদী'। স্পষ্টত ১৯২১ সাল থেকে মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার জগতে আবার নবপ্রাণ সঞ্চারিত হলো। 'দৈনিক সোলতান' (১৯২২), 'দৈনিক তরক্কী' (১৯২৬), 'দৈনিক হানাফী জামায়েত' (১৯২৬), 'দৈনিক আমির' (১৯২৬), 'দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা' (১৯৩০) প্রভৃতি কতিপয় দৈনিকই বাঙালি মুসলমানেরা এ দশকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিরিশের দশক পর্যন্ত 'ইসলাম', 'এসলাম', 'মোসলেম' 'মুসলমান' নাম সংবলিত সাময়িকপত্রের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এগুলো অনেকটাই ছিল গোঁড়া প্রকৃতির। অবশ্য মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী সম্পাদিত 'আল এসলাম' ধর্মীয় নামের হলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সমাজের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় মুসলমানদের অন্যতম সংগঠন মহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৫৩) ও বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি (১৯১১) ঢাকাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।এর ফলে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গতি ত্বরান্বিত হয় এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। এই দশকেই ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে গড়ে ওঠে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)। তাদের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭) নামটিতেও বিপ্লবাত্মক অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। 'শিখা' বাঙালি মুসলমান সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। 'তরুণপত্র' (১৯২৫), 'অভিযান' (১৯২৬), 'জাগরণ' (১৯২৮) পত্রিকা তিনটিকে 'শিখা'র গোত্রভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ পত্রিকাগুলি ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র লেখকদের, বিশেষত আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদের কোনো কোনো লেখা ও বক্তব্য নিয়ে মুসলমান সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বাদানুবাদ হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে বিতর্ক সৃষ্টিকারী এসব লেখা ও এর প্রতিক্রিয়া ও বাদানুবাদ কিন্তু শিখায় প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে 'অভিযান', 'জাগরণ', 'জয়তী', 'সঞ্চয়' ও অন্যান্য পত্রিকায়।[২] ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে 'দ্য মুসলমান' সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁর সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম' বেরোতে শুরু করে। অন্তত বছর চারেক চলা পত্রিকাটি "সে যুগের তুলনায় বেশ উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক ছিল"[৩]।

---

১ সফিউদ্দিন আহমদ, *সাময়িকপত্রে ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬০১
২ হাবিব রহমান সম্পাদিত, *নির্বাচিত সংকলন : মাসিক জাগরণ পত্রিকা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৭ ও ১২
৩ *মৌলবি মুজিবর রহমান ও দ্য মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭১

১৯২১-৩০ সময়ে প্রকাশিত, মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার নামগুলোও এক নজরে দেখলে বোঝা যায়,পত্রিকাগুলির মধ্যে খাঁটি বাঙালি মুসলমানের আলোকাভিসারী হয়ে উঠার প্রত্যয় স্পষ্ট হয়েছে। যেমন, 'নারী শক্তি' (১৯২২), 'সোনার ভারত' (১৯২৩), 'বাহাদুর' (১৯২৩), 'দেশের কথা' (১৯২৪), 'সত্যাগ্রহী' (১৯২৪), 'যুগবাণী' (১৯২৪), 'তরুণপত্র' (১৯২৫), 'সৌরভ' (১৯২৫), 'লাঙল' (১৯২৫), 'যুগের আলো' (১৯২৬), 'খাদেম' (১৯২৬), 'দরদী' (১৯২৬), 'হিন্দু মুসলমান' (১৯২৬), 'অভিযান' (১৯২৬), 'গণবাণী' (১৯২৬), 'সাহিত্যিক' (১৯২৭), 'জাগরণ' (১৯২৮), 'তরুণ' (১৯২৮), 'সঞ্চয়' (১৯২৮), 'জয়তী' (১৯৩০) প্রভৃতি। ১৯০১ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমান সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যা ১০৭টিসহ ১৮৩১ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত সংখ্যা হিসাব করলে তা দাঁড়ায় ১৫৬। এর থেকে কমপক্ষে ২৫টি পত্রিকা বাদ দিলে এ সংখ্যা হয় ১৩১। মোটামুটি এ সময়কালে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৩১-এর কম হওয়ার কথা নয়।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সম্পাদিত 'সাম্যবাদী' (১৯২৩) পত্রিকার আলোচনা *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র শেষ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজে ভালো সাময়িকপত্রের অভাব আছে বিধায় এই 'নবীন সহযোগী'কে সাহিত্য-পত্রিকায় সাদর অভিনন্দন জানানো হয়। একই সাথে হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে থেকে মুসলিম সমাজের মধ্যেও যে শ্রেণিভেদের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনকল্পে 'সাম্যবাদী' ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকার আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য :

> মানব সমাজে সাম্য ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম আদর্শ। যাহাতে মুসলমান সমাজ এই আদর্শভ্রষ্ট না হয়, মানব সমাজে সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উচ্চতর ও পবিত্রতর জীবনযাপন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই সাম্যবাদীর প্রচার। আমরা মাঘ ও বৈশাখ এই দুই সংখ্যার সাম্যবাদী পড়িয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।[১]

*বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র আরেকটি লেখায় 'সাম্যবাদী'র সূচনা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, যা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> সাম্যবাদী নামে আর একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সদ্য সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা তাঁহারা বক্তৃতায় অনেক কিছু আশা করার কথা বলিয়াছেন। দেখা যাউক কার্য্যে কতদূর গড়ায়। সমাজের ভিতর সাম্য প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কিছুকাল পরে উৎসাহের সাম্য বা উপশম না হইলেই মঙ্গল।[২]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬-১৯৫৪) সম্পাদনায় 'সাম্যবাদী' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। তিনি ছিলেন 'সাম্যবাদী'র প্রথম সম্পাদক। দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ ১৩২৯ থেকে বৈশাখ ১৩৩১ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকরূপে

---

১ সম্পাদক 'সাম্যবাদী: সাহিত্য পরিচয়', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ. ৭৯
২ এম আনসারী, 'মুসলমান সাময়িকী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ. ৭৫

প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় বর্ষে সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'সাম্যবাদী'কে দ্বিমাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন, যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল মাসিক আকারে প্রকাশ করা। সুতরাং প্রথম বর্ষের ত্রৈমাসিক চারটি সংখ্যা এবং দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিমাসিক তিনটি সংখ্যা তারই সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালীন বেশ কিছু পত্রিকা-গ্রাহক 'সাম্যবাদী'কে মাসিকরূপে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সম্পাদক ওয়াজেদ আলীর যথেষ্ঠ আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে 'সাম্যবাদী'কে মাসিক আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সম্পাদকবৃন্দ যথাক্রমে খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১), আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী (১৮৯৩-১৯৩৫) তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা (কার্তিক ১৩৩২) পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ঐ সংখ্যার পর মাসিকে রূপান্তরিত হওয়া ব্যতিরেকেই 'সাম্যবাদী'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। কবিতা বা গল্পের চেয়ে প্রবন্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় 'সাম্যবাদী'। এ-প্রসঙ্গে পত্রিকার একটি বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> সাম্যবাদীর প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রবন্ধগুলি পড়িলে কেবল সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না, প্রত্যেক দেখাতেই ভাবিবার, শিখিবারও জানিবার কথা অনেক থাকে। মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "কামাল পাশার স্বপ্ন" শীর্ষক সন্দর্ভে অল্প পরিসরে তুরস্কের অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যে বর্ণনা আছে তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।[১]

কামাল পাশাকে নিয়ে লিখিত ইবরাহীম খাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ সমকালে দেশবাসীর নিকট ভবিষ্যৎ তুর্কি জাতির পিতাকে সম্যকভাবে পরিচিত করিয়েছিল। তবে লেখক 'এই প্রবন্ধ কামাল পাশারস্মার্না বিজয়ের পূর্বে লিখিত' হয়েছিল বলে প্রবন্ধ শেষে পাদটীকায় উল্লেখ করেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার বিষয়

সাময়িকপত্রের সংকলক ও গবেষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রকাশিত রচনাসমূহকে কয়েকটি ভাগেবিভাজন করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকপত্রের রচনাগুলিকে বিন্যাস করেছেন শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ – এই পাঁচ ভাগে। তবে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষার ওপর। অপরদিকে বিনয় ঘোষ অর্থনীতির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিশেষভাবে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন রাজনীতি প্রসঙ্গ। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থের দুটি খণ্ডে সংকলিত লেখাগুলিকে বিভাজন করেছেন শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, আত্মচেতনাবোধ ও আত্মজাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, বিবিধ – এই দশটি পর্বে। এগুলি মূলত অনেকগুলি সাময়িকপত্রের সংকলিত বিষয় নিয়ে, একক কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নয়। একক পত্রিকা হিসেবে ইতোমধ্যে 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সওগাত', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'ছোলতান', 'প্রদীপ', 'কবিতা', 'মোসলেম ভারত', 'বালক', 'ভারতবর্ষ', 'হিতকরী', 'ধূমকেতু', 'সাম্যবাদী', 'শিখা', 'লাঙল', 'গণবাণী'সহ অনেক পত্রিকার এক বা একাধিক বিষয়ভিত্তিক সংকলনগ্রন্থ বেরিয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজ ও ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সাহিত্যকর্ম, ভাষা – এই চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। সাহিত্য-পত্রিকার বেশিরভাগ প্রবন্ধ ও রচনায় উপরোক্ত বহু বিষয় একত্রে স্থান পেয়েছিল। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নানা বিষয়কে বিবেচনায় রেখে আমরা বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও ধর্ম

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা মূলত সাহিত্য-পত্রিকা হলেও এতে পরিবেশিত হতো সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত মুসলিম মনীষীগণ পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুগান্তসৃষ্টিকারী ভূমিকা পালনে সক্ষম হন। চিন্তা ও দর্শনে এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। যার পরিপ্রেক্ষিতে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* অসাম্প্রদায়িক চেতনা সংবলিত রচনাই অধিক প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কীভাবে সমাজের বাস্তবমুখী মঙ্গল সাধন করা যায়, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় সমাজের নানা স্বার্থ, ধর্মীয় ঐক্য, সমাজে নারীর অবস্থান, মানবজীবনে সামাজিক প্রভাব, প্রচলিত শিক্ষা, কৃষি ও কৃষক সমাজের কথা, তরুণ ও ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ইত্যাদি নানান সামাজিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পত্রিকায় বিভিন্ন ধর্মের মানবতা, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্ট ধর্মের আচারপ্রথা, ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা, ধর্মপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ (সা.) সহ যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্যদেব প্রমুখ মনীষীর আলোচনা স্থান পায়। বলা যায়, সমাজ ও ধর্মের প্রায় সবদিক স্পর্শ করার প্রয়াস ছিল *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার*।

বিশ শতকের প্রায় প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ অতিবাহিত করেছে একটি গৌরবহীন অধ্যায়। অবক্ষয় ও অধঃপতনের কালো ছায়া নেমেছিল তাদের জীবনের সর্বস্তরে। ফলে তাদের জীবনগতি হয়ে পড়েছিল স্থবির। শুধু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেই নয়, সাধারণভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজেও এমন কিছু সামাজিক আচার-বিধি, মত-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যা ইসলাম ধর্মের আদর্শবিরোধী। এসব আচার-বিধি শাস্ত্রের ছদ্মাবরণে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। ফলে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি ছিল প্রায় নির্বাসিত। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার প্রায় গোটা সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।[১]

এসব ধর্মবিরুদ্ধ দেশাচার ও লোকাচারের পেছনে একাধিক কারণ নিহিত ছিল। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ইসলামের মূলনীতি অনুধাবনে অক্ষমতা, দীর্ঘকাল হিন্দুদের সাহচর্যে বাস করার ফলে হিন্দু ধর্মের আচার প্রথার প্রভাব প্রভৃতি ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে।[২] এছাড়া সুফিপন্থী পির-ফকির, আউল-বাউল-দরবেশ প্রভৃতি সাধকদের আচার, উদারতা ও শরিয়ত বহির্ভূত অনেক প্রথাপদ্ধতি মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশকে ইসলামপন্থী হয়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে।[৩]

---

১ ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৬৬

২ আজিজুর রহমান মল্লিক, *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলা মুসলমান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ২৯-৩০

৩ *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে সচেতনতাবোধ উন্মেষিত হতে শুরু করলে স্বসমাজের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে শহরে ও মফস্বলে বেশ কিছু আঞ্জুমান বা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩), 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮), 'কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩), 'মহামেডান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৯৬), 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৮৯৯), 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩), 'বেঙ্গল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৯০৬), 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এ্যাসোসিয়েশন' (১৯০৭), 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগ' (১৯০৯), 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি' (১৯১১), 'আঞ্জুমান-এ ওলামায়ে বাঙ্গালা' (১৯১৩), 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (১৯১৬), 'বেঙ্গল মোসলেম ফেডারেশন' (১৯২১), 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) প্রভৃতি সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজে বিদ্যমান কুপ্রথা দূর করে তাদেরকে বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

বাংলার হিন্দু সমাজের আধুনিকতাচর্চার সঙ্গে বাংলায় মুসলিম সমাজের আধুনিকতাচর্চার একটি বড়ো পার্থক্য এই যে, অবহেলিত হিন্দু নারীকে মুক্তির পথে নিয়ে যান মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙালি মুসলিম নারীর উন্নতিবিধানের জন্য মুসলিম চিন্তাবিদদের মনে মাঝে মাঝে চিন্তাভাবনা হলেও নারীর অবস্থা উন্নয়নের জন্য কোনো আন্দোলন তখনও মুসলিম সমাজে হয়নি। বরং ইসলামে নারীর যে মূল্য ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তাদের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়। তাদেরকে কঠোর অবরোধের মধ্যে রেখে, শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, ইচ্ছে মতো বিয়ে করে ও তালাক দিয়ে, বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না করে সামাজিক অগ্রগতির পথরোধ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'অবলাবান্ধব', 'রামাবোধিনী' পত্রিকা হিন্দু নারী সমাজের প্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে ঠিক সেরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে 'নবনূর', 'The Mussalman', 'আল-এসলাম', 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'সাধনা', 'সহচর', 'শিখা', 'নওরোজ', 'মোয়াজ্জিন', 'জাগরণ', 'বুলবুল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় তো স্পষ্টভাবে লেখা হয় :

> বঙ্গ মোসলেমের সামাজিক অবস্থা দর্শনে আজ স্পষ্টই অনুমিতি হইতেছে যে, ইসলামী মতবাদে নারীকে যতোধিক মাত্রায় সম্মান ও স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, ইসলামী ধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গ মোসলেম আজ নারী জাতিকে ততোধিক মাত্রায় অসম্মান ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গ মোসলেম সমাজে নারীকে বিবাহ দেওয়া আর একটি গৃহপালিত পশুকে গলায় রশি লাগাইয়া হাটে-বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা একই ধরণে হইয়া থাকে।[১]

ইসলামে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হলেও এদেশে নারী সমাজকে শিক্ষাবঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল কঠোর পর্দা ও অবরোধ প্রথার নামে। পর্দা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে দু-রকম মনোভাব প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ লেখক পর্দা ও অবরোধকে আলাদা করে দেখেছিলেন। আর

---

১ 'বঙ্গ মোসলেম সমাজে মহিলা জীবন', *মোয়াজ্জিন*, শ্রাবণ ১৩৩৫, উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত: ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭৩

অল্পসংখ্যক লেখক এ দুটিকে একই অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। পর্দা বা অবরোধ যাই বলা হোক না কেন, ইসলামে এগুলির অজুহাতে মেয়েদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার কথা বলা হয়নি। নারীকে গৃহবন্দি রেখে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারেনি। বিশিষ্ট লেখক এস. ওয়াজেদ আলি সমাজের মঙ্গলের জন্য পর্দাপ্রথা বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। 'বাঙালি মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> পর্দা প্রথার একটা মারাত্মক দোষ হচ্ছে সে প্রথা জাতির মধ্যে physical degeneracy আনে, জাতিকে প্রাণী হিসেবে দুর্বল করে দেয়। ফলে জাতি সৌন্দর্যের হিসেবে, স্বাস্থ্যের হিসেবে, চরিত্রের হিসেবে, ধী শক্তির হিসেবে নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামতে থাকে।[১]

বাঙালি মুসলিম নারীর জীবনে বিবাহ নামক ব্যাপারটি মনে হয় সবচেয়ে বেশি সংকট সৃষ্টি করেছিল। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, তালাক ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের জীবনকে নিগ্রহের যাঁতাকলে পিষ্ট করেছিল। এই কুপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস মুসলিম সমাজে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে মুসলিম চিন্তানায়কদের লেখনীর মধ্য দিয়ে। বিংশ শতাব্দীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে পর্দা, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীর নিরক্ষরতার কুফল প্রভৃতি সম্পর্কে সমাজসচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব প্রথা যে উৎপীড়ক প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের অপব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত-সে সত্য সচেতন সমাজ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম লেখকদের বক্তব্য সময়ের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ, প্রতিবাদী ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে বাংলার 'নবনূর', 'মোহাম্মদী', 'আল-এসলাম', 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'সহচর', 'শিখা', 'মোয়াজ্জিন', 'জাগরণ', 'বুলবুল'প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ভূমিকা বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা সৃষ্টি করতে কিছুটা সফল হয়েছিল। এর ফলে বাংলার মুসলিম তরুণেরা হয়ে ওঠে উদারচেতা ও সাহসী। নারী সমাজের উন্নয়নে উৎসাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তরুণ ছাত্রসমাজ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'পর্দা বিরোধী সঙ্ঘ' নামক একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন। বিশের দশকে এ ধরনের পর্দা বিরোধী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলিম সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে একটি নির্ভীক পদক্ষেপ ছিল। 'আল মামুন ক্লাব' নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম লেখক আবুল হুসেনের উদ্যোগে। এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ। খলিফা আল-মামুন ইসলামের ইতিহাসে মুসলমান যুক্তিবাদীদের অগ্রণী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর নামানুসারে উপরোক্ত ক্লাবের নামকরণ করা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ফজিলাতুন্নেসা (১৮৯৯-১৯৭৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলে আল-মামুন ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।[২] এ অভিনন্দন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে ফজিলাতুন্নেছা বলেন :

> নারীকে পর্দার অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে, বাইরের কোন সাড়া তার মনকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। যুগের পর যুগ এমনিভাবে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এ জড়তা ঘুচিয়ে সমাজ দেহকে সুস্থ করবার কোন চেষ্টা হয়নি। আপনাদের মধ্যে সেই প্রয়াস দেখেই আমি আমার কথা কয়টি নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছি।[৩]

---

১ সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *এস ওয়াজেদ আলি রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪১
২ আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ.১৪৮
৩ ফজিলতুনন্নেছা, 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *সওগাত*, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ .৫২৫

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র মুখপত্ররূপে যখন *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* আত্মপ্রকাশ করে, তখন মুসলিম সমাজের লক্ষ্য ছিল ইতিবাচক পরিবর্তন। পাশাপাশি প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে মুসলিম সমাজের বিষয়ে 'হীন ধারণা' দূর করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয় এর প্রথম সংখ্যায়। পত্রিকাটির 'নিবেদন' অংশে উক্ত হয় :

> আমরা চাই আমাদের অতীতের গুপ্ত অথচ গৌরবময় ভিত্তি পুনরায় লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া তাহার উপর বর্তমানের বিরাট, বিশাল, উদার, উন্নত ও মহামহিম সৌধ রচনা করিতে। আমাদিগকে এখন সমাজ- গঠনের কাজ করিতে হইতেছে। তাই বাস্তবকে অনেকটা আদর্শের ছাঁচে ঢালিতে হইবে। ... আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িতে। তাই চাই বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা।[১]

মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পত্রিকাটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনায় প্রথম থেকেই তৎপর ছিল। সমাজে উভয় সম্প্রদায়ের সেতুবন্ধন হতে পারে সাহিত্য, এটি বেশ স্পষ্টভাবে পত্রিকায় বলা হয়। তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বলা হয় :

> হিন্দু-মুসলমান বঙ্গ-জননীর যুগল সন্তান। রাজনীতি ক্ষেত্রে উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে আলিঙ্গন দিতে পারিয়াছে। ইহা সুখের কথা। এই মিলন পরস্পরের স্বার্থের অনুরোধেই ঘটিতেছে, তবুও ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন হইবে, তাহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকিবে না। সে মিলন অতি পবিত্র এবং অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকার ভাই বলিয়া চিনিতে পারিবে, সেই শুভদিনের সূত্রপাত হইয়াছে।[২]

সমাজে বাঙালি হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াসী হিসেবে সর্বদাই তৎপর ছিল *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। তৎকালে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 'বাঙালি জাতি' গড়তে বহু বাধা ছিল। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* এ-প্রসঙ্গে লেখা হয় :

> হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেই হউক না কেন, তাহা করিতেই হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান ব্যতীত চলিতে পারিবে না। বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু ব্যতীত চলিতে পারিবে না। চিরকাল কি একভাবেই যাইবে? জগতের ইতিহাসপৃষ্ঠে কি হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাঙ্গালী জাতি, ফরাসি, ইংরাজ, ইতালিয়ান, জার্ম্মান, জাপানী প্রমুখ জাতির ন্যায় নাম রাখিতে পারিবে না? আশা কানে কানে গুজন করিয়া বলে 'পারিবে'।[৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবধর্মের লেখকের একাধিক এবং নানান বিষয়ে লেখা প্রকাশই এর বড় প্রমাণ।

সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে বিশ্বনাগরিক হওয়ার অভীপ্সাও ব্যক্ত করেছে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*:

> সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এক একটা বিশিষ্ট ভাবের আদ্যন্ত বিচার হওয়া উচিত। এই ছোট ছোট সমাজের সমন্বয় ও সংযোজনের ফলে আমরা একটি বৃহৎ বিশ্বসমাজ পাই। তখন প্রত্যেকটির বিশিষ্ট ও

১ 'নিবেদন', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ১-২

২ দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য- সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৯

৩ চণ্ডীদাস গুপ্ত, 'অর্থবিজ্ঞানের উপাদান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ.৯৮

> নিজগত প্রবৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের সাধারণ সামঞ্জস্যের বার্ত্তা ঐ বিশ্বসমাজের সুমহতী বার্ত্তার চরণতলে লুটাইয়া পড়িবে।[১]

সমাজ-সংসারের অনাচার ও অসাম্য প্রত্যক্ষ করে 'রবীন্দ্র প্রতিভা' (বাঙালি মুসলমানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ) খ্যাত মৌলভী একরামুদ্দীন (১৮৭২-১৯৪০) *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> এ সংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক মহাকুরুক্ষেত্র। এখানে কেবল একজন অন্যকে ঠকাইয়া জয়লাভ করিতে চায়। যিনি ঠকান তিনি সক্ষম এবং যিনি ঠকেন তিনি অক্ষম পুরুষ। ভিখারীর পর্ণকুটির হইতে সম্রাটের রাজ-প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই এই ঠকাইবার চেষ্টা শিকারের চেষ্টায় জাগ্রত হইয়া বসিয়া আছে।[২]

সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় ভয়ভীতি, রাষ্ট্রীয় কঠোরতা মানুষকে মানুষকে তার পাশব প্রবৃত্তি থেকে সবসময় বিরত রাখতে পারে না। স্বার্থচিন্তা থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। তাই লেখক সখেদে বলেন :

> কোন কোন স্বার্থ এত দুরন্ত যে সমাজ, ধর্ম ও রাজবিধি এই তিনের সমবেত শক্তিও তাহাকে বশে রাখিতে পারিতেছে না। সমাজ-দণ্ড, পারলৌকিক দণ্ড ও রাজদণ্ড এই তিন সতর্ক প্রহরী দিবারাত্র কঠোর হস্তে চৌকি দিয়াও শিষ্ট স্বার্থকে দুরন্ত স্বার্থের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না।[৩]

স্বার্থের ঊর্ধ্বে কেউ নন। তবে স্বার্থের মধ্যেও শিষ্টাচার থাকা চাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের ন্যায় জাতি, সমাজ, ধর্ম, দেশেরও স্বার্থ থাকে – তবে তা সাধারণ স্বার্থ।

ব্যক্তিগত স্বার্থের মতো সাধারণ স্বার্থও স্বেচ্ছাচারী ও বিষাদপ্রিয়। পতি-পত্নী-মাতা-পিতার স্বার্থের কথা উল্লেখ করে লেখক বলেন :

> প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি সুকুমার ভাবগুলিও যতটা সম্ভব লাভ করিবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র। পতিব্রতা পত্নী বা পত্নীরত স্বামী, স্নেহময়ী জননী বা মাতৃভক্ত পুত্র প্রত্যেকেই যতটা পারেন প্রতিদান আদায় করতে চান। প্রতিদান চায় না, এরূপ ভালবাসা কবির মস্তিস্কে আছে কিন্তু সংসারে নাই। স্বার্থের ভাগ মাতৃস্নেহে যত অল্প, এত অল্প বোধ হয় আর কোন ভালবাসায় নাই, কিন্তু মাতাও এখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্রবধূ আসিয়া পুত্রের স্নেহে ভাগ বসাইয়াছে তখন তিনি বধূর প্রতি বিদ্বেষিণী হইয়া উঠেন।[৪]

ভালোবাসা আর ঈর্ষার ভেতর দিয়েই মানুষ ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কখনো একজন বিজয়ী হন, কখনো আরেকজন। এটাই সমাজ সংসারের নিয়ম। প্রতিটি ক্ষেত্রে জয় বা পরাজয় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সৌজন্য বা সমঝোতার ভেতর দিয়ে এক ধরনের আপসকামিতাও সমাজের সর্বত্রই বিরাজমান। সাহিত্য-পত্রিকার লেখক বলেন :

> সংসারে প্রত্যেকেই জয় লাভের উদ্যোগে ব্রতী কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই জয়লাভ করিতে পারে না। একের জয়ে অন্যের পরাজয় এবং একের পরাজয়ে অন্যের জয় অবশ্যম্ভাবী; সম্পূর্ণ জয়লাভ কচিৎ ঘটে।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২ একরামুদ্দীন, 'সবল ও দুর্ব্বল স্বার্থ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১০৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪ প্রাগুক্ত

> আংশিক জয় লাভই নিত্য ঘটনা। সংসার সংগ্রামে আড়ম্বরের যদিও অভাব নাই, কিন্তু শেষ ফল সন্ধি। এই সন্ধিতে যাহার লাভের ভাগ অধিক তিনিই জয়ী এবং যাহার লাভের ভাগ অল্প তিনি জিত।[১]

আমরা ছোট ছোট বঞ্চনা বা ক্ষতিকে বড় করে দেখি, আবার অনেক বড় ক্ষতি যা অলক্ষ্যে থাকে তা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। এরকম সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচারের দূরদর্শিতা অধিকাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। লেখক মানব-মনস্তত্ত্বের এই দিকটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস পান এভাবে :

> যাহারা মুখ্যভাবে ঠকাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে যায় আমরা তাহাদিগকে শীঘ্রই চিনিয়া ফেলি এবং 'শঠ', 'তস্কর' 'অত্যাচারী আদি নিন্দিত বিশেষণের কলঙ্কে চিহ্নিত করিয়া জগৎকে সতর্ক করি কিন্তু যাঁহারা গৌণ ঠকাইয়া কার্য্যোদ্ধার করেন তাঁহাদের বাহ্য উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদিগকে 'উদ্যোগী', 'কৃতী', 'যশস্বীস্বী' আদি প্রশংসিত আখ্যায় বিভূষিত করি। কেহ সোনা বলিয়া পিতল বিক্রয় করিলে আমরা তাহাকে শঠ বলি কিন্তু যখন কেউ সোনাই উচিত মূল্য অপেক্ষা অধিক টাকায় বিক্রয় করিয়া বড় লোক হয় আমরা তাহা কৃতী পুরুষ বলি।[২]

লেখক তির্যকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করলেও একেবারে যে অমূলক তা কোনোভাবেই বলার উপায় নেই। আমাদের সমাজে প্রায়ই সবল কর্তৃক দুর্বলকে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। একইভাবে সরল বা সোজাসাপ্টা ব্যক্তি নানাভাবে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা মহলবিশেষের বঞ্চনা বা প্রতারণার শিকার হন। সরল ব্যক্তি যেন 'সমর্থ জগতের উপহাসের পাত্র' হিসেবে পরিগণিত হন। 'অপূর্ণাঙ্গ' বামনকে দেখলে যেমন পূর্ণাঙ্গ সুস্থ ব্যক্তির 'ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি' জেগে ওঠে, তেমনি অসমর্থকে, সরলকে দেখলে সমর্থের 'উপহাসপ্রবৃত্তি' প্রবল হয়। লেখক তাই বলেন :

> কার্য্যে ও কথায় প্রতিপদে সরলকে ঠকিতে হয় এবং তিনি সমর্থের সঙ্গীনের আঘাতে ভূপতিত হইয়া যতই যাতনা অনুভব করিতে থাকেন সমর্থ জগৎ ততই আপন শক্তির সফলতায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে থাকে।[৩]

আমাদের দেশের কৃষকের অবস্থাও তদ্রূপ। পল্লিসমাজের বিকাশ ও পরিপুষ্টির সাথে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি নির্ভর করে। দেখা যায় কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের বা পণ্যের উপযুক্ত দাম পান না, এমনকি উৎপাদনব্যয় উঠিয়ে আনাও অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। পাইকারি ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের কূটকৌশল ও প্রতারণার শিকার হন কৃষকরা। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখা হয় :

> এই সমস্যার মূলে যে অতি বৃহৎ প্রতারণার বীজ নিহিত আছে তাহা সর্বপ্রথম উৎপাটিত করিতে না পারিলে ঠিক খাঁটি সত্যের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।[৪]

কৃষির উন্নতি মানে দেশের উন্নতি, কৃষিপ্রধান দেশের জন্য এটি শতভাগ প্রযোজ্য। আবার কৃষকের উন্নতি, দেশের উন্নতি হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার কথা, কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় তার বিপরীতচিত্র। কৃষককে যথার্থ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৪ চণ্ডীদাস গুপ্ত, 'ভারতের পল্লী-সেবা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃ. ২০১

কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত করতে পারলে উন্নত ফলনের আশা করা যায়। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* এ-প্রসঙ্গে লেখা হয় :

> অন্যান্য সমস্ত পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের কথা বিস্মৃত হইয়া আমাদের অগ্রেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের জীবনীশক্তি কেবলমাত্র কৃষি কার্য্যের প্রসারের উপর নির্ভর করিতেছে। এ কথা যে স্বপ্রমাণিত তাহা শুধু আমরা কেন সকল সভ্যজাতিই মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের দারিদ্র দুঃখ প্রপীড়িত কৃষকের সুখ সচ্ছন্দতার দিকে, তাহাদের কৃষিবিদ্যার বিশেষ চর্চার দিকে মনোযোগ দিতে হইবেই।[১]

সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকসমাজ ছিল প্রায় পুরোপুরি অশিক্ষিত। তাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হলে গ্রামে সান্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাদানের প্রস্তাব *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* করা হয়। গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের এ কাজে এগিয়ে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। পত্রিকায় প্রস্তাব করা হয় :

> প্রেম, দাক্ষিণ্য, স্বার্থ ত্যাগ এই পল্লী পূজার একমাত্র উপাচার, এই সমস্ত সান্ধ্যবিদ্যালয়ে সপ্তাহে অন্ততঃ চারিদিবস কৃষকদিগকে সাধারণ লিখন-পঠন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে। বৎসরের ধান্য কাটিবার সময় বাদ দিয়া ঐ বিদ্যালয় চলিতে থাকিবে।[২]

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে তার কৃষি ও শিল্পের উপর। বাংলা অঞ্চলসহ সমগ্র ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ, আর কৃষক হচ্ছে তার মূল চালিকাশক্তি। অথচ কৃষকের সার্বিক কল্যাণ বা উন্নতির জন্য দেশ তেমন কিছুই করেনি। কৃষিজাত নানা উপকরণ জীবনযাত্রার অবলম্বন হলেও কৃষকের সমস্যার দিকে কেউ সুনজর দেয়নি। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতে, পরাধীন ভারতবর্ষে রেল, ট্রাক, স্টিমার, প্লেন, মোটরগাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্ট অফিস ব্যবস্থা, পাঁচতলা বাড়ি প্রভৃতির প্রচলন হলেও এসব অধিকাংশ মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠেনি। দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে তখন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অবদান দেশের সমৃদ্ধির প্রতীক হতে পারে না। এসব বিষয় নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাহাদিগকে (রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ) বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই 'গোলায় ভারা ধান, ঢাকা মসলিন' লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প–বিশেষত ভারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তেকার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রঙ্গপুর বাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লী গ্রামের সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।[৩]

এছাড়া রোকেয়া 'এন্ডি শিল্প' প্রবন্ধে দেশি শিল্পের প্রসারের জন্য রেশম পোকা চাষের এগারোটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। রেশমের গুটি থেকে নানাপ্রকার বৈচিত্র্যময় রেশমি বস্ত্র তৈরি হয়। ফলে বাঙালি কৃষক সমাজ এই শিল্পের দিকে নজর দিলে তাদের আর্থিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে, তেমনি এই শিল্প দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে প্রভূত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩ মিসেস আর এস হোসেন, 'চাষার দুক্ষু', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ. ৩

কৃষকের সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে আবুল হুসেনের (১৮৯৬-১৯৩৮) 'বাংলার বলশী' শীর্ষক প্রবন্ধ সাহিত্য-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নামের সাদৃশ্যে তিনি 'বলশী' শব্দটি ব্যবহার করেন। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষক মূল চালিকা শক্তি হলেও তার শ্রমের মর্যাদা সে কখনোই যথাযথভাবে পায়না। এটি যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে। কায়িক শ্রম নির্ভর কৃষকদের দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করার যেন কেউ নেই, এমন কি ন্যূনতম সহানুভূতিটুকুও তারা সরকার বা রাষ্ট্র থেকে পায় না। এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে লেখকের এই প্রবন্ধে। সরকার বা জমির মালিকরা কৃষকের দুর্দশা লাঘবে কোনো কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেয় না, ফলে দেশের কৃষক বা চাষি একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করে। কোনোরকমে খেয়ে-না-খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এ অবস্থা থেকে কৃষক সমাজের মুক্তি কামনা করে আবুল হুসেন লেখেন :

> কৃষির উন্নতি চাই বেশি ফসল উৎপাদনের জন্য – চাষীর শেখা চাই জীবন যাপন করার কৌশল, তার শেখা চাই আচ্ছাদন তৈরি করতে। তার নিজের অভাব তার নিজে নিবারণ করবার জন্য তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সে বিদেশের উপর নির্ভর করতে পারে না, সে বিদেশে তার তৈরী ফসল পাঠিয়ে বিলাস সামগ্রীর আমদানী করতে পারেনা। তবে সে বেশি খেতে পাবে–বেশি খেতে পেলে সে রোগমুক্ত হবে সে বাঁচবে।[১]

বাংলার চাষিদের বাঁচাবার দায়িত্ব যাদের, তাদের অর্থাৎ রাজনীতিবিদদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন প্রাবন্ধিক। কারণ, চাষি ফসল উৎপাদন করছে কিন্তু তার ন্যায্য পাওনা না দিয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণি তাকে শোষণ করছে। ভোটের সময় তাদের প্রয়োজন, অথচ ভোটের পরে তারা অপাঙ্‌ক্তেয়, এধরনের ডেমোক্রেসির বিরোধী ছিলেন লেখক।

কৃষকের অধিকার আদায়ে ও কৃষির উন্নতিকল্পে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল, তা সমকালীন লেখকদের অভিমতসূত্রে অনুধাবন করা যায়।

সাহিত্য-পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলোতে সমকালীন শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা বাধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা, শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান ও মুসলিম সমাজের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা সাহিত্য-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। কোরানের শিক্ষা নিয়েও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-পত্রিকায়। কোরানে নারীর মূল্যায়ন এবং সামাজিক উন্নয়নে নারী শিক্ষাও যে গুরুত্বপূর্ণ তাও আলোচিত হয়েছে।

সব মানুষকে যার যার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে সমাজের সবাইকে ইতিবাচক ভূমিকাসহ এগিয়ে আসতে হবে। 'এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি।' মানুষকে শক্তিশালী ও উন্নত করার উপায় সমাজকে খুঁজে বের করতে হবে। 'মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায় সকল সময় আহার ও দানের মতো হেসে খেলে জ্ঞানের সেবা করতে হবে।' মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (ডা. ১৮৮৯-১৯৩৬) *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

---

১ আবুল হুসেন, 'বাংলার বলশী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৮, পৃ. ৮২

> জাতিকে খাঁটি রকমে বড় ও ত্যাগী করতে হবে কি উপায়ে ? দেশের মানুষের ভিতরে আত্মবোধ জাগিয়ে দেবার উপায় কি ? সমস্ত জাতিটা শক্তিশালী উন্নত হৃদয়, প্রেম ভাবাপন্ন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অন্যায় ও মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে কেমন করে? জাতির প্রত্যেক বা অধিকাংশ এই ভাবে উন্নত না হইলে, জাতি বড় হবে না। তা করতে হলে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে জ্ঞানের জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জন্মিয়ে দেওয়া চাই।[১]

হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় আচার-বিধি নিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়, যেগুলো ছিল অনেকটাই বিতর্কধর্মী। এসব লেখার মাধ্যমে দুই (হিন্দু-মুসলিম) সম্প্রদায় যেমন পরস্পরকে জেনেছে তেমনি ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হবার প্রয়াসও পেয়েছে। পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ধর্মীয় উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বিষয়ক 'ওয়ারেসী সম্পত্তি' নামে একটি প্রবন্ধে লেখক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

> বাঙ্গালার একই মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও একই আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে শোণিত সম্পর্ক বর্তমান থাকায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি যেমন হিন্দুর, তেমনি মুসলমানেরও 'ওয়ারেসী সম্পত্তি' বা পৈতৃক ধন। বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতৃগণ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ত্যাগ করিয়া শুধু হাফেজ, নেজামী বা সাদীতে তৃপ্ত থাকিবেন কেন। যে পর্যন্ত তাঁহারা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি আর্য্য সভ্যতার ন্যায্য দাবি পরিত্যাগ করিয়া শুধু মুসলমান সভ্যতারই আদর করিবেন সে পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ সহজ হইবে না।[২]

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের এ আলোচনার পর খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতিফ, অধ্যাপক সানাউল্লাহ, মোজাম্মেল হক এবং এবং মৌলভী করমচাঁদ (কে চাঁদ) তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অধ্যাপক সানাউল্লাহ বলেন :

> যোগেন্দ্রবাবু বাঙ্গালি মুসলমানগণকে রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিতে আহব্বান করিয়াছেন। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালি হিন্দু কোরআন-হাদিসের উপদেশ, হজরত মোহাম্মদের পুণ্যময় জীবনকথা, হযরত ওমরের ন্যায়-নিষ্ঠার বিষয় অবগত আছেন? মুসলমানের যেমন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি পাঠ করা উচিত, হিন্দু ভ্রাতৃগণেরও তেমনি মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে জানা থাকা দরকার।[৩]

করমচাঁদ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি হিন্দুদের অনীহার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন :

> যোগেন্দ্র বাবু বাঙালি মুসলমানগণকে হিন্দু-সভ্যতার জন্য গৌরব করিতে বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহারাই তো মুসলমানগণকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।... হিন্দু ভ্রাতৃগণ বাঙ্গালি মুসলমানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন বলিয়াই মুসলমানগণ আপনাদিগকে অনুদার গোঁড়ামীসর্ব্বস্ব হিন্দুগণের আপনার লোক বা শোণিত সম্পর্কের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করেন।[৪]

---

১ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'জাতির উত্থান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৫১

২ যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ওয়ারেসী সম্পত্তি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৫৪

৩ 'সমিতি-সংবাদ', মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*,৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৯৪

৪ মোহাম্মদ কে চাঁদ, প্রাগুক্ত

লেখক মোজাম্মেল হক যোগেন্দ্রকুমারের এই আলোচনাকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, এতে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরকে জানার পরিধি আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে। এসব পঠন-পাঠনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে– এ আশাবাদও তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :

> বাঙালি মুসলমানের প্রতি যোগেন্দ্রবাবুর আন্তরিক টান আছে বলিয়াই তিনি আজ বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মানিত করিলেন। আমরা আশা করি তাঁহার প্রদর্শিত এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ এই সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপস্থিত হইবেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন।[১]

প্রবন্ধকার ও সমালোচকদের এসব বিতর্কের কালে ভারতবর্ষে স্বরাজ আন্দোলন চলছিল। এ-সময় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* ও *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িক মিলনকেন্দ্রিক ভাবনা-বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ববহ ছিল। পত্রিকার এই ভূমিকা প্রসঙ্গে তাই বলা যায়, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* মুসলমানদের, কিন্তু *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* ছিল অনেকখানি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সমাজের।

সমাজে ও রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সুসম্পর্ক অব্যাহতভাবে চলমান রাখা এদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকলে স্ব-স্ব সমাজের লোক যেমন স্বস্তিবোধ করে, তেমনি দেখ ও জাতির মঙ্গল হয়। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র লেখাগুলিতে এই সৌহার্দ্যের বার্তাগুলি সোচ্চারভাবে ধ্বনিত হয়েছে। পত্রিকার মতামত ও নির্দেশনাগুলিও মনে রাখার মতো, যা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায় নির্দেশনা করতে গিয়ে একজন লেখকের হার্দ্য-উচ্চারণ :

> আমাদের অভীপ্সিত মিলনের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। সাহিত্যেরই সাহায্যে দেশের উপর দিয়া মিলন-সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করিতে না পারিলে আমাদের মিলনাশা তত শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। কেন না বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহু সম্প্রদায় ও বিস্তর পার্থক্য সমন্বিত বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে মিলনভাব প্রচার করিয়া একটা সার্ব্বজনীন একতা প্রতিষ্ঠিত করা সাহিত্যের দ্বারা যতদূর হয় অন্য কোন কিছুর দ্বারা ততদূর সম্ভব হয় না।[২]

সাহিত্য-পত্রিকার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাহিত্যধর্মী নির্ভেজাল লেখার প্রকাশ নয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমাজের সব সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা এর মূল উদ্দেশ্য।

এভাবেই সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্কোন্নয়নে সাহিত্য-মাধ্যমের পাশাপাশি সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে জানানো হয়। নগরে নগরে, গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে হিন্দু-মুসলিম মিলনভাব সম্প্রসারণ করা যেতে পারে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। কোনো কোনো সংবাদপত্রের 'আজগুবী এবং

---

১ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২ আহমদ মিঞা, 'মিলনের উপায়', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, *২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা*, *শ্রাবণ* ১৩২৬, পৃ. ১১৪

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ ও খবর প্রকাশ' একে অন্যের মনে ব্যথা দিতে পারে বলে আশঙ্কার কথাও বলা হয়। 'মনকষ্ট লাঘব এবং প্রাণের ব্যথার উপশমই যে মিলন ও একতার সহজ ও সরল পন্থা এই কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না।'[১] সব সম্প্রদায় মিলে এক উন্নত সমাজ বা জাতি গঠনে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা* সর্বদা সচেষ্ট ছিল।

বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) অবদান ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বজনবিদিত। মুসলমানদেরকে হিন্দু, ইংরেজ ও অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক কাতারে আনার উদ্দেশ্যে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এনে তাদেরকে উন্নত করার জন্য তিনি ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে 'Mohamedan Literary Society' বা 'মুসলমান-সাহিত্য-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম তিরিশ বছর এই সভা মুসলমান সমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতের সর্বত্র যাতে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয় সেই উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ কিছু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। ১৮৫৩ খ্রি. তিনি একশত টাকার একটি 'পারিতোষিক' প্রদান করবেন বলে ঘোষণা দেন।

'ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের আহবান ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগস্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। প্রথমে পাঁচ মাস সময় দেয়া হলেও সর্বভারতীয় সমাজের কাঙ্ক্ষিত সাঁড়া পাবার লক্ষে সময় বাড়ানো হয়। এতদ্বিষয়ে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকেও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাওয়া যায়, যা মূল্যায়নের জন্য সমসাময়িক বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ভেতর থেকে চারজনকে নিয়ে একটি 'প্রবন্ধ-পরীক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়। বাংলার তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর (পরে বাংলার প্রথম লেফটেনেন্ট গর্ভনর) এবং প্রাচ্য ভাষানুরাগী স্যার ফ্রেডরক হ্যালিডের (১৮০৬-১৯০১) নেতৃত্বের এই কমিটি প্রবন্ধগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করে বোম্বাই শহরের স্যার জামসেদজী জিজি ভাই পারস্য দাতব্য বিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি ভাষার অন্যতম শিক্ষক মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফতেহ্ সাহেবকে পুরস্কার প্রদান করেন।[২] তৎকালীন সময়ে ফারসি ভাষা প্রভাবিত মুসলিম সমাজে ইংরেজি প্রচলনের ব্যাপারে নবাব আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল।

'অগ্নি কুক্কুট', 'সমাজ ও সংস্কারক, 'মুসলমান সাম্রাজ্য' 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, সমাজ সেবক পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদীকে (১৮৫৯-১৯১৮) নিয়ে তাঁর 'মিতাজী' মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের (১৮৬২-১৯৩৩) একটি লেখা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। একজন আচারনিষ্ঠ মুসলিম সমাজসেবক ও সংস্কারক মাশহাদীর পরিচয় এতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বদেশকে নিশ্চয় ভালবাসি কিন্তু পরপদদলিত স্বজনগণ আমার নিকট তদপেক্ষাও ভালবাসার পাত্র'।[৩] মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অসুখ-বিসুখে তিনি নিজে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন।

---

১ 'মিলনের উপায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

২ এম. আবদুল জব্বার, 'নওয়াব আবদুল লতীফ ও মুসলমান শিক্ষা বিস্তার', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ১৬৪

৩ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬, পৃ. ১৯৭

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭, জানুয়ারি ১৯২১) এগারো পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধ 'মানব জীবন' প্রকাশিত হয়। লেখক জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণপূর্বক মানব জীবনের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য, আহার-বৈচিত্র্য, প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু, হিংসা-অহিংসা, জীব হত্যার নানা কারণ,জীবনের সুশিক্ষা-কুসংস্কার, আহার-নিদ্রা-মৈথুন, প্রাণিকুলের বংশবিস্তারের ধরন, জাপানের উন্নয়ন, ফরাসিদের অভিজ্ঞতা, জীবনের গতিধারা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মত, সর্বোপরি ব্যক্তি 'আমি'র পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জীবন নিয়ে অন্ধকার যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মনীষীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম আলোচনার কথা শোনা যায়। এই আলোচনা বিজ্ঞজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণের মধ্যে রহস্যঘেরা কুয়াশার মতো প্রশ্ন তৈরি করে। প্রশ্ন যেমনই হোক, জীবনের যে স্বতন্ত্র একটি ধারা আছে এবং এর প্রকৃতিও যে ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন, সে সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখক কিছু কথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন প্রাণীর জীবনের ধারা থেকে মানবজীবনের গতিধারার পার্থক্য চিহ্নিত করে লেখক নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন :

> মোটামুটি ভাবে জীবনের ধারাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-একটী উচ্চতর ধারা, অপরটী নিম্নতর ধারা। নিম্নতর ধারা অর্থে পশুর ধারাকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুইটী বিভিন্নমুখী ধারার মধ্যে যুক্ত বিন্দুটী নির্ণয় করা একটি দুরূহ ব্যাপার। ইহাকে আরো জটিল করে তুলেছে প্রকৃতির দুরূহ সূক্ষ্ম বিধান। কারণ পশু প্রকৃতির মধ্যে মানব প্রকৃতিও সময়ে সময়ে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়।
>
> এই দুইটী প্রকৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা শক্ত। তবে মোটের উপর যে ধারাটি প্রকৃতির তাড়না সম্ভূত নহে, Instinct এর প্রচারণায় নহে,-বিচার শক্তি ও rational ভাবের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাই উচ্চতর ধারা ও পশুর ধারা নহে।[১]

উভয় ধারাটিকে তিনটি সাধারণ জিনিসের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করতে বলেছেন লেখক। ধারা তিনটি ধারা হলো – আহার, নিদ্রা ও মৈথুন; যেগুলির প্রভাব জীবের ভিতরে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। এসব কর্মস্পৃহার আদিমূলে যে ঐক্যের সূত্র পাওয়া যায় তা বাহ্যত শুরু হতে এক রূপ হলেও উদ্দেশ্যের বেলায় আকাশ-পাতাল তফাত। তাই আহার প্রসঙ্গে হিংসা ও অহিংসা নিয়ে কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়। কোনো কিছুর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করাকে অহিংসা নীতি বলা হয়। জীবহত্যা এবং তার মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ প্রসঙ্গেও অহিংসা কথাটি অনেকে বলেন। লেখক এ প্রসঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং চীন ও জাপানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন :

> অহিংসা পরম ধর্ম্মঃ; এই কথাটী শুনিতে বড়ই শ্রুতিমধুর ও প্রেমের সাঁচে ঢালা হইয়া যেন যুগপত আমাদের মন ও প্রাণ কাড়িয়া নেয়। ইহার ভিতরেও একটী সত্য যে আছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে যত গোলমাল এই অহিংসা জিনিসটার ব্যাখ্যা লইয়া। জৈন ও বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর ভিত্তি রাখিয়া জীব হত্যা মাত্রই হিংসা বোধে অবৈধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদের মধ্যেও জীব হত্যা শনৈঃ শনৈঃ পুনরায় তাহার প্রসার বাড়াইয়া তুলিতেছে। কাজেই চীন ও জাপানে জৈন ও বুদ্ধ ধর্ম সেবীগণ তাহাদের ধর্ম্মের বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ মাংস ভোজী হইয়া পড়িয়াছেন।[২]

---

১ মোহাম্মদ ফজলে রহিম চৌধুরী, 'মানব জীবন', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৫৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

তাই বলা যায়, জোর করে প্রাণীহত্যা নিবারণ করতে পারলেও জীবনধারণের জন্য জীবের প্রাণহানি নাকচ করতে পারা সম্ভব নয়। সবক্ষেত্রেই প্রকৃতির বিধানের মধ্যে সৃষ্টি ও বিনাশের সূক্ষ্ম ও রহস্যময় নীতির প্রতিষ্ঠা রয়েছে। যেখানে বিনাশের প্রারম্ভ সেখানেই সৃষ্টির শুরু। সৃষ্টির মধ্যে বিনাশ,বিনাশের মধ্যে সৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ-বিষয়ে লেখক বলেছেন :

> মানব ও ইতর জীব জন্তুর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আহারের জন্য যে জীব হত্যা বা বিনাশ সাধনে তাহাই প্রকৃতির প্রকৃত ধর্ম্ম কিন্তু শুধু হিংসা বৃত্তি চরিতার্থই বল, কি সখের শিকারের নিমিত্তই বল প্রকৃতির রক্ষামূলক নীতির সাহায্য কল্পে যে হিংসা কার্যকরী না হইয়া তদ্বিপরীত কার্য করে তাহা প্রকৃতি সিদ্ধ নহে – কাজেই অধর্ম্ম।[১]

শুধুমাত্র শিকার বা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য জীবহত্যাকে লেখক অধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নিজের এবং জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার মূলে যে হিংসা তা অধর্ম নয় বরং তাই ধর্ম বলা যায়। তবে ধর্মের নামে কিছু কর্মকে কী বলা যায়, লেখক নিম্নে সেই প্রশ্ন করেছেন :

> দেবতা শুধু রক্ত চান কি ? দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত গৃহপালিত বড় বড় জানওয়ারগুলিকে যুপকাষ্ঠে ফেলিয়া হত্যা করা হইল, কিন্তু তাহাদের মাংস ভক্ষণ না করিয়া সবগুলিকেই ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই যে দেবতার নামে ছলনায় এতগুলি পশুর অর্থশূন্য বধ, ইহা কি ধর্ম্মের অভিসারে বাস্তবিক কি উৎসর্গকারীদের কপালে পুণ্যের টিব কাটিয়া দেয় ?[২]

তবে ধর্মীয় সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস যাই বলা হোক না কেন, এর থেকে মুক্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। ধর্মের অন্ধবিশ্বাসের তাড়না সৎ-অসৎ পার্থক্যকে, এমনকি বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেয়। অন্ধবিশ্বাস থেকেই মূলত কুসংস্কারের সূচনা হয়। কুসংস্কার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> পশু দিকের বিচার শক্তি নাই, তাহাদের কার্যকলাপ instinct এর তাড়নায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মানুষের বিচার শক্তি আছে, Instinct এর তাড়নাও আছে। যে স্থলে বিচার শক্তি ও Instinct এর মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রবল কষাঘাতে উভয়ই নিষ্ক্রীয় হইয়া পড়ে ও তাহাদের ওলট পালটের মধ্যে একটা আসুরিক ভাবে সূচনা হয়, তাহাই হইতেছে কুসংস্কার। ইহাতে বিচার শক্তির প্রভাব নাই Instinct এর তাড়না নাই, ইহা অন্ধবিশ্বাস জাত।[৩]

অন্ধবিশ্বাস ও প্রচলিত ধর্ম এক নয়। সমাজে ধর্মের মোড়কে অনেক অন্ধবিশ্বাস প্রচারিত হয়ে থাকে। লেখক ধর্মকে ব্যাপকার্থে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> ধর্ম্মের দর্শন অনুসারে বিচার করিলে, প্রকৃতির নিয়মতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার উদ্দেশ্যের সাহায্য করে যে বিধান অগ্রসর হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম।[৪]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

আহার প্রসঙ্গে ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার পর লেখক এবার 'নিদ্রা' বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। লেখক বলেছেন যে, 'নিদ্রা' বিষয়ে সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক কোনো একক সিদ্ধান্ত নেই। লেখক নিদ্রা নিয়ে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক মত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন :

> Dr. Boris Sides বলেন যে ঘুমই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা এবং যখন আমাদের হাতে কোন কাজ থাকেনা তখনই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। Mr.S.M.Evans এই মত পোষণ করেন। Mr.Evans বলেন, যে কবিগণ যদিও নিদ্রাকে মৃত্যুর সহচর বলিয়া কল্পনা করেন তথাপি বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহার স্বীকার করা চলে না। মৃত্যু হলে শরীর ও মনের সকল বৃত্তিরই লোপ হয় কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের যন্ত্রের কার্যাবলী বন্ধ হয় না। মানসিক বৃত্তিরও সম্পূর্ণ লোপ হয় না। যেমন নিদ্রিতাবস্থায়ও আমাদের পরিপাক শক্তির কার্য বন্ধ হয় না, আমাদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কেবল আমাদের চৈতন্যের অবসাদ হয় মাত্র। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, রক্তের মধ্যে এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাই নিদ্রার মূলীভূত কারণ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে শরীরের ভিতরে lactic acid প্রবেশ করাইয়া দিলে নিদ্রা হয়।
>
> Professor Evria বলেন, যে নিদ্রা শারীরিক যন্ত্রের একপ্রকার নেশার পরিণাম। মাংসপেশীর ভিতরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইলে নিদ্রা হয় । কাজ করিতে করিতে মাংসপেশি যখন দুর্বল হয়, সেই দুর্বলতার ফলে মস্তিষ্ক অবসাদ গ্রস্ত হইয়া নিদ্রা আসে। Dr.Sides তাঁহার Experimental Study of Sleep নামক গ্রন্থে বলেন যে, যখন চৈতন্য বিভিন্ন জাতীয় অনুভব শক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ থাকেনা তখন যে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয় ।[১]

নিঃসন্দেহে লেখকের এই সমস্ত মতকে সর্বসম্মত বলা যায় না। পরিণত বয়স্ক মানুষের জন্য মোটামুটি ছয় থেকে আট ঘণ্টা এবং অপরিণত তরুণ বালকদের জন্য আট থেকে দশ ঘন্টা নিদ্রামানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট। ঘুমানোর সময়সীমা নিয়ে অবশ্য একশ বছর পূর্বে (১৯২১খ্রি.) লেখকের বলা এই মত এখনো চালু আছে।

পশুরা তাদের নিদ্রার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম কিছুই মানে না। নিদ্রার মধ্য দিয়ে নিজের সত্তাকে বুঝে নেবার বৃত্তিবা কঠোর সমস্যার সমাধান প্রকৃতিতে নেই। মানুষ নিদ্রাকেই উপলক্ষ্য করে জীবনের ব্যাপারে অনেক রহস্যের সমাধান করেছে এবং অনেক তথ্য উদঘাটিত করেছে; অঙ্ক শাস্ত্রের জটিল সমস্যার মীমাংসা করেছে। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ (সা.)-এর শবে মেরাজের বৃত্তান্ত সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> শবে-মেরাজ সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বহু তত্ত্বদর্শী সাধু যে ইহাকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আর ভুল নাই। হজরত মোহাম্মদের এই যে নিদ্রা, ইহা যেমন তেমন নিদ্রা নয়,-যোগ নিদ্রা। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদ্রা। ইহা শরীরকে রক্ষা করার উপলক্ষ মাত্র করিয়া জীবন রক্ষা করে, ইহাই মানুষের খাঁটি নিদ্রা। পশুর নিদ্রা শরীর রক্ষায় সাহায্য করে বটে কিন্তু জীবন রক্ষার তিল মাত্র সাহায্য করে না। বহু বছর চৈতন্যের সহিত যোগ ও সাধনা দ্বারা জীবনকে খোওয়াইয়া যাহা লাভকরা যায় না- নিদ্রার মধ্য দিয়া হজরত মোহাম্মদ সেই সত্যের স্পর্শ প্রাণে প্রাণে পাইলেন। ইসলামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান গুলিও ইহার মূলে। তোমরা ইহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিও না। ইহা সত্য, খাঁটি সত্য। ইহাকে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। ফরাসীর বিখ্যাত গণিত সমিতির অনুশীলনী পাঠে এইরূপ ভাবের বহু জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসীর কোন গণিতজ্ঞ বহুদিন ধরিয়া অঙ্ক শাস্ত্রের একটি কঠোর problem নিয়া মাথা ঘামাইতেছিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই problem টির সমাধান করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহার সমাধানে গোটা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। সন্ধান করিলে ভুরী ভুরী পাওয়া যায়।[১]

তাই বলা যায় ভালো ঘুম যেমন সুস্থতার নিয়ামক, তেমনি ঘুমের মধ্যে অনেক সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনাও পাওয়া যায়। ফরাসি গণিতজ্ঞদের অভিজ্ঞতার কথা লেখক তাই উল্লেখ করেছেন।

লেখক এই পর্যায়ে জীবজগৎ প্রসারের জৈবিক প্রক্রিয়া 'মৈথুন' নিয়ে আলোচনা করেন। মানবসৃষ্টির ধারাবাহিকতার মূলে স্বীকৃত জৈবিক ক্রিয়ার নেপথ্যে আইন-কানুন, সমাজবিধি ও ধর্মবিধির নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। লেখক এতদ্বিষয়ে বলেন :

প্রকৃতি তোমার মধ্যে কামের লালসা দিয়াছেন; প্রকৃতি হইতে ভুক্ত দ্রব্যের মধ্য দিয়া তুমি অবলীলাক্রমে রস গ্রহণ করতঃ নিজের বর্দ্ধন করিতেছে ও সেই রস হইতে কামের বীজ, জীব সৃষ্টির বীজ তোমার শরীরে সঞ্জীবিত হইয়া তোমাকে বীর্যশালী, শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতি কেবল তোমাকে শক্তিশালী করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন; তোমার দ্বারা তোমার গোটা জাতিটা যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুমি মর, রাম মরুক, শ্যাম মরুক তাহাতে প্রকৃতির কোন আফসোস নাই কিন্তু গোটা মানবজাতি মরিবে, প্রকৃতির সুনিপুণ হস্তের এমন নিদর্শনটি চিরলুপ্ত হইবে প্রকৃতি তাহা কখনোই সহ্য করিতে পারে না। কাজেই তাহার মূলে মানুষের দ্বারা মানুষ পরম্পরায় সৃষ্টির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ এই মৈথুনের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সামাজিক বিবাহ বন্ধনাদি যাহা দেখিতেছ, তাহা এই উদ্দেশ্যের হেতিভূত কারণ।[২]

শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য মানবজাতিকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি, ইন্দ্রিয় সংযমেরও প্রয়োজন আছে। তা না হলে মানুষ পশু পাখির পর্যায়ভুক্ত হয়। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে বলেছেন :

আমাদের জীবনের অবনতির বহু কারণের মধ্যে এই অপরিমিত বিন্দুপাত একটি প্রধান কারণ। পশুদিগের মৈথুনের পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই। প্রকৃতির সুশাসনে তাহারা কেবল seasonএ রতিক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টিকল্পে সাহায্য করিয়া থাকে। মানুষের ন্যায় অস্বাভাবিক মৈথুন করিতে তাহাদের প্রায়ই দেখা যায় না; কাজেই তাহাদের স্বাস্থ্য মানুষের চেয়ে ঢের ভাল।

পশুদিগের মধ্যে মহিষের ভিতরে আর একটী বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহারা কখনই মাতৃ অভিগমন করে না।

এই যে পশুদিগের মধ্যে যে কাম ভাব, তাহা কেবল কামের ক্ষণিক তাড়না সম্ভূত। সন্তান উৎপাদন তাহাদের লক্ষ্য নহে। পরন্তু মনুষ্যজনোচিত যে কাম ভাব তাহার উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ব্যতিত আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু হায়, আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে অভিনব লালসা মেটানোর ফন্দি আমাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়া গোটা দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

মানবজীবন প্রধানত দুইটা জিনিসের সমবায়ে গঠিত : একটি তার বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি, আরেকটি তার ভিতরের প্রকৃতি। কেবল মানুষের মতো বিশিষ্ট আকৃতি ও রূপ থাকলেই সে মানুষ হয় না। মানুষের বিশিষ্ট প্রকৃতি তাকে প্রাণিরাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। এই জন্য মানুষ সব প্রাণীকে বশে আনতে পারে এবং তারা মানুষের নিকট নত হয়। লেখক মানুষের স্বকীয়তার স্বরূপকে নিজের ভিতর থেকে ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন এভাবে :

> সকলের ভিতর দিয়াই, তুমি তোমার নিজত্বকে আঁকড়িয়া ধর। নিজত্ব অর্থে ভিতরের প্রকৃতি ও বাহিরের রূপ উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। নিজত্ব অর্থ কেবল তোমার personal নিজত্ব নহে, তোমার জাতির, ধর্ম্মের যাহা নিজস্ব, তাহাকেও নিজত্বের মধ্যে ধরা হইয়াছে।[১]

অতঃপর লেখক জাপানের বর্তমান উত্থানের মূলে এই নিজত্বকে আকড়ে ধরার কথা উল্লেখ করেন। জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তবে সেটি তাদের মতো করে। তাই বিশ বছর পূর্বে মুর্খ ও অসভ্য জাপান বর্তমানে একটি সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে বলে লেখক মনে করেন।

লেখক পরিশেষে ব্যক্তিমানুষের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> আত্মপ্রকাশ করিতে হইলেই আত্মবোধমূলক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। আমি কে ?-এই নিখিল বিশ্বের সহিত আমার কতটা; আমি বা নিখিল বিশ্বের কতটা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় ফিরিতে হইবে ইত্যাদি বোধের বোধত্ব জন্মাইতে হইবে। আত্মবোধমূলক জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে বিশ্বসংসারের মধ্যে আর তোমার বাঁধ থাকিবে না।[২]

লেখক মানব জীবনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নানারকম পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে চিত্র তা বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধটিকে তিনি করে তুলেছেন সমৃদ্ধ।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) ইবরাহীম খাঁর (খাজা ছদ্মনামে) সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক আট পৃষ্ঠার সুলিখিত প্রবন্ধ 'মুসলমান সমাজে কন্যাদায়' প্রকাশিত হয়। এতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের কিছু চিত্র দেখিয়ে বর্তমান মুসলমান সমাজে এর প্রভাব কীভাবে পড়েছে তা দেখিয়েছেন লেখক। প্রবন্ধকার ধর্ম-অধর্ম নিয়ে অতীত সংস্কার বর্তমানে কতটুকু ন্যায়সংগত ও যুগোপযোগী তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইবরাহীম খাঁ প্রবন্ধের শুরুতে 'কন্যাদান', 'গৌরীদান' প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ ও এর সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক 'দান' এর রকমফের নিয়ে বলেছেন :

> দান অতি মহৎ গুণ। কিন্তু যেখানে বাধ্য হইয়া দান করিতে হয়, সেখানে দানের মাহাত্ম্য থাকে না, দান গ্রহণকারীও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে দান গ্রহণ করে না; দাতব্য জিনিসের মর্যাদা দাতা দানগ্রহণকারী উভয়ের নিকট বড় কমিয়া যায়। সুতরাং হিন্দু সমাজে 'কন্যাদান' যে অতি সহজেই 'কন্যাদায়' হইবে ইহা অতি

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

> স্বাভাবিক। মুসলমান সমাজে 'কন্যাদান' নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিতা কন্যার উপর পিতারও অধিকার থাকে। বয়স্কা কন্যা নিজকে স্বামীর হাতে 'দান' করিয়া দেন না; তাঁহার নিজের আংশিক স্বাধীনতা থাকে। তবু যে বর্ত্তমান বাংলার মুসলমান সমাজে কন্যাদায় দেখা দিয়াছে ইহাতে সমাজনায়কগণ শঙ্কাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।[১]

লেখকের এই শঙ্কার কারণ 'কন্যাদানে'র ওপর আবার দক্ষিণাস্বরূপ যৌতুক দান করা। মুসলমান সমাজে মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকেন। সম্পদশালী মুসলমান পিতার 'কন্যাদায়' ঘটার সম্ভাবনা না হওয়ারই কথা, কিন্তু দায় মনে করে দানের নামে যৌতুক প্রদান এ সমাজে অহরহ ঘটছে। পাশাপাশি হিন্দু সমাজের প্রভাব এর ভেতর কাজ করতে পারে বলে মনে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক বলেন :

> হিন্দু পিতা যত ঐশ্বর্য্যশালীই হউন, পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাটিকে রিক্তহস্তেই স্বামীর বাড়ি যাইতে হয়। কাজেই হিন্দু-বর স্বভাবতই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্ত্রীর পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি পূরণটা আদায় করিয়া লইতে চাহেন। হিন্দু সমাজের মত পাশ্চাত্য সমাজেও কন্যা উত্তরাধিকারিণী নহেন; তথাপি যে তথায় পণ বা যৌতুক প্রথা প্রসার লাভ করে নাই, তাহার কারণ এই, বিবাহ তথায় পাত্র-পাত্রীর নির্ব্বাচন অনুসারে হয়।[২]

বলা যায়, কন্যাদায় কোন সমাজেই সমর্থনযোগ্য নয়। কন্যাদায়ের আগুনে হিন্দু সমাজের অনেক পিতাসর্বস্বহীন হয়েছেন, আবার মুসলমান সমাজে কন্যাদায় আশঙ্কায় পিতৃকুল বিচলিত হয়েছেন, এটিও দেখা গেছে। তবে বাংলার যুবকদের অবস্থাও যে বড় সমস্যাসঙ্কুল, লেখক সেটিও বলতে ভুল করেননি। লেখাপড়া না করলে সে হয় 'চাষা', না করলে হয় 'ফুলবাবু' কোনো পরীক্ষায় পাস না করলে 'অপদার্থ গাধা', পাস করে ভালো চাকরি পেলে 'সরকারি গোলাম', না পেলে হয় 'মাছিমারা কেরানি', না হয় 'আইনজীবী নামক পরধনলোভী শিক্ষিত জুয়াচোর', নিতান্ত সাধু শিষ্ট হলে 'হাবা ভেড়াকান্ত', একটু অ-সাধু হলে 'বখাটে', অতিরিক্ত পড়াশোনা করলে 'কেতাবকীট', না পড়লে 'টোটো কোম্পানির ম্যানেজার' ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণের কথা লেখক এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে যুবকদের শিল্প-বাণিজ্যে প্রবেশ করার পরামর্শও দেন লেখক। লেখক এতদ্বিষয়ে বলেন :

> বি, এ এম, এ পাশ করিয়া যুবকেরা দুয়ারে দুয়ারে চাকুরীর প্রত্যাশায় ফিরিতেছে, ইহার জন্য যুবকদলই দায়ী, স্কুল কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বেই তাহারা স্বাধীন-জীবিকা উপায়ের নানা পথ আবিষ্কার করিয়া রাখে নাই কেন ? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তরঙ্গে প্রাচ্যের সমাজবন্ধন, ধর্ম্মের অনুশাসন ভাসিয়া যাইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে ?যুবক মণ্ডলী নিশ্চয়;[৩]

তাই সমাজে এই যে কন্যাদায়ের বিভীষিকা জেগেছে, এও যুবকগণের 'কীর্ত্তি', তাঁরা পূর্বের মুসলমান মহাপুরুষগণের আদর্শে বিনা যৌতুক-পণে কেন বিয়ে করেনি, লেখক এই প্রশ্ন রেখেছেন। পাশাপাশি বর্তমান মুসলমান সমাজে কন্যাদায়ের উদ্ভব ও প্রসারের জন্য তিনি কন্যার পিতাদেরকেই দায়ী করেন।

---

১ ইবরাহীম খাঁ (খাজা), 'মুসলমান সমাজে কন্যাদায়', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩০-১৩১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

পুত্র-কন্যাকে সমান দৃষ্টিতে দেখলে তাদের হাহুতাশ করার দরকার হতো না বলে তিনি মনে করেন। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে বলেছেন :

> বিধাতার হাতে পুত্রকন্যার মর্যাদার তারতম্য আছে বিশ্বাস করিনা। সদ্যোজাত শিশুসন্তানের জন্য বিধাতা মায়ের বুকে যে অমৃত-উৎসের সৃষ্টি করিয়াছেন, মেয়ের জন্য তাহা কম উৎসারিত হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে মানবেতর প্রাণী জগতে পুং জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মর্যাদা ন্যূন ত নহেই,কিছু বেশি বলিয়াই মনে হয়; মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের পরিবার গড়িয়া উঠে।[১]

লেখক এ প্রসঙ্গে বর্তমানে মাতৃতান্ত্রিক জাতির কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ইসলামও নারী জাতিকে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বলে লেখক উল্লেখ করেন। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা উভয়েরই অধিকার বর্তমান, এটি তার একটি উদাহরণ হিসেবে লেখক মনে করেন। তবে সমাজই পুত্র-কন্যা বৈষম্য তৈরী করে রেখেছে, বিশেষত মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে, এ ব্যাপারে লেখক বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

> পুত্রের শিক্ষার জন্য যে চেষ্টা হয় কন্যার জন্য আদৌ হয় না। আর যাঁহাদের কোন কন্যাদায় ঘটিয়াছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক শিক্ষিত এবং পুত্র থাকিলে, শিক্ষিত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, এমন পুত্রের পিতা; সঙ্গতি অনুসারে তাঁহারা একটি পুত্রের শিক্ষার জন্য দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতে রাজী, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কন্যার শিক্ষার জন্য কয়টি কপর্দ্দক ব্যয় করেন? বালিকাদের জন্য সুবিধাজনক মক্তব পাঠশালা, স্কুল কলেজ না থাকা যদি কারণ হয়, তবে তাঁহাদের এরূপ ঔদাসীন্যের জন্যই ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই![২]

প্রয়োজনে পর্দা পালন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বাড়িতে রেখে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারেও লেখক গুরুত্ব দেন। একজন পিতা তাঁর পুত্রের শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন বা করতে রাজি থাকেন, মেয়ের জন্য তার এক-দশমাংশ ব্যয় করেন না, বা করতে রাজি থাকেন কিনা সেই প্রশ্ন করেন ইবরাহীম খাঁ। সন্তানের বিয়ের সময় যখন আসে, তখন যা ঘটে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> পুত্র কন্যা একসঙ্গে বড় হইয়া উঠে; বিবাহের সময় আসে; পিতা তাঁহার পুত্রের বিবাহের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হইতে সম্মত, কিন্তু কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিতে তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত! সমাজের নিম্ন স্তরে এ হীন আদর্শের এমনই জঘন্য অনুকরণ হইয়াছে যে, অনেক পরিবার একদিকে পুত্রের বিবাহে বাজি পুড়াইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে, কিন্তু অন্যদিকে পণ নামক মূল্যে কন্যাকে অযোগ্য পাত্রের নিকট দস্তুরমত বিক্রী করিতেছে।[৩]

পুত্র বা পাত্র এবং কন্যা বা পাত্রীর মূল্যায়ন অবশ্যই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে নির্ধারণ করা উচিত বলে লেখক মনে করেন। সমাজের সামঞ্জস্য বিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এটি খুবই আবশ্যক, এ ব্যাপারে পরিবার থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। ছেলে-মেয়ের শিক্ষাদানে বৈষম্য থাকলে পরবর্তীকালে এর

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

প্রভাব দাম্পত্যজীবনে পড়তে বাধ্য। লেখক এরকম আরো অনেক বৈষম্যের কথা তাঁর প্রবন্ধ তুলে ধরে বলেন :

> শিক্ষিত যুবকের পিতা তাহার পুত্রের জন্য শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও পাত্রীকে শিক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া বাছিয়া লইবার সুযোগ পান না এবং সেই জন্য অন্যান্য কারণের অবর্ত্তমানে, কোন পাত্রীবিশেষকে তিনি পুত্রবধূ রূপে পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এদিকে শিক্ষিত সুপাত্রে কন্যা ন্যস্ত করেন ইহা সাধারণতঃ সকল পিতারই স্বাভাবিক, সঙ্গত এবং প্রশংসনীয় ইচ্ছা; কিন্তু সমাজে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং শিক্ষিত বর পাইতে কন্যাকর্ত্তাগণের স্বভাবতই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা প্রতিযোগীতার ভাব আসিয়া পড়ে। সুতরাং বরকর্ত্তাকে যৌতুকদানে বাধ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না, বরকর্ত্তার কাছে শিক্ষাহিসাবে সাধারণতঃ সব কন্যাই সমান; কাজেই তিনি যেখানে যৌতুক পাইবেন, সেখানেই পুত্রের বিবাহ দিতে আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে আশ্চর্য কি? কন্যাকর্ত্তাগণের পক্ষে কন্যাগণকে অশিক্ষিত রাখিয়া, শিক্ষিত বরের জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং 'পাশ করা ছেলের' মোহে পড়িয়া যৌতুক দেওয়া সঙ্গত কি না তাঁহারাই বিচার করিবেন।[১]

যৌতুক প্রথার নানান কারণের পাশাপাশি একটি বড়ো কারণ সমাজের দারিদ্র্য। দরিদ্রতার কারণে সন্তানকে ব্যয় বহুল উচ্চশিক্ষা প্রদান অনেক পিতার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার সমাজের এক-চতুর্থাংশ লোক অবস্থাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। অন্যদিকে কিছুটা আগ্রহ থাকলেও অনেক পুত্র বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে। ধনী বা দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিপরীতে যৌতুককে বৈধ করার যে প্রবণতা, তার প্রতি ইঙ্গিত করে লেখক বলেন :

> ছেলেদের লেখাপড়া হইতে না দেখিয়া ইহাদের কেহ কেহ, অন্ততঃ একটি শিক্ষিত জামাই পাইতে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত; এদিকে দরিদ্র পিতার এ উপায়ে কিছু অর্থ সমাগম হইলে পুত্রের লেখাপড়াটা আরও কিছুদিন চলে। তাহাতে একটা সুফল এই হইতেছে যে, অনেক দরিদ্র এবং অন্যথায় অসমর্থ যুবকগণের লেখাপড়া চলিতেছে। এবং যেসব ধনী আর কোন উপায়ে ধনের কিছু সদ্ব্যবহার করেন না, এই উপায়ে তাঁহাদের ধনের কিছু সদ্ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু ইহার কুফলও দেখা দিয়াছে। কারণ ইতিমধ্যেই কোন কোন সমর্থ পিতাও পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তার নিকট লেখাপড়ার খরচ দাবী করিতেছেন এবং হয়ত বা আদায়ও করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুসমাজের আদর্শ সাধারণ অর্থলোভ এবং 'পাশের' প্রতি অসঙ্গত মোহও সমাজে কন্যাদায় প্রচলনের কারণ।[২]

তাই দেখা যায়, মুসলমান সমাজে 'খাঁটি ও নগদ' যৌতুকের দাবি না উঠলেও অনেক শ্বশুর তাঁর জামাতার লেখাপড়ার জন্য সানন্দে অর্থদান করছেন বলে লেখক জানান। এ ধরনের 'কন্যাদায়'কে বিন্দুমাত্র সমর্থন করার প্রশ্ন আসে না। এই সমস্যার মূলীভূত কারণ দর্শানোই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর মতে:

> কন্যাদায়ে কন্যা-পিতার অবমাননা, কন্যার মনুষ্যত্বের অবমাননা, বরের আত্মসম্মানের অবমাননা, বর-পিতার হৃদয়ের অবমাননা, পবিত্র দাম্পত্যসম্বন্ধের অবমাননা। অবমাননা যেরূপই হউক, তাহা মানুষকে বড় হীন করিয়া তোলে; সুতরাং সূচনাতেই এই সমাজ-ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে হইবে, এবং

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

> যাহাতে ইহার বিলোপ না হউক অন্ততঃ আর প্রসার লাভ না ঘটে তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজহিতৈষীকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।[১]

লেখক এই প্রবন্ধে কন্যা ও পুত্র উভয়ের সম্মানের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং যার যার সামর্থ্য ও শিক্ষা অনুযায়ী সমাজে অবস্থান নেওয়া এবং বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের বিভিন্নমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব পিতা-মাতার বলে লেখক মনে করেন। লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন :

> এ বিষয়ে প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য কন্যাকর্ত্তাগণের। তাঁহারা পর্দ্দার বন্ধনটা কিছু শিথিল করিয়া কন্যাগণের লেখাপড়া, শিল্প, সেলাই, রান্না, সন্তান-পালন, রোগী-চর্যা প্রভৃতিতে সুশিক্ষিত করিয়া তুলুন; গুণগ্রাহী সুশিক্ষিত বরের নিকট সুশিক্ষিতা পাত্রীর আদর হইবেই। আর যাহারা শুধু অর্থ লোভে পড়িয়া ঘটক নামক দালাল পাঠাইয়া কন্যা-পিতার আর যৌতুকের পরিমাণ যাচাই করিতে আসে, তাহাদিগকে স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিউন, যতই 'পাশই' করুক না কেন, এরূপ আত্মসম্মানশূন্য অর্থগৃধ্নু বরের হাতে তাঁহারা কন্যা সমর্পণ করিতে সম্মত নহেন।[২]

সমকালীন শিক্ষিত যুবকদের অবস্থা অনেক গুরুতর বলে লেখক মনে করেন। লেখকের মতে, তাদের শিক্ষা ও গৌরবের পরিচয় দেওয়া উচিত, এবং একইসঙ্গে যৌতুকের ভিক্ষার স্পর্শে তাদের দাম্পত্যজীবন কলুষিত ও অপবিত্র করা উচিত নয় বলেও তাঁর অভিমত। যদিও যৌতুকের ব্যাপারে অনেক সময় বরের পিতাই বেশি সক্রিয় থাকেন এবং অনেকক্ষেত্রে বরের অসম্মতি নিষ্ফল হয়। তাই পিতা-প্রীতির জন্য যৌতুকে সম্মতি দেওয়ায় অনেক যুবকের বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হয়েছে একথাও সত্য। তবুও বয়স্ক শিক্ষিত যুবকের পক্ষে ক্ষণিকের জন্য নিজের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে 'কন্যাদায়ে'র মতো একটা অন্যায় প্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনক্রমেই সংগত নয়। এতে পিতৃভক্তি ক্ষুণ্ন হবে বলে মনে হলেও পিতৃভক্তি অপেক্ষা মহত্তর বিবেক-ভক্তি, ধর্ম-ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকুক, এ কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে লেখক প্রবন্ধটি শেষ করেন। লেখক ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কারের নিরিখে সামাজিক অপপ্রথার বিলোপসাধনার্থে সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটি লেখকের গভীর সমাজচিন্তার সুচিন্তিত প্রতিফলন। তাঁর উদ্দেশ্য, বিয়ের নামে সামাজিক প্রথার ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করে তার বিলোপসাধন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাঙ্ক্ষা' নামক একটি রচনা প্রকাশিত হয়, যেখানে সামাজিক সদিচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে। রচনাটির শিরোনামের নীচে লেখা হয় 'শ্রীহট্ট কলেজ হস্‌টেলে ছাত্রদের আহবানে যে বক্তৃতা করা হয়, তাহারই সারমর্ম'। ছাত্রদের উদ্দেশে লেখা এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও পরামর্শ নির্দেশিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক বিশ্বাস, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে। তরুণদের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে তবে তা যথাযথ কাজে লাগানোটাই তার কর্তব্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। কবি এতদ্বিষয়ে বলেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত

নূতন মন নূতন শক্তি বারে বারে নূতন করে তাঁর কাজ আরম্ভ যদি না করে, তাহলে অসীমের প্রকাশ বাধা পাবে। অসীমের ত জরা নেই। এই জন্যে বুদ্ধুদের মত জরা কেবলি ফেটে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীর কোল জুড়ে তরুণ ফুলের মধ্যে তরুণ ফুলের আলোয় দেখা দেয় তরুণের দল। ভগবান কেবলি নুতনকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকচেন, আর তারা দলে দলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর করে তাদের জন্য দ্বার খুলে দিচ্চে।[১]

রবীন্দ্রনাথের ষাট বছর বয়সে লিখিত প্রবন্ধটিতে তিনি নিজেকে 'বৃদ্ধ সেজে' তরুণদের উপদেশ দিতে চাননি বলে উল্লেখ করেছেন। নবীনদের নবীনতাকে তিনি শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন এই বলে যে, সমাজের জঞ্জালকে তারাই অপসারণ করতে পারে। তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশে এটিই রবীন্দ্রনাথের বার্তা। সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে :

এই পৃথিবীকে সকল প্রকার জীর্ণতাকে তোমরা সরিয়ে দিতে এসেছ, কেননা জীর্ণতাই আবর্জ্জনা, জীর্ণতা যাত্রাপথের বাধা। এই জীর্ণতাকে যারা আপন বলে মমতা করে তারাই সত্যকার বৃদ্ধ। পৃথিবীতে তাদের কাজ ফুরিয়েচে। মনিব তাদের জবাব দিয়েছে, তারা সরে পড়বে। কিন্তু তোমরা নবীন, তোমাদেরই হাতে পৃথিবীর ভার নুতন করে পড়েচে, তোমাদের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন হতে দিয়োনা, পথ পরিষ্কার কর।[২]

পথ পরিচ্ছন্ন করে সামনে এগোতে গেলে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা লাগে বলে কবি মনে করেন। যার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ ও প্রবল তারাই পৃথিবীতে উন্নতি সাধন করেছে বলে তাঁর অভিমত। গায়ের জোরে অনেক কিছু হতে পারে তবে 'গুরু' হওয়া যায় না, যে মানুষ 'গৌরব' পায়, সেই 'গুরু' হয় বলে কবি বুঝিয়েছেন। নিজ ব্যক্তিস্বার্থকে না দেখে মনুষ্যত্বের মাধ্যমে আত্মাকে বড় করে তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় কবি বলেন :

মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সেটাকে বড় করে তুলে মানুষ বড় হয় না, ছোটই হয়ে যায়, সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখীর সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায়, রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়, দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে, তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, তাতেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না, কোনো অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই সে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে করে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে, সে জানে যে তার দুঃখ মোচন তার নিজেরি হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার।[৩]

তাঁর মতে, মনুষ্যত্ব হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য, দুঃসাধ্য অধ্যবসায় আর মহৎ সংকল্পের দুর্জয় সমন্বয়। কবি 'মনুষ্যত্বের শিক্ষাই চরম শিক্ষা' বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানসমুদ্রের যে বন্দরে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে আত্মাকে জানতে হবে এবং সুমহৎকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তরুণদের থাকতে হবে বলে লেখক জানান। তাইতো পেশা বা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষানয়, ত্যাগের দ্বারা 'সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা'

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ২৬৯
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

নামক শক্তির মাধ্যমে মৃত্যুকে অতিক্রম করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন লেখক। কবি তরুণদের উদ্দেশে তাই বলেছেন :

> আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিদ্যাসমুদ্রে এই যে মহা-ভিড় করা খেয়ায় পাড়ি দিচ্ছে সামনের কোন বন্দর সে দেখতে পাচ্চে বল ত ? দারোগাগিরি, কেরাণীগিরি, ডেপুটিগিরি। এইটুকুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এতবড় সম্পদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এর লজ্জাটা এত বড় দেশ থেকে একেবারে চলে গেছে। এরা বড় করে চাইতেও শিখলে না ? অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। কেননা, অন্য দারিদ্র্য বাহিরের, এই আকাঙ্কার দারিদ্র্য আত্মার।[১]

তাই কবি আকাঙ্ক্ষাকে বড় করার কথা বলেছেন। শক্তি কারো ছোট, কারো বড়, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে কখনই ছোট করা চলবে না বলে কবি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের সমাজ যেন তার কাজকর্মে আকাঙ্ক্ষাকে প্রকারান্তরে একপ্রকার ছোট করে দেয়। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত আমাদের বিষয়বুদ্ধির কারণে 'ছোট বুদ্ধিটাই বড় হয়ে ওঠে' বলে তিনি জানান। শিশুকাল থেকে অনেকের বড় রাস্তায় চলার ভার পরিবার থেকে হালকা করে দেয়া হয় বলে লেখক মনে করেন। ফলে পরবর্তীকালে যে অবস্থাটি হয়, তা রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

> প্রথম কয় বৎসর এরকম বেশ চলে কিন্তু ছেলেরা যেই থার্ড ক্লাসে গিয়ে পৌঁছায় অমনি বিদ্যা অর্জন সম্বন্ধে তাদের বিষয় বুদ্ধি জেগে উঠে। অমনি তারা হিসাব করে শিখতে বসে। তখন থেকে তারা বলতে আরম্ভ করে, আমরা শিখব না, আমরা পাস করব। অর্থাৎ যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশি মার্কা পাওয়া যায় সেই পথে চলব।[২]

তাই আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করে ও সাধনাকে সংকীর্ণ করে প্রকৃত শিক্ষা এড়িয়ে পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে নিজেকে বিদ্বান মনে করা কেবল নিজের অহংকারকেই বড় করে তোলা হয় বলে কবি মনে করেন। তাই সবশেষে তিনি সমাজের জন্য নিজেকে কিছুটা হলেও দেয়ার কথা বলেছেন। ভিক্ষা বা করুণার ভেতর কোনো তৃপ্তি নেই। কবির মতে :

> যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয়ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি, তখন আপনাকে পাই।[৩]

নিজেকে জানা এবং পাওয়ার যথার্থ আকাঙ্ক্ষা সময় ও বয়সভেদে সবার থাকা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার প্রতি পত্রিকাটির সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। সর্বজনীন শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষায় যাঁরা অবদান রেখেছেন, সেসব ব্যক্তিত্বের আলোচনা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা, শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষা নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজের শিক্ষা নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কোরানের শিক্ষা নিয়েও একটা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। কোরানে নারীর মূল্যায়ন এবং নারী শিক্ষাও যে পুরুষের পাশাপাশি

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন, তা সাহিত্য-পত্রিকায় তুলে ধরা হয়। শিক্ষার নানামাত্রিক দিক বিশ্লেষণে পত্রিকাটির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সাহিত্য-পত্রিকায় মুসলমান সমাজের শিক্ষাদান প্রণালী হিন্দু সমাজের শিক্ষাদান পদ্ধতির তুলনায় অনেকটা অনগ্রসর ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। একজন হিন্দু বালক যে বয়সে বৈষয়িক বা পার্থিব (Secular) শিক্ষা আরম্ভ করে মুসলমান বালক তার থেকে অধিক বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বলে উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> বর্তমান শিক্ষাদান-প্রণালীতে যে সকল গবেষণা ও উন্নতি হইয়াছে, মুসলমান বালক-বালিকাগণের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন বাঁধা-ধরা নিয়মেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিতে হয়। বস্তুতঃ বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া কঠিনতর কার্য্য। যে বিষয়ে যেমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিশুর মস্তিষ্কও তদনুযায়ী গঠিত হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার সহিত জ্ঞান, ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার মিল না থাকিলে তাহার মনোযোগ বা কৌতূহল কিছুই আকৃষ্ট বা উদ্রিক্ত হইতে পারেনা। বস্তুত পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগিতা বা চিত্তদ্রোহিতা (Reputation) প্রধানতঃ শিক্ষকের দক্ষতা ও শিক্ষা পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং যোগ্য শিক্ষক একদিকে যেমন গভীর জ্ঞান, স্বাভাবিক উপযুক্ততা, সংযম, ত্যাগ, শিশু চরিত্রে অভিজ্ঞতা, শিশুদের ও তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সহানুভূতি প্রভৃতি সদগুণের অধিকারী হইবেন, অন্যদিকে তেমনি আবার প্রফুল্লচিত্ত এবং সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করিবার মত মধুরস্বভাব হইবেন। সৎ শিক্ষকের এই সকল গুণ মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির ক্রীড়াসামগ্রী এবং বস্তুত শিক্ষার চিত্রাবলী পাঠ্যবিষয়কে শিশুদের নিকট একান্ত সরল ও মনোজ্ঞ করিয়া তোলে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষায় এসকল দ্রব্যের ব্যবহার হয় না।[১]

প্রথমে মা এবং পরে শিক্ষক শিশুর মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে থাকেন। তাঁদের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠন নীতিগতভাবে সুদৃঢ় হয়ে থাকে। সমাজে এসবের সুফলও পাওয়া সম্ভব। সাহিত্য-পত্রিকায় শিশুশিক্ষায় জননী ও শিক্ষাগুরুর ভূমিকাকে তুলে ধরে লেখা হয় :

> জননী এবং শিক্ষকেরাই পৃথিবীর সমস্ত ভালো মন্দের বীজ বপন করিয়া থাকেন। কারণ যাহারা বালক-বালিকাগণের নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন তাহারা ভিন্ন অন্য কাহারো দ্বারা সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি বা নীতিতে কোন বৃহৎ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং (দেখা যাইতেছে) সমাজ-নিয়ন্ত্রণের সূত্র শিক্ষকদের হস্তেই নিবন্ধ রহিয়াছে। এবং তাহারা ইহার ভবিষ্যত উন্নতির পথ যতটা উন্মুক্ত বা রুদ্ধ করিতে পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না।[২]

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য এখনো যেমন আলোচনা হয়, তৎকালেও সেরূপ আলোচনা আমরা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একথা ঠিক যে একশ বছর পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার যে হাল ছিল, বর্তমানে তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনে-বিবর্তনে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* মতো মুসলমান সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রের মধ্যে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

শিক্ষাদান প্রণালীর ফারাকের জন্য তাদের মধ্যে সুসম্পর্কের পরিবর্তে ব্যবধানই যে রচিত হয়, সে সম্পর্কে জনৈক আলোচক লেখেন :

> পাঠশালার ছাত্র অপেক্ষা মক্তবের ছাত্ররা যে সাধারণ জ্ঞানে, কর্ম্মপটুতায় এবং নৈতিক বলে হীন হইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে, মক্তব অপেক্ষা পাঠশালায় উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বালকেরা পাঠশালায় চার-পাঁচ বছর পড়িয়া মোহরের, গোমস্তা, দোকানদার হইতে পারে। কিন্তু মক্তবের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা তাহার দ্বিগুণ সময় অধ্যয়ন করিয়াও প্রায় এই সকল কার্য্যের যোগ্য হয় না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় গুলি এক প্রকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে; আর মুসলমানেরা অনেক স্থলে মক্তবের অন্ধ অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়ায় কোণঠাসা হইয়া রহিয়াছে।[১]

শিশুর জন্ম থেকে তার মানসিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মা ও পরিবারের ভূমিকা নিয়ে গোলাম মোস্তফার লিখিত প্রবন্ধ 'শিশুর শিক্ষা' প্রকাশিত হয় সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। লেখক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বাবা-মার আদর-যত্নে-স্নেহে কীভাবে বেড়ে ওঠে, তা আলোচনা করেন। একাডেমিক শিক্ষায় নয় পারিবারিকভাবে সতর্কতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলা যায়, তার মানসিক ও প্রবৃত্তিগত আচরণ সেভাবেই তৈরি হয়। লেখক শিশুর মনকে 'কাদার মতো কোমল' বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে কোনো কিছুর ছাপ দিলে তার দাগ পড়ে। লেখক প্রথমত শিশুর প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের পাশাপাশি আরেকটি দ্বিতীয় স্বভাবের কথা (সেকেন্ড নেচার) বলেছেন, যার উপাদান হচ্ছে 'অভ্যাস'। অভ্যাসগুলি ক্রমে ক্রমে কালে কালে আর একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়। কীভাবে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে এবং তার অর্থ ও উদ্দেশ্য কীরূপ হবে তা বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়-সে যাহাতে মানুষ হইতে পারে, এই শিক্ষাই তাহাকে দিতে হইবে। পরবর্তীকালে উকিলই হউক, ব্যারিস্টারই হউক, কুলিই হউক, মজুরই হউক-সকল শিশুকেই প্রকৃতি 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তোলে ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং শিশু যাহাতে বড় হইয়া এই মানুষের যতরকম কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তাহাকে দিতে হইবে। তাহার জীবন যাহাতে মানুষ হিসেবে ব্যর্থ না হয়, মানুষের সমাজে তাহার আসন যাহাতে ছোট না হয়, তাহাই আমাদের শিশু শিক্ষার মূল লক্ষ্য হইবে।[২]

শিশুকে বোঝাতে হবে শুধু বেঁচে থাকাই জীবন নয়, কাজই জীবনের মন্ত্র হওয়া উচিত। জীবন সবসময় প্রশান্ত গতিতে চলে না। চন্দ্র-সূর্যের আলো যেমন আছে, তেমনি মেঘ ও অন্ধকার, ঝড় ঝঞ্ঝা, অশনি সংকেতের সম্ভাবনাও জীবনে থাকে। তাই নিয়তির এই বিড়ম্বনা অম্লান বদনে সহ্য করার ক্ষমতা শিশু যেন সহজে অর্জন করতে পারে, সে চেষ্টাই বাবা-মা ও বড়দের করা উচিত। তবে শিশুকে এসবের শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে শুধু তাকে সুশীতল শান্তি দেওয়া ও সমস্ত ভালো জিনিস দেয়ার বাসনাই যেন শুধু পিতা-মাতার লক্ষ্য হয়ে থাকে। সমাজে দেখা যায় সামর্থ্যবান পিতা-মাতার ক্ষেত্রে শিশুর খাওয়া-দাওয়া-পোশাক-পরিচর্যার পেছনে তাদের সমস্ত ধ্যান-মন-জ্ঞান ব্যয়িত হয়।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
২ গোলাম মোস্তফা, 'শিশুর শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৪৭

শিশু একটু বড় হয়ে যখন বিদ্যালয়ের অঙ্গনে পা দেয়, তখন সন্তানের নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করানো বাবা-মার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কাজ বা দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ তাতে শিশুর পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে, এমনটাই বাবা-মার একমাত্র লক্ষ্য হয়। এতে জীবনে তিক্ততার শিক্ষা তো তার হলোই না, তাদেরকে শুধু সুখভোগী বিলাসী করা হলো, তাকে ত্যাগী হওয়ার শিক্ষা দেয়া হলো না। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সন্তানদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ চিত্রই দেখা যায়। শুধু সুখভোগই প্রকৃতির নিয়ম নয়, দুঃখ-কষ্টেরও একটা স্থান থাকে। লেখক এ বিষয়ে গ্রিক মিথলজির উদাহরণ উদ্ধৃত করে বলেন :

> কথিত আছে, গ্রীস-দেবী Thetis (থেটিস্) তাহার শিশুপুত্রের জীবন অজেয় করিবার জন্য ঋঃ নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের শিশু শিক্ষার ইতিহাসে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইত। অতি শৈশব হইতেই তাহাদিগকে জীবনের দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত করান হইত।[১]

তবে এসব করতে গেলে শিশুর কান্না বাবা-মার অন্তরকে বিচলিত করে। শিশু কান্নার বিনিময়ে তার ইচ্ছা পূরণ করতে চায়। পিতা-মাতা যতই বাধা দিক, পরিণামে শিশুর আবদারের জয় হয়ে থাকে। ফরাসি দার্শনিক-লেখক জাঁ জ্যাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) উদাহরণ দিয়ে লেখক বলেন :

> শিশুর প্রথম কান্না একটা করুণ প্রার্থনা মাত্র যদি আমরা প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ না দেয় তবে তৎক্ষণাৎ হুকুমে পরিণত হয় কি গভীর সত্য কথা।[২]

ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শৈশবেই শিশুর প্রতি কঠোর হয়ে (অন্তরে নয়, বাহ্যিকভাবে) পর্যায়ক্রমে সে যত বড় হতে থাকবে, ততই তাকে ভালোবাসার কোমলতা প্রদান করতে হবে। লেখক পরিশেষে বলেছেন :

> আমাদের শিশু শিক্ষার মূলনীতি হইবে-Neither Slaves not ants অর্থাৎ তাহাকে একেবারে ক্রীতদাস করাও চাই না, অথচ একেবারে 'আল্লাদ'ও করা চাইনা।[৩]

শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে শিক্ষাটি তার জীবনে বাস্তবে ফলপ্রসূ ও উপযোগী হতে পারে, সে শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট ছিল *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*।

মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েতাদের নবযুগের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে উন্নতমনা, দৃঢ়চরিত্রের মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যে অবদান রেখেছেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা সাহিত্য-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তি হলেন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)। ভারতবর্ষের সর্বত্র যাতে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয়, এই উদ্দেশ্যে নবাব আবদুল লতিফ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ উদ্যোগে মুসলমানদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য পারিতোষিক প্রদানের ঘোষণা দেন। তাঁর প্রস্তাবানুসারে কলকাতা মাদ্রাসায় জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যবই হিসেবে ইংরেজি বই পঠিত হতো। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণিতে মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে সে চেষ্টা করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হলে তাতে সকল

---

১ উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

জাতির সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি হয়। পূর্বে স্থাপিত হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য সে সুযোগ ছিল না। লর্ড নর্থব্রুক (১৮২৬-১৯০৪) কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার সময় নবাব আবদুল লতিফ এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তাঁর বক্তৃতায়। সাহিত্য-পত্রিকায় আবদুল জব্বারের লিখিত 'নবাব আব্দুল লতিফ ও মুসলমান শিক্ষা বিস্তার' নামক প্রবন্ধে এ-তথ্য পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজকে শিক্ষাদানে সহায়তার জন্যে হাজী মুহাম্মদ মহসীনের দানকৃত অর্থে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'মহসীন ফান্ডে'র বার্ষিক প্রায় ৫০,০০০ টাকা হুগলি কলেজে তৎকালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হতো। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহের ফলে হিন্দু ছাত্রদের বৃহদংশ এই ফান্ডের আনুকূল্য পায়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে নবাব আবদুল লতিফ বিষয়টি তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্টের (১৮০৭-১৮৯৩) গোচরীভূত করেন। পিটারের অনুরোধে লতিফ সাহেব তাঁর একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রস্তাব ও প্রকাশ করেন। নবাব আবদুল লতিফ যে প্রস্তাব রাখেন এবং সে বিষয়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সাহিত্য-পত্রিকায় তা উল্লেখ করে বলা হয় :

> এই প্রস্তাবে নওয়াব আবদুল লতীফ সাহেব বলেন যে, হুগলী কলেজে মোহসিন ফন্ড হইতে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া হুগলী মাদ্রাসার সুসংস্কার ও মুসলমান ছাত্রগণের জন্য মাদ্রাসায় আরব্য বিভাগের সৃষ্টিকল্পে ঐ অর্থ প্রযুক্ত হউক। বলা বাহুল্য, নওয়াব আবদুল লতীফের প্রস্তাব এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের অনেকেই হিন্দু ছাত্রগণের স্বার্থে আঘাত ও তাহাদের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কারণ হুগলী কলেজ তৎকালে বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইত।[১]

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রত্যক্ষ করে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন (১৮০৭-১৮৯৩) মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্যের পদ প্রদান করেন। তিনি আজীবন এই পদে বহাল ছিলেন।

শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে জানার জন্য ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়াম হান্টার (১৮৪০-১৯০০) এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন, যা ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিত। এই কমিশনে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে নবাব আবদুল লতিফের ভূমিকা সম্পর্কে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> নওয়াব আবদুল লতীফ দেশের শিক্ষা বিস্তারকল্পে জীবনের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং বলা বাহুল্য তিনি এই কমিশনে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে বাঙ্গালি মুসলমানগণকে প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই

১ মুসলমান সমাজের শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫ ও ১৬৬

দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকে যাহাতে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব কম থাকে এবং আরব্য ও পারস্য শব্দ অধিক থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।[১]

শিক্ষার প্রসারে নবাব আবদুল লতিফের নানামুখী ভূমিকার আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য যে-সকল ব্যক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, যাঁদের অক্লান্ত অধ্যবসায়, অপ্রতিহত উদ্যম ও অবিচলিত উৎসাহের ফলে আজ ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাঁদের গৌরবময় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফের স্থান অনেক উপরে।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মুজফ্‌ফর আহমদের 'বঙ্গদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা' নামে চার পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এতে মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাস্তব জীবনে এর কার্যকারিতার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সাধারণত আরবি ভাষা ও আরবি ভাষামাধ্যমে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, তাকে মাদ্রাসা বলে। ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় সে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করা হয়তাকে বলে স্কুল বা কলেজ, আর সংস্কৃতি ভাষায় দিলে তাকে বলে টোল। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষায় আবশ্যিক আরবির পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় শিক্ষা দেয়া হলেও তাকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কথা বলা হয়ে থাকে। তৎকালে মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্বলতা নিয়ে মুসলিম মনীষীরাও ভাবতেন। সাহিত্য-পত্রিকায় এ বিষয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ লেখেন:

> বঙ্গদেশে আরবি মাদ্রাসার অভাব নাই। কিন্তু এই মাদ্রাসাগুলিতে এতই অপকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হয় যে আমার মোটেই ইচ্ছা হয় না এগুলিকে শিক্ষালয় নামে অভিহিত করি। কালের গতির সহিত মাদ্রাসার শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য নাই। মাদরাসা হইতে যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হন, তাহারা বর্ত্তমানকালে বাঁচিয়া থাকার উপযুক্ত নহেন। তবে বাঁচিয়া যে আছেন, সেটা দরিদ্র সমাজকে মারিয়া। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের মাঝে মাঝে সংস্কারের খেয়াল মাথায় চাপে। তাই দুই-চারিজন জন চিহ্নিত লোকের সমবায়ে সংস্কার কমিটিও বসিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে দরিদ্র প্রজার রাজস্বের টাকাগুলি জলে ফেলা ব্যতীত কোন কাজ হয়না।[২]

লেখকের মতে, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংস্কার করলে কোনো লাভ হবে না। বর্তমানে অনুসৃত প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করে এগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করেন মুজফ্‌ফর আহমদ।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় 'শিক্ষা ও কোরআন' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির লেখক খলিলুর রহমান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে 'ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার প্রথমাংশ মাত্র সাহিত্য-পত্রিকায় 'শিক্ষা ও কোরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে বলে পত্রিকার ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়। এই প্রবন্ধে লেখক কোরান অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক-পর্যায়ে শিক্ষার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

২ মুজফ্‌ফর আহমদ, 'বঙ্গদেশে মাদরাসা শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৩৩

> পবিত্র ইসলামের আগমনে পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। ইসলাম আসিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অধ্যয়নের বিষয় এবং পৃথিবীকে অধ্যয়ন শালায় পরিণত করিল। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে অধ্যয়নের পুস্তক এবং পৃথিবীকে স্কুল গৃহে পরিণত করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে জগতের আদর্শ শিক্ষা-সংস্কারকের স্থান অধিকার করিল। ইসলামের আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে সাহিত্য, পদ্য, ন্যায়, দর্শন এবং অন্যান্য রুচি-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল বটে কিন্তু অধুনা যাহা Modern Science বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহার Research বা গবেষণা করিবার কোনও প্রকার প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা ইসলামের পূর্ব্বে কখনো ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানরাই এই কার্য্যে চেষ্টা পায়। তাঁহারা পদার্থবিজ্ঞান বা Materal Science কে যথেষ্ট উন্নত এবং সমৃদ্ধ করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।[১]

লেখক কোরানের বিধি ও মোহাম্মদ (সা.) র আদেশ অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। মুসলমানের জ্ঞানোন্নতির মূলই কোরান বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে তিনি কোরানের কয়েকটি আয়াত বা শ্লোক উদ্ধৃত করেন,যা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে কোরান শুধু মানবের মনে প্রেরণা জাগিয়ে দিচ্ছে না, বরঞ্চ কীভাবে জ্ঞানের চর্চা বা শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তাও বলে দিচ্ছে। শিক্ষার কীরূপ পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তা কোরানের আলোচনা থেকে বোঝা যায়। লেখক কোরানিক শিক্ষা বিষয়ে বলেন :

> কোরআন সঙ্কেত করিতেছে যে, হে মুসলমানগণ, এই বিশ্বজগৎ তোমাদের শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় আর ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু তোমাদের অধ্যয়নের বিষয়ীভূত।[২]

কোরানের একটি আয়াতের শেষাংশে 'রাব্বানা মাখালাকতা হাজা বাতিলান' অর্থাৎ মানুষের কোনো চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সম্বন্ধে ঘোষণা করছে। 'রব্বানা' শব্দের প্রতিশব্দ কেবল বাংলায় 'প্রভু' এবং ইংরেজির Lord নয়, এর অর্থ আরো অনেক বেশি। এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তক অর্থাৎ তিনি কেবল সৃষ্টি করেন তা নয় বরং সৃষ্ট জীবের প্রতিপালনও করেন এবং এর মানসিক শক্তির পূর্ণত্ব সাধনে সক্ষম হন। লেখক স্বাভাবিকভাবেই কোরানের শিক্ষাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এভাবে :

> কোরআন সঙ্কেত করিতেছে যে হে মুসলমানগণ, এই বিশ্বজগৎ তোমাদের শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় আর ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু তোমাদের অধ্যয়নের বিষয়ীভূত। ... মুসলমানরা কেবল আধ্যাত্মিক বা উন্নতির চেষ্টা করিবেন না, তাঁহাদিগকে শারীরিক উন্নতি ও যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ নিয়ে সম্বেন্ধেও চিন্তা ধ্যান ও গবেষণা করিতে হইবে। অতএব আধ্যাত্মিক নিয়ম ও বিধি এবং শারীরিক ও পদার্থ বিষয়ক শিক্ষা লাভ করা মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম। মুসলমানগণের শিক্ষার ইহাই আদর্শ এবং এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে এত উন্নত হইয়াছিলেন।[৩]

কোরান মুসলমানদের বারবার আদেশ করছে যে, তারা যেন পৃথিবীর নানা জাতির অধঃপতনের কারণসমূহ এবং কোন অবস্থায় তাদের ধ্বংস হয়, সেই সমুদয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ও ধ্যান করেন। তারা যেন তাদের পূর্বপুরুষগণ থেকে শিক্ষা লাভ করে আল্লাহতায়ালার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ না করেন। অতএব জগতের

---

১ খলিলুর রহমান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'শিক্ষা ও কোরআন', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৬৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০-৩৭১

ইতিহাসচর্চা করা মুসলমানদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কোরানের আসমান ও জমিনের প্রত্যেক পদার্থকে মানুষের অধীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখিত আছে। কোরানের বাণী শুধু মুসলমানের নয়, মুসলমানদের মধ্য দিয়ে সকল জগৎ প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের উপর প্রকৃতির যে শাসনক্ষমতা আছে তা কোরানের সংশ্লিষ্ট আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। লেখক এস্থলে প্রথম মানবের স্বর্গে অবস্থান ও এতদ্বিষয়ে বলেন :

> হযরত আদমের বেহেশ্‌তে অবস্থান এবং পবিত্র কোরআন ও বাইবেলে ইহার পৃথক পৃথক বর্ণনার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জেনেসিস মতে জ্ঞান বৃক্ষের ফল আস্বাদন করাতে আদম স্বর্গচ্যুত হন এবং তৎক্ষণে সমস্ত মানব জাতির সর্ব্বনাশ ঘটে। ইহাই Christian Theoulogistদের প্রচলিত মত। কিন্তু মুসলমানের পবিত্র কোরআনের মতে জ্ঞানের অধিকারী হওয়াতেই মানুষ সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছেন।[১]

পৃথিবীর যে কোন প্রাণিরওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্যের প্রমাণ, ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহ-দত্ত কোরানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি অনেকটা ক্ষমতাধর ফেরেশতাগকেও মানুষের আজ্ঞাবহ করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কোরান জানায়। মানুষ যদি যথোপযোগী জ্ঞান ও শক্তিরঅধিকারী হতে পারে তবেই ফেরেশতাগণ বা যে কোনো প্রাণিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব বলে লেখক কোরানের আলোকে অভিমত প্রকাশ করেন। লেখক পরিশেষে বলেন :

> আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানের অধিকারী, হজরত আদম এর উত্তরাধিকারী বা তাঁহার জ্ঞানেরও উত্তরাধিকারী। ইহা অপেক্ষা আমাদের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ?সুতরাং মানবজাতির শিক্ষা সর্ব্বশেষ প্রেরিত পুস্তকের এক প্রধান উদ্দেশ্য।[২]

শিক্ষার্জনে কোরান ও কোরানের শিক্ষার বিশেষত্ব এখানে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্যবিষয়ক লেখার পাশাপাশি ধর্মবিষয়ক লেখা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা এতে স্থান পায়। পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হযরত মোহাম্মদের (সা.) কর্মময় জীবন নিয়ে রচনাও প্রকাশিত হয় সাহিত্য-পত্রিকায়। ইসলাম ধর্মের আচরণীয় দিকের মূল স্তম্ভ 'নামাজ' নিয়ে যেমন প্রবন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি ইসলামে নারীর মর্যাদা নিয়েও একাধিক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কোরান ও হাদিসের আলোকে মুসলিম নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা জুড়ে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসের ত্রুটি বিচ্যুতির খুঁটিনাটি দিকও পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

যে-কোনো সমাজে যার যার ধর্মীয় বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে সব ধর্মের লোক বসবাস করে বিধায় কারো ধর্মীয় বিশ্বাস অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় ও গর্হিত কাজ। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* ইসলাম ধর্মের প্রতি তার নিষ্ঠার দিকটি বজায় রেখেছিল।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

ধর্মের মূল বিষয় মূলভাষা রপ্ত করার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায় বলে সাহিত্য-পত্রিকার বিশ্বাস ছিল। মুসলিম সমাজকে কোরান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এর প্রথম সংখ্যাতেই। কোরানকে মূল ভাষায় অধ্যয়নের ব্যাপারে পত্রিকাটির বিশেষ তাগিদ ছিল। এতদ্বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের কোরান বিষয়ক অংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য :

> যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কোরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খৃষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তাহার কোরআনকে না জানিবে, সে পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ জাগিবে না।[১]

সাহিত্য-পত্রিকার আরেকটি সংখ্যায় বলা হয় :

> উর্দ্দুই হোক বা বাঙ্গালা হোক সর্ব্বদা অর্থ বুঝে আল্লার বাণী আলোচনা কর। ক্রন্দনের সুর ধরে খোদার কাছে কাঁদলে কোন লাভ হবে না। তোমার প্রাণ কাঁদবে, তোমার মুখ নয় – তোমার জিহ্বা নয়।[২]

পত্রিকায় এভাবে কোরানকে শিক্ষণীয় হিসেবে পঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মুখ বা জিহবা দিয়ে নয়, মন দিয়ে কোরানকে জানা ও বোঝার ব্যাপারে বেশি জোর দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'নামাজ' সাহিত্য-পত্রিকায় প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। লেখক আবেগময় কাব্যিকভাষায় নামাজের মহিমার দিক চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেন। কোরান হাদিসের আলোকে নামাজের ব্যাখ্যা তিনি দেননি কিন্তু নামাজ যে 'চিত্তের ক্ষুধা' মেটানোর পাশাপাশি প্রভুর প্রীতির জন্য অনবদ্য আয়োজন তা জানাতে তিনি ভোলেননি। অনেকগুলি স্বস্তি ও সুখের প্রশ্ন রেখে তিনি নামাজ কেন প্রয়োজন তার ব্যাখা দেন।[৩] সুখী, দুঃখী, সত্যবাদী, সমাজ-সেবকসহ ভালো-মন্দ সব মানুষের জাগতিক চাওয়া-পাওয়া যাই থাকুক না কেন, পক্ষে-বিপক্ষে যত যৌক্তিক কারণ থাকুক না কেন 'হৃদয়ের প্রবোধ মানার' জন্য নামাজের কোন বিকল্প নেই বলে লেখক মনে করেন। মানব-মনের গভীরে যে শূন্যতা বিরাজমান তা দূর করার উপায়ও হচ্ছে নামাজ। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করে লেখক বলেন :

> আমার প্রাণের কোণে এ শূন্যতা কেন ? মর্ম্মতলে এ তপ্ত ব্যথা লুক্কায়িত কেন? আমার হৃদয়ের সকল আনন্দ স্তব্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া এ হাহাকার কেন? আমি জানি না, আমি বুঝি না, কি এ? কিসের ব্যথা? কেন এ ব্যর্থতা-বোধ? কর্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, হাসির মধ্যে মজিয়া যাই, কিন্তু শূন্যতা ত দূর হয় না; হৃদয়ের কোন এক নিভৃত কোণ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না। কে আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়। সুখের সৌধ ভেদিয়া কাহার স্বর শুনা যায়। কাহার মহাধ্বনি সকল ধ্বনি স্তব্ধ করিয়া প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে ? আমার মন প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া পড়ে।[৪]

---

১ দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'কোরআন ও নারী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, *৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা*, *শ্রাবণ* ১৩২৯, পৃ. ১৩১

৩ মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরী*, *জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৭

৪ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'নামাজ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, *বৈশাখ* ১৩২৫, পৃ. ৩৫

এরকম অবস্থায় মানুষের ‘কর্ম্ম-কোলাহল’, ‘উল্লাস-আবেগ’ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তখন ‘ধ্যানের মধ্যে’ ডুবে যেতে ইচ্ছা হয়। নিজেকে একান্ত একা মনে হয় যখন, তখন অনন্তের সন্ধান পেতে মন চায়। লেখকের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> আমি নামাজ পড়িয়া অনন্তের সন্ধান লই, রূপের অতীতে- ধ্বনির অতীতে সীমাহীন গভীর শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হই, প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইয়া লই।[১]

লেখক নামাজকে ইসলামের সুষমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নামাজের মাধ্যমে তিনি ‘সর্বজীবের প্রভু’র আরাধনা করার কথা বলেন। সেই ‘অদ্বিতীয় প্রভু’র প্রতি তিনি নামাজের মাধ্যমে নিজেকে নিবেদন করেন। মহান স্রষ্টাকে স্মরণ করে শেষে তিনি বলেন :

> ধন্য সে মহান আল্লাহ, এমন নামাজ পড়ার বিধান দিয়েছেন, এমন রক্ষা-কবচ মঙ্গল-মনি ললাট ফলকে বাঁধিয়া দিয়েছেন। আমার ইমানের উৎস, বিবেকের বল। নামাজ পুণ্যের অমিয় ধারা, আমি পান করিয়া অমর হই, সংসারের ধূলি-মলিন পথে চলিতে চলিতে নামাজের সত্য-সায়রে স্নান করিয়া ফুলের মত নির্ম্মল হই, সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হই।[২]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির এক সভায় ‘নামাজ’ প্রবন্ধ শুনে মুগ্ধ হয়ে খ্যাতিমান সম্পাদক-সাহিত্যিক জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) যে কথা বলেছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গবেষক এম আবদুর রহমান (১৯০৯-১৯৯২) তা তুলে ধরেছেন এভাবে :

> সমিতির এক মাসিক জলসায় সুসাহিত্যিক মৌলানা এয়াকুব আলী চৌধুরী ‘নামাজ’ শীর্ষক এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় ‘ভারতবর্ষ’ সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রী জলধর সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধের বক্তব্য শুনে এই মন্তব্য করেন যে, এই যদি নামাজ হয় তাহলে আমার ইচ্ছা, আমিও এইভাবে উপাসনা করি।[৩]

নামাজ যাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় সেই আল্লাহ্‌কে উপলক্ষ্য করে অন্য সাহিত্য-পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ‘অনন্ত জগতের মহাজ্যোতি’ হিসেবে বিশেষিত করা হয়। আলোকে, আঁধারে, অসীমে, সসীমে তিনি সর্বত্র আছেন। চন্দ্র-সূর্য তারই ইশারায় পরিচালিত হয়। সকল সত্তার মধ্যে তিনি বিরাজমান। স্রষ্টাকে ইঙ্গিত করে এতদ্বিষয়ে লেখকের বক্তব্য বিবেচনাযোগ্য :

> এই যে আমি এখানে বসিয়া আছি, তাঁহার জ্যোতি কি আমাকে ঘিরিয়া রহে নাই ? আমার হৃদয়ের আধার তাঁহার আলোক ছুইতে পারিতেছে না, তবুও কি আমার চতুর্দ্দিকে মহালোকবৎ অবস্থান করিতেছেন না ?তিল স্থান বাদ না দিয়া, তিনি অসীম ব্যাপীয়া আছেন, এ মহা অসীমে যেখানে তিনি আছেন, সেখাসে কি মানব-কল্পনাতীত বর্ণনাতীত আভা ও বিমলতাপূর্ণ মহাজ্যোতিঃ জ্বলিতেছে না ?[৪]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩ এম আবদুর রহমান, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ইতিহাস, উদ্ধৃত, *জেগে উঠিলাম : বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি স্মারক-সুবর্ণলেখ*, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১

৪ ‘নামাজ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

আল্লাহ্‌কে এভাবে পাওয়ার সাধনা যিনি করেন তিনি সেই সাধক, যিনি 'অবনত মস্তকে, অব্যক্ত আনন্দে, নীরবে এ আলোকের ধারা পান' করেন। লেখক একেই স্বর্গ হিসেবে অভিহিত করেন। আল্লাহ্‌কে 'মহাজ্যোতি' হিসেবে সম্বোধনের পাশাপাশি ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদকে (সা.)'স্বর্গের জ্যোতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*। বিবি সারা তয়ফুর (১৮৮৮-১৯৭১) সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর 'স্বর্গের জ্যোতি' রচনায় লেখেন :

> হজরতের আদর্শ জীবনের কথা মানব সমক্ষে বিবৃত করিতে চেষ্টা করাও আমাদের ধর্ম্মে পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হজরতের জীবনের ঘটনাবলী অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সম্মুখে ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এতদ্দেশীয় মুসলমানবৃন্দ প্রায়ই বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ আরবী ফার্সিযুক্ত কঠিন উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হজরতের জীবন কাহিনী তাঁহারা খুব অল্পই বুঝিতে পারেন। হজরত মানব ছিলেন, মানবের রক্তমাংসে তাঁহার শরীর গঠিত ছিল, আত্মার পবিত্রতা ও নিষ্পাপ চরিত্রগুণে খোদাতালা তাঁহাকে নষ্ট ও ভ্রমান্ধ জাতির মুক্তি ও উদ্ধারার্থে নবী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।[১]

কাজী ইমদাদুল হকের 'রসুলে করিমের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও মর্ম্মকথা' গ্রন্থের আলোচনা হিসেবে সারা তয়ফুর উক্ত 'স্বর্গের জ্যোতি' রচনাটি সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন।

লেখক ইমদাদুল হক বিবি সারা তয়ফুরকে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের পর 'মহিলা মহলে কেন পুরুষ-মহলেও সাহিত্যিক সমাজের আদর্শ স্থানীয়া' বলে গণ্য করেন। বইটিতে হযরতের প্রকৃত কর্মজীবন অঙ্কিত করা হয়েছে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক-সমালোচক ইমদাদুল হক বলেন :

> হযরত সংসার জীবনের প্রত্যেক মোসলেমের আদর্শস্বরূপ। প্রকৃত মনুষত্ব তাঁহাতে ছিল; কেবল অলৌকিত ঘটনার জঞ্জালে তাঁহার সেই প্রকৃত মনুষত্বকে ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহাকে একটা অপার্থিব, অতি মানুষ করিয়া তুলিয়া তাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে সেটা আশ্চর্য্য রূপকথায় সামিল হইতে পারে বটে, কিন্তু আসল মানুষটি তাহাতে একেবারে হারাইয়া যায়। 'স্বর্গের জ্যোতি'তে সেই আসল মানুষটি আমরা বাস্তবিক যেন স্বর্গের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখিতে পাই এবং তাঁহাকে জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য অন্তরে প্রেরণার অনুভব করি।[২]

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৫) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানবতায় হযরত মোহাম্মদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ত্যাগ, প্রেম ও কল্যাণের প্রসঙ্গে জগতে যিশুখ্রিষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হয় বলে লেখক উল্লেখ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি যে-কোনো ধর্মীয় নেতাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা লেখক উচ্চারণ করেন। তবে লেখক গুরুত্বসহকারে হজরত মোহাম্মদের (সা.) সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপকতর ভূমিকার দিকে আলোকপাত করেন। শুধু মুসলমান নয়, সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মোহাম্মদ অনুসরণীয় হতে পারেন বলে লেখক মনে করেন। মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় মোহাম্মদ এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, এ কথা উল্লেখ করেন লেখক এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন :

---

১ সারা তয়ফুর, *স্বর্গের জ্যোতি*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯২৫, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪-৫

২ কাজী ইমদাদুল হক, স্বর্গের জ্যোতি: আলোচনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৬৬

এই মানবতার যুগে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষরূপে বিশ্বমানবতার নিকট ইহা অসঙ্কোচে বলিবার সময় আসিয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ মানবতার যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুধু অসামান্য নহে, অতুলনীয়, মুহূর্তের মৃত্যু দ্বারা নহে, পরন্ত বহুবর্ষব্যাপী জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন, তাহার নিকট বৃদ্ধের সুখত্যাগ ও খৃষ্টের প্রাণত্যাগ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।[১]

যে-সেব মহাপুরুষের আগমনে পৃথিবী আলোকিত ও ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.) অন্যতম। শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নয়, সব ধর্মের লোকদের নিকট তিনি শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী চরিত্রের অধিকারী হিসেবে পরিগণিত হন। মানবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক মহাপুরুষের পাশপাশি তাঁর নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়। সাহিত্য-পত্রিকার লেখক বলেন :

মহাপরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবমুকুট তাঁহারই প্রাপ্য। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মানবতার সুমহান্ গৌরব। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহের, তিনি মানুষ। ইহাতেই তাহার সার্থকতা ও ইহাতেই তাঁহার অহঙ্কার। তিনি মানুষের শক্তি ও অধিকারের যে জয়ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষের মহিমা ও গৌরবের যে ডঙ্কা বাজাইয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে অতি বড় গৌরবের বিষয়।[২]

তিনি নিজেকে আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি মানবমনের অন্ধকার দুরীভূত করে আলোকবর্তিকা হিসেবে মানবসমাজে আর্বিভূত হন। মানবতার জয়গানই তার মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁকে নিয়ে লেখকের উক্তি অনুধাবনযোগ্য :

তিনি আপনাকে আল্লাহর দাস ও মানুষরূপে ঘোষণা করিয়া মানুষের সমগ্র জীবন ব্যাপারে আপনাকে মিশ্রিত করিয়া মানুষের মনের মধ্যে এই মহাসত্য দৃঢ়রূপে আঁকিয়া দিয়াছেন যে, মানবত্রাতা মহাপুরুষ মানুষ হইতে উচ্চ নহেন, মানবসত্তার সীমার বাহিরে নহেন, তিনিও মানুষ, মানুষেরই তিনি মহত্তম পরিণাম। শত শত মানুষ যাঁহার বাণীর বেদনায় অধীর হইয়া ধর্মকে বরণ করিয়াছে, শত শত আর্ত্ত যাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়াছে, যিদি মানুষের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মনিকাঞ্চনের মধ্যে থাকিয়াও অল্লাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়াছেন, অথচ যাঁহার অঙ্গুলী হেলনে রাজমুকুট ধূলায় লুটাইয়াছে, যাঁহার স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া মরুভূমির অসুর দেখিতে দেখিতে মানুষ হইয়া মহত্বের মহিমা লইয়া দিগ্ দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই মহাপুরুষকে নিঃশ্বেষে ঘরের মধ্যে লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহার মুখে "আমি মানুষ" শুনিয়া মানুষের মন উন্নত হইয়াছে। মানুষ বহুদিন পর আপনাকে চিনিতে পারিয়া উজ্জ্বলরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৩]

মহাপুরুষদের ঈশ্বরের আসনে বসাতে গিয়ে মানুষের মহিমাকে শোচনীয়রূপে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বলে লেখক মনে করেন। হজরত মোহাম্মদ মানুষকে প্রেম ও ক্ষমার উপদেশ দিয়েছেন। নিজ জীবনে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তিনি মহাপুরষের কল্পিত দেব সিংহাসনে সবলে পদাঘাত করে মানবতার উদার সমতলে দাঁড়িয়ে যা বলেছেন, লেখকের ভাষায় তা এই :

---

১ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'মানবতায় হযরত মোহাম্মদ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৩২

২ 'মানবতায় হযরত মোহাম্মদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

> ঐ একমাত্র মহান আল্লা ছাড়া, হে মানুষ। তোমার আর কোন উপাস্য নাই। এই আল্লা ছাড়া তোমার জন্য আর কেহ বড় নাই।[১]

এই বাণী মানুষের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে, তার আত্মার আগুন এমন করে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তার আধ্যাত্মিক জীবনকে এমন ঊর্ধ্বগতি প্রদান করেছে যে, তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হতে পারে না। শঙ্কর, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, খ্রিস্ট, চৈতন্য, কৃষ্ণ সবার মহান অবদানকেস্মরণ করেছেন লেখক, এবং তবে তাঁদের জীবনের অনেক ঘটনা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন বলে লেখক মনে করেন। এক্ষেত্রে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও চরিত্র কল্পনা-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন নয়; তা ঐতিহাসিক সত্যের রুদ্রালোকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। লেখক আবারও হজরত মোহাম্মদকে পুরোপুরি একজন মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে পরিশেষে লিখেছেন :

> তিনি হাড়ে হাড়ে মানুষ। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি প্রত্যেক দিন কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতেন, কতক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, কোন দিন কাহার সহিত কি কথা বলিয়াছিলেন। তাহা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদেশিক রাজার নিকট তাঁহার প্রেরিত পত্র ও পরিচ্ছদের নিদর্শন এখনও মুসলমানদিগের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। তাহার কোনোটিই ভক্তের কলপনা নহে, ঐতিহাসিক ঘটনার রুদ্রালোকে পরিচিত সত্য। শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এখনও মুসলমানের ধমনীতে ধমনীতে তাঁহার শোণিত প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে।[২]

লেখক হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় যেমন দেন, তেমনি তাঁর স্নিগ্ধ মধুর গম্ভীরবাণী দুর্জয় দুর্বিপাকে মুসলমানদের প্রাণে গভীরভাবে বেজে ওঠে বলে জানান। রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারবদ্ধ হয়ে বসবাস করে কীভাবে স্বাভাবিকভাবে ধর্মসাধনা করতে হয়, তার উদাহরণ হজরত মোহাম্মদ (সা.)। সন্তুষ্টির সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি অন্যের মঙ্গল সাধন করা, স্রষ্টার সঙ্গে জীবনের যোগ স্থাপন করা, তারই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তিনি মানুষকে প্রদর্শন করার ব্রত নিয়েছিলেন বলে পরিশেষে উল্লেখ করেন লেখক এয়াকুব আলী চৌধুরী। এখানেই হজরত মোহাম্মদের (সা.) মানবধর্মী মহিমা সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে।

মহাত্মা মোহাম্মদ (সা.) কোরানের যে বাণী মানবজাতির কল্যাণার্থে প্রচার করেছেন, তাতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সহচরদের মধ্যে খালিদ বিন অলিদ, ওমর বিন আল্ আস, সাদ বিন ওয়াক্কাসহ অনেক জগদ্বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতিগণ মক্কার উত্তপ্ত অনুর্বর মরুভূমি অতিক্রম করে রোম, মিসর, পারস্যের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসকগণের দর্প চূর্ণ করে ইসলামের মহান বাণী প্রচার করেছেন। এই বিজয়াভিযান অবলম্বনে 'সেতারায়ে সোব্‌হ' নামক সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকার ১৯১৬ সালের ১ম সংখ্যায় 'ফোস্তাত' (শিবির) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের আলোকে সারা তয়ফুর সাহিত্য-পত্রিকায় একই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শেষাংশে মোহাম্মদকে (সা.) নিয়ে যে উক্তি করা হয়, তা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> আজ খোদাতা'লার সৃজিত নির্ব্বাক্ জীবগণকে নিষ্ঠুর মানবের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা যে সকল সদনুষ্ঠানের উদ্ভাবনা করিয়াছে, তার সার্দ্ধ তেরশত বর্ষ পূর্বে মদিনার এক

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

মেম্বারের (বেদী) উপর দণ্ডায়মান এক সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের পবিত্র কণ্ঠ হইতে নির্গত সেই অনুষ্ঠানমন্ত্র আজও সমগ্র ইসলাম জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।[১]

অন্য একটি প্রবন্ধে 'হীন জীবের প্রতি দয়া বিতরণের' কথা বলা হয়েছে। সকল ধর্মই জীবের প্রতি দয়া করাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। লেখক আহমদ মিঞার বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

জীবের প্রতি 'দয়া বিকাশের' জন্য সাংসারিক ও পারলৌকিক ভাবে সুফল তো অনেক আছেই, বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ পাক করিমের মনস্তুষ্টি সম্পাদনও পূর্ণ মাত্রায় তদ্দ্বারা সাধিত হয়।[২]

'দয়া বিকাশে'র পাশাপাশি জ্ঞানসাধনায় মহানবীর (সা.) অবদান ব্যাপক। ইসলামের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বে পৃথিবীতে সভ্যতার শোচনীয় অধঃপতন ঘটেছিল। প্রাচীন গ্রিক, মিসরীয়, রোমান, পারস্য, আসিরিয়া, ব্যবিলন, চীন সাম্রাজ্য 'স্থবিরত্ব প্রাপ্ত' হয়েছে। একইভাবে আরবের মরু ময়দানে যেন সমস্ত জগতের পাপ ও দুর্নীতিসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে নীতিধর্মকে নিদারুণ বিদ্রূপ করছে। এই সময় মহানবীর (সা.) আর্বিভাব আরব তথা বিশ্বসমাজে এক আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এ-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক আজম উদ্দীনের বক্তব্য:

এমন সময় শত সূর্যের প্রভাবকে পরিম্লান করিয়া মক্কার খর্জ্জুর বনের পশ্চাৎ হইতে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল, যুগ যুগান্তর ব্যাপী অন্ধকারময়তা মূহূর্তে তিরোহিত হইল; প্রভাত-ওরে প্রভাত! মহাপুরুষ নবজাগ্রত শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, এই যে অজ্ঞতা ইহাই মুক্তির পরিপন্থী, শয়তানের সহায়, অতএব মার্জিত জ্ঞানের খোলা তলোয়ার হাতে লইয়া এই অজ্ঞতার সঙ্গে সংগ্রামে বাহির হও; ইহাই জেহাদ, শ্রেষ্ঠতম জেহাদ।[৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের ভেতর দিয়ে অনুধাবন করা যায়, মোহাম্মদ (সা.) জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারকে জেহাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইসলামে জ্ঞানানুশীলনকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলাম পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের প্রচার ভিন্নতর এবং এর প্রসারও হয়েছে বিভিন্নভাবে। মরুময় আরব প্রান্তরের তপ্ত ধুলার মাঝখানে যে ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো, তা নিখিল জগতে কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল, তা একটি বিরাট প্রশ্ন। সর্বধর্মেই কমবেশি সাম্যের কথা বলা হয় কিন্তু ইসলামে সাম্যবাণীর আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি বলে ধারণা করা হয়। এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রচারের তুলনা করতে গিয়ে বলা হয়:

খৃষ্টান ধর্ম্ম কেবলমাত্র পাদ্রীরাই প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম প্রত্যেক মুসলমানই প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাই ইসলাম প্রচারের মূল এবং বড় কারণ। 'যুক্তি তর্ক এবং সদয় ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে (বিধর্ম্মীদিগকে) আল্লাহ্‌র পথে আহবান করো'-ইহা কোরআনের বাণী। এই বাণী প্রকৃত মুসলমানের কানে বাজিয়াছে সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবে কেন ?[৪]

---

১ বিবি সারা তয়ফুর, 'ফোস্তাত', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৫৯
২ আহ্‌মদ মিঞা, 'হীন জীবে দয়া', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৭৬
৩ আজম উদ্দীন, 'জ্ঞান-সাধনায় ইসলাম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১৩৪
৪ গোলাম মোস্তফা, 'ইসলাম প্রচার', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ১২৬

খ্রিস্টধর্মে পাদ্রিগণ যে কাজ করেন, ইসলাম ধর্মে 'প্রত্যেক মুসলমান' সেই কাজ করেন। তৎকালে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' নামে লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ইসলাম প্রচারকদের একটি তালিকা বের হয়। তাতে দেখা যায় স্কুলের শিক্ষক, আবগারি বিভাগের কেরানি, সওদাগর, দর্জি, পত্রিকার সম্পাদক, বুক বাইণ্ডার ইত্যাদি সকল শ্রেণির লোকই ইসলামের প্রচারণায় কাজ করেন। শুধু যে পুরুষ লোকই ইসলাম প্রচার করেছে তা নয়, স্ত্রীলোকও এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কতিপয় মোঙ্গলীয় যুবরাজ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন তাদের মুসলমান স্ত্রীর প্রভাবে। পূর্ব আফ্রিকার এক বর্বর জাতি মুসলিম নারীদের দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) মুসলিম নারীদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়। এছাড়া সবদেশের সব সমাজে কমবেশি মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ধারা প্রচলিত আছে।[১] ইসলামে নারীকে অন্যধর্মের তুলনায় অধিকতর মূল্যায়ন করা হয় বলে ইসলাম প্রচারে তাদের অংশগ্রহণ একটি কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে লেখক মনে করেন।

নারীর মূল্য ও ইসলাম নিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* মঈন উদ্দীন হোসায়নের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরপর কয়েকটি সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলে। লেখকের প্রবন্ধের উত্তরে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, হামীদুর রহমান ও সহকারী সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ দুই কিস্তিতে এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দেন। বিষয়টি আরো চলতে পারত কিন্তু সহকারী সম্পাদক তিন সংখ্যায় এ বিষয়ক লেখা ছাপার পর জানিয়ে দেন, বিষয়টি নিয়ে আর কোনো মতামত বা লেখা প্রকাশ করা হবে না। লেখক মঈন উদ্দীন হোসায়ন প্রবন্ধের শুরুতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান ধর্মানুসারী কারো কারো মতের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করেন, যা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে। হিন্দুরা সজোরে শঙ্খ বাজায় এই বলে যে, তারা নারীজাতির যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন আর কোনো জাতি সেরূপ করেনা। অপরদিকে ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানগণ বলেন যে, হিন্দু বা মুসলমানগণ কেউ-ই নারীর কদর করে না। লেখক এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে হিন্দু, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে নারীদের কতটুকু মর্যাদা দেয়, সে আলোচনা করে ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শ্রীমতী অনিলা দেবীর হিন্দু সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্য উদ্বৃত করে লেখক বলেন :

> হিন্দুর নিকট রমণী স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিতা। 'বিল্বমঙ্গল' নামক ধর্মমূলক নাটকের বণিক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজ সহধর্ম্মিনীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে। তাহার মনের ভাবটা এই যে, আমার গায়ে তৃণাঙ্কুর না বিদ্ধ হয়, তোমার যা হয় তা হোক। তা ছাড়া শাস্ত্রে আছে, সর্ব্বস্ব দিয়াও অতিথি সৎকার করিবে। অর্থাৎ ধন দৌলৎ, হাতী ঘোড়া, গরু বাছুর যা কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই। কিন্তু অতিথি যখন ওসব চায় না, তখন তুমিই (স্ত্রী) যাও।[২]

হিন্দুধর্মের সতীদাহ বা সহমরণের ইতিহাস অনেকটা রহস্যময় বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়। কী কারণে এর উৎপত্তি হয়েছিল, তা নিরূপণ করা দুষ্কর বলে জানানো হয়। তাঁর মতে, হিন্দু নারীর মর্যাদাহানি উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধির কারণে হয়ে থাকে, আবার তার নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক জীবনহানি যেন অধিকতর মর্যাদার বিষয় হিসেবে মনে করা হয়। এরপর লেখক ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও মূল্য কতটুকু তার আলোচনা করেন। লেখক বলেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২ মঈন উদ্দীন হোসায়ন, 'নারীর মূল্য ও ইসলাম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২০৯

নারীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার জন্য বাইবেলের প্রথমার্দ্ধে আদি পুস্তক প্রধানত দায়ী। এই আদি পুস্তকে সৃষ্টি প্রকরণ এবং আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। আদম ও হাওয়ার 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণ প্রসঙ্গে বাইবেল নারীজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, 'নারীই সমুদয় পাপের মূল কারণ'। Rabbinism অর্থাৎ ইহুদি ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতেছে যে, রমণীরূপে জন্মগ্রহণ করা মহা দুর্ভাগ্য। ইহুদি ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে, সতী সাধ্বীরমণী অপেক্ষা পাপিষ্ঠ পুরুষ শতগুণে শ্রেষ্ঠ।[১]

সেন্ট এ্যান্টনি, জেরোম, গ্রেগেরি, সিশিআন প্রমুখ ধর্মযাজক ও ধর্মাচার্য নারী জাতিকে এই ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। বলেছেন The Organ of Devil অর্থাৎ নারী শয়তানের অঙ্গ।[২]

ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। যখনই এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও উপাসনা লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখনই পথভ্রষ্ট জগদ্বাসীকে সৎপথে আনয়নের জন্য তত্ত্বাবধায়কের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা ধর্ম, রীতি ও সামাজিক অনেক বিষয়ে সংস্কার সাধন করেছিলেন। কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে তাঁরা অধিক মনোযোগ দিতে পারেননি। কারণ, তখনও নারী বহুল পরিমানে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও ন্যায্য অধিকারসহ পুরুষের সাথে কোনরূপ পার্থক্য না রেখে সমানভাবে বিচরণ করত। এতৎপ্রসঙ্গে লেখকের নিম্নলিখিত বক্তব্য লক্ষণীয় :

এক আল্লাহ্‌র উপসনার পরিবর্তে মুর্ত্তিপূজা, সাকার পূজা, জড়োপসনা, পীর পূজা প্রভৃতি মারাত্মক অনাচার একেবারে প্রচলিত না হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল, সেইরূপ নারী তাহার প্রথমযুগের প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য ও ন্যায্য অধিকার একেবারে হারায় নাই-ক্রমে ক্রমে হারাইয়াছিল। এইরূপে রমণীর ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার পর হইতে রমণীর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা শনৈ: শনৈঃ এতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে নারী যে খোদাতাআলার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নারী যে নরের উপর এক অঙ্গ তাহা পুরুষ অস্বীকার করিয়া বসিল।[৩]

নারীর অপমানের মাত্রা ষষ্ঠ শতাব্দীতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। মহানবীর (সা.) আর্বিভাব ও পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পর নারীর অধিকারের বার্তাগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা তখন জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়। পুরুষ কর্তৃক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, উৎপীড়িত ও পদদলিত নারীকে শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা করা ও ন্যায্য অধিকার প্রদান করা ইসলামের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। ইসলামে নারীর সম্মান, উচ্চাসন ও মূল্য কতটুকু তা অনিলা দেবী নামক একজন বিদুষী হিন্দু নারীর[৪]লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যায় :

নারীর প্রতি অত্যাচার, অবমাননা না করার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলামে। মোহাম্মদ (স.) নারীজাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছন, বিশেষ করিয়া বিবাহকে- যাহার অবস্থা ও ইহুদি (ও অন্যান্য জাতির মধ্যে) সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরূপায় ছিল-তাহাকে দয়া ও ন্যায়ের

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৪ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) ছদ্মনামে (অনিলা দেবী) কয়েকটি প্রবন্ধ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সূত্র: *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫১১, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ।

> দৃষ্টিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন এ সব কথা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ তদানীন্তন আরব রমণীর ভয়ংকর অবস্থার তুলনায়, ইহুদি ও অন্যান্য রমণীর হীনতার তুলনায়, আরবের নব ইসলাম ধর্ম যে নারীকে সহস্রগুণে উন্নত করিয়াছে তাহাতে লেশ মাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।[১]

নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার ও ন্যায্য অধিকারের বিষয় কোরানে অনেক স্থানে বলা হয়েছে।[২] নারীর মূল্য ও নারীর আত্মা নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী দুটি সংখ্যায় বিতর্ক জমে ওঠে।

সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় লেখক মঈন উদ্দীন হোসায়নের প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করে পত্র লেখেন সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। তাঁর এই আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে সমালোচনামূলক উত্তর দেন সাহিত্য-সমিতির সহকারী সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ একই সংখ্যায়। লেখক মঈন উদ্দীন হোসায়ন শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুধাকান্তবাবুর পত্রের উত্তর দিতে পারেননি বলে সহকারী সম্পাদক জানান। এ বিষয়ে মঈন উদ্দীন হোসায়নের আর কোনো বক্তব্য সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি।

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী হিন্দু সমাজের লোকাচার ও সামাজিক নিয়ম বিষয়ে বলেন যে, মঈন উদ্দীন হোসায়নের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতের কোনই অনৈক্য নেই, তবে তিনি তাঁর বক্তব্য হিন্দু শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ না করে কেবল সমাজ বিধির নিদর্শন থেকে সংগ্রহ করেছেন। মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, 'রমণীদের জন্য অতিরিক্ত রকমের পর্দ্দা প্রথা, পুরুষদের সহিত নারীর অধিকার সমান – একথার সহিত খাপ খায় না। এই পর্দ্দা System যে নারীরের প্রতি পুরুষের জুলুম নয় একথা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করেন না'। বর্তমান মুসলমান সমাজ ও সমাজবিধি সম্বন্ধে আলোচিত না হওয়ায় প্রবন্ধটি একটু একতরফা হয়ে গেছে বলে তিনি দাবী করেন। মুসলমানরা রমণী জাতির আত্মার অস্তিত্বে (Existence of Soul) বিশ্বাস করেন না বলে লেখক মনে করেন। Howbeek Ricant প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা মুসলমানরা 'নারীদের পশুর মতো মনে করার' মতো মন্তব্য করার পরও মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদের লক্ষণ না দেখায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৩]

সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর লেখার উত্তর তাঁর লেখার পরপরই ছাপা হয় একই সংখ্যায়। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ জানান যে, জগতের সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে তেরোশ বছর পূর্বে মুসলমানই সর্বপ্রথম নারীকে তার মানবিক অধিকার প্রদান করেছে। তার আগে নারীর ব্যক্তিত্ব কোনো জাতিই স্বীকার করেনি। এমনকি যে সভ্যজাতি গ্রিক, যাদের মধ্যে প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করে জগতে বরেণ্য হয়ে গিয়েছেন, তাদের মেয়েরাও পরিণত বয়সে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারত না, পিতা কিংবা অভিভাবকদের ইচ্ছায় তাদের বিয়ে করতে হতো। এমনকি পিতার নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে না চাইলে গ্রিক আইন অনুসারে পিতা কন্যাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারতো। রোমের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। প্রাচীন হিন্দুজাতির মধ্যে নারীর হীনাবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

---

১ 'নারীর মূল্য ও ইসলাম', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

২ প্রাগুক্ত

৩ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, 'নারীর মূল্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ৩২৯-৩৩০

স্ত্রীজাতির জন্য মনু কেবল বশ্যতা ও পরাধীনতার বিধানই করিয়া গিয়াছেন। 'Day and night must Women be held by their protctors is a status of subjection (Manu)'। কখন কখন একজন নারীকে একই সময়ে কয়েকজন পুরুষের স্ত্রীও হইতে হইয়াছে। কখনও বা সে পাশা খেলার 'বাজী' হইয়াছে। ইসলামের আগমনের পূর্ব্বে আরবেও নারীর দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। মোট কথা জগতের সকল দেশের সকল জাতির সামাজিক বিধিই নারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া ছিল।[১]

ইসলামের আবির্ভাবের পর মহাশিক্ষক মোহাম্মদ (সা.) নারীদের নানা অধিকারের ব্যবস্থা করেছেন যে অধিকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যজাতিগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নারীদের দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ এই মোহাম্মদ (সা.) জন্মেছিলেন সেই আরব জাতির মধ্যে, যারা কন্যা ভূমিষ্ট হওয়াকেই বিপদ মনে করত। বাস্তবিক মানবতা এই জন্য তাঁর নিকট চিরঋণী থাকবে। মুসলমানরা নারীর আত্মায় বিশ্বাস করে কী-না এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বিবেচনাযোগ্য :

Howbeek Ricant কিংবা অপর কেহ যদি বলেন যে ইসলাম নারীর আত্মা স্বীকার করে না তাহা হইলে সেই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার যোগ্য-মুসলমানদের তরফ হইতে তাহার কোনও উত্তর দেওয়া উচিত নহে। যাহারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নারীর ব্যক্তিত্ব ও মানবত্ব বিশ্বের চক্ষে ধরিয়া দিয়াছে তাহারাই নারীর আত্মায় বিশ্বাস করে না একথা যে বলিবে সে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া বলিবে। মুসলমানদের ভালটুকুও তাহার নিকট মন্দ বোধ হইবে।[২]

তিনি বলেন যে, আত্মা জিনিসটা যদি পুরুষের থেকে থাকে, তাহলে তা নারীরও আছে। কারণ পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে আত্মা থাকবে আর নারী হয়ে জন্মালে আত্মা থাকবে না, এটি প্রকৃতির নীতিবিরুদ্ধ। কোরান বা হযরত মোহাম্মদের (সা.) বাণী হাদিসে কোথাও এমন কথা লিখিত নেই যে, নারীর আত্মা নেই। সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় 'ইসলামে নারীর আত্মা' শীর্ষক আলোচনায় একথাটি লেখেন হামীদুর রহমান। তিনি কোরানের সুরা আল ইমরান, সুরা নিসা, সুরা মুমিন, সুরা মোহাম্মদ, সুরা হদীদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান – আত্মার অস্তিত্ব ও নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা। লেখক এ প্রসঙ্গে পরলোকে বিশ্বাসের উদাহরণ এনে বলেন :

মানবাত্মাকে পরমাত্মা খোদা তায়ালার নিকট নিজ কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে। আল্লাহ্ তাআলার বিচারে সে দু:স্কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ ও সৎ কর্মের জন্য পুরস্কার লাভ করিবে। যদি মনুষ্যের জন্য দ্যুলোকের পর পরলোক থাকা এবং পরলোকে কর্ম্মের বিচার ও ফলাফল ভোগ নিশ্চিত করিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ইতর প্রাণী হইতে পৃথক ভাবে আত্মার অস্তিত্ব মানব দেহে থাকা স্বীকার করিতে হইবে। যদি পরলোক বিশ্বাস করা যায় তবেই আত্মার আবশ্যকতা আছে আর পরলোকে বিশ্বাস না করিলে মনুষ্যের আত্মা থাকা না থাকা উভয়েই সমান। নারীর আত্মা থাকুক আর নাই থাকুক উহার তর্ক উত্থাপন করিয়া কোন ফল নাই।[৩]

---

১ মুজফ্‌ফর আহমদ, 'নারীর মূল্য: উত্তর', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ৩৩১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

লেখক আশা করেন, অতঃপর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক বিতর্কের অবসান হবে। আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে বিশ্বাস করেন। শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য সমান সমান ব্যবস্থা রয়েছে। পুরুষ যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, নারীও সেখানে তার অংশ পাবে। পর্দার প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক বলেন যে, পর্দাপ্রথা ইসলাম অনুমোদন করেছে কিন্তু কঠোর অবরোধের ব্যবস্থা করেনি। তিনি বলেন :

> পর্দ্দার মানে হইতেছে স্ত্রীজাতির আবরু রক্ষা করিয়া চলা। মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাহিরে যাওয়া আসা নিষিদ্ধ নহে। তাহাদের মসজিদে যাওয়ার বিধানও আছে। নারীগণ হজব্রত সম্পন্নকরিতেও পারেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর স্ত্রী গণ কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে যাওয়া আসা করিতেন।তাঁহার কন্যা বিবি ফাতেমা সাধারণ সভায় বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়াছেন। মোটকথা মুসলমান নারীগণ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি নীচ পুরুষগণের প্রলুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় এইরূপভাবে, বাহিরে যাওয়া আসা করিতে পারেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজও মুসলমান নারীগণ এই নিয়ম পালন করিয়াই চলিতেছেন।[১]

বলা যায়, মুসলমান সমাজে নারীরা যেভাবে পর্দার অনুশাসন মানেন বা বিশ্বাস করেন, অন্য কোনো সমাজে হুবহু সে রকমটি আশা করা বৃথা। নারীর পোশাকের শালীনতার গুরুত্ব অবশ্য সবাই স্বীকার করেন। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* পরপর তিনটি সংখ্যায় পাঁচটি রচনার ভেতর 'নারীর মূল্য ও ইসলাম' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সর্বশেষ রচনা 'নারীর মূল্য ও ইসলামের জের' শীর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটান *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* সহকারী সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ। পাশাপাশি বসবাস করেও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে জানার ব্যাপারে ঘাটতি আছে বলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। লেখক হিন্দু সমাজকে উদ্দেশ্য করে লেখেন :

> মুসলমান হিন্দুকে যতটা জানেন, হিন্দু মুসলমানকে ততটা জানেন না। কিন্তু আমাদের জানা উচিত। তাহা না হইলে পাশাপাশি বাস করিয়াও একে অন্য হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান জগতে হিন্দুগণ বিশেষত বাঙ্গালী হিন্দুগণ (কর্ষণার) দিক দিয়া নগন্য নহেন।[২]

তৎকালীন বাঙালি সমাজে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্ম বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছিল। হিন্দুরা ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করতো। কেউ কেউ আলাদা ধর্ম হিসেবে মূল্যায়ন করতো। অনেকটা উদারবাদী ব্রাহ্মধর্মের অনেক অনুশাসন ইসলাম ধর্মের সাথে মিলে যায়। একটা কথা ঠিক, ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন, অনুবাদ ইত্যাদি করেছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থ কোরান শরিফ অনুবাদ করেন। ব্রাহ্মরা এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন, দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন না। সাহিত্য-পত্রিকায় এতদ্বিষয়ক লেখা থেকে ব্রাহ্ম ধর্মবিষয়ক উক্তিটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য :

---

১ মুজফ্ফর আহমদ, 'নারীর মূল্য ও ইসলাম এর জের', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ. ৫৫

২ হামীদুর রহমান, 'ইসলামে নারীর আত্মা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

> পবিত্র কোরআনের শিক্ষা প্রভাবেই রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অনেক শিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু ধর্মের অংশ, আমরা কিন্তু একথাএকেবারেই স্বীকার করি না, প্রত্যুতঃ একেশ্বরবাদী ও সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মপুস্তক হইতেই যে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মমতাবলম্বী লিখিয়াছেন, 'স্বর্গ নরক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের মতগত কুসংস্কার (?) পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঐক্য হইতে পারে, অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নায়। কেননা, মুসলমান অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, কোন রূপ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ ইত্যাদির সংস্রব রাখেন না।[১]

ইসলামকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনযাপনের প্রায় সর্ববিষয় নিয়েই আলোচনা আছে ইসলামে। সময়ের নিরিখে ইসলামি অনুশাসনের যৌক্তিক ও বাস্তবানুগ অনুশীলন অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষকরা অনুমোদন করেন। ইসলামি নীতিশাস্ত্র নিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত এ বিষয়ে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম অংশে ইসলামে ক্ষমার গুণ বিষয়ে 'মোস্‌লেম নীতিশাস্ত্রভুক্ত ক্ষমাগুণ' শিরোনামে মোহাম্মদকে (সা.) নিয়ে মোহাম্মদ কে. চাঁদের (করম চাঁদ) লেখাটি প্রকাশিত হয়। লেখক বলেন যে, ক্ষমাগুণ অন্যান্য সকল গুণাগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধায় আল্লাহ তাঁর নবী করিমকে (সা.) এই ধর্ম অভ্যাস করতে আদেশ করেছেন। হত্যা করতে উদ্যত ব্যক্তিকে হাতের নাগালে পেয়েও ক্ষমা করেছেন মহানবী (সা.)। এতদ্বিষয়ে প্রবন্ধটিতে আরো বলা হয় :

> যখন কেহ নিজে যে অপরাধ করিয়াছে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া এইরূপ বুঝেন যে, তাহারও আল্লাহর ক্ষমার আবশ্যক হয়, তখন যে কোন অপরাধীকে ক্ষমা করিতে তাহার অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নহে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ও তাহার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা দান করিতে পারিবেন।[২]

তবে যে সকল নীতিবিগর্হিত এবং ঘৃণিত কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তদ্রূপ কঠিন কাজ করলে মার্জনা করা উচিত নয়। কারণ তাতে অপরাধীরা উৎসাহপ্রাপ্ত হয় এবং বারবার সেই কাজে ব্রতী হতে থাকে। এ ব্যাপারে লেখক Mr. Gorham লিখিত Ethics of the Great Religion গ্রন্থে বর্ণিত নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর ক্ষমাবিষয়ক গুণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

মুসলিম নীতিশাস্ত্রভুক্ত সদগুণাবলির লক্ষণ ও পরিচয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সদগুণের মূল বিষয়কে প্রজ্ঞা (Wisdom) হিসেবে অভিহিত করা হয়। মানুষের যতটুকু গ্রহণ শক্তি সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, ঐ বস্তুগুলির অবস্থা সম্বন্ধে অবগতিকে প্রজ্ঞা বলা হয়। প্রজ্ঞার আলোকে 'মুখ্য ধর্ম্মচতুষ্টয়' হিসেবে সাহস (Courage), মিতাচার (Temperance), ন্যায়পরায়ণতা (Equity) ও বিজ্ঞতাকে পরিচয় করানো হয়।

---

১ খোন্দকার গোলাম আহ্‌মদ, 'ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ২৮৮

২ মোহাম্মদ কে চাঁদ, 'মোসলেম নীতিশাস্ত্রভুক্ত ক্ষমাগুণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ৯৮

প্রথমে সাহস সম্পর্কে বলা যাক। ভয় ও বিপদে মনকে ব্যাকুল না করে প্রকৃত বিবেকের আদেশানুসারে কাজ করাকে সাহস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর ১১টি প্রকারভেদ চিহ্নিত করা হয়,সেগুলি হলোঃ মহানুভবতা, ধীরতা, উদ্দেশ্যের উচ্চতা, অটলতা, শান্তশীলতা, মহত্ব, নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, অনুগ্রহশীলতা, উদ্যম ও অনুকম্পা। দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলির বন্ধনকে মিতাচার বলা হয়। মিতাচারের কয়েকটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলোঃ লজ্জা, খোসমেজাজ, ধর্মপ্রাণতা, অনবগত (চেতনাতীত), জিতেন্দ্রিয়তা, ধৈর্য, সন্তুষ্টি, শশব্যস্তভাব (সত্বরতা), পুণ্যশীলতা, নিয়মনিষ্ঠা, সাধুতা, উদারতা। তৃতীয় বিষয় ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলা হয়ঃ যে বৃত্তিগলি পরস্পর মিলিত হয়ে সূক্ষ্মধর্মী বৃত্তি অনুযায়ী আপনা আপনিই গঠিত হয় তাই। ন্যায়পরায়ণতার কয়েকটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়। যথাঃ বিশ্বস্ততা, মিলন, যথার্থতা, পরদুঃখকাতরতা, ভ্রাতৃত্ব, কৃতজ্ঞতা, সৎসঙ্গ, সদভিপ্রায়, হৃদ্যতা, বশ্যতা, আত্মত্যাগ, ধ্যাননিষ্ঠা (ভক্তি)। সর্বশেষে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনকারী ব্যক্তির দক্ষতাকে 'বিজ্ঞতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞতার সাতটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়, যা হলোঃ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, বুদ্ধিবৃত্তির সুস্পষ্টতা, জ্ঞানার্জনের সহজসাধ্যতা, বিচারণার ন্যায্যতা, ধৃতি (গৃহীত), স্মৃতি। এরকম অসংখ্য সৎগুণের পরিচয় ও প্রকারভেদ নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় কোনোটি সংক্ষিপ্ত কোনোটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

প্রেম বলতে সাধারণ অর্থে নর-নারীর দ্বৈত সম্পর্ককে বোঝায়। ব্যাপকার্থে প্রেমের আবেদন গভীর ব্যঞ্জনাবাচক। যে-কোনো জীবকে ভালোবাসা, সর্বোপরি মানুষকে ভালোবাসা সবচেয়ে বড় প্রেম। ঈশ্বরপ্রেমের কথাও আমরা বলে থাকি। মানবপ্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেমে উন্নীত হওয়া যায়, মনীষীরা তাই বলেন, এতদ্বিষয়ে হাদিস শরিফের আলোকে মানবপ্রেম নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকার উক্তিটুকু উদ্বৃতিযোগ্য :

> তুমি মানুষকে এবং সেইহেতু আল্লাহতায়ালাকে প্রেমদান করিতে পারিলে না, কিরুপে তুমি আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে প্রেমের আশা করিতেছ ?হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলিয়াছেন, বিশ্বমানবের প্রতি যাহার দয়া নাই, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে কখনও দয়া করিবেন না। দয়া ইমানের চিহ্ন, যাহার দয়া নাই তাহার ইমানও নাই।[১]

ইমান তথা বিশ্বাসের আলোকে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রোগীর শুশ্রূষা করা, নিরপরাধ কয়েদিকে কারামুক্ত করা এবং নিপীড়িত ব্যক্তি যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, তাকে সাহায্য করা কর্তব্য।[২]

বৌদ্ধধর্ম পূর্ণভাবেই একে সমর্থন করে বলা হয়, যিনি প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত তিনি সমদর্শী ও বিশ্বপ্রেমিক না হয়ে পারেন না।[৩] সকল ধর্মের সারতত্ত্ব সম্পর্কে আরেকটি প্রবন্ধে বলা হয় :

> ঈশ্বরে ভক্তি, সর্বজীবে প্রীতি, ইন্দ্রিয় সংযম ও নিস্ফলভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই সকল ধর্মের সারবস্তু। শাস্ত্রাদি গ্রন্থে আর যাহা কিছু আছে তাহা ইহারই সম্প্রসারণ মাত্র। কায়মনোবাক্যে এই চারটি বিধি যথাযথভাবে

---

১ মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম, 'হাদীস শরীফে মানব সেবা ও বিশ্ব প্রেম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ.৩০৬

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

প্রতিপালন করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। কি এসলাম ধর্ম্ম, কি হিন্দু ধর্ম্ম, কি খ্রীস্ট ধর্ম্ম ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিত্তি এই চারটি বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেমসম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তিন লেখকের তিনটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রেমের তাত্ত্বিক, জৈবিক, আত্মিক দিকের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ প্রবন্ধগুলির উপজীব্য ছিল। সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরীর 'প্রেম' নামক আট পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রেমের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ প্রসঙ্গে যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি প্রেম ও অপ্রেমের পার্থক্যও চিহ্নিত করেছেন। প্রেমের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে তিনি বলেছেন :

> যে স্থানে কামনা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রতিদানের টান আছে, ভালোবাসার বিনিময় ইচ্ছা আছে, সেই স্থানেই প্রেম বহুদূরে 'আকাশ-কুসুম' কল্পনার ন্যায়। যে স্থানে 'বিকিকিনি' আছে, সুরূপ ও কুরূপের আসক্তির টান আছে, বরের পণ আছে, কি 'দেন মোহরে'র ডাক অমাত্রায় চড়িতেছে সেইখানে অপ্রেমের সূচনা হইতেছে। যেখানে বংশ-গৌরব, আভিজাত্য আছে, ধনী নির্ধনের কথা আছে, বিজ্ঞ অজ্ঞের বিচার আছে, সেখানেই প্রেম চিরবিদায় লইয়াছে।[২]

প্রেমের মহত্তর স্বরূপ কল্পনায় তিনি গৌতম বুদ্ধ, হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মোহাম্মদ (সা.) এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রেমভক্তির নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি এঁদের একই সঙ্গে মহাপুরুষ ও মহাপ্রেমিক বলেও চিহ্নিত করেছেন। এঁদের নিঃস্বার্থ প্রেমধর্ম যে জগতের বুকে জাগরণের জোয়ার নিয়ে এসেছিল, তা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। প্রেম যে কেবলই 'কাম' নয় তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি অবশেষে বলেছেন :

> প্রেমের বীজ জীবহৃদয়ে নিহিত আছে। ইহার culture করাটা মাত্র দরকার, যেন প্রেম ও কাম এক না করি। প্রেম নিজেই শিক্ষক; সে তাহার নিজের পথে প্রেমিক ছাত্রকে চালাইয়া প্রেমের কন্টক-সংকুল পথে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাইয়া লয়।[৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় সব ধর্মের বাণী গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি বড় উদাহরণ 'বিশ্বজনীন প্রেমঃ তিনটি মহাবাক্য' প্রবন্ধটি। মাত্র দুই পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটির তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক ধর্মের আদর্শের মূল বিষয়টি 'প্রেম', লেখক সুরেশচন্দ্র মিত্র তিনটি মহান বাক্য ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রবন্ধ শুরু করেছেন ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের তিনটি উপদেশাত্মক বাক্য দিয়ে, যার মর্মার্থ মানবপ্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া। তিনি বলেছেন :

> আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল সত্য-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উপদেশ এই যে – সকলকেই আপনার ন্যায় ভালোবাসিবে।
>
> এ সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মের উপদেশ এই ইন্ন-ল্লাহা য়ুহিব্বু-ল মুহসিনীন।
>
> 'আল্লাহ তাহাদিগকেই ভালবাসেন যাহারা সকলের মঙ্গলকারী।'

---

১ সুরেশচন্দ্র মিত্র, 'খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৪৯
২ মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরী, 'প্রেম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭, পৃ. ১৯৭
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৮

> খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ এই Thou shalt love thy neighbour as thyself
>
> হিন্দু ধর্মের উপদেশ এই 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'। অতএব এ সম্বন্ধে কি ইসলাম ধর্ম, কি খ্রীস্টধর্ম, কি হিন্দুধর্ম সকলেই একমত।
>
> যিনি প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বিশ্বপ্রেমিক না হইয়া পারেন না।[১]

উপরে যে তিনটি মহাবাক্য উদ্ধৃত হলো, তার প্রত্যেকটি অভ্রান্ত। লেখক অতঃপর ভগবৎ বাক্যের বিশ্লেষণ করে বলেন :

> যদি আমরা শাস্ত্রের এই আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করিতে চাহি, তাহা হইলে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে আমাদের হৃদয় হইতে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে এবং সর্ব্বদাই পবিত্র অন্তরে সকলের মঙ্গল কামনা করিতে হইবে ইহাই এই মহাবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য।[২]

সকলেই সুখী হোক, নিরাময় হোক, মঙ্গল ও শান্তির অধিকারী হোক, কাউকে যেন দুঃখভোগী হতে না হয়–সর্বশেষে এ প্রেম কামনা করে লেখক প্রবন্ধটি শেষ করেন।

সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামে ছয় পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণের বিষয়টি বর্ণনা করে প্রেমের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-গ্রহ-উপগ্রহব্যাপী যে বিস্তার, তা তুলে ধরেছেন তাঁর চমৎকার বয়ানে। তিনি শুরু করেছেন এভাবে :

> সূর্য্য যে শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে স্বীয় পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না, পৃথিবী যে শক্তির প্রভাবে চন্দ্রকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দেয় না,অণু যে শক্তির প্রভাবে পরমাণুকে টানিয়া রাখে তাহার নাম আকর্ষণ শক্তি। বস্তুত যদি এই আকর্ষণ শক্তি সংসারে না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী একটি বিশৃঙ্খল বস্তু (chaos) হইত এবং তাহার ফলে জগতের যাবতীয় জিনিস বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সংসারের প্রতি মুহূর্তে তড়িৎতরঙ্গের যে বিষয় সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহাও আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে। গ্রহ যদি উপগ্রহকে টানে, শরীর যদি শরীরকে টানে তাহা হইলে মনও মনকে না টানিবে কেন ? মনের প্রতি মনের এই টানের নাম প্রেম এবং প্রেম আকর্ষণের রূপান্তর মাত্র।[৩]

মনের প্রতি মনের যে টান তাকে যদি আমরা প্রেম বলি, দেখা যায় তারও প্রকারভেদ আছে। যে আকর্ষণে মানুষ অজ্ঞাতসারে মহাপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার নাম ভক্তি। মহামানবেরা মানুষকে যা কিছু উপদেশ দিয়েছেন তা মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। এই মঙ্গলই সৌন্দর্য্যের নামান্তর বলে লেখক মনে করেন। তিনি মহাকবি গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৮৯) সৌন্দর্যকে মঙ্গলের উপরে স্থান দেয়াকে উদ্ধৃত করেছেন। মহাকবি গ্যেটে বলেছেন: The Beautiful is higher than the Good, the Beautiful includes in it the good. অর্থাৎ সৌন্দর্য মঙ্গল অপেক্ষা উচ্চতর, সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। তিনি এ প্রসঙ্গে শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং (১৮১২-১৮৮৯), কোলরিজ সহ দেশি-বিদেশি অনেক সাহিত্যিকের সৌন্দর্যসূত্রের

---

১ সুরেশচন্দ্র মিত্র, 'বিশ্বজনীন প্রেম: তিনটি মহাবাক্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ. ৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, 'প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯, পৃ. ২৬৭

অনুসন্ধান করেছেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নির্ণয়েরও চেষ্টা করেছেন। প্রেমের নানাবিধ গৌণ কারণও তিনি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। মানবরুচির ভিন্নতা অনুযায়ী প্রেম-অপ্রেমের ঘটনা ঘটে থাকে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। ভালোবাসার কারণও অনেক সময় নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। মোহাম্মদ (সা.) (৫৭০-৬৩২), শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), স্যামুয়েল জনসনের (১৭০৯-১৭৮৪) প্রতি ভক্ত-অনুরাগীর শ্রদ্ধা ভালবাসার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, সেও তো এক ধরনের পরিণত ভক্তি-প্রেম। লেখক প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে বলেছেন :

> সৌন্দর্যটা প্রেমিকের উপহার মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রেমের কোনও মুখ্য কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি না অথবা যাহারা প্রত্যেক বিষয়ের কারণ না জানিলে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন না তাহাদিগকে বলিতে হয় প্রেমই প্রেমের কারণ। আমি একজনকে ভালোবাসি কিন্তু কেন ভালোবাসি জানি না। সে কি রূপ? তাহার অপেক্ষা অধিক রূপসী আছে তাকে ভালোবাসি না কেন ? তবে কি গঠন ? তাহাও নয়, কারণ অষ্টচক্র মুনিও তাহার অপেক্ষা দেখিতে সুশ্রী। তবে কি যৌবন ? তাহাও নহে, দৃষ্টান্ত মোহাম্মদ, শেক্সপীয়ার, স্যামুয়েল জনসন। তবে বোধহয় প্রেম। কিন্তু ইহা কি ? কোথা হইতে আসিল ? ভবভূতিও ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই, বর্তমান লেখক কোন ছার...[১]

প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত চিন্তার বিপরীতে প্রেমের যে একটি বৃহত্তর রূপও বিদ্যমান, প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে তা-ই স্পষ্ট হয়েছে। প্রেমের কারণ নির্দেশ করার চেয়ে প্রেমের বিচিত্ররূপ অনুসন্ধান করা সাহিত্য-পত্রিকার লক্ষ্য ছিল। 'প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ' অর্থাৎ প্রেমের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান–এই পাঁচটি বিষয়ই আলোচনায় স্থান পেয়েছে সাহিত্য-পত্রিকার পাতায়।

ধর্ম বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দুটি প্রবন্ধ সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়। একটি 'কুরআন শরীফে যুদ্ধনীতি' অপরটি 'কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম্ম' নামে পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। কবীরের ধর্ম পরিচয় কী, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন :

> হিন্দু কিংবা হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা বা পরিচয় নির্নয় করা দুষ্কর। সাধারণতঃ যাহাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয় তাহার প্রতি কবীরের মন্তব্য শুনিয়াই তাঁহাকেই হিন্দু বলা হইবে কি না পাঠক বিচার করিবেন। দেবতা সম্পর্কে কবীর সাহেব বলিতেছেন-ব্রক্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বল ইহাদিগকে কেন প্রনিপাত করিবে। ইহারা মুক্তি পাইবে না। কবীর অবতার মানিতেন না। তিনি বলিতেন- পাষাণ পুজিলে যদি হরি পাওয়া যায়, তবে আমি পাহাড় পূজা করি। লোকে পাষাণের পুতুল করিয়া কর্ত্তাকে পূজা করে। তাহার ভরসায় থাকিও না।[২]

প্রখ্যাত গবেষক ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) কবীরকে মুসলমানের সন্তান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে কারো কারো মতে, তিনি মুসলমানের পালিত বলে উল্লেখ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নূর এবং মাতার নাম নীমা। কবীর রামানন্দের শিষ্য হলেও গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন। এতদ্বিষয়ে তিনি আরো বলেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১-২৭২

২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম্ম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১০০-১০৩

> কবীর দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real); সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই খেলা।[1]

কোরান সম্পর্কে বলা হয়, পবিত্র কোরান কোন অসম্ভব নীতি শিক্ষা দান করে না। এর নীতি হিংসা-দ্বেষ, পাপ-তাপ-পূণ্য পৃথিবীর মানব জাতির জন্য। কোরানে যিহাদের কথা আছে। 'জিহাদ' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'আত্যন্তিক চেষ্টা'। এর থেকে যোগরূঢ়ভাবে 'ধর্মযুদ্ধ' এই অর্থে এসেছে। কোরানে 'জিহাদ' শব্দ উভয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কোরানে ব্যক্তিগতভাবে শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও সদব্যবহারের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। সুরা আল ইমরানের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> যাহারা সুখে ও দুঃখে দান করে ও ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদিগকে ক্ষমা করে, আল্লাহ (সেই সকল) সৎকর্মশীল লোককে প্রেম করেন। (সুরা আল ইমরান, র-১৬)[2]

দেশের বা ধর্মের শত্রুকে ক্ষমা করার অধিকার কারো নেই। এই জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে কিন্তু আগে আক্রমণকারী হয়ে যুদ্ধ করতে কোরান অনুমতি প্রদান করে না। জিহাদ আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা ও শান্তিরক্ষার জন্য বলে এতদ্বিষয়ে সুরা বাকারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয় :

> এবং যাহারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহর পথে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (সুরা বাকারাহ, র-২৪)[3]

যদি শত্রু যুদ্ধ থেকে বিরতি দেয়, তবে তার সাথে যুদ্ধ করা নিষেধ বলে কোরানের নির্দেশ আছে। শত্রুর আগ্রহ থাকলে, শত্রুর সাথে সন্ধি স্থাপন করা যায়। কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> যদি তাহারা সন্ধির ইচ্ছুক হয়, তবে তুমিও তাহার ইচ্ছা করিও এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিও। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। (সুরা আনফাল, র-৮)[4]

তবে শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা করার আশঙ্কা থাকলে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া উচিত। এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ধর্মপ্রচার কোরানের নীতি নয়। আবার ধর্ম প্রচারকালে পরধর্মের নিন্দা করা কোরানে নিষেধ।

ইসলামের ভাবাদর্শের সাথে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা ও সাহিত্যাদর্শের অনেক মিল লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে কোথাও আমরা ইসলাম-বিদ্বেষ দেখতে পাই না। বরং তাঁর লেখায় এত ইসলামি ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে বলে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক মনে করেন। মহান স্রস্টার প্রতি নিজেকে সমর্পণ, প্রেম ও শান্তি স্থাপন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোরানে প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্র্যের কথা যেন রবীন্দ্রনাথেও অনুরণিত হয়েছে। মানব জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের বাণী ইসলামি ভাবধারার আদলে রবীন্দ্রনাথে প্রতিবিম্বিত

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬

২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'কুরআন শরীফে যুদ্ধনীতি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭, পৃ. ২৮৪

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত

হয়েছে।[১] কবির 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'গীতপঞ্চাশিকা', 'শেফালী', 'কেতকী' ও অন্যান্য গানের বইগুলি ঈশ্বর প্রেম বিষয়ক কবিতায় পরিপূর্ণ। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তরে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে

উক্ত কবিতার সাথে সুরা ফাতিহার সাদৃশ্য তুলে ধরে কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার সারমর্ম্ম'[২] হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই একটি কবিতার দ্বারা কবির সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও গতিপথ নির্ণয় করা যায়। এই কবিতার ভিতর ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ ঘটেছে। এতদ্বিষয়ে লেখক গোলাম মোস্তফা সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করেন :

> একমাত্র খোদাতা'লাকেই সর্ব্বময় প্রভু মনে করিয়া তাহার চরণ-তলে মাথা নত করা, নিজের অক্ষমতা নিবেদন করা এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করা, অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া খোদার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করা, অন্য কিছু কামনা না করিয়া খোদাতা'লারই 'চরম শান্তি' ও 'পরম কান্তি' প্রার্থনা করা-এ সমস্তই খাঁটি ইসলামের কথা।[৩]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ'র (এম. আনসারী ছদ্মনামে) 'তপোবল' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক এই প্রবন্ধে সাধক জালাল উদ্দীন রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ধর্মচিন্তা ও অলৌকিকতা নিয়ে কিছু জাগতিক ও দৈবিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সাধক-কবি মাওলানা রুমির তপোবল তথা ধ্যানের শক্তি নিয়ে লেখক শুরুতে আলোচনা করেন। উপবাসের বা রোজার সঙ্গে তপোবল সঞ্চয়ের সম্পর্ক কেমন তা উল্লেখ করতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় এম. আনসারী লেখেন :

> মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রাচীন সাধক জগতে জন্মিয়াছিলেন, যতদূর জানা যায়, তাহাদের অধিকাংশই সাধনার জন্য উপবাস ব্রত প্রতিপালন করিতেন। সাধারণত মনে হয় উপবাসে শারীরিক শক্তির হ্রাস হইয়া তাকে। কিন্তু সাধকদের এই কঠিন ব্রতে কিরূপে শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ইহাই আশ্চর্য্য।[৪]

লেখক অতঃপর এ প্রসঙ্গে জালালউদ্দীন রুমির কথা উল্লেখ করেছেন। রুমি ছয় বছর বয়স থেকে রোজা রাখতে আরম্ভ করেন এবং 'তরুণ বয়সে এক এক বারে তিনদিন, চারদিন বা ক্রমাগত সাতদিন উপবাস' করতেন বলে লেখক জানান। রুমির ধর্মগুরু মাওলানা বোরহান উদ্দিন তাঁর এই কঠোর ব্রত পালনের পর তাঁকে সর্বশাস্ত্রে ও সর্বসাধনায় পারদর্শী হয়েছিলেন বলে অভিহিত করেছেন। রুমির পিতা মাওলানা বাহাউদ্দিনও সুফি সাধক ও গ্রন্থকার ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সেই প্রভাব রুমির ভেতর পড়েছিল এবং পিতাও পুত্রকে দেখে শৈশবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি একদিন তাপসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮
২ গোলাম মোস্তফা, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১০৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪ এম. আনসারী 'তপোবল', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ. ২৪১

করবেন। লেখক এম. আনসারী রুমির এরকম একটি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে লেখেন। রুমি একদিন সমবয়সী কয়েকজন বন্ধুসহ কোনো এক ভবনের ছাদে আড্ডা দিতে যান। এক বন্ধু পাশের ভবনের ছাদে লাফিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে, কারণ এতে প্রমাণিত হবে, তারা কে কেমন সাহসী। সব বন্ধু এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়, কিন্তু রুমি তার থেকে বড় কিছু করার কথা বন্ধুদের জানিয়েছিলেন। লেখক রুমির জবানিতে অলৌকিক কথাগুলি সাহিত্য-পত্রিকায় বর্ণনা করেন এভাবে :

> যদি কেহ সাহসী থাক, এস আসমানে উঠিয়া একবার বেড়াইতে আসা যাউক। যেমন বলা অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জালালের বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। এই শিশু অদৃশ্য হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। সকলে ভয়বিহবল হইয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। অল্প পরে জালাল উন্মনা মূর্ত্তিতে পুনরায় তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।[১]

এই অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর বন্ধুদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারা পরবর্তীকালে তাকে রীতিমত সমীহ করা শুরু করে।

জালালের বাল্যশিক্ষক মাওলানা সৈয়দ বোরহান উদ্দীন একজন সাধক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ও অলৌকিকতা বিষয়ে শিক্ষক বোরহান উদ্দীন যা বলেন, তা সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক এম. আনসারী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

> আমি জালালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম এবং যোগ বলে সময় সময় তাঁহাকে স্বপ্নজগতের অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইতাম। কিন্তু এখন জালাল আমাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সে আমাকেই অধ্যাত্ম জগতের অনেক তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক সময়ে আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া অমরলোকে বিহার করিতাম, এখন সেই আমাকে সঙ্গে লইয়া আমাকে কৃতার্থ করে। জালালকে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।[২]

এসব ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুব দুরূহ, তবে যে কোনো সাধনার মাধ্যমে যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, এটি অনেক মনীষী বলেছেন।

সাহিত্য-পত্রিকায় সমাজে সৃজনশীল ও মননশীল কর্মকাণ্ডের বিষয় নিয়ে বেশকিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধে বিজ্ঞানধর্মী চিন্তা-চেতনার উপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কবির কল্পনাশক্তি আর বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার কি পরস্পরবিরোধী নাকি একে অপরের পরিপূরক, এ আলোচনা সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। কবি গোলাম মোস্তফা 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> কবি কল্পনা-সূত্র দিয়া বিশ্বের সমুদয় সৌন্দর্যকে অভিনব ছন্দে গ্রথিত করিতে যাইতেছিলেন, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া যুক্তিজ্ঞান দ্বারা তাহার কল্পনা-সূত্রকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।[৩]

প্রকৃতপক্ষে একজন কবি যা কল্পনা করেন, একজন বিজ্ঞানী তা বাস্তবে পরিণত করেন। পাখির মতো মানুষের আকাশে উড়বার আকাঙ্ক্ষা এক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিকই বাস্তবায়ন করেন। কবি যা কল্পনা করেন,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
৩ গোলাম মোস্তফা, 'কবি ও বৈজ্ঞানিক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৪০

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুণে তা সত্যে ও বাস্তবে পরিণত হতে দেখা যায়। গোলাম মোস্তফা কবিকে প্রকৃতির দান হিসেবে মনে করে বলেন :

> যুগে যুগে এক এক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও একজন খ্যাতনামা কবিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ একথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে।[১]

কবি গোলাম মোস্তফা এ পর্যায়ে সমাজে কবি ও বৈজ্ঞানিকের যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান মেনে নেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইবরাহীম খাঁ (খাজা ছদ্মনামে) ১৩২৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় বিজ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকারপূর্বক কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের প্রতি ঋণ স্বীকার করে বলেন :

> কবি ও বৈজ্ঞানিকে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। আগে এরূপ একটা বিরোধের অন্যায় ধারণা লোকের মনে ছিল বটে, সৌভাগ্যক্রমে আজ তাহা চলিয়া যাইতেছে। অতএব হে কবি ও বৈজ্ঞানিক, তোমরা ঝগড়া করিও না। তোমাদের বিবাদ দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়, কারণ তোমাদের নিকটে আমরা ঋণী। তোমরা উভয়েই আমাদের শ্রদ্ধেয় তোমাদের চতুশ্চরণে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিদায় হই।[২]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের চার খলিফা নিয়েও কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে, ধর্ম ও সমাজে তাঁদের প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা থাকার কারণে। সমকালীন বাঙালি মুসলমান এসব ব্যক্তিত্বের যুগান্তসৃষ্টিকারী ভূমিকার কথা জ্ঞাত হয়ে স্বসমাজও স্বদেশের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হবেন – এ-ই ছিল সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সমকালীন সমাজের এমন দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অনেকের কাছে ছিল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মুসলিম সমাজের একাংশ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারণে এ-দুজনকে মূল্যায়ন করেছিলেন নেতিবাচকভাবে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ব্রাহ্মণ বা হিন্দু যা-ই হোন না কেন, এঁদের সামগ্রিক অবদান মূল্যায়নে প্রয়াসী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (আবদুল্লাহ আল আজাদ ছদ্মনামে)। 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন :

> গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ই জীবিত পুরুষ; শুধু দেহ ধারণের জন্য নয়, অন্তর্জীবনেও এঁরা জীবিত। এদের দেখা শেষ হয় নাই,বলাও শেষ হয় নাই। কাজেই মাঝখান থেকে তাঁদের কোনো কথা চেপে ধরে বিচার করতে যাওয়া অবিচারও হতে পারে। এ সব জেনেশুনেও যে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, সে কেবল এই সত্যের জোরে যে তাঁরা আমাদেরই বুকে তাদের চিন্তা-ভাবনা উৎসাহ আবেগের তরঙ্গ জাগিয়ে সামনে চলেছেন। সেসব ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের বুকে কেমন করে এসে লাগছে, কি কথা কি আভাস ইঙ্গিত দিয়ে উঠছে আমাদের শিরায় শিরায়, এ পর্যন্ত যতটাআত্মপ্রকাশ তাঁরা আমাদের সামনে করেছেন তাতে কাকে আমাদের কেমন মনে হচ্ছে– এসমস্তের নিশ্চয়ই একটা সত্যকার মূল্য আছে।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২ খাজা: ইবরাহীম খাঁ, 'কবি ও বৈজ্ঞানিক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ.২৩৬

৩ আবদুল্লাহ আল-আজাদ, 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ২

গান্ধী তাঁর *Indian Home Rule* শীর্ষক গ্রন্থে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ও কবিতায় যা বলতে চেয়েছেন, এ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর আদর্শ আমাদের সামনে এগিয়ে চলার পাথেয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীণা আর গান্ধীর কর্মমন্ত্রের আবেদন চিরকালই থাকবে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করে পত্রিকাটি সমকালে প্রগতিশীলতার একটি বড় উদাহরণ সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রয়াত কীর্তিমানদের অবদান মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পত্রিকায় 'স্মরণ' নামে একটি বিভাগ ছিল। মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) রচিত 'পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী' শীর্ষক রচনাটি 'স্মরণ' পাতার অন্যতম একটি স্মৃতিচারণ ছিল। স্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে নামের মিল থাকার কারণে লেখক তাকে 'আমার মিতা' বলে উল্লেখ করেন।

রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮) কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম 'অগ্নি কুক্কুট', 'সমাজ ও সংস্কারক', 'সুরিয়া বিজয়' ও 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা'। রেয়াজউদ্দীন আহমদ মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করতেন। সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'পত্রিকার সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের (১৮৫২-১৯৩৬) সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। সমকালে কাশ্মীর গোরক্ষিণী সভার কলকাতা অধিবেশনের (সভায় ৩০-৩২ জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন) প্রধান অতিথি জনৈক স্বামী গো-বধের বিরুদ্ধে (টাউন হলে) যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ যেন কোনো বিরূপ মন্তব্য না করে *সঞ্জীবনী* সম্পাদক বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র রেয়াজ উদ্দীনকে সেদায়িত্ব নিতে বলেন। এ বিষয়ে মাশহাদী উত্তর দেন :

> আমি স্বদেশকে নিশ্চয় ভালোবাসি, কিন্তু পরপদদলিত স্বজনগণ আমার নিকট তদপেক্ষাও ভালোবাসার পাত্র। যাহারা আমাকে জানেন, তাহারা এ কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, সামাজিক স্বত্তের এক বিন্দু পরিমাণও পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কুমার বাহাদুর (শোভাবাজার রাজবংশের) আপনার বন্ধুতায় আমি যদি নিরপেক্ষভাবে মৌনাবলম্বন করিয়াও থাকি, তথাপি, উত্তেজিত স্বজনবর্গের অভিশাপ এখনই আমার মস্তকে নিপতিত হইবে।[১]

একাধারে স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজনপ্রীতি মাশহাদীর চেতনায় বিরাজমান ছিল। সমকালে আলোচিত এই লেখককে রেয়াজউদ্দীন আহমেদ 'সহৃদয় ও তেজস্বী সাহিত্য সেবক' বলে অভিহিত করেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজ তাঁর চিরবিদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

> বঙ্গভাষার উপর পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদী সাহেবের যেরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি সেইরূপ চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন। তিনি যেই আদর্শ সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন তাহাতে তাহাকে মুসলমানদের মধ্যে নব্যতন্ত্রের গুরু বলা যাইতে পারে। তাঁহার জীবনী আরো বিশেষভাবে আলোচিত হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা তাঁর সুযোগ্য জামাতা মৌলভী নুরুর রহমান সাহেবকে তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। শুনিতে পাইলাম, সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা, কলিকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস আর এস হোসায়ন সাহেবার সহিত

---

১ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ, 'পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমেদ মাশহাদী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ১৯৯

পণ্ডিত সাহেবের আত্মীয়তা ছিল। তিনি যদি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখেন তাহা হইলে আমরা বড় বাধিত হইব।[১]

উনিশ শতকের ফারায়েজী আন্দোলনের মুখপাত্র হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)-র পুত্র মুহাম্মদ মুহসীনউদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) স্মরণে সাহিত্য-পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় 'মোহাম্মদ মোহসেন' নামেও তিন পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুদু মিয়া ছিলেন ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। প্রবন্ধে তাঁকে 'অসম সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ' হিসেবে অভিহিত করা হয়, যিনি 'সরকার বাহাদুর'কে পর্যন্ত গ্রাহ্য করতেন না।[২] এভাবে পণ্ডিত মাশহাদী ও দুদু মিয়ার সমাজকর্মের কিছু দিক সম্পর্কে সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়।

সামাজিক আচার-আচরণ, সমাজের বহুমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, দেশ ও সমাজে নারীর ভূমিকা, স্বার্থ, সমাজে সব ধর্মের অনুশীলনের সমাজ সুযোগ-সুবিধা, সমাজ ও পারস্পরিক হিন্দু-মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নির্ধারণ, সমাজে শ্রমজীবী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাজীবী শ্রেণির অবদান, সমাজে শরীর-স্বাস্থ্যের বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ও সচেতনাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কণ্যা ও পুত্রের প্রতি সমদৃষ্টি, সামাজিক রীতির নামে কুপ্রথার বিরোধিতা, সব পর্যায়ের ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার নানান দিক, ধর্মবিশ্বাসী ও অজেয়বাদীদের দৃষ্টিতে ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের ইতিবাচক মূল্যায়ন ও পার্থক্য, সমাজের মধ্যে বিরাজমান ইতিবাচক বিভিন্নমুখী প্রেম ও মানবপ্রেমের সমাজ গড়ার মাধ্যমে সমাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রত্যয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* অনেক রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইসলাম ধর্মের শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সব মহলের এক আলোচিত মহান পুরুষ। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসারে তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়, বিশ্বের সামগ্রিক মহান ব্যক্তিদের ইতিহাসে তাঁর একটা প্রভাববিস্তারী অবস্থান রয়েছে। তবু আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাঁকে সাহিত্য-পত্রিকার রচনার আলোকে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাঁর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তক এবং মহান নেতাদের আলোচনাও এই অধ্যায়ে রাখা হয়েছে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা সমাজ ও ধর্মকে পৃথকভাবে বিচার করেনি। সব ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের ভিতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করত সাহিত্য-পত্রিকা। ধর্মের সহনশীলতার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছিল সাহিত্য-পত্রিকায়। ধর্মের কুসংস্কার, পরধর্মমতের বিরোধিতা, সমাজে মানুষে-মানুষে বৈষম্য সাহিত্য-পত্রিকার আদর্শের পরিপন্থি ছিল।

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, 'মোহাম্মদ মোহসেন: জীবনী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১৪৯

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস বিষয়ক অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস পত্রিকার অধিকাংশ স্থান জুড়ে ছিল। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিভাষণগুলিতে আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেক তথ্য ও উপকরণ পাওয়া যায়। এছাড়া সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধে ইতিহাসের বহু উপাদান বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইসলামের ইতিহাসের নানা বিষয় পত্রিকায় স্থান পেতো। আরব, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, চীন, ভারতসহ বঙ্গদেশে ইসলামের চর্চা, অবদান, প্রসার, প্রভাব ইত্যাদির বিশ্লেষণ সাহিত্য-পত্রিকায় পাওয়া যায়। তুরস্ক, পারস্য, আরবজাতির অতীত ব্যর্থতা ও গৌরবের ইতিহাস, বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস, বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার খ্যাতিমান মুসলিম মনীষীদের জীবনেতিহাস পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। ক্রুসেডের ইতিহাস ও পরিণাম নিয়ে পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ক্রুসেড যোদ্ধা সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবীর বীরত্বের পাশাপাশি ইমাম আল-গাজ্জালী, ইবনে সিনার বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ইতিহাস সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। পুরাতন ও নতুন সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশনার ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন সাহিত্য-পত্রিকার পাতায় তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উপস্থাপিত হতো।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় অটোমান সুলতান সুলায়মানের জীবন ও শাসনপর্বের দীর্ঘ বর্ণনা পরিবেশিত হয়। পাশ্চাত্যের কর্ডোভা, গ্রানাডা, প্রাচ্যের চট্টগ্রাম, মক্কা ও বাগদাদ নগরীর ইতিহাসের পাশাপাশি মোগল, 'খেলাফত' শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে চীনে ইসলাম প্রচারের ইতিবৃত্তও পত্রিকায় স্থান পায়। উপমহাদেশের মুসলিম ব্যক্তিত্ব নবাব আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ মোহসেন (দুদু মিঞা), চট্টগ্রামের গাজী বড় আদম লস্করের জীবন ও কর্মের পাশাপাশি ব্রিটেনগামী প্রথম বাঙালির ভ্রমণবৃত্তান্তও পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান মনীষীদের ঐতিহাসিক লেখার কিছু মূলানুগ অনুবাদও সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান পায়।

আঁধার যুগের আরব, বাবর ও খানজাদ, চীনে ইসলাম, যন্নুরয়েনের (হযরত ওসমান) শাহাদাৎ, আরবগণের বিজ্ঞানচর্চা, ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা, আল হামরা, বুইয়ব এর যুদ্ধ, ইসলাম ও তুর্কী জাতি, আল-ফারুক (হযরত ওমর ফারুকের জীবনী), মক্কা বৃত্তান্ত, ইসলাম গৌরব, খেলাফৎ বিবরণ, ভারতে মোসলেম নৌ-শক্তি, বোগদাদ নগরীর ধ্বংস সাধন, বঙ্গে আফগান পরিবার, কোম্পানীর আমল, যাদুঘর, মুসলমানের অবনতির কারণ, বিদ্যায় মুসলমানের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্য, ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী, খলিফাদের শাসনকালে ডাক প্রথা, বীজগণিতে মুসলমান, ইসলাম ও সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতা, ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ ইত্যাদি শিরোনামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বৈচিত্র্য ধর্মী অনেক প্রবন্ধ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। এছাড়া সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিভাষণগুলিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনেক তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটেছিল।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৫, জানুয়ারি ১৯১৯) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দীর্ঘ অভিভাষণ প্রকাশিত হয়। তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন উপলক্ষে ঐ অভিভাষণটি প্রদান করেন। তাঁর 'সুলিখিত দীর্ঘ অভিভাষণে' চট্টগ্রামের মুসলমান অধিবাসী, মুসলনমান রাজত্বে চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষার ব্যাকরণ বিধি, কাব্যরচনা, মুসলমান সাহিত্যের ভাষা ও গতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ইত্যাদি উপ-শিরোনামে উল্লেখিত হয়। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি অভিভাষণটি রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রামের গৌরবময় স্মৃতি, সাহিত্যের অতুলনীয় কবিত্ব সুধার কথা বলে 'ধনদৌলতে হীন হইয়াও ইসলামাবাদের ইসলাম-সন্তানগণ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত' মনে করে থাকে বলে উল্লেখ করেন। তিনি চট্টগ্রামের দুই কবি আলাউল (১৬০৭-১৬৭৩) ও নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন :

> একে নবীনচন্দ্রের কল্যাণে বাঙ্গালার সাহিত্য-রাজ্যে আমাদের চট্টগ্রাম বরেণ্য, অন্যদিকে আমাদের জাতীয় মহাকবি আলাওলের জন্মস্থান বলিয়া আমাদের এই ইসলামাবাদ বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যে চিরদিনের সর্বোচ্চ আসন পাইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।[১]

লেখক চট্টগ্রামকে 'ইসলামাবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন, এবং একে 'প্রকৃতির চির লীলানিকেতন' বলে অভিহিত করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভারতের মধ্যে চট্টগ্রামের সঙ্গে তুলনীয় স্থান কম আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। একে 'সৌন্দর্য্যের রানী' বললেও তার কিছুই বর্ণনা করা হয় না বলে লেখক মনে করেন। এই 'অনুপম সৌন্দর্য্যই' আবহমানকাল থেকে নানাদেশের যোগী ও দরবেশদের আকর্ষণ করেছিল। 'পরীর রাজ্য' বলে চিরদিন চট্টগ্রামের একটা খ্যাতি রয়েছে। তিনি আরো যোগ করেন :

> সাধনার এমন উপযোগী স্থান সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয়টি নাই। সৌন্দর্য্য-পিপাসুর সৌন্দর্য্য লিপ্সা মিটাইবার উপযুক্ত স্থান এই চট্টগ্রাম। ভাবুক জনের জন্যেও ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান জগতে দুর্লভ।[২]

তিনি আবেগের প্রাবল্যে 'কল্পনারাজ্য ভিন্ন বাস্তব জগতে এমন সুন্দর দেশ জগতে বড় বেশি মিলিবে কিনা', সন্দেহ করেন। অনন্ত সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রামের নদী-পাহাড় পরিবেষ্টিত অবস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লেখেন :

> উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে আরাকান সীমার নাফ নদী এবং বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের গিরিরাজি এবং পশ্চিমে বঙ্গসমুদ্র-এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ২৪৯৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগই আমাদের ইসলামাবাদ। নামে ইসলামাবাদ হইলেও ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এই চারি জাতির বসতি রহিয়াছে।[৩]

---

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'অভিভাষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ২৫৪

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

তখন চট্টগ্রামে প্রায় এগারো লক্ষ মুসলমানের পাশাপাশি প্রায় চার লক্ষ হিন্দু, সত্তর হাজার বৌদ্ধ, দেড় হাজার খ্রিষ্টান বসবাস করতো বলে লেখক উল্লেখ করেন। নামে 'ইসলামাবাদ' হলেও সব ধর্মের অনুসারীদের সহাবস্থান চট্টগ্রামে ছিল বলে লেখক গর্বের সঙ্গে ব্যক্ত করেন।[১]

আবদুল করিম (তখনো নামের সঙ্গে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধিটি যুক্ত হয়নি) 'চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ' শিরোনামে চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী ও চট্টগ্রামের নামের বিবর্তনের ইতিহাস মেলে ধরেন। বৌদ্ধরা যে এদেশের (চট্টগ্রামের) আদিম অধিবাসী তা তিনি শুরুতে বলেছেন। তবে এক সময়ে বৌদ্ধরা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছিল। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক চায়মিতা এসে তাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। হিন্দুদের মতো জাতিভেদপ্রথা না থাকায় এরা মুসলমানদের সঙ্গে অনেকটা খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক কীর্তি আজও দেশমধ্যে বিদ্যমান বলে লেখক উল্লেখ করেন।[২]

অপরদিকে হিন্দুদের কথা বলতে গিয়ে লেখক জানান, হিন্দুদের মধ্যে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-কায়স্থের সংখ্যাই ছিল অধিক। খ্রিষ্টানদের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, তাদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজারেই তাদের অধিকাংশের বসবাস, যারা আসলে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। পর্তুগীজরা এদেশে 'ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিত।[৩]

মুসলমানগণ হিন্দুদের অনেক আগেই এদেশে জলপথে এসে উপস্থিত হন। এজন্য চট্টগ্রামকে 'প্রসিদ্ধ আরব জাতীয় বণিকদিগের উপনিবেশ' বলে অনুমান করা হয়ে থাকে বলে লেখক জানান। এইভাবে চট্টগ্রাম হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান – পৃথিবীর এই চারটি প্রধান ধর্ম-শক্তি ও সভ্যতার মিলন-স্থল হয়ে ইংরেজ আমলের বহু পূর্ব থেকেই উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হয়ে আছে।[৪]

ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামের আদি নাম ছিল 'ইসলামাবাদ'। চট্টগ্রামের আরো অনেক নাম বিভিন্ন সময়ে যে প্রচলিত ছিল, তা এই প্রবন্ধ পাঠেও জানা যায়। 'পুষ্পপুর', 'শহরে সব্‌জ', 'কর্ণবুল', 'রোখাম', 'রামেস', 'সতের কাওন', 'চাটিগ্রাম', 'চাটিগাও', 'ফতেহাবাদ' ইত্যাদি নামে চট্টগ্রামের পরিচয় ছিল বলে আমরা জানতে পারি।[৫]

অতি প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ কর্নেল উইলফোর্ডের মতে, কমলাঙ্গ (কুমিল্লা), বর্ম্মনক (আরাকান) এবং চট্টগ্রাম এই তিনটি এলাকা বা পুর থেকেই 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি হয়েছে।[৬]

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৫ প্রাগুক্ত
৬ প্রাগুক্ত

চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসনকর্তা মোহম্মদ রেজা খাঁর ভাই হাকিম মোহাম্মদ হোসেন খাঁ আলবী চট্টগ্রাম ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর 'মখজনল আদবীয়া' নামক বইয়ে লিখেছেন যে, চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম 'শহরে সব্‌জ' বা সবুজ শহর। তিনি বলেন, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ ও শস্যশ্যামল বলে এর এরূপ নামকরণ হয়েছিল। আরব দেশী ভূগোলবিদ আল-এদ্রিসী (১১০০-১১৬৫) ১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের 'কর্ণফুল' নাম ছিল বলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ধারণা করা হয়, 'কর্ণফুলী' নদীর নামকেই তিনি ভুল করে শহরের নাম মনে করেছিলেন।[১]

প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। এই কারণেই একে 'রোসাং' বা 'রোখান' বলা হয়েছে। চট্টগ্রামে 'চাটি' অর্থ আলোকবর্তিকা। একটি চাটির সাহায্যে ঐ স্থান সর্বপ্রথম মানুষের বসবাস উপযোগী হয়েছিল বলে এর নাম 'চাটগাও' হয়েছে।[২]

প্রবাদ আছে, খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা বাংলাদেশ আক্রমণ করে বর্তমান চট্টগ্রামে এক 'জয়স্তম্ভ' স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভে 'চিৎ-ত-গৌ' অর্থাৎ 'যুদ্ধ করা অন্যায়' এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ ছিল। সেই শব্দ থেকেই সম্ভবত চট্টগ্রাম বা চিটাগাং নামের উৎপত্তি হয়ে থাকবে।[৩]

রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর (১৮৪৯-১৯১৭) পালি সাহিত্য থেকে আবিষ্কার করেছেন যে, বৌদ্ধ যুগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল। তখন চট্টগ্রাম 'রম্যস্থান' (পালিভাষায় 'রম্যা') নামে অভিহিত হতো। বর্তমানে ক্ষুদ্র রামু থানায় তৎকালীন বৌদ্ধ গৌরবের শেষ চিহ্নস্বরূপ রয়েছে।[৪]

১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ আরবীয় পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮) চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। তিনি আরবি ভাষায় তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'রেহলা'য় চট্টগ্রামকে 'সতের কাওন' বলে উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রকূলে গড়ে ওঠা বিশাল শহর এটি।[৫]

কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন কালে চট্টগ্রামের রাজপথ এলাকায় একটি ক্ষুদ্র 'চাটি' (বস্তি বা গ্রাম) মাত্র ছিল। তা থেকেই 'চাটিগ্রাম' হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, চট্ট ভট্ট জাতি চট্টগ্রামের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। এজন্য হিন্দুগণ একে চট্টগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। এখনও চট্টগ্রামে অনেক ভট্টের বাস আছে। তারাই এদেশের প্রাচীন কবি বলে কথিত।[৬]

পর্তুগিজরা পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁওকে Porto Piqueno (ক্ষুদ্র বন্দর) এবং এই চট্টগ্রামকে বৃহৎ বন্দর নামে অভিহিত করত। পর্তুগিজ লেখক ডি বেরোস, ফেবিয়া-ই-সুজা, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিজ নিজ গ্রন্থে 'চাটিগাঁও' নাম নিবন্ধ করে গেছেন। আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) রাজস্বসচিব তোডরমলের (১৫০০-১৫৮৯) রাজস্বের হিসাবে 'সরকারে চটগ্রাম' এর উল্লেখ রয়েছে।[৭]

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০
৬ প্রাগুক্ত
৭ প্রাগুক্ত

চট্টগ্রামের ‘ইসলামাবাদ’ নামকরণ নিয়ে দুরকম মত প্রচলিত আছে। তবে মুসলমান শাসনামলে যে এ-নামকরণ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। নবাব ইসলাম খাঁ (১৫৭০-১৬১৩) মগ ও পর্তুগিজদের অত্যাচার নিবারণ করতে চট্টগ্রাম জয় করে নিজের নামে এর ইসলামাবাদ নামকরণ করেছেন বলে প্রচলন থাকলেও আজকাল এই মত গ্রহণ করতে প্রায় কেউই সম্মত নন। নবাব শায়েস্তা খাঁর (বাংলায় শাসনকাল ১৬৬৬ খ্রি.-১৬৮৯ খ্রি.) পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ-ই (চট্টগ্রামের শাসক ১৬৬৬ খ্রি.) চট্টগ্রাম জয় করে মগ ও পর্তুগিজদের অত্যাচার থেকে এই অঞ্চল নিরাপদ করেন। তিনি ‘চাঁটগ্রাম’ নাম পরিবর্তন করে এর ‘ইসলামাবাদ’ (Residence of the Faithful) নাম প্রচার ও একে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি এখন সর্ববাদিসম্মত সত্য হিসেবে বিবেচিত। ইংরেজ আমলে অনেককাল পর্যন্ত সরকারি দফতরে ‘ইসলামাবাদ’ নাম ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে আবার ‘চাটিগ্রাম’ থেকে ‘চট্টগ্রাম’ এবং তারপরে ইংরেজি সংস্করণে ‘বিলাতী রং’ ফলাতে গিয়ে ‘চিটাগাং’ রূপ অদ্ভুত নামের সৃষ্টি হয় বলে লেখক জানান।[১] বর্তমান বাংলাদেশে চিটাগাং (Chittagong) শব্দটির বিলোপ সাধন করে ইংরেজিতেও মূল বাংলা শব্দের (Chottogram) প্রচলন করা হয়েছে।

লেখক ‘সাতগাও’ শব্দটি ইবনে বতুতার আরবীয় উচ্চারণে ‘সতের কাওন’ নামটি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। চট্টগ্রামের একটি প্রধান স্থান ‘সাতকানিয়া’ নামে পরিচিত। লেখক বলেছেন ‘সাতগাও’কে ‘সাতকাওন’ ও পরে তা থেকে ‘সাতকানিয়া’য় রূপান্তর ঘটতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এককালে ‘সপ্তগ্রাম’ প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পূর্ববঙ্গের ‘সাতগ্রাম’ উক্ত ‘সপ্তগ্রামে’র সাথে প্রতিযোগিতা করত। এটিও বোধহয় ‘চাটিগাঁও’ নামে অভিহিত হওয়ার অন্যতম কারণ। নামকরণ বিষয়ে সবশেষে লেখক বলেছেন:

> চট্টগ্রামের লোকদের শব্দ বিকৃতকরণ-পটুতার কথা স্মরণ করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে ‘সাতগাও’ শব্দটিই তাহাদের কৃপায় ‘চাটগাঁও’ হইয়া গিয়াছে।[২]

‘চট্টগ্রামে’র নামের মতো বিবর্তন (সংখ্যার দিক থেকে) অন্য কোনো এলাকার ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না বলে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করেন।

বাণিজ্যিক পরিচিতিতে চট্টগ্রামের খ্যাতি রয়েছে দীর্ঘকাল পরিক্রমায়। চট্টগ্রামের বাণিজ্য খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে আরবগণ স্মরণাতীত কাল থেকেই এর সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দলে দলে এদেশে উপনিবিষ্ট হন। বাণিজ্যক্ষেত্রে তখন এর এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল যে, ইতিহাস বিখ্যাত তাম্রলিপি ও সপ্তগ্রামের সাথে এর ঘোর প্রতিযোগিতা চলত বলে লেখক উল্লেখ করেন। চট্টগ্রামের বাণিজ্য খ্যাতি অত্র অঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।[৩]

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ বণিকরা এসে এদেশে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা সপ্তগ্রামকে Porto Piqulno বা ক্ষুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রামকে Porto Grando বা বৃহৎ বন্দর নামে অভিহিত

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

করতেন। বাণিজ্যের দিক থেকে এটি যে তখন সপ্তগ্রামের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বিখ্যাত তিব্বতী পর্যটক রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) লিখেছেন, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে এই দেশের নাম সপ্তগ্রামের নামের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এই দেশের এক নাম 'রম্যা' বা 'রম্যভূমি' এবং অপর নাম 'পণ্ডিত বিহার'। তিব্বতীয়রা 'পণ্ডিত বিহার' থেকেই 'উষ্ণীষের গঠনপ্রণালী' শিক্ষা করেছিলেন। এই দেশের বাণিজ্যসমৃদ্ধি ইংরেজদেরকেও আকৃষ্ট করেছিল। ওলন্দাজ কর্তৃক চাচুড়া থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ক্রমাগত হুগলি বালেশ্বর ও হিজলি বন্দরের উপযোগিতা পরীক্ষার পর ইংরেজ কোম্পানি অবশেষে এই চট্টগ্রামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলে মনোনীত করেছিলেন। এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের মর্যাদা 'রাজধানী' হতে পারতো বলে উল্লেখ করে লেখক বলেন :

> সেকালের মুসলমান নওয়াব ইংরেজদের তৎকালীন চট্টগ্রাম বিজয় বাসনার মূলে কুঠাবাঘাত করিতে না পারিলে সম্ভবত আমাদের এই চট্টগ্রামই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া পড়িত।[১]

ইংরেজ রাজত্বে ভারতে বাণিজ্যের দশা অন্যান্য স্থান যেরূপ হয়েছে এদেশেও তার কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। 'অর্ণবপোত' ও 'বাষ্পীয় শকট' এসে এখন দেশীয় লোকের হাত থেকে সমস্ত বাণিজ্য কেড়ে নিয়েছে। সেই হিসেবে বলতে গেলে চট্টগ্রামের মুসলমানগণ বর্তমানে বাণিজ্য ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হবে। চট্টগ্রামের 'পাল তোলা মাহাত্ম্য তরণী'র বাণিজ্য বিলোপই এরূপ হওয়ার একটি কারণ তাতে আর সন্দেহ নেই বলে লেখক নিশ্চিত করেন। লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় বলেছেন :

> যে বাণিজ্যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া কেবল মুসলমানেরই একচেটিয়া ব্যাপার ছিল তাহা এখন ধীরে ধীরে অন্য জাতির হস্তগত হইতেছে। যে দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যবসায়ী বিরল পরিদৃষ্ট হইত আজ সে দেশে ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায়ীর দল বৃদ্ধি হইতেছে।[২]

চট্টগ্রাম এমন একটি অঞ্চল যেটি পাহাড়-পর্বতময় এলাকা হলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী থাকার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো কৃষিরও বিস্তর সুবিধা রয়েছে। দক্ষিণে শঙ্খ ও মাতামুহুরী আর সম্মুখবর্তী কর্ণফুলী নদী পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম মুখে গিয়ে অনন্তবিস্তার বঙ্গোপসাগরের বারিরাশির সাথে একাত্ম হয়েছে। এই নদী তিনটিই চট্টগ্রামের প্রায় সমগ্র সমতল ভূভাগকে সরসতা ও সজীবতা প্রদান করে একে শস্য-শ্যামল ও সুজলা-সুফলা করে রেখেছে।

খ্রিস্টীয় ষোলো ও সতেরো শতকে সন্দীপের উপর দিয়ে অনেক ভীষণ রণরঙ্গ ঘটে গিয়েছে। ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু রাজা কেদার রায় (১৫৬১-১৬০৩) সন্দীপ আক্রমণ করে মগ ও পর্তুগিজগণকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে সন্দীপ অধিকার করেন, এর অল্পকাল পরেই মানসিংহের সাথে যুদ্ধে পরলোক গমন করেন।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত

৩ কমল চৌধুরী সংগৃহীত সম্পাদিত, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৪৩

সন্দ্বীপ অধিকারের লড়াই-পাল্টা লড়াই চলে এর প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক আকর্ষণের জন্য। সন্দীপকে 'ব্যাবিলোনের শূন্যোদ্যানের মত এক ভাসমান উদ্যান বলে প্রতীয়মান' হয়। যাই হোক সন্দ্বীপ ছাড়াও পুরো চট্টগ্রামে বৃহৎ নদীর পাশাপাশি অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত রয়েছে। এই ছোট বড় নদীসমূহ চট্টগ্রামে সারাবছর কৃষিকাজের পানির যোগান দিয়ে থাকে। এইসব নদীর ওপর দিয়ে স্বদেশীয় জলযান দিয়ে যেখানে সেখানে অনায়াসে যাতায়াত করা যা। বহির্বাণিজ্যের স্রোত রূদ্ধ হলে স্থানীয় কৃষিজাত ফলশস্যে পরের মুখাপেক্ষি না হয়ে স্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব।

চট্টগ্রামের লবণ শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। পূর্বকালে চট্টগ্রামে পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের লোনাজল থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হতো। চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষে ঐ লবণই যথেষ্ট ছিল। তখন নুনছাইও ব্যবহার হতো। এখনও আনোয়ারা থানা এলাকায় 'নুন্যাপাড়া' আছে।[১] সমুদ্র উপকূলে এক সময়ে লবণ প্রস্তুতের বিস্তৃত কারখানা বিদ্যমান ছিল। সেইসব কারখানা তখন অনায়াসে সমগ্র বঙ্গে লবণ যোগাতে পারত। লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কবি নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) উক্তি উদ্ধৃত করে লেখেন :

> লবনাম্বু রাশি বেষ্টিত যে মৃল
> জন্মে লিবারপুলে লবণ তাহার।[২]

নবীনচন্দ্র সেনের এই উক্তির মধ্যে আক্ষেপ লক্ষ করা যায়।

পুরাকালে চট্টগ্রামে যথেষ্ট কাগজ প্রস্তুত হতো। তখনকার দিনে সমস্ত লেখাপড়ার কাজ ঐ সকল কাগজ দ্বারাই নিষ্পন্ন হতো। চট্টগ্রামের হলদে কাগজ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং তা খুব শক্তও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পুরনো পুথিপত্র ও সর্বোপরি অফিসের আগেকার সমস্ত নথিপত্র এই হলদে কাগজেই লিখিত হতো। সেই সকল নথিপত্রের অনেক এত বৎসর পরেও এখনো নতুনের মত রয়েছে। পটিয়ায় কাগজের অন্যতম স্থান হওয়ার কারণে তাকে কাগজিপাড়া নামে অভিহিত করা হয়। লেখক আবদুল করিম *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লিখেছেন :

> আমাদের পটিয়ায়-এই অভাজনের বাড়ীর পার্শ্বেই সেই কাগজীপাড়া। এখন শ্মশানের দগ্ধ বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের মত দাঁড়াইয়া আছে। সে দেশের কাগজে দেশের সমস্ত কাজ চলিত। তখন সরকারী দফতরে পর্যন্ত সেই কাগজই ব্যবহৃত হইত। ঢেঁকিযন্ত্রে রাত্রে শন পাট ছেঁচিবার ধুমধুম শব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত, ইহা বড় বেশিদিনের কথা নহে।[৩]

তখনকার সময়ে আমান আলী চৌধূরী নামে জনৈক ব্যক্তি এ কাগজের ব্যবসায় করে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেন। কিছু বিশেষ কাগজ ফরমায়েস মতো তৈরি করে দেয়ার মতো লোক বিদ্যমান আছে বলে লেখক জানান। এই সকল কাগজ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ু সহ্য করে চার-পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত টিকতে পারতো। এরূপ কাগজ সাধারণত 'হরিতালী কাগজ' নামে পরিচিত। এই 'হরিতালী কাগজে' লিখিত অসংখ্য প্রাচীন পুথি প্রদর্শনী গৃহে দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ কাগজে লিখিত হয়েছিল বলেই যুগযুগান্তরের পূর্ববর্তী এই সকল অমূল্য সম্পদ আজ আমাদের হস্তগত হতে পেরেছে বলে

---

১ প্রাগুক্ত
২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৩ প্রাগুক্ত

লেখক মনে করেন। লেখকের কথায় 'কত যুগযুগান্ত পূর্বের কাগজ, অথচ সর্বভূক কীটরাজ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।'

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন যে চট্টগ্রামের 'যোগী জেলারা' লজ্জা নিবারণের উপযোগী পরিধেয় প্রস্তুত করতে এখনও সম্পূর্ণ সমর্থ। তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয় :

> চট্টগ্রামের কাপড়ের মহাজন কয়েকঘর আছেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই বিশেষ ধনী নাই। সংবাদ প্রভাকর ২০ ফাল্গুন ১২৬১ বঙ্গাব্দ (১৮৪৪ খ্রি.)[১]

এছাড়া চট্টগ্রামের চতুর্দিকে গভীর অরণ্য থাকার ফলে গৃহনির্মাণের উপযোগী বাঁশ বেত ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি রান্নার উপযোগী কাঠদ্রব্য সর্বদাই পাওয়া যায়। তাই বলা যায় নিত্যব্যবহার্য কোনো দ্রব্যের জন্যই চট্টগ্রামবাসীর পরের মুখের দিক তাকাতে হয় না।

চট্টগ্রামে পূর্ব থেকেই খনন করা প্রচুর পুকুর ও দীঘি বিদ্যমান থাকায় পানীয় জলের জন্য অন্য অঞ্চলের মুখাপেক্ষি হওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'পূন্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষের খনিত 'দিঘী ও পুষ্করিণী' বাংলার আর কোনো এলাকায় আছে কী-না সন্দেহ' বলে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে বাংলাদেশের বরিশালকে আমরা 'নদীনালার দেশ' হিসেবে জানি আর পুরো বাংলাদেশই তো 'নদীমাতৃক' দেশ বলা হয়। চট্টগ্রামের প্রাচীন সুখ সম্পদ ও এই দিঘী পুষ্করিণীর কথা বিবেচনা করতে গেলে প্রাচীন কবি শেখ ফয়েজুল্লা 'গোরঙ্গ বিজয়' এ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা স্মরণ করা যায় বলে লেখকের অভিমত :

> নাথে বোলে এই রাজ্য বড় হএ ভালা।
> চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলাঃ
> লোকের পিঁধন দেখে পাটের পাছড়া।
> প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়াঃ
> কার পখরির পানি কেহ, নাহি খাএ।
> মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেত শুকাএঃ
> ধন্য ধন্য রাজ নগর করি এ বাখানি
> সুবর্ণের কলসে সর্ব্ব লোকে খাএ পানি।[২]

এই কথাগুলি 'আমাদের এই ধন্য দেশকে' তথা চট্টগ্রামকে লক্ষ করেই লিখে গেছেন বলে লেখক মনে করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজ শুধু সেই দিঘী আর পুকুর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ পড়ে রয়েছে বলে লেখক বলেন। লেখক আবেগমথিত ভাষায় বলেন :

> কোথা হইতে কালের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া সুখ সম্পদের সঙ্গে আমাদের সেই সোনার কলস ও মণি মাণিক্যও উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।[৩]

---

১ কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
৩ প্রাগুক্ত

সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য নৌযান অপরিহার্য একটি বাহন। চট্টগ্রাম অঞ্চল সামুদ্রিক বাণিজ্যে অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। বাণিজ্য তরণীর জন্য চট্টগ্রামকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হতো না। চট্টগ্রামে প্রায় সমস্ত জাহাজ নির্মিত হতো বলে লেখক দাবি করেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী চৈনিক পরিব্রাজক মা-হুয়ান (১৩৮০-১৪৫১) লিখে গেছেন, এই দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে মহামান্য রোমের সম্রাট আলেকজান্দ্রিয়ার ডক কারখানা ও জাহাজ পছন্দ না হওয়ায় এই চট্টগ্রাম থেকেই জাহাজ তৈরি করে নিতেন। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ দিকস্থ হালি শহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে এদেশীয় শিল্পীর কর্তৃত্বে অনেকগুলি জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। এইসব কারখানার যান্ত্রিক আওয়াজে অহর্নিশ মুখরিত থাকতো। স্থাপত্য বিদ্যায় বর্ণজ্ঞান-শূন্য অশিক্ষিত কারিগরেরা নিজ যোগ্যতায় অর্জিত বুদ্ধিতে যে প্রকাণ্ড জাহাজ নির্মাণ করত এবং এখনও করে থাকে, তা দেখলে বিষ্ময়ের সীমা থাকে না। তখন এক একজন সওদাগর শতাধিক জাহাজের মালিক ছিলেন। হান্টার (১৮৪০-১৯০০) সাহেব লিখেছেন, এইসব জাহাজ নির্মানের কারখানা ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছিল। লেখক আবদুল করিম সে সময়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> বর্তমান ইয়োরোপীয় মহাসমরের গতিকে বিলাতী আগ্নেয় তরণীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় সম্প্রতি আমাদের এই গৌরবকর শিল্পটি নির্ব্বানোম্মুখ প্রদীপ শিখার মত উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। জানি না ইহা জন্মের মত শেষ উজ্জ্বল্য কি না।[১]

লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বিলেতি জাহাজ পঙ্গপালের মতো দেশ ছেয়ে ফেলবে। তাহলে এটি একটি অতীত স্মৃতিবাহী কিংবদন্তী ও স্বপ্নকাহিনিতে পরিণত হয়ে যাবে।

সমকালে এখানকার আবদুর রহমান দোভাষ সাহেব কয়েকখানি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করিয়ে পালতোলা জাহাজের নির্মাণ কৌশল দেখাবার সুযোগ দিয়েছেন বলে লেখক জানান। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই কর্ণফুলী নদীবক্ষে সকল জাহাজ 'শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসীর ন্যায়' ভাসমান থেকে অপূর্ব শোভা বিস্তার করতো। চট্টগ্রামের কবি নবীনচন্দ্র সেন একসময় মনের আবেগে যা গেয়েছিলেন,লেখক উদ্ধৃত করেন:

> পল্লব বিহীন একটি কানন
> সিন্ধু বক্ষে যেন ভাসিছে, মরি।[২]

লেখক বলছেন, আপনারা এখন কর্ণফুলীর বক্ষে সেই পল্লব-বিহীন কানন আর দেখবেন না,কিন্তু জাহাজ-মাস্তুলের দুই-চারিটি পল্লববিহীন বৃক্ষমাত্র দেখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেতে পারেন।

বাঙালির উদ্ভাবনী শক্তি ও বাহুবলের পরিচায়ক অনেক কীর্তি দেশ থেকে একে একে লোপ পেয়েছে। 'ইউরোপীয় তরণীর' জন্য এদেশের শেষ কীর্তিটুকু একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সমুদ্রাভিযানে এদেশের মুসলমানগণ চিরাভ্যস্ত বলে লেখক জানাচ্ছেন, বিলেতি জাহাজের লস্কর ও খালাসিদের অধিকাংশ লোকই এই দেশীয়। এখানকার লোকদের মধ্যে এমনও আছে যারা জলপথে মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, চীনদেশ, ব্রহ্মদেশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান, জাভা, সুমাত্রা এমন কি সুদূর মিসর পর্যন্ত তখন চট্টগ্রামের অনেকে যাতায়াত করতো। তখন ঐ সব দেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের বাণিজ্য

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫
২ প্রাগুক্ত

সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য চীন সম্রাট ১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গহো নামক এক রাজদূতকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, তিনি এই নগরেই অবস্থান করতেন।

ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খ্রি.) ১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মালাকার উপকূল থেকে মালদ্বীপে হয়ে চট্টগ্রামে উপনীত হন এবং এই দেশের জাহাজে চড়ে জাভা দ্বীপ হয়ে চীনদেশে গমণ করেন। এই সময় মাহুন্দ নামক আর একজন চীনদেশীয় ভ্রমণকারী এদেশ পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন চট্টগ্রাম তাম্রলিপ্তকে অতিক্রম করে চীন এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এইসব স্থানের সঙ্গে চট্টগ্রামের তখন একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল। নৌবিদ্যা বিশারদ অনেক কাপ্তান, মালুম ও নাবিক এদেশে জন্মেছিলেন। সেই বিদ্যার জোরে তাঁরা মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা অগ্রাহ্য করে অবলীলাক্রমে তরণী বেয়ে চলতেন। সেদিন আর ফিরে আসবে না বলে লেখক আফসোস করে বলেন :

> কিন্তু হায়। এখন আমাদের তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ আমাদের এই পালতোলা বাণিজ্যতরণীও নাই, সেই কাপ্তান মালুমও নাই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাত্র এখন আমাদের সেই পূর্ব্বখ্যাতি বিরাজিত, বাস্তব রাজ্যে তাহা নৈশ স্বপ্নবৎ অলীক।[১]

চট্টগ্রামে চারটি মহাধর্মশক্তি সম্মিলিত হয়ে আছে। এই অঞ্চল হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এই তিন মহাজাতিরই একটা পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড তীর্থের কথা উল্লেখ করা যায়। শিবতুর্দ্দশীর সময় এখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দু নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। এই শহরের উত্তরাংশে হিন্দু পুরাণের 'চট্টেশ্বরী পীঠ' অবস্থিত। মহেষখালী দ্বীপের আদিনাথও হিন্দুর একটি পবিত্র তীর্থ স্থল।

বৌদ্ধধর্ম মগধ হতে বিতাড়িত হয়ে চট্টগ্রামেরই ছায়া-স্নিগ্ধ বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এজন্য ইহা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী মাত্রেরই পরম শদ্ধেয় ও পূজনীয়। এই চট্টগ্রাম ও লঙ্কাদ্বীপই বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধধর্মের ও পালিভাষা শিক্ষার সর্বপ্রধান স্থান। মহামুনি ও ডোগরমুনি নামক স্থানদ্বয়ে প্রতি বৎসর হাজার হাজার বৌদ্ধ নরনারী সমবেত হয়ে তাদের আরাধ্য মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের অর্চণা করে কৃতার্থ হয়ে থাকে বলে লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

চট্টগ্রাম একসময় 'ইসলামাবাদ' নামে খ্যতিমান ছিল। ইতিহাস 'Residence of the Faithful' বা 'ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানদিগের আবাসস্থান'-এই অর্থেই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই ধর্মভাব-শৈথিল্যের দিনেও চট্টগ্রামবাসী ইসলাম-ধর্মানুসারীদের ধর্মপ্রাণতা দেখলে 'ইসলামাবাদ' নাম সার্থক হয়েছিল বলেই ধারণা করা যায় বলে লেখকের অভিমত। তথ্যাপিও সবধর্মের সহাবস্থানের কথা বলতে গিয়ে লেখক অতঃপর বলছেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

> আমরা যখন স্বরণ করি যে, ইসলামাবাদ পার হইয়া গেলে সম্মুখস্থিত আগন্তুক ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলমান, তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, তখন স্বদেশের এই গৌরবাত্মক নাম ধারণের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বদেশভক্ত সন্তানের প্রাণ আনন্দোচ্ছাসে আপনি নৃত্য করিয়া উঠে।[১]

তাই বলা যায় হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব চট্টগ্রামে আজও সম্পূর্ণ বজায় আছে বলে লেখকের বিশ্বাস।

এক গ্রাম পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে, 'এক পুকুরের জল খেয়ে' হিন্দু মুসলমান দুটি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকেই স্ব স্ব ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে পরম প্রীতিতে বসবাস করে আসছে। তৎকালে জাতিধর্ম নিয়ে এ পর্যন্ত চট্টগ্রামে তেমন একটা অপ্রীতিকর হয়নি, এটা চট্টগ্রামের একটা বড় গুণ বলে লেখক মনে করেন। ইসলামের প্রকৃত মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য চট্টগ্রামে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট আছে বলে লেখকের বিশ্বাস। ইসলাম সাম্যের ধর্ম বিধায় 'পরধর্ম্ম-দ্রোহী' হলে ইসলামের তৎকালীন 'সার্বভৌমিক ও সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির মুখে' অন্যান্য ধর্মের কি পরিণাম ঘটত, তা অনুমান করার বিষয় বলে লেখক মনে করেন। তাই 'ইসলামাবাদে ইসলামের গৌরব যতটা অক্ষুণ্ন অবস্থায় বিদ্যমান, অন্ততঃ বঙ্গের আর কোথাও এতটা আছে কিনা' বলে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

চট্টগ্রামকে 'বারো আউলিয়ার দেশ' বলা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁরা চট্টগ্রামে এসে সাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দরগা বিদ্যমান থাকায় এখনও তাঁদের বহু পুণ্য স্মৃতি বহন করছে। এই শহরের বুকে এবং এই সভামণ্ডপের (৩য় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান) অনতিদূরেই সুবিখ্যাত পীর বদর সাহেবের দরগাহ বর্তমান। এর অতি নিকটে অপর মহাতাপস হজরত আমানত শাহের দরগাহ অবস্থিত। এঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট সমানভাবে সম্মানিত। লেখক মহাত্মা বদর সাহেবের আগমনের কাহিনি জানাতে গিয়ে বলেন :

> মহাত্মা বদর সাহেব যেই বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহা এখন কর্ণফুলী নদী কর্তৃক 'পাথরঘাটা' নামক পল্লীর নিম্নস্তরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। এই শহরে এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ফকির দরবেশের দরগাহ ও তাকিয়া বিদ্যমান থাকিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া লোক হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।[২]

চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহকে লেখক 'সাধন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক কীর্তিস্তম্ভ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই তাপস-প্রবরের ধর্মদ্যুতিতে ইসলামাবাদ বিভাসিত বলে লেখক বলেন। এর সামান্য দূরে তাপস শেখ ফরিদের 'অশ্রু-প্রবাহ প্রস্রবণ-মূর্তি' বিরাজ করছে। লেখক এ ব্যাপারে প্রচলিত জনমতকে প্রকাশ করেন এভাবে :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
২ প্রাগুক্ত

> শেখ ফরিদ পদদ্বয় বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয় অহর্নিশ নিম্নমুখে লম্বমান হইয়া ঈশ-প্রেমে নয়নের নীরপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেন। তাহাতেই এই পুণ্য প্রস্রবণের উৎপত্তি। উহা 'শেখ ফরিদের চশমা নামে খ্যাত। লোকের বিশ্বাস, উহার পবিত্র জলপানে নান উৎকট রোগ আরোগ হইয়া থাকে।[১]

চট্টগ্রাম শহরের উত্তরাংশে বিখ্যাত কাতাল পীরের দরগাহ অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে 'কাতালগঞ্জ' নামটি প্রচলিত হয়ে আছে। এছাড়াও শহরের বুকে আরো ১০/১২ জন দরবেশের দরগাহ বা তাকিয়া দেখতে পাওয়া যায়। আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী মৌজায় বিখ্যাত শাহ মোহসেন আউলিয়ার দরগাহ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন লেখক। এত এক প্রকান্ড পাথরে আরবি অক্ষরে কিছু লেখা দেখা যায়, যদিও তার পাঠোদ্ধার করার সুযোগ তখন পর্যন্ত ছিল না। ধারণা করা যায়, ওটা অলৌকিক কিছুর নিদর্শন হতে পারে। লেখক অতঃপর বলছেন :

> কথিত আছে, ঐ প্রস্তরে বসিয়া শাহ সাহেব ভাসিতে ভাসিতে গৌড় হইতে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। পাথর কি করিয়া ভাসে অথবা এত বড় পাথর সেকালে কিরূপে এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইত, তাহা ভাবিতে বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়।[২]

এমনিভাবে শহরের আশেপাশে ও দূর মফস্বলে এরূপ কত দরবেশের দরগাহ অবস্থিত থাকিয়া ওগুলির অলৌকিক সাধন-মাহাত্ম্যের পরিচয় দিচ্ছে, তার সবগুলির নামোল্লেখ করতে গেলে সাধারনের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে লেখক বলেছেন। এসকল তাপস ও আউলিয়াগণ চট্টগ্রামের গৌরব বলে লেখক মনে করেন। তাঁরাই ইসলামের ভাস্বর-জ্যোতি, উজ্জ্বলতর জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছেন। এ বিষয়ে লেখক সবশেষে বলছেন :

> তাঁহাদের সাধনা-সিদ্ধ-দেহ-বিচ্ছুরিত অপূর্ব্ব জ্যোতিতেই ইসলাম ধর্ম্ম এখানে এতটা উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বিভাসিত, আর তাহারই নিবিড় শান্তি-শীতল ছায়াতলে বসিয়া প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দেশে আমরা ১১ লক্ষ ইসলাম সন্তান।[৩]

বাণিজ্য উপলক্ষে আরব বণিকদের দলে দলে চট্টগ্রামে আগমন ঘটত প্রাচীন কাল। চট্টগ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে এদেশেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এতে আরবি ভাষার শব্দরাজির যতটা বেশি প্রয়োগ রয়েছে, আর কোনো ভাষার শব্দ সমূহের ততটা নেই। আরবদের সহিত বিশেষ সদ্ভাব না থাকলে এবং আরবরা পূর্বপুরুষ না হলে এদেশের ভাষায় এত অধিক পরিমাণ আরবি শব্দ কখনোই প্রবেশ করার কথা নয় বলে লেখক মনে করেন। এসব বিবেচনা করে সহজেই বোঝা যায় যে, চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আরবদের বংশধর বলে নির্ধারণ করা যেতে পারে। আরবদের মধ্যে 'শেখ' উপাধির ব্যবহার খুবই বেশি, চট্টগ্রামে উক্ত উপাধিধারী লোকের সংখ্যাধিক্য দেখে সহজেই তাদেরকে আরব শেখদের 'ঔরসজাত বলিয়া বিনিশ্চিত' করা যায় বলে লেখক মনে কনে।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত

চট্টগ্রামের বহু স্থানে সৈয়দ বংশ বিদ্যমান। তাঁরা এদেশে পির বা দীক্ষাগুরুর আসনে উপবিষ্ট আছেন। আরবগণ এদেশে আসার সময় তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এত সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই বলে লেখক নিশ্চিত করেন। চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোক আরবদিগের রক্তজাত না হলে এখানে এতটা ইসলাম প্রভাব কখনোই থাকতে পারতো না, একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে। চট্টগ্রাম পর্দা প্রথার কঠোরতাও আরবদের সংস্রাবের ফল বলেই মনে হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম। আরবরা বাণিজ্যর প্রসারের পাশাপাশি নৌ বিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়। চট্টগ্রামের খালাসি ও লস্করদের নৌচালন বিদ্যার দক্ষতার কথা বেশ প্রচলিত ছিল। চট্টগ্রামের বহুলোক বিলেতি জাহাজে সারেং, টেন্ডল, মালুম ও লস্করের কাজ করে থাকে। আরবদের সংস্রবে এবং তাদের নিকট থেকেই চট্টগ্রামবাসীগণ জাহাজ নির্মাণ ও নৌবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় বলে লেখক অনুমান করেন।

ঔপনিবেশিক আমল থেকই চট্টগ্রামে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু জনগোষ্ঠীর থেকে অধিক ছিল। এর কারণ হতে পারে, আরব বণিকেরা শুধু বাণিজ্য কাজেই লিপ্ত ছিলেন না, তারা দেশে বিদেশে ধর্ম প্রচারও করতেন এবং প্রচারকও পাঠতেন। বাগদাদের খলিফারা দেশ বিজয়ের জন্য যেমন সেনাদল প্রেরণ করতেন, ধর্ম প্রচারের জন্য তেমনি ধর্ম প্রচারকও পাঠাতেন। চট্টগ্রামে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলে মনে হয়। বলা যায়, চট্টগ্রামে শেখ ও সৈয়দ ব্যতীত পাঠান ও মোগল বংশীয় মুসলমানও ছিল। হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে লেখক বলেন :

> কেবল জোর জবরদস্তিতে কোন ধর্ম্ম এতটা প্রসার লাভ করিতে পারে না। মুষ্টিমেয় ইসলাম সন্তানগণ কেবল জোর করিয়া পৃথিবীময় তাঁহাদের ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা অর্ব্বাচীনের উক্তি, ইহা মুর্খের কল্পনামাত্র। জোর করিয়া বরং রাজ্য বিস্তার করা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম বিস্তার করা যাইতে পারে না। মুসলমানগণও তাহাই করিয়াছিলেন।[১]

কথাটি অনেকাংশে যথার্থ বলেই বলে হয়। কারণ, ইসলামের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে অধিকাংশ অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন বলে ধারনা করা যেতে পারে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে আরবদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে এদেশে ইসলামের অনেক প্রাবল্য ছিল বলে মনে করা হয়। এ কারণে আরবি এবং ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ চিরদিনই খুব বেশী বলে ধারণা করা যায়। শহরে ও গ্রামে বহু মাদ্রাসা মক্তব ইসলামি ভাষায় শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত রয়েছে। নিজ নিজ পুত্র-কন্যাকে অন্ততপক্ষে কোরান, দোয়া, কলেমা, নামাজ শিক্ষা দেয়ার জন্য অধিকাংশ পিতামাতারই আকুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য দেখা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে মওলানা-মৌলবীর সংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের অন্য কোনো অঞ্চলে দেখা যায় না।

এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, এরাই যে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইসলামের মহিমা কীর্তন করবার জন্য এদেশের প্রতি গ্রামেই এক বা একাধিক মসজিদ বর্তমান। চট্টগ্রাম শহরের বুকেই অনেক মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

নওয়াব আলিখা'র মসজিদ, জুমা মসজিদ, কদম মোবারক মসজিদ ও হামিদুল্যা খাঁর মসজিদই সমধিক প্রসিদ্ধ। আন্দরকিলার জুমা মসজিদ সুলতান শাহ সুজার শোকবহ স্মৃতি বহন করছে। মসজিদটি কৃষ্ণ পাথর দ্বারা নির্মিত এবং এতে আরবি অক্ষরে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। কদম মোবারক মসজিদেও শিলালিপি আছে। এগুলি শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা বেশ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবি-ফারসিতে হিন্দু মুসলমান সকলেই শিক্ষা লাভ করতেন। শিক্ষিত মুসলমানদের মত শিক্ষিত হিন্দুরা 'মুন্‌শী' আখ্যায় অভিহিত হতেন। তৎকালে মুসলমানদের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ হাকিম ও আমলা ছিলেন। বাদশাহি আমলের অনেক জমিদার বংশ চট্টগ্রামে আজও বিদ্যমান, যদিও কয়েকঘর পূর্বে নির্বংশ হয়ে গেছে। জমিদার বংশ ছাড়াও এদেশে অনেক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ বিদ্যমান। কৌলিন্য মর্যাদায় তাঁরা উক্ত জমিদার বংশগুলি থেকে কোনো অংশেই হীন বলে বিবেচিত হন না।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার মধ্যে অন্যতম একটি খেলা হলা 'বলি খেলা'। অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দর্শনীয় এই খেলা চট্টগ্রামে অতি প্রাচীনকাল থেকে চালু রয়েছে। একধরণের কুস্তিখেলা এই 'বলিখেলা' বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বক্সীর চামরীর খেলা, দেয়াং এর আনোয়ার আলী খাঁ সাহেবের খেলা আর শহরের আবদুল জব্বার সওদাগরের খেলা চট্টগ্রামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র চট্টগ্রামে 'জব্বারের বলিখেলা' এখনোও পর্যন্ত সমান জনপ্রিয়তার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনেক লোকের একত্র সমাবেশ কোনো বড় তীর্থক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথাও আছে বলে জানা যায় না। লেখক এ পর্যায়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টেনে বলেন :

> এ সমস্ত বাজে কীর্ত্তি ছাড়াও আমাদের দেশের একটা ধারাবাহিক সুদীর্ঘ গৌরবাত্মক ইতিহাস আছে। কিন্তু 'বহু বছরের সেই সুদীর্ঘ কথা' বলিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া আমি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।[১]

চট্টগ্রাম বর্তমান বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর নগরী। সমুদ্রের গায়ে, কর্ণফুলি নদীর চারপাশের বিশাল জলাভূমি জুড়ে অবস্থিত চট্টগ্রাম, বাংলার বহু প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় চট্টগ্রাম বাংলার অংশ ছিল না বলে বাণিজ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই বন্দরে আসত। আরাকান, ত্রিপুরা আর বাংলার মধ্যে এই বন্দরের অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই বন্দর কয়েকটি গ্রামের সমাহার ছাড়া কিছুই ছিল না[২]। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর অভিভাষণে মুসলমান বিজয়ের পূর্বে চট্টগ্রামের ইতিহাস 'ঘোর তিমিরাবৃত' বলে উল্লেখ করেন। তখন প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ী শাসন শৃঙ্খলা ছিল না বললেই চলে। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে আরাকান রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে বলে লেখক উল্লেখ করেন। তিনি চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপির উল্লেখ করে বলেন :

> এই দেশ ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের হস্তগত হয়। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও এর স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ফখরউদ্দিন মোবারক সর্ব্বপ্রথমে মেঘনা নদী পার হইয়া উত্তরে শ্রীহট্ট

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২
২ বিপ্লব দাশগুপ্ত, *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.২৮৭

হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর মধ্য দিয়া চচট্টগ্রাম পর্যন্ত ইসলামরে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন।[১]

অতঃপর তিনি মোগল ঐতিহাসিক শেহাবুদ্দিন তালিশের বর্ণনানুযায়ী জানান, চট্টগ্রাম (তৎকালীন প্রদেশ) সম্পূর্ণভাবে জয় করে ফখরউদ্দিন মোবারকশাহ চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজবর্ম নির্মাণ করেন এবং এখানকার প্রায় সব মসজিদই তাঁর সময়ে নির্মিত হয়। এভাবে মুসলমান অধিকারে থাকার পর এটি আবার মগ রাজার শাসনাধীনে চলে যায়। তখনও কিন্তু রাজমুদ্রার পেছনে ফারসি অক্ষরে মুসলমান নরপতির নামাঙ্কিত থাকত। আরাকানের শাসনাধীনে স্বল্পকাল থেকে এটি পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হয়।[২]

চট্টগ্রাম অধিকার বা শাসনের বিষয় বলতে সবসময় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করা হয়েছে, তেমন নাও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কর্ণফুলির উত্তর ও দক্ষিণ তীর দুই পক্ষের দখলে ছিল বলে মনে হয়। একই ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরার সূত্র এবং আরাকানের সূত্রে ভিন্ন-ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। একই সময়কালে দুই পক্ষ থেকেই চট্টগ্রাম অধিকারে রাখার দাবি করা হয়েছে।[৩]

সাহিত্যবিশারদ বলছেন, ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সৈন্যদলকে পরাভূত করে ত্রিপুরারাজ চট্টগ্রাম জয় করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসনভার গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ জন ডি মেলভিয়ার নামক ভ্রমণকারী ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে পরিভ্রমণে এসে তখন একে আরাকানরাজের অধীনে দেখতে পান। ত্রিপুরা-পতি কর্তৃক বিজিত হলেও তা যে তাঁর দ্বারা শাসিত হত না, এই উক্তি থেকে তাই প্রমাণিত হয়।[৪] তবে আমরা ১৫১২ থেকে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকান শাসক মেং রাজা, ত্রিপুরার ধনমাণিক্য, বাংলার আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অধীনে শাসনকার্য পরিচালনার তথ্য পাই। এর ভেতর ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দের একটি সময় এবং ১৫১৫ থেকে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানা যায়।[৫]

১৫৬৬ থেকে ১৫৭২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম কার অধীনে কতদিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে যা বোঝা গেছে সে হিসেবে বলা চলে, ওই সময়কালে বিজয়মাণিক্য ও সোলায়মান কররানির মধ্যে চট্টগ্রামের একাধিকবার হাতবদল হয়েছে।[৬]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দেয়া তথ্যানুযায়ী ১৫১৮ থেকে ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরত শাহ পুনরায় এ প্রদেশ (চট্টগ্রাম) জয় করেন। 'তওয়ারিখী হামিদী'র মতে, তখন থেকেই চট্টগ্রাম প্রকৃত 'দারুল ইসলাম' বলে পরিগণিত হয়। এরপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানপতি মুসলমানের হাত থেকে আবার চট্টগ্রাম কেড়ে নেন এবং ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বীয় শাসনাধীন রাখেন।[৭]

---

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২
২ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩
৩ হারুন রশীদ, *উপনিবেশ চট্টগ্রাম: ৫০০ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস*, পূর্বস্বর, চট্টগ্রাম, মার্চ ২০২১, পৃ.৭৫
৪ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪
৫ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
৬ প্রাগুক্ত
৭ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪

কিন্তু আমরা অন্য সূত্রে দেখতে পাই, ১৫৩৮ নয় ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত আরাকানরাজ মেংবেং এর অধীনে চট্টগ্রাম শাসিত হয়। আর ১৫৫৪ থেকৈ ১৫৮৫ পর্যন্ত বাংলা আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে অন্তত : পাঁচবার হাতবদল হয়। ১৫৫৪ থেকে ১৫৬৫ বাংলা (শাসসুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ গাজি, সোলায়মান কররানি), ১৫৬৬ থেকে ১৫৭২ ত্রিপুরার বিজয়মাণিক্য এবং বাংলার সোলায়মান কররানি, ১৫৭৩ থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার দাউদ খান কররানি এবং ১৫৭৬ থেকে ১৫৮৫ পর্যন্ত আরাকান রাজা মেং ফালং এর অধীনে চট্টগ্রাম শাসিত হয়।[১]

বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে পর্তুগিজদের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। পশ্চিম ভারতে পর্তুগিজদের মশলার বাণিজ্য ধীরে ধীরে উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করেছিল। যদিও এই উপনিবেশের আকার ভারতের গোটা ভূখণ্ডের তুলনায় বেশ ছোট ছিল। এই উপনিবেশ, ভারতে ব্রিটিশ উনিবেশেরথেকেও বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল। পর্তুগিজদের আগমনের কয়েক যুগ পর মোগলরা ভারতবর্ষে এসেছিল। পর্তুগিজরা এদেশে এসেছিল সাগর পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে, মোগলরা এসেছিল উত্তরপূর্ব প্রান্ত থেকে হিমালয় পেরিয়ে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে পর্তুগিজরা জলপথ ধরে ভারতবর্ষে আসে। অপরদিকে তারপরে এসেও মোগলরা ষোড়শ শতকের সত্তর-আশির দশকে তাদের শক্তি সংহত করে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খান, বাংলার স্বাধীন শাসক দাউদকে পরাস্ত করেন। মোগলদের বাংলায় পৌছাঁনোর যুগে, বহু বাঙালি গোষ্ঠীপতি পর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্যকে নিজেদের সেনাবাহিনিতে নিয়োগ দিয়েছিল। এই সৈন্যদের সাহায্য তারা প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল।[২] মোগলদের আগমনের আগে ও পরে পর্তুগিজরা ক্ষমতার বলয়ের ভেতরে ও বাইরে যেসব এলাকায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলে, চট্টগ্রাম তার মধ্যে অন্যতম একটি স্থান ছিল।

লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রামে পর্তুগিজ অভিযান নিয়ে এ পর্বে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* আলোচনা করেন। চট্টগ্রামে পর্তুগিজ বাণিজ্য এবং উপনিবেশ স্থাপনের পরম্পরা নিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। ১৫১৭ সালে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে স্থানলাভের চেষ্টা করেন কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। তাদের দ্বিতীয় বারের চেষ্টারও কোও ফল হয় নাই। অনেক বারের চেষ্টার পর অবশেষে তারা বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার লাভ করে।[৩] চট্টগ্রামের মতো প্রাচীন বন্দর শহর নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল পর্তুগিজদের প্রভাবে। ১৫৩৬ সালে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি গড়ার অনুমতি অর্জন করলো। শুধু বাণিজ্য কুঠি নয়, চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দরে শুল্ক আদায়ের দায়িত্বও পেয়ে গেল পর্তুগিজেরা। চট্টগ্রামে ভূমির খাজনা আদায়ের দায়িত্বও পর্তুগিজদের হাতে অর্পণ করা হলো। এভাবে চট্টগ্রামে বাংলার প্রথম পর্তুগিজ উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৪] *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখক বলছেন :

১ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২ বিপ্লব দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬
৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৪ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

> এই অধিকার লাভের পর তাহার দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে, তাহার ফলে চট্টগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ধ্বংস প্রায় হইয়া উঠে। তাহাদের বিষদন্ত ভঙ্গ করিবার মানসে সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ অগ্রসর হইয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইহার পর পর্তুগীজেরা সিবেষ্টিয়ান গঞ্জালিসকে সন্দীপের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা শাসন করিতে থাকে।[১]

অর্থাৎ 'প্রক্সিওয়ার' ও শাসনক্ষমতার রদবদলে পর্তুগিজদের একটা ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তবে তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তা আমরা লেখকের বক্তব্য এবং ইতিহাসের অন্য সূত্র থেকে দেখতে পাই।

পর্তুগিজদের নিয়োজিত সন্দ্বীপের শাসক সিরেষ্টিয়ান গঞ্জালিস ও পর্তুগিজ বাহিনির যৌথ আক্রমণে আরাকান রাজা মেং খামং এর লড়াই হয়। মেং খামং এর দশ বছরের শাসনামলে মোগল, পর্তুগিজ, ত্রিপরা এই তিন শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে। ১৬১৭ সালের দিকে আরাকান রাজ মেং খামং তাঁর নৌবহরকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। এবারের আক্রমণ অত্যন্ত বিপদজনক ছিল পর্তুগিজদের জন্য। এ আক্রমণে সন্দ্বীপের পর্তুগিজদের নির্বিচারে হত্যা করার পর আরাকান-বাহিনি তাদের সকল স্থাপনা ধ্বংস করে। অধিকাংশ পর্তুগিজ অধিবাসীকে আরাকানিদের দাস হিসেবে চট্টগ্রামের মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তর করা হয়। এ প্রসঙ্গে লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> আরাকানপতি, পর্তুগীজ ও মোগলদের মধ্যে মেঘনার তীরে এক ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পর্তুগীজগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। গঞ্জালিস কোনরূপে প্রাণ লইয়া সন্দীপে পলায়ন করেন। পরবর্তী বৎসর আরকান রাজ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া গজালিসকে পরাজিত এবং সন্দ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহকে আপনাদের দূর্গরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। তথা হইতে নির্গত হইয়া তাহারা পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ লূণ্ঠন করিত এবং হতভাগ্য অধিবাসীগণকে ধৃত করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত।[২]

গঞ্জালিস কোনমতে পালাতে সক্ষম হলেও হুগলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়। কারও মতে, তিনি পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ফিরে গিয়েছিলেন। তবে সন্দ্বীপে দীর্ঘ এক দশকের গঞ্জালিস রাজত্বের দাপুটে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে সেখানেই।[৩]

১৬৩৮ সাল আরাকানি ইতিহাস কলঙ্কজনক একটি বছর যার প্রভাবে চট্টগ্রামেও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা পরবর্তী ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। তখন দিল্লির সম্রাট ছিলেন শাহজাহান আর বাংলার সুবেদার ইসলাম খান মাশহাদী। আরাকানি মগ সৈন্যদের উৎপাত-উপদ্রবে তখন বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় বাধ্য হয়ে স্থানান্তর করতে হয়। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> মগ ও পর্তুগীজদের ভয়ে পদ্মা ও মেঘনার বক্ষে সুবিশাল নৌবহল দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখা হইত, কিন্তু প্রথমে তাহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজ-প্রতিনিধি কাসেম খাঁ এবং আজিম খাঁ সীমান্ত প্রদেশে শাসনে অকৃতকার্য হইয়া বিশেষ অপযশ-ভাজন হন। অবশেষে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মাসহাদী কঠোর হস্তে মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার দমন করেন।

---

১ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
৩ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

এই সময়ে প্রসিদ্ধ আরকান রাজ প্রতিনিধি মুকুটরায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করে বাংলার নবাবের হাতে তার শাসনভার অর্পণ করেন। লেখকের মতে, এই সময় থেকে চট্টগ্রামে মুসলমান শাসনের দিন গণনা করা হলেও, একই সময়ে কালকে অনেক গবেষক 'চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক শূন্যতার সময় (১৬৩৯-১৬৫৯)'[১] হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের সুনির্দিষ্ট কোনও ঘটনা, কোনও শাসনতান্ত্রিক বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু জানা যায়, চট্টগ্রাম যখন আরাকান শাসনাধীনে, তখন বাংলা মোগল শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে আরাকানি বা মগ জলদস্যুরা মোগল সীমান্তে বারবার হানা দিলেও আগের মতো বাংলা-অভিমুখী কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি। আবার মোগলরাও এই সময়ে চট্টগ্রাম দখলের জন্য কোনও অভিযান চালায়নি। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, ১৬৬০/১৬৬১ সালে চট্টগ্রামের উপর দিয়ে শাহ সুজার আরাকান পলায়ন এবং মর্মান্তিক পরিণতি বরণ। তখন সময়কাল অনুযায়ী বাংলার সুবেদারদের দায়িত্বে ছিলেন শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯) মির জুমলা (১৬৫৯-১৬৬৩) শায়েস্তা খান (১৬৬৩-১৬৭৮)। একই সময়ে আরাকানের শাসক ছিলেন নারাপতি (১৬৩৯-১৬৪৫), থাদো মান্ত্রা (১৬৪৫-১৬৫২) ও চেন্দা সুধর্মা (১৬৫২-১৬৭৪)।[২] প্রকৃতপক্ষে নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দেই চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।[৩]

উপর্যুক্ত সুবাদারদের একজন শাহ সুজার পলায়ন, আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ বা ত্রিপুরায় আত্মগোপন এবং তাঁর অস্বাভাবিক পরিণতি বা মৃত্যু নিয়ে পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত চালু রয়েছে। কিছু প্রচলিত মত থাকলেও তা যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। এ ব্যাপারে সাহিত্যবিশারদ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> মগদের অত্যাচার ক্রমে এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল যে, অবশেষে উহার মাত্রাধিক্যের ফলেই ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র হতভাগ্য সুলতান শাহ সুজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই হতভাগ্য রাজেন্দ্রতনয়ের বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইবার কথা আপনারা জানেন। কথিত আছে, শাহ সুজা মক্কাগামী কোন জাহাজের দর্শন লাভাশায় এখানে পলাইয়া আসেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত ছিল না বলিয়া গত্যন্তর অভাবে অবশেষে আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আপন অনুচরদিগকে বিদায় প্রদান করত : স্বীয় পরিজন সমভিব্যাহারে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। নাফ নদী পার হইয়া আরাকান সীমান্ত উপনীত হইলে এই হতভাগ্য রাজেন্দ্র বর্ব্বর মগ রাজের হস্তে সপরিবারে প্রাণ হারাইলেন।[৪]

ইতিহাসে বহুল আলোচিত শাহ সুজার শাসন ও প্রয়াণপর্ব নিয়ে গবেষকরা কি বলেছেন তা দেখা যাক। শাহসুজা (১৬০৯-১৬৬০) সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দ্বিতীয় পুত্র। সম্রাট শাহজাহান

---

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪
২ হারুন রশীদ, পৃ. ১০৫
৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৪ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪

১৬৩৯ সালে শাহ সুজাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে উড়িষ্যা প্রদেশের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বছরের কিছু অধিক সময় ধরে তিনি প্রদেশ দুটি শাসন করেন। শাহ সুজার নিযুক্তির সময় ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। শাহ সুজার শাসনকালে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশ দুটিতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল, কোনো অংশেই কোনও বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। তাছাড়া সুজা কেবল দুই প্রদেশের (বাংলা ও উড়িষ্যা) সুবাদারির দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকেননি, তিনি কামরূপ ও আশ্রিত রাজ্য কুচবিহার দখল করেন। সব মিলিয়ে শাহ সুজা পূর্বভারতের এক ভাইসরয়ের মতোই ছিলেন।

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন। বড় ভাই দারাশিকো থাকা সত্ত্বেও তখন শাহ সুজা নিজেকে দিল্লির সম্রাট বলে ঘোষণা করেন ও রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি রাজমহল থেকে বিরাট বাহিনি নিয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। বাহাদুরপুরের তুমুল যুদ্ধে (বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ) দারাশিকোর বাহিনির হাতে পরাজিত হয়ে আবার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য শাহ সুজা রাজমহলে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে আরেক ভাই আওরঙ্গজেব দুবার (ধর্মাট ও সামগড়ে) দারাশিকোকে পরাজিত করেন এবং তাকে বন্দি ও হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন করেন। শাহ সুজার জন্য ঘটনাটি প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করলেও তিনি আবারও দিল্লির অভিমুখে রওনা হন।

এবার তার অভিযান আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি খাজোয়ায় (ভারতের উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে জেলা) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হন এবং তিনি বাংলার দিকে পশ্চাদপসরণ করেন। এদিকে আওরঙ্গজেব সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্য শাহ সুজাকে মেরে ফেলার জন্য মির জুমলাকে নির্দেশ দেন। বাঁধা ও যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রিষ্বদের এপ্রিল মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। তখন তিনি সপরিবারে এবং দলবল নিয়ে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল তান্ডা ত্যাগ করেন এবং এপ্রিলের ১২ তারিখে ঢাকা পৌছাঁন। ঢাকার জমিদারদের তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং মির জুমলার ঢাকার দিকে ছুটে আসার কারণে শাহ সুজা সিংহাসনের আসা ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে নজিরবিহীন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রকে আরাকানরাজ চেন্দা সুধর্মার কাছে পাঠিয়ে আরাকানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। শাহ সুজার লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রামে পৌছে সেখান থেকে জাহাজে মক্কা গমন করা। মক্কায় হজ সেরে পারস্যের রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন যাতে দিল্লির সিংহাসন দখল করা যায়।

আরকানরাজ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক চট্টগ্রাম থেকে একটি নৌবহর পাঠিয়ে শাহ সুজার পরিবারকে নিয়ে আসার জন্য দেয়াঙের পর্তুগিজ বাহিনিকে নির্দেশ দেন। পর্তুগিজরা তখন আরাকান রাজের অনুগত ছিলেন। শাহ সুজা চট্টগ্রামের দেয়াং বন্দরে পৌছাঁন ৩ জুন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি স্থলপথে কক্সবাজার টেকনাফ হয়ে আরাকানের রাজধানী মোহাং পৌছান ২৬ আগষ্ট ১৬৬০। মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত এই চার মাস শাহ সুজার জন্য কঠিন একটা সময় ছিল।

শাহ সুজা তিনটি নৌকায় পরিবার ও ধনরত্ন বোঝাই করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু মাঝপথে রত্নবোঝাই একটি জাহাজ নিয়ে পর্তুগিজদের একটি দল উধাও হয়ে যায়। বাকি দুটি জাহাজ নিয়ে শাহ সুজা সপরিবারে

চট্টগ্রাম পৌছাঁন। আরাকানরাজ শাহ সুজার পুত্রের সঙ্গে ৫১টি জালিয়া নৌকা পাঠিয়েছিলেন। সেই নৌকায় শাহ সুজার অবশিষ্ট বাহিনি চট্টগ্রাম এসেছিল।

চট্টগ্রাম থেকে স্থলপথে রাস্তা তৈরি করতে করতে বেশ বড়সড়ো দলটি আরাকানের পথে রওনা হয়। শোনা যায়, সেই বহরে ছিল ১০০০ পালকি। শাহ সুজার সাথে স্ত্রী পরিবার ছাড়াও ছিল তিন পুত্র ও তিন কন্যা। আর ছিল নৌকা বোঝাই করে আনা বিপুল রত্নরাজি। শাহ সুজাকে প্রাথমিকভাবে সাদরে বরণ করা হলেও কিছুদিন পর আরাকানরাজ চেন্দা সুধর্মার মনোভাব বদলাতে শুরু করে। পর্যটক মানুচ্চি ও বার্ণিয়ের অনুমান করেছেন, শাহ সুজার সঙ্গে আনা বিপুল রত্নসম্ভারের উপর নজর পড়েছিল আরাকানরাজের। কেউ কেউ অনুমান করেন, শাহ সুজাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মির জুমলার হুমকিই ছিল প্রধান কারণ।

শাহ সুজা সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন আরাকানে। কথা ছিল, আরাকান থেকে জাহাজ নিয়ে তিনি মক্কা যাবেন সপরিবারে, যে কথাটি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নিজেও উল্লেখ করেছেন সাহিত্য-পত্রিকায়। শীতকাল ছিল আরাকান ত্যাগের উপযুক্ত সময় কিন্তু মক্কার জাহাজের কোনও ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। ১৪ অক্টোবর ১৬৬০ এক ওলন্দাজ পত্র থেকে জানা যায় (Dagh-Registar records), মির জুমলা আরকানরাজের নিকট ১২০০০ টাকা দেয়ার প্রস্তাব দেন শাহ সুজাকে হস্তান্তরের পরিবর্তে। ২৯ নভেম্বর ১৬৬০ তারিখের হুগলির আরেকটি ওলন্দাজ পত্র থেকে জানা যায়, মির জুমলা ওলন্দাজ জাহাজের সাহায্য কামনা করেছিলেন, শাহ সুজা ও তার পরিবারকে ফিরিয়ে আনতে।

এরকম অস্থির সময়ে আরাকানরাজ একদিন শাহ সুজাকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। শাহ সুজা এতদিনে বিশ্বাস হারিয়েছেন আরাকানরাজের উপর। শাহ সুজা নিজে না গিয়ে তাঁর পুত্রকে পাঠানোতেও আরাকানরাজ খুশী হন। খেতে বসে সুজাপুত্র দেখল তার সামনে খাবার হিসেবে পরিবেশন করে হয়েছে এক গামলা ষাঁড়ের রক্ত। তা দেখে তার গা গুলিয়ে ওঠে। সুজাপুত্র তাকিয়ে দেখে, আরাকানরাজ সেই রক্ত তৃপ্তির সঙ্গে পান করছেন। সেই সময়ে সুজাপুত্র আরাকানরাজের কাছে মক্কা যাওয়ার জাহাজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি সদুত্তর দেননি।

এর কয়েকদিন পরে শাহ সুজার কন্যাকে আরাকানরাজ চেন্দা সুধর্মার বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোকে সুজা চরম ধৃষ্টতা ও জন্য অপমানের শামিল মনে করেন। রুষ্ট হয়ে চেন্দা সুধর্মা হুকুম জারি করেন, তিন দিনের মধ্যে শাহ সুজাকে আরাকান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি ঘোষণা দেন, আরাকানের হাটবাজারে শাহ সুজা বাহিনীর কাছে কোনোও পণ্য বিক্রি করা যাবে না। আরাকানরাজের ধৃষ্টতার জবাব দিতে শাহ সুজার নেতৃত্বে আরাকানে অবস্থিত মোগল পাঠান সৈন্যরা আরাকানরাজের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে।

আরাকানরাজ চেন্দা সুধর্মার কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি নির্দেশ জারি করেন শাহ সুজা ও তাঁর দলবলকে হত্যা করতে। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৬৬৬ শাহ সুজার আবাসস্থলে আক্রমণ করা হয়। শাহ সুজা পালিয়ে গেলেও তাঁর পরিবার আরাকান বাহিনীর হাতে আটক হয়, এবং শাহ সুজার অনুগত বাহিনীর একাংশ নিহত হয়। এর পরই শাহ সুজার মৃত্যু ও পরিণতি নিয়ে রহস্যের সূচনা হয়।

'আলমগীর নামা', বার্ণিয়ের মানুচ্চিসহ সমকালীন নানাসূত্রে জানা যায়, শাহ সুজা কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে হাতিতে চড়ে জঙ্গলে পালানোর চেষ্টা করেন এবং বনের মধ্যে আরাকান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি সঙ্গে থাকা মনিমুক্তো বিলিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। ক্ষিপ্ত আরাকানিদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা রত্নরাজি আত্মসাৎ করার জন্য হত্যার পর তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। কিন্তু একদম অন্যরকম বিবরণ মেলে মণিপুরি রাজ-ইতিহাস 'চেথারল কুম্বাবা'য়।

উক্ত মনিপুরি রাজ ইতিহাসের তথ্যমতে, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৬৬১ তারিখে আরাকানিদের আক্রমণের পর শাহ সুজা মোটা অর্থের বিনিময়ে পর্তুগিজদের নৌসাহায্য নিয়ে পালিয়ে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গোবিন্দমাণিক্যের আনুকূল্যে তিনি ত্রিপুরা পৌছাঁন ১৬ মে ১৬৬১। কিন্তু বছরশেষের আগেই শাহ সুজার মণিপুরে আত্মগোপনের কাহিনি জেনে যান মির জুমলা। তিনি মনিপুরে তিনজন দূত পাঠান ১৬৬১ সালের ডিসেম্বরে। তখন শাহ সুজা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে উখরুল নামক ইমফলের পার্বত্য শহরের একটি গুহায় আত্মগোপনে থাকেন। সেই গুহাটি এখনও সুজা লক (Shuja lock) বা 'সুজা গুহা' নামে পরিচিত। শাহ সুজা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই শহরেই কাটান। শাহ সুজার এই মতটি মণিপুরে জনপ্রিয় হলেও বাইরে তেমন প্রচার পায়নি।[১] লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বহুল প্রচারিত মতকেই অর্থাৎ আরাকানি মগদের হাতে তাঁর প্রাণ হারানোর বিয়োগাত্মক অধ্যায়কেই গ্রহণ করেছেন।

শাহ সুজার বিয়োগাত্মক ঘটনার পর চট্টগ্রাম মোগলদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। শাহ সুজার বিশ বছরের সুবেদারিত্বে চট্টগ্রামের দখল নিয়ে কোনও অভিযান হয়নি। আরাকান-মোগল সম্পর্ক সে সময় কিছুটা উত্তেজনাহীন ছিল বলে মনে হয়। যদিও অনেক ঘটনা পরম্পরায় আরাকানিদের হাতেই শাহ সুজাকে প্রাণ হারাতে হয় বলে ধরা হয়। আরাকানে পলাতক প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই শাহ সুজার করুণ পরিণতিতে আওরঙ্গজেব যে স্বস্তি পেয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৬৬৩ সালে আরাকানিদের হাতে শাহ সুজার পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ব্যাপারটা মোগলদের জন্য অপমানের শামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বারবার অনুরোধেও আরাকানিরা শাহ সুজার পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে না দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মতো যে-ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তার জবাব দেয়ার জন্যই হয়তো আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে চট্টগ্রাম অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন।[২]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম অভিযান শুরুর বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> মগ ও মোগল রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দেশের এবং শাহ সুজার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের সুবিধার্থেই নবাব সায়েস্তা খাঁ জলদস্যু বিনাশার্থ ঢাকা হইতে হোসেন বেগ নামক সেনাপতির অধিনায়কত্বে জলপথে তিন সহস্র সৈন্য এবং স্বীয় পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর অধীনতায় স্থলপথে দশ হাজার সৈন্য মগদের শাসনার্থে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। এই বিশাল নৌবহর প্রথমে যুগদিয়া নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়। পরে তথা হইতে উহা 'আলমগীর নগর' হইয়া অবশেষে দস্যুর আবাসভূমি সন্দ্বীপে উপস্থিত হয় এবং অসতর্ক দ্বীপবাসীদিগকে সহজেই পরজিত করিতে সমর্থ হয়।[৩]

---

১ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

এই আরাকান বিরোধী অভিযান আরাকান দখলের জন্য নয়, শুধু চট্টগ্রামকে আরাকান থেকে মুক্ত করে মোগল অধিভুক্ত করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। চট্টগ্রামে আরাকানদের উপস্থিতি তখন সমগ্র বাংলার জন্য হুমকি ছিল। তখন বাংলার দক্ষিণ সীমান্তের শেষভাগ ছিল ফেনী নদীর উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফেনী নদীর উত্তরাংশ ভুলুয়া নামে পরিচিত ছিল যা পরে নোয়াখালী জেলায় বিবর্তিত হয়েছিল। ফেনী নদীর দক্ষিণাংশে মিরসরাই থেকে সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম নিরঙ্কুশ আরাকানি দখলে ছিল ১৫৮৫ সাল থেকে। লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখেন :

> উমেদ খাঁর সৈন্যদল ফেনী নদীর তীরে উপনীত হইলে আরাকান সৈন্যরা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া চট্টগ্রামে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পরে হোসেন বেগ সসৈন্যে আসিয়া উমেদ খাঁর নিকট কুমারীয়ার নিকট সম্মিলিত হন। আরাকান সৈন্যেরা বিপর্যস্ত হইয়া সম্যকরূপে পরাজিত হয়। তারপর এই সম্মিলিত সৈন্য গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া উহার অধিকার কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।[১]

উপর্যুক্ত হোসেন বেগকে অনেক গবেষক ইবনে হোসেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই ইবনে হোসেনই আরাকানি দুর্গের অধিকার বুঝে নেন।

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি আরাকানি দুর্গের সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন। আরাকানি দুর্গাধিপতিকে আরও ৩৫০ জন সহ গ্রেপ্তার করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, সঙ্গে ছিল ১৩৫টি জাহাজ ও ২০২৬টি বন্দুক। এছাড়াও প্রচুর গোলাবারুদ ও ৩টি হাতি ছিল। বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রাম প্রবেশ করেন ২৭ জানুয়ারি ১৬৬৬ তারিখে। শায়েস্তা খানের কাছে ২৯ জানুয়ারি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ের সংবাদ পৌঁছালে তিনি বিজয়ী মোগল-বাহিনীকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেন। অর্ধ-শতাব্দী আগে সুবেদার ইসলাম খাঁ যে-কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার উত্তরসূরি শায়েস্তা খান তা পূরণ করলেন। সে কারণেই চট্টগ্রামকে 'ইসলামাবাদ' হিসেবে নামকরণ করেছিলেন শায়েস্তা খান–এ কথা প্রচলিত থাকলেও ইতিহাস এর স্পষ্ট কোনোও জবাব দেয় না। তবে বিজয়ের পর বুজুর্গ উমেদ খানকে শায়েস্তা খান ইসলামাবাদের প্রথম মোগল শাসক হিসেবে নিয়োগ করেন।[২]

তবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্য-পত্রিকায় চট্টগ্রামকে ইসলামাবাদ নামকরণের ব্যাপারে স্পষ্টতই বলেন :

> উমেদ খাঁ ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহাকে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার 'ইসলামাবাদ' নামকরণ করেন। ইহাই চট্টগ্রামে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র বিজয় নিশান উত্থিত ও মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।[৩]

এরপর চট্টগ্রাম পর্যায়ক্রমে যে সকল মোগল প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হয়, তাদের ত্রিশজনের নাম তিনি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেন। নামগুলি হলো : ১. নওয়াব বুজুর্গ উমেদ খান ২. নওয়াব অসকর খান ৩. নওয়াব রশিদ খান ৪. নওয়াব বুজুর্গ উমেদ খান (২য় বার) ৫. নওয়াব ফরহাদ খান ৬. নওয়াব জাফর

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
২ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

খান ৭. নওয়াব মুজাফফর খান ৮. নওয়াব ফেদাই খান ৯. নওয়াব নূরউল্লা খান ১০. নওয়াব এয়াকুব খান ১১. নওয়াব রহমতউল্লা খান ১২. নওয়াব আকিদত খান ১৩. নওয়াব রহমতউল্লা খান (২য় বার) ১৪. নওয়াব বশারত খান ১৫. নওয়াব সরবোলন্দ খান ১৬. নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান ১৭. নওয়াব আলী খান বেগ ১৮. নওয়াব মির্জা বাকের ১৯. নওয়াব ফিদরি হোসেন খান ২০. নবাব হোসেন মোহাম্মদ খান ২১. দেওয়ান মণিরাম ২২. নবাব জোলকদর খান ২৩. নবাবমীর মোহাম্মদ রেজা খান ২৪. নবাব সেরাজ উদ্দিন মোহাম্মদ খান ২৫. নবাব মীর আফজল ২৬. নবাব হাসন কুলী খান ২৭. নবাব সদাকত হোসেন ২৮. নায়েব মহাসিংহ ২৯. নবাব আকা মোহাম্মদ নেজাম ৩০. নবাব মীর মোহাম্মদ রেজা খান (২য় বার)। লেখক এরপর চট্টগ্রামে নবাবদের স্মৃতিবিজড়িত যে-সব স্থাপনা রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এই সকল নবাবের নানা কীর্তি চট্টগ্রামে ও অন্যত্র লক্ষণীয়। নবাব বুজুর্গ উমেদ খাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্মিত সুবৃহৎ জামে মসজিদ বর্তমান সভাগৃহের অদূরে অবস্থিত বলে লেখক জানান। শহরের উত্তর দিকে 'আস্করতালাও' নামক প্রকাণ্ড দিঘি ও আস্কারাবাদ গ্রাম নবাব আস্কর খাঁর নাম কীর্তন করছে। শহরের বুকের উপর ঘাট ফরহাদবেগ ও রহমতগঞ্জ নবাব ফরহাদ খান ও রহমতউল্লা খাঁর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। জোলাপাড়া গ্রামের মসজিদ ও নিকটবর্তী দিঘি নবাব আকিদত খাঁ দেওয়ান মোহাম্মদ খাঁর কীর্তি। নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথমে চট্টগ্রামের ফৌজদার ও থানাদার ছিলেন, পরে চট্টগ্রামের নওয়াব ও বাংলার সুবেদার হন। নওয়াব রহমতউল্লা খাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনকাল থেকে নওয়াবের সহকারী একজন নায়েবও নিযুক্ত ছিলেন। নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান চট্টগ্রামের শেষ নওয়াব। তার পরবর্তীকালে আর নওয়াব ছিলেন না, কেবল নায়েবই দেশ শাসন করতেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর নায়েব নওয়াব এয়াসিন খাঁর অমর কীর্তি কদম মোবারক মসজিদ। এটি জুমা মসজিদের অদূরে অবস্থিত। চট্টগ্রামের চকবাজার ও কাতালগঞ্জের সম্মেলনস্থালে নির্মিত প্রকাণ্ড মসজিদ এবং এর সামনে দিঘি নওয়াব আলী বেগ খাঁর কীর্তি। এনায়েত বাজারে নবাব আলি বেগ খানের কবর জীর্ণাবস্থায় আছে। চট্টগ্রামের আরেক নবাব মীর্জা বাকের ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় নামে 'বাকেরগঞ্জ' জেলার[১] নামকরণ করেন।

'বাকরখানি' রুটি তাঁর নাম বহন করছে। আলি বেগ খাঁর দেওয়ান মনিরামের নামে 'মনিরামবাগ' নামক গ্রাম স্থাপিত। পরে তিনি নায়েব হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'থানাদার' বলা হতো। 'জোলকদর খাল' আজও নওয়াব জোলকদর খাঁর নাম ঘোষণা করছে। ১৭৫৪-৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেওয়ান মহাসিংহ চট্টগ্রাম শাসন করেন। এখানকার দেওয়ান বাজার তাঁরই স্থাপিত। তিনি হাজারীবাগের প্রভাব বিচূর্ণ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বারো জন হাজারির মধ্যে দশজনকে বন্দী করে তিনি মুর্শিদাবাদে পাঠান, অবশিষ্ট দুই হাজারির বংশধরগণ আজও 'দোহাজারি' গ্রামে বাস করছেন। চট্টগ্রামে যত লাখেরাজ সম্পত্তি আছে, তৎসমস্তই দেওয়ান মহাসিংহের দান। তিনি ফটিকছড়ির অন্তর্গত কাঞ্চননগরে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পরে আকা মোহাম্মদ নেজাম নায়েব হন। নেজামপুর পরগনা একই নাম কীর্তন করছে। এরই পরে সুপ্রসিদ্ধ মোহাম্মদ রেজা খান ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন। তিনি বাদশাহী আমলের শেষ নায়েব। এভাবে চট্টগ্রাম ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল শাসনাধীনে থেকে অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ঐ বছরই মীর জাফর আলী খাঁ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁর জামাতা মীর কাসিম আলী খাঁ বাংলার

---

১ তপঙ্কর চক্রবর্তী, *বরিশালের সংবাদ ও সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০০১, পৃ. ২

নওয়াব নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ নওয়াব মীর কাসিম কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম প্রদান করেন।[১] এ-প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেন :

> পলাশী যুদ্ধ ঘটে গেলেও তখন ইংরেজরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়নি। ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল যে কোনও একজন পুতুল শাসককে সিংহাসনে বসিয়ে তার মাধ্যমে যতটুকু বাণিজ্য ও আর্থিক সুবিধা আদায় করা যায়। তাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল কোনও একটা অঞ্চলের দেওয়ানিত্ব অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। প্রথমে শুধু চট্টগ্রামেই চেয়েছিল মির জাফরের কাছে। কিন্তু মির কাশিমের সঙ্গে চুক্তি করার সময় চট্টগ্রামের সঙ্গে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামও যুক্ত করে নিয়েছিল কোম্পানি। কারণ এই তিন জেলার মোট রাজস্ব আয় সমগ্র বাংলার এক তৃতীয়াংশ ছিল। তাই সিংহাসনের জন্য মির কাশিম যে কোনও শর্তে রাজি ছিলেন।[২]

সুতরাং অবিলম্বে মির কাশিমের সঙ্গে একটি খসড়া চুক্তি সম্পাদন হয়ে গেল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৬০ তারিখে। এই চুক্তি চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা হয় ১০ অক্টোবর ১৭৬০ থেকে। তবে মির কাশিমের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই চুক্তিগুলি সম্পন্ন হয়। লেখক আবদুল করিম সাহিত্য-পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লেখেন :

> ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর তারিখে মীর কাশিমের প্রদত্ত সনদে উল্লিখিত আছে যে, 'নওয়াব সরকারের সাহায্যার্থে ৫০০ ইয়োরোপীয় অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক এবং আট হাজার দেশীয় সিপাহীর ব্যয় নির্বাহের জন্য থানে ইসলামাবাদ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দান করা গেল।[৩]

মির কাশিমের সঙ্গে খুব বেশিদিন সখ্য থাকেনি ইংরেজদের। পুরোনো শুল্ক নিয়ে আবারও বিবাদ বেধে গেল তাঁদের মধ্যে। দুবছরের ব্যবধানে, ১৭৬৩ সালের শুরুতে এসে তা চরম আকার ধারণ করে। মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই বিবাদ গড়াতে গড়াতে জুন মাসে গিয়ে সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছে যায়। পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মির কাশিমের মিত্রতার অবসান ঘটে চিরতরে। মির জাফরকে পুনর্বহাল করার সম্ভাবনা নিয়ে তখন আলোচনা হয়। কোম্পানি ৪ জুলাই ১৭৬৩ তারিখে বোর্ডের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় – চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্ধমান এই তিন জেলার বিষয়ে বলা হয়, মির জাফরের সঙ্গে নতুন যে চুক্তি হবে তাতে ঐ তিন জেলার আগেকার দেওয়ানিত্বের বদলে মালিকানাস্বত্ব কোম্পানির হাতে অর্পণ করতে হবে।[৪] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মীর জাফর পুনরায় নওয়াবী প্রাপ্ত হইয়া ঐ সনদ পরিবর্ত্তন করতঃ ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের প্রদত্ত সনদ দ্বারা এই বন্দোবস্ত স্থায়ী করেন। তৎসময়ে ২৯৮৭ বর্গ মাইল স্থান চট্টগ্রামের দখল ছিল এবং জায়গীর ইত্যাদিতে সর্ব্ব সাকুল্যে মোট ৩২৩১৩৫ টাকা ইহার বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইত। প্রাগুক্ত দানের ফলে ১৭৬১ খ্রি. মি. ভেরেলেই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আসিয়া মোহাম্মদ রেজা খাঁর হস্ত হইতে চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন।[৫]

লেখকের মতে, উল্লেখিত সম্রাট শাহ আলম হলেন দিল্লির ফেরারি শাহজাদা আলি গওহর যিনি সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন ইংরেজদের সহায়তায়, বিনিময়ে ইংরেজদের যে কোনও দাবি মেনে নিতে রাজি

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭
২ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৪ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬
৫ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

ছিলেন। ২২ নভেম্বর ১৭৬৪ তারিখে তাঁর ইংরেজদের উদ্দেশে লিখিত পত্রে কোম্পানির প্রতি দুর্বলতা, নতজানুতা লজ্জাজনকভাবে প্রকাশ পায়।[১]

চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক ছিলেন রেজা খান। পারস্যের অধিবাসী রেজা খানকে আত্মীয়তার সুবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে ১৭৫৬ সালে কাটোয়ার ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ দেন। এবং কিছুদিন পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে রেজা খান ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তাকে সরিয়ে দেয়া হয় পদ থেকে। সেই থেকে পরবর্তী সাড়ে তিন বছর তিনি ক্ষমতাবলয়ের বাইরে থাকেন। আবার ১৭৬০ সালের শুরুতে মির জাফর তাঁকে ইসলামাবাদের ফৌজদার হিসেবে পদোন্নতি দেন। সম্ভবত তখন থেকেই তিনি ইংরেজদের সুনজরে পড়েছিলেন, যার প্রমাণ মেলে মির জাফরকে সরিয়ে দেওয়ার পরও তিনি চট্টগ্রামের ফৌজদার হিসেবে কয়েকমাস কাজ করেন। ২০ অক্টোবর ১৭৬০ তারিখে মুর্শিদাবাদের পালাবদল সম্পন্ন হওয়ার পর কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়ানি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

পরবর্তীকালে ১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেজা খানের কাছ থেকেই চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই শাসনভার হস্তান্তর প্রক্রিয়া সীতাকুণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রামের পথে রওনা দিয়ে হ্যারি ভেবেলস্ট যখন লক্ষ্মীপুর পৌঁছান, সে সময়ে রেজা খান ত্রিপুরা রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে ঐ এলাকায় অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত সে কারণে সীতাকুণ্ডেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সারার পরও রেজা খানকে আরও দেড়মাস চট্টগ্রামে অবস্থান করতে হয়, নতুন প্রশাসকের কাছে স্থানীয় বিষয়াদি বুঝিয়ে দিতে। এই দেড়মাস সময়ের মধ্যে হ্যারি ভেরেলস্ট ও রেজা খানের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[২] সাহিত্য-পত্রিকার লেখক আবদুল করিম সংক্ষেপে এই হস্তান্তর পর্বের তথ্যটি উল্লেখ করেছেন।

এভাবে চট্টগ্রাম ইংরেজদের অধিকারে এসেছিল বটে, তবে তারা এর বহু আগে থেকেই চট্টগ্রামের অধিকার লাভের চেষ্টা করেছিলেন। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অবরোধ করতে চেষ্টা করেন। স্যার জোশিয়া চাইল্ড চট্টগ্রাম অভিযানের ব্যাপারে রাজা দ্বিতীয় জেমসের অনুমতি সংগ্রহ করেন। তারপর ১৬৮৬ সালে অ্যাডমিরাল নিকলসনের নেতৃত্বে বারোটি সশস্ত্র জাহাজের বড় একটি বহর রওনা হয়েছিল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> এই চেষ্টার সফলতা সাধন জন্য ইংল্যান্ড হইতে সেনাপতি নিকলসনের অধিনায়কতায় ১০ খানি যুদ্ধ জাহাজ ও বহু যুদ্ধোপকরণ ভারতবর্ষাভিমুখে প্রেরিত হয়। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ বাহিনী পথেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেনাপতি নিকলসন কয়েকজন সৈনিক সমভিব্যহারে হুগলী প্রবেশ করিলে অগণিত মোগল সৈন্য তাহাদিগকে অচিরে তথা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়।[৩]

কিন্তু এতেও ইংরেজরা চট্টগ্রাম অধিকারের সংকল্প ত্যাগ না করে পুনরায় নতুন উদ্যমে অভিযান আরম্ভ করে।

---

১ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

২ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

গভর্নর জোশিয়া চাইল্ড চট্টগ্রামে নতুন করে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং এ কাজের জন্য সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচিত করলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথকে (William Heath)। কিন্তু হিথ তিন তিনবার অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হন, যাকে অনেক গবেষক 'তিন পাগলামী' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১] এতৎপ্রসঙ্গে লেখক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে হিথ (Heateh) নামক জনৈক ইংরেজকে দশ বারো খানি রাণতরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া একেবারে চট্টগ্রাম আসিয়া উহা অবরোধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত সেনাপতি প্রথমত : বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া নৃতন সুবাদার বাহাদুর শাহকে আরাকান বিজয়ে সাহায্য করেন এবং তৎপরে বলেশ্বর বিজয়ে অগ্রসর হইয়া তৎপরে তথা হইতে ১৫ খানি রণতরী ও ৩০০ শত সৈন্য লইয়া ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত নগর দশ সহস্য সৈন্য কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং চট্টগ্রাম আক্রমণ সমীচীন মনে না করিয়া তিনি আরাকানের দিকে অভিযানে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে মাদ্রাজে গিয়া উপনীত হন।[২]

ঢাকার নবাব তখন ছিলেন বাহাদুর খান, লেখক যাকে বাহাদুর শাহ বলে উল্লেখ করেছেন। একই সময়ে চট্টগ্রামের গভর্নর ছিলেন বাহাদুর খানের পুত্র মোজাফ্ফর খান, যাঁর অধীনে সবসময় যুদ্ধ সাজে তৈরি থাকত ১০,০০০ মোগল সৈন্য। চট্টগ্রামে মোগলদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি থাকত আরাকানি আক্রমণের আশঙ্কার কারণে। ইংরেজ গুপ্তচরেরা মোগলদের এই সার্বক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর নিয়ে জাহাজে ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন হিথের যুদ্ধবাসনা হঠাৎ করেই দমে যায়। মজার ব্যাপার হলো, চট্টগ্রামে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজদের হাতে তারপর কলকাতা নগরের ভিত্তি স্থাপন হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৬৯১ তারিখে জারিকৃত ফরমানে ইংরেজদেরকে বার্ষিক মাত্র ৩০০০ রূপির বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করা হয়। বস্তুত এই দিন থেকেই কলকাতা নগরের ক্রমপ্রক্রিয়ার শুরু হয় এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর স্যার জোশিয়া চাইল্ডের পরিকল্পনায় একটু ছেদ ঘটিয়ে চট্টগ্রামের বদলে কলকাতার গভর্নর হন জব চার্নক (১৬৩০-১৬৯৩)।[৩] এরপর ইংরেজদেরকে চট্টগ্রাম দখলের জন্য ১৭৬১ সাল প্রায় ৭০ বছরের অধিককাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এভাবে এ পর্যন্ত আমরা চট্টগ্রামের ইতিহাসের নানান বাক্-বদল সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে অবহিত হই।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক ছয় পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'এগার সিন্দুর' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে ময়মনসিংহের (বর্তমানে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম) ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত এগার সিন্দুর নামক স্থানটির পূর্ব পরিচয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অলৌকিক ও প্রচলিত ঘটনা ও বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবুল ফজল ইবনে মুবারক (১৫৫১-১৬০২ খ্রি.) এই গ্রামটির কথা তাঁর গ্রন্থ 'আকবরনামা'য় উল্লেখ করেছেন।

---

১ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৩ হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৪০

প্রবন্ধটিতে এগার সিন্দুর নামের পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে :

> প্রবাদ আছে যে মোগল শাসন সময়ে তাঁহারা উল্লিখিত স্থানটি ত্রিমোহনার তীরস্থিত উপযুক্ত স্থান বলিয়া তথায় একটি সহর স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন ও ধনাঢ্য একাদশ জন ওমরাহ্‌কে তথায় বসতি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। ওমরাহ্‌গণ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী তথায় বসতি স্থাপন করিতে আসিয়া ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্ববাহী ও উত্তরবাহী ব্রহ্মপুত্র নদের দুই শাখার গতি অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। তাই তাঁহারা দুই তিন জন ব্যতীত সকলেই বর্ত্তমান বুড়িগঙ্গার তীরস্থিত ঢাকা নগরীতে তাঁহাদের আবাসস্থল নির্দ্দেশ করেন এবং কালক্রমে ঢাকা নগরীর সৃষ্টি করিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে থাকে। অতএব কেহ কেহ একাদশজন ওমরাহের সংখ্যানুসারে বা কেহ কেহ ওমরাহ্‌গণের দুই ভাগে পৃথক হইয়া বাস করায় "ইয়াবছে দূর" হইতে এগার সিন্দুর নামে অভিহিত করেন। ইহার পূর্ব্বে উক্ত স্থানের নাম কি ছিল জানা যায় না।[১]

আমরা জানি, এগারোটি নদীর মোহনায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে উঁচু শক্ত এটেল লাল মাটির এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাসের স্থান হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এই এলাকাটি গঞ্জের হাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গঞ্জের হাট এলাকাটি এগারটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় তখনকার জ্ঞানী-গুণীজন স্থানটির নামকরণ করেন এগার সিন্দুর, বর্তমান ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়।

এগার সিন্দুর নামে মধ্যযুগের বাংলার একটি দুর্গও ছিল। এটি পাকুন্দিয়া উপজেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। বারো ভূঁইয়াদের একজন ঈশা খাঁ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই দুর্গ ব্যবহার করেছিলেন, বর্তমানে এ দুর্গের অস্তিত্ব নেই। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে এগার সিন্দুর এলাকায় দুটি দুর্গ নির্মিত হওয়ার কথা এবং ঈশা খাঁ কর্তৃক পরবর্তীতে এর সংস্কারের কথাও বলা হয়েছে।

মোগল সম্রাট আকবর যখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন তখন সুজলা-সুফলা নদনদী বিধৌত বঙ্গভূমিতে বারো ভূঁইয়ারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশা খাঁ, তা এই প্রবন্ধে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। প্রবন্ধকার এতৎপ্রসঙ্গে বলেন :

> এই বার ভূঁঞাগণের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, ভাওয়ালের ফজলল গাজী, বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মানিক্য ও চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ এই পাঁচটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করিয়া ঢাকা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ শাসন করিতেছিলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে ঈশা খাঁ অতিশয় প্রবল ছিলেন।
>
> এই সময়ে সম্রাট আকবর শাহের রাজস্ব সচিব তোডরমল্ল ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া ঈশা খাঁ ও অন্যান্য ভূঁঞাদিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গালার ভূমির সুব্যবস্থা করেন। ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহা ও সোনার গাঁ এই উভয় সরকার শাসন করিতে থাকেন। এই সময়ে সরকার বাজুহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিবার জন্য ব্রহ্মপুত্র তীরস্থিত একডালা ও এগারসিন্দুরে দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়।[২]

---

১ আফতাবউদ্দিন আহম্মদ, 'এগার সিন্দুর', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ.১৪৯-১৫০

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

ঘটনার পরবর্তীতে ঈশা খাঁ দিল্লির সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করার কিছুদিন পরেই ভাওয়ালের ফজলল্ গাজী ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ, কলাগাছিয়া নামক স্থানে তিনটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন ও এগার সিন্দুরের প্রাচীন দুর্গদ্বয়ের সংস্কার করেছিলেন। ঈশা খাঁ ১৫৭৭ সালে এগার সিন্দুরকে রাজনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। নিজস্ব শক্তি সঞ্চয় করে ঈশা খাঁ পরবর্তীতে দিল্লির বাদশাহের রাজস্ব একেবারে বন্ধ করে দেন। এতে সম্রাট আকবর তাঁর প্রতি রুষ্ট হন।

সম্রাট আকবর ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তার সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে এক বিপুল বাহিনিসহ প্রেরণ করেন। এতে ঈশা খাঁ প্রথমে পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি শাহবাজখাঁকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী সোনার গাঁ পুনর্দখল করেন। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফফিচ ঈসা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁওয়ে পদার্পণ করেছিলেন বলে প্রবন্ধ থেকে আমরা জানি।

এই সময়ে ঈশা খাঁ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হাজরাদী পরগণার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ির লক্ষণ হাজং নামক কোচ রাজাকে পরাজিত করে সেখানে নিরাপদ বিবেচনায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং প্রভূত শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। সেই সময়ে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে প্রবন্ধকার লিখেছেন :

> ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আকবর শাহের শ্রেষ্ঠ রাজপুত রাজা মানসিংহ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ঈশা খাঁ একডালার দুর্গে পরাজিত হইয়া এগার সিন্দুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, মানসিংহ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে এগার সিন্দুরের নিকট ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে উভয়পক্ষের বলবীর্য্যের পরীক্ষা হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে ঈশা খাঁ জয়লাভ করেন ও মানসিংহের জামাতা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হন। দ্বিতীয় দিবস উভয় পক্ষ সমভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিবস যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া যায়, সেই দিন ঈশা খাঁ যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা দেবকর্ম্ম বই আর কিছুই নয়। ঈশা খাঁ মানসিংহকে নিরস্ত্র হইতে দেখিয়া যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মানসিংহকে আবার যুদ্ধ করিতে একটি তরবারি প্রদান করিলেন "ধন্য তোমার মহত্ব, ঈশা খাঁ আজ তুমি ইচ্ছা করিলে মানসিংহকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারিতে কিন্তু তুমি মহৎ, তুমি দেবতা। তাই তুমি আজ এই নশ্বর জগতে এই অলৌকিক সৌজন্য দেখাইয়া যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিলে তাহা চিরস্মরণীয়-তোমার মঙ্গল হউক।" ঈশা খাঁর এই অলৌকিক সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া মানসিংহ ঈশা খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ও ঈশা খাঁকে লইয়া দিল্লীতে গমন করেন। ঈশা খাঁ দিল্লী হইতে "মসনদ আলি" উপাধি লাভপূর্ব্বক বাইশ পরগণার আধিপত্য লইয়া জঙ্গলবাড়ী প্রত্যাগমন করেন।[১]

এই প্রবন্ধ লেখার সময়েও ঈশা খাঁর বংশধরগণ জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎ নগরের দেওয়ান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন বলে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

তবে প্রবন্ধ লেখার সময় এগারসিন্ধুর দুর্গের কোনো নিদর্শন না থাকলেও দুর্গের চতুর্দিকে প্রায় একমাইলব্যাপী আট হাত উঁচু এবং ছয় সাত হাত প্রস্থ একটি মাটির প্রাচীর জঙ্গলাবৃত হয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ঈশা খাঁর চেষ্টাতেই ওই স্থানে 'বহু জনাকীর্ণ ও মুসলমান ভদ্রমণ্ডলীর আবাসভূমি হয়।'[১] প্রবন্ধকার এরপর এগার সিন্দুর এলাকায় যে সমস্ত কাহিনি প্রচলিত ছিল তাঁর মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে শেখ শাহ্ মামুদ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। লোকের গরু ও মহিষ মাঠে চরিয়ে যা উপার্জন হত, তা দিয়েই তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। কিন্তু উত্তরকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর হয়েছিলেন ।

তার সম্বন্ধে এরূপ একটি কিংবদন্তি চালু আছে যে, তিনি একদিন মাঠে গো-মহিষ চড়াতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে এক গাছের তলে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তখন একটা সাপ তার ফণা বিস্তার করে শাহ্ মামুদের উপর ছায়া প্রদান করেছিল। এটিও তাঁর উত্তরকালে ধনশালী হওয়ার একটি লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছিল, সত্য ও সংস্কার যাই হোক না কেন।

তাঁর সম্বন্ধে আমরা আরো শুনতে পাই যে, এগার সিন্দুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম 'গঞ্জের বাজারে' এক কামেল দরবেশ থাকতেন, লোকে তাকে পাগল বলে ডাকতো। বাজার শেষ হওয়ার পরে মাছের পেটের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পড়ে থাকত, তাই তিনি সুখাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। একদিন শাহ্ মামুদ গরু চরাতে গিয় উক্ত দরবেশের মাছের উচ্ছিষ্ট জিনিসগুলো কোনো তেল-মসলা ছাড়াই সামান্য একটি পাত্রে সিদ্ধ করে খেতে দেখলেন। যদিও তেল মসলা ছাড়া জিনিসগুলো রান্না হচ্ছিল, তথাপি এর থেকে এমন একটি সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, যাতে শাহ্ মামুদ তার একবার স্বাদ গ্রহণ করতে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং উক্ত জিনিস কিছু পাওয়ার জন্য দরবেশের নিকট বারবার আবেদন করতে থাকলেন। তাতে দরবেশ অনেকটা বিরক্তির সাথে তাকে সামান্য আহার করতে দিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কতগুলো কীট তার হাতের উপর গড়াগড়ি করছে। মামুদ শুধু চোখ বুজে তা একেবারে মুখে পুরে দেখলেন যে, এমন সুস্বাদু বস্তু যা স্বর্গীয় সুধার সঙ্গেই মাত্র তুলনা করা যায়। তিনি আবার দরবেশের কাছে হাত বাড়িয়ে আরো কিছু পেতে অনুরোধ করলেন, দরবেশ এতে রাগান্বিত হয়ে তাকে সজোরে আঘাত করলেন। তিনি দরবেশের আঘাত পেয়ে তাঁর নিকট থেকে সরে এলেন। তখন দরবেশ এই ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে মামুদ অনেক ধনশালী হবেন। দরবেশের জন্য হোক বা না হোক, এই কথা পরবর্তীতে মামুদ-এর জীবনে কার্যকরী হয়েছিল।

এই প্রবন্ধের শেষে কয়েকজন কামেল দরবেশের নাম উল্লেখিত হয়েছে, এরকম পাঁচজন হলেন : নেকি শাহ, শাহ গরীবুল্লাহ, শাফর শাহ, জানুল্লা শাহ, শাহ দরিয়া। দরবেশ শাহ্ দরিয়া অবলীলাক্রমে নদী ও সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন তাঁর এরকম নামকরণ হয়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

এগার সিন্দুর এলাকার উক্ত শাহ্ মামুদ প্রতাপশালী সওদাগর হিসেবে পরিচিত হলেও অতিশয় দয়ালুও ছিলেন। ধনবান ও সম্মানী ব্যক্তি হওয়ার কারণে ঢাকার নায়েব-সুবেদার পর্যন্ত তাঁর জন্য বিশেষ আসন বরাদ্দ রাখতেন। এতৎপ্রসঙ্গে যে ঘটনাটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, তা হলো এই :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

> একদিন শাহ্ মামুদ বুড়িগঙ্গায় ঢাকার ঘাটে নৌকা রাখিয়া সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলে সুবেদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু শাহ্ মামুদ দেখিলেন, তাঁর মনিব জঙ্গলবাড়ি ঈশা খাঁ মসনদ আলির বংশধর কোন একজন দেওয়ান বাদশাহী খাজনা দিতে না পারিয়া সুবেদারের সমীপে দণ্ডায়মান। পাঠক বোধহয় অবগত আছেন, যখন শাহ সুজা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রীতিমতো বাংলায় কর আদায় করিতে ছিলেন, তখন ঢাকায় দেওয়ান খানা স্থাপিত হয়।[১]

তখন বাংলা অঞ্চলের জমিদারগণ খাজনা দিতে অসমর্থ হলে ঢাকায় তাদেরকে কতদিন আবদ্ধ থাকতে হতো তার ঠিক নেই। তাই শাহ্ মামুদ উক্ত দেওয়ান সাহেবের এরকম আবদ্ধ থাকবার উপক্রম দেখেই তাঁর অর্থাৎ জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানের দাঁড়ানো অবস্থায় শাহ্ মামুদ নিজের আসন গ্রহণ নেহায়েত বেয়াদবি বলে উল্লেখ করলেন। শাহ্ মামুদ দেওয়ান সাহেবের কত টাকা বাকি, তা জেনে নৌকা থেকে টাকা এনে সুবেদারের নিকট প্রদান করলেন। তারপর দেওয়ান সাহেবকে বসিয়ে নিজেও বসলেন। এভাবে তিনি সবার সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন।

এরূপ কথিত আছে যে, শাহ্ মামুদ ডাকাতের ভয়ে বড় বড় কলসী পূর্ণ করে অনেক টাকা 'কূপে ও গড়-খাইয়ে' ফেলে রেখেছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত টাকা যথাস্থানে পাওয়া যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি একখণ্ড সমতলভূমিতে টাকা-পয়সা ঢেলে গণনা করতেন। প্রবন্ধকার নিজেও স্থানটি দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। ভূমির পরিমাণ, নিরাপদ বসতবাটির ও কয়েকটি কারণে তাঁর নিকট এটি সত্য বলে মনে হয়েছে। এই এগার সিন্দুর গ্রামে কয়েকটি দিঘি ও পুকুর আবর্জনাপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বুধাই শেখের দিঘি খুব বড়ো, যার অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে বলে আমরা জানতে পারি। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার তেরো বছর পর ১৯৩৩ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এগার সিন্দুর এলাকায় রৌপ্য মুদ্রা, লোহার অক্ষ, লেন্স, ধনুক ও তীর পাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এগার সিন্দুর এখনও একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য রচনার ভেতর ভ্রমণ-বিষয়ক কিছু লেখা প্রকাশিত হয়, লেখাগুলিতে অবিভক্ত বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের চিত্তাকর্ষক কিছু বিষয় আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো: অশ্বিনীকুমার সেন লিখিত 'ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালি', অপরটি হলো ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখিত 'ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ'। এসব ভ্রমণকাহিনিতে ইতিহাসের অনেক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে রাজা রামমোহন রায়কে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণকারী হিসেবে জানা যায়। ইতিসামউদ্দীনের 'বিলায়েতনামা' গ্রন্থটি আবিষ্কারের পর এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে। এ-সম্পর্কে লেখক বলেন :

> শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এতদিন আমাদের এই ধারণাই ছিল কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে শিগারফ নামা-ই-বিলায়ৎ (Shigaraf Nama Vilayat) নামক যে একখানি পারশি গ্রন্থ ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে

১ প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

> তাতে জানা গিয়েছে যে এর সম্মান রাজার প্রাপ্য নয় উক্ত পার্সী গ্রন্থের লেখক ইতিসামউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এ সম্মানের অধিকারী।[১]

লেখক এর পর ইতিসামউদ্দীনের (১৭৩০-১৮০০) বিলেত গমনের সময়, উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা দেন। ইতিসামউদ্দীনের পিতার নাম তাজউদ্দীন, নদীয়া জেলায় তাঁর জন্মস্থান। তিনি বহু দিন ধরে নবাব মীর জাফরের সেরেস্তার কাজ করে ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এরপর মীর কাসিম নবাবি পদে অধিষ্ঠিত হলে তিনি সেরেস্তার কাজ ত্যাগ করে ইংরেজদের অধীনে কাজ নেন। এর পরের ঘটনা ইতিসামউদ্দিন বর্ণনা করেন এভাবে :

> ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেজর ইয়র্ক বীরভূমের তদানীন্তন মুসলমান নরপতি আসাদুজ্জমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, আমিও তখন তাঁহার সহিত তথায় গিয়েছিলাম। আসাদুজ্জমানের পতনের পরে ইয়র্কের সঙ্গে আমাকে পাটনায় যাইতে হয়। এখানেই দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের নিকট পরিচিত হই। পাটনা হইতে আমরা কলকাতা গিয়াছিলাম।[২]

এর কিছুদিন পর মেজর ইয়র্ক বিলেত চলে যান। যাবার সময় ইতিসামকে একখানি অনুরোধপত্র দিয়ে পাটনার মেজর এডামসের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে রাজা নবকৃষ্ণের ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি অনেকদিন কোনো কাজ সংগ্রহ করতে পারেননি। পরে অনেক কষ্টের ফলে জলেশ্বরের সেরেস্তায় একটা চাকরি পেতে সক্ষম হন। অতঃপর রাজমহল হয়ে মেদিনীপুরে তিনি এক বৎসর তহশীলদার এর কাজ করেন। এরপর তার মালিক ষ্ট্রাচি (Strachy) সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কার্নাকের অধীনে কাজ নেন। অতঃপর 'চুনার' নামক স্থানে সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে এলাহাবাদে নিয়ে আসেন। ঠিক এই সময় লর্ড ক্লাইভ ইংল্যান্ড থেকে এসে বাংলার দেওয়ানি লাভ করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে একটি চিঠি ও বহু মূল্যবান উপহার সহ ক্যাপ্টেন সুইনটনকে ইংল্যান্ডে পাঠান। তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে মুন্সি হিসেবে ক্যাপ্টেনের সহকারী হয়ে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার খরচ হিসেবে রাজকোষ থেকে সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রী নবাব মনির উদ্দিন ৪০০০ টাকা ইতিসামুদ্দিনকে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে যাবার পর ইতিসামউদ্দিন ক্লাইভের ধূর্ততা সম্পর্কে জানতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এরকম:

> ইংলন্ডে যাইবার পথে সুইনটনের নিকট শুনিলাম, যে উপহার দ্রব্য পত্র লইয়া আমাদের যাইবার কথা তাহা আদৌ আমাদের সঙ্গে আইসে নাই, লর্ড ক্লাইব সেগুলি রাখিয়া দিয়াছেন।এই কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। যে জন্য যাইতেছি তাহাই যখন ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিল তখন আমার ইংলন্ডে যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু তখন সমুদ্রবক্ষে জাহাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হইয়াই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ইংলন্ডে চলিলাম। এখানে পৌঁছিয়া ক্লাইবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।[৩]

১অশ্বিনীকুমার সেন, 'ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ,শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১১৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৩ প্রাগুক্ত

তিনি বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রামের লস্কর ব্যতীত কোন শিক্ষিত বাঙালি ইংল্যান্ডে যাননি। রাষ্ট্রীয় সফরে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি সবার কৌতূহলের পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবার কিছুদিন পর ক্লাইভ ইংল্যান্ডে এলেও সম্রাটের পত্র বা উপহারের কথা একেবারেই গোপন রাখেন। ইতিসামুদ্দিন যতদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন ততদিন সুইনটন ও তাঁর বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব ইতিসামুদ্দিনের সুযোগ-সুবিধা ও যত্নআত্তির দিকে নজর রেখেছিলেন। তাঁরা তাকে ফারসি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ডে উচ্চ বেতনে থাকতে বলেছিলেন। কেউ আবার ঐ দেশের নারী বিয়ে করে স্থায়ী হতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। এরপর তাঁর দেশে ফেরা এবং লিখিত অসমাপ্ত কথা লেখক অশ্বিনীকুমার সেন উদ্ধৃত করেন এভাবে :

> অবশেষে কলিকাতা কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মি: ম্যাজেন্ডির সাহায্যে জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলাম। ইংল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর চুপচাপ করিয়াছিলাম।পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল জন রাফটন (Colonel John Wroughten) এর সহিত পুনরায় সাতরায় যাই। এখানে মহারাষ্ট্র দিগের সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়।[১]

তাঁর এই 'সিগারফ নামা বিলায়ৎ' (Shigaraf Nama Vilayat) বা 'বিলায়ৎনামা' গ্রন্থটি মূল ফারসি থেকে অনুবাদ করে বের করেছেন একাধিক গবেষক। তন্মধ্যে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (১৯১৮-২০১৬) ও আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর (১৯১১-১৯৮৪) অনুবাদ অনেক জনপ্রিয়।

সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধ 'ইবন বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ' প্রকাশিত হয়। ইবনে বতুতার (১৩০৪-১৩৭৮) সময়কালে বহু পর্যটক ছিলেন; কিন্তু লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের কারণে তিনিই কেবল সুবিদিত হয়েছেন। লেখক এ প্রসঙ্গে ইবনে বতুতার পূর্বে যেসব মুসলমান ভূগোল ও ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁদের মোট ২১ জনের গ্রন্থসহ নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে আল বিরুনি ও তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ' অন্যতম। ইবনে বতুতা ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতির যুগের একজন ভ্রমণকারী হিসেবে তাঁর ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে অনেক ঘটনা ও তথ্য উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। লেখক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন :

> ৭২৫ সালের রজব মাসে ২২ বছর বয়সে হয্যের উদ্দেশ্যে তিনি জন্মভূমি হইতে রওয়ানা হন। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করিয়া শেষে তিনি মিসরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে হিজায বন্দরে পৌঁছিয়া মক্কা শরীফে যাইবার উদ্যোগ করেন। সেই দেশের রাজা তখন মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইবনে বতুতা সেই জন্য তথায় কোন জাহাজ না পাইয়া পুনরায় মিসরে ফিরিয়া আসেন। সেখান হইতে তিনি সীরিয়া দেশে যান। দমশকে (Damascus) হদীসের বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে দুইজন বিদুষী রমণীয়ও ছিলেন। তারপর তিনি তথা হইতে গত বৎসরের হয্যের সংকল্প পূরণের জন্য প্রথমত: মদীনা শরীফে উপস্থিত হন। তৎপরে মক্কা শরীফে যাইয়া হয্য সম্পন্ন করেন।[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১১৬

ইবনে বতুতার জন্মভূমি মরক্কো। তিনি যখন বাংলা সফর করেন তখন তার বয়স ৪২ বছর, ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পুরো নাম শেখ আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ। এর বেশ আগে তিনি ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে পৌঁছান। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক যোগ্যতা দেখে তাঁকে দিল্লির কাজী নিযুক্ত করেন। প্রায় আট বৎসর তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। এরপর সুলতান তাকে চীনে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে যান এবং সেখানে এক বৎসর বিচারক পদে কাজ করেন। ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহল অভিমুখে রওনা হন এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছান। 'মাদুরা'য় কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি বাংলা অভিমুখে রওনা হন। তিনি প্রায় চুয়াল্লিশটি দেশ ভ্রমণ করেন। লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় ইবনে বতুতার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের বর্ণনা করে বাংলায় উপনীত হওয়ার সময়ের বর্ণনা দেন এভাবে :

> সেখান হইতে (মালদ্বীপ) জাহাজে রওনা হইবার ৪৩ দিন পরে বাঙ্গালাদেশের সপ্তগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নদীপথে কামরুপে গিয়া শেখ যেলাল উদ্দিন তবরিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে সোনারগাঁয় উপস্থিত হন। অনুমান হিজরী ৭৪৬ অব্দের প্রারম্ভে ইবনে বতুতা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।
>
> সোনারগাঁ হইতে একটি চীনা জাহাজে চড়িয়া ইবনে বতুতা আরাকান ও পেগুর তীর দিয়া সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে মালিক জাহির রাজা ছিলেন। সুমাত্রা হইতে মূল যাবা পৌঁছেন।মূল যাবা সম্ভবতঃ শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচিন। সেখান হইতে চীন দেশে গিয়া কিছুদিন সেখানে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় সুমাত্রায় উপস্থিত হন।[১]

লেখক 'যাবা' বলতে 'জাভা' বুঝিয়েছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। লেখক অতঃপর ইবনে বতুতার লিখিত ভ্রমণকাহিনির ১৩ অধ্যায়ের বঙ্গালহ (বঙ্গদেশ) অংশের ১ম পরিচ্ছেদ (বঙ্গদেশের সুলভতা), ২য় পরিচ্ছেদ (সদকাওয়ান : সপ্তগ্রাম বা সাতগা), ৩য় পরিচ্ছেদ (কামরু দেশঃ কামরূপ),৪র্থ পরিচ্ছেদ (সুনারকাওনঃ সোনারগাঁ) অংশটুকু অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক সুনিপুণভাবে তাঁর বিবরণটি তুলে ধরেছেন।

ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনির 'বঙ্গদেশের সুলভতা' অংশে বাংলাদেশকে বহুবিস্তৃত দেশ হিসেবে অভিহিত করেন। চাল প্রচুর পরিমাণে এদেশে জন্মে এবং এত সস্তা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে 'অন্ধকারময়' বলেছেন। খোরাসানের (ইরানের একটি প্রদেশ) লোকে একে 'দোযখপুর নিয়ামত' অর্থাৎ 'সম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেছেন বলে উদ্ধৃত করেন। যেসব ক্রয়যোগ্য বিষয়ের ও দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তা হলো দুধওয়ালা মহিষ, গাভি, মুরগি, পায়রা, ভেড়া, গোলাপ, ঘি, চিনি, সরিষার তেল, তুলার কাপড় এমনকি সুন্দরী বাঁদি ও গোলাম আছে। মানুষ কেনা-বেচার কথাও জানতে পারি ইবনে বতুতার লেখায়। পাশাপাশি ইউরোপের সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের পার্থক্যও তুলে ধরা হয় ভ্রমণকাহিনিতে। বিভিন্ন বিক্রয় সামগ্রীর মধ্যে নারীর কথা বলতে গিয়ে শেষে তিনি যা বলেছেন, লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় তা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৩০ গজ লম্বা তুলার কাপড়ের দাম ২ দীনার এবং সুন্দরী বাঁদীর দাম ১ সোনার দীনার (যাহা পশ্চিম দেশের দুই দীনারের সমান)। আমি এই মূল্যে 'আশূরহ' নামে একটি বাঁদী কিনিয়াছিলাম। সে খুব সুন্দরী ছিল। আমার একজন সঙ্গী 'লুলু' নামে একটি অল্প বয়সের গোলাম ২ দীনারে খরিদ করিয়াছিল।[১]

উপর্যুক্ত প্রবন্ধ দুটিতে আমরা বাংলা অঞ্চলের তৎকালীন সময়ের অনেক অজানা ও আকর্ষণীয় তথ্য অবহিত হয়ে পুলকিত হই।

তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তি নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (পত্রিকাটির প্রকাশিত সর্ববৃহৎ সংখ্যা) চট্টগ্রামের রাউজান অঞ্চলের একজন অন্যতম সাধক-মনীষী গাজী বড় আদম লস্কর এর নামে তাঁরই এক অধঃস্তন বংশধর আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামৎ উল্লাহর তিন পৃষ্ঠাব্যাপী এরকম একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান'। লেখক আদম লস্করকে চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট মনীষী হিসেবে পাঠকদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেন, যিনি বাংলার শাসক সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১) এর রাজত্বকালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। নসরত শাহের পাশাপাশি গাজী বড় আদম লস্করের স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান চট্টগ্রামে থেকে তাঁদের অতীত গৌরব ঘোষণা করছে বলে লেখক জানান। লেখক কবি আলাউলের (১৬০৭-১৬৭৩ খ্রি.) স্মৃতিচিহ্নের পাশাপাশি অন্যান্যদের পরিচিতিমূলক নিদর্শনের উল্লেখ করে লেখেন :

> চট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদ শহরের অদূরবর্ত্তী ফতেহ্ আবাদ গ্রামে নসরত শাহের বাটী ও দীঘিকা, তাহার অদূরে কবি আলাউলের দীঘিকা, হাটহাজারীর শাহী মসজিদ, রাউজান মহকুমার কদলপুর গ্রামে লস্কর উজিরের দীঘিকা ও রাউজান গ্রামের রায়মহলের দীঘিকার নির্ম্মল সলিলের প্রতি অবলোকন করিলে তৎসমুদয়ের জীর্ণাবস্থা সত্ত্বেও প্রাণে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।[২]

লেখক তাঁর এই রচনার অন্যতম উৎস হিসেবে ফারসি ভাষায় লিখিত একটি জীর্ণ 'শাষারা' বা বংশ তালিকা পত্রের উল্লেখ করেন যেখান থেকে এই মনীষী সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বলে দাবি করেন।

মহাত্মা গাজী বড় আদম লস্করের 'আদি জন্মস্থান' খায়বর, তাঁর পিতার নাম গাজী হামদানী। তিনি পারস্যের আতাবক আজম সাআদ ইব্‌নে জঙ্গীর পরিবারের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যা লেখক তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। আদম লস্কর ধর্মবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে তিনি ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করে দুর্ভেদ্য ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে ১০৭৬ হিজরিতে (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) দিল্লিতে আগমন করেন। অতঃপর লেখক তাঁর বর্ণনায় বলেন :

> বাদশাহ আলমগীর তাহার শৌর্য্যবীর্য্য দর্শন করিয়া, বিশেষ : সাধনায় তাহাকে একজন সিদ্ধ সাধু পুরুষ মনে করিয়া অতিশয় সমাদর করেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করার পর সামন্ত রাজগণের কয়েকটি বিদ্রোহ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২ আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামতউল্লাহ, 'গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৫৮

দমন করিয়া বড় আদম লস্কর নিতান্ত সম্মান ও যশের অধিকারী হন এবং তাহাকে গাজী উপাধিতে ভুষিত করা হয়।[১]

লেখক গাজী বড় আদম লস্করের 'গাজী' উপাধি প্রাপ্তির ঘটনাটি এভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। রাজ্যহারা সুলতান নসরত শাহ্ গাজী বড় আদম লস্করের সুখ্যাতি আরো আগেই শুনেছিলেন বলে লেখক জানান। সুলতানের দুর্দশার কথা শুনে গাজী সাহেব তাঁর সাথে মিলিত হন এবং একদল মুসলমান ও কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ অভিযানের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন বলে লেখক পাঠকদের অবহিত করেন। এরপর অবিবাহিত গাজী সাহেবের সঙ্গে সুলতান নসরত শাহের 'পিতৃব্য-কন্যার সহিত বিবাহও' সম্পন্ন হয় বলে লেখক জানান।[২]

গাজী বড় আদম তাঁর লোকজনসহ জাহাজে করে একপর্যায়ে চট্টগ্রাম পদার্পণ করেন, এর আগেই বড় আদমের সাথে নসরত শাহ্ গাজী নিজেকে সামিল করেন। চট্টগ্রামে তখন মগ জাতির দৌরাত্ম্য ছিল। বড় আদমের আগমনের পর থেকে চট্টগ্রাম 'ইসলামাবাদ' নামে অভিহিত হয়। এটি লেখকের বর্ণনা। চট্টগ্রামের চাটগাঁ বা ইসলামাবাদ নামকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস খান বাহাদুর হামিদুল্লা খাঁ রচিত 'আহাদুসুল খাওয়ানিন' ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'অভিভাষণে' (যেটি *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত) বর্ণিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গাজী বড় আদম লস্করের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেন, তিনি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন এবং কোলাহলশূন্য স্থান ভালোবাসতেন। তিনি অধিকাংশ সময় যোগ সাধনা ও আরাধনা করে অতিবাহিত করতেন। সুলতান নসরত শাহের সঙ্গে গাজী সাহেবের সখ্যতা এমন ছিল যে, সুলতানের বাসস্থান ও তাঁর অনুচরদের বাসস্থান নির্ধারণের পর তার উপযোগী বাসস্থান নির্ধারণের জন্য সুলতান নিজেই এগিয়ে আসেন। এ উদ্দেশে সুলতান নসরত শাহ এবং গাজী সাহেব এবং তাঁর পক্ষে আবশ্যকীয় লোকজন জলপথে 'শরেয়ানা' বা বৃহদাকার নৌকাযোগে চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে গমন করেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছাঁবার আগে নদীর স্রোত প্রতিকূল বা উজান হয়। এই কারণে গাজী সাহেবের নির্দিষ্ট স্থানের মহকুমার নাম 'রাউজান' বলে অভিহিত হয়এবং 'রাউজান' স্টেশন সংলগ্ন অনুচ্চ পার্বত্য জায়গায় গাজী সাহেবের বাসস্থান মনোনীত হয়[৩]বলে লেখক উল্লেখ করেন। সুলতান নসরত শাহের সমর্থন ও সহযোগিতার গাজী সাহেবের বাসস্থান নির্ধাররিত হয় এবং 'গাজী সাহেব স্বয়ং রাজ বংশীয় বিধায়' সুলতানের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ইত্যাদি কারণে গাজী সাহেবের বসবাস করা গ্রামের নামকরণ 'সোলতানপুর' করা হয়। এই গ্রামে আদম লস্করের বংশধরগণ এখনও বর্তমান আছে বলে লেখক নিশ্চিত করেন। গাজী সাহেব নিজ ও সুলতানের বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন তাই নয়, তিনি সুলতানের নামে পরিচিত সোলতানপুর গ্রামে বিভিন্ন পেশাজীবীর স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ্ এতদ্বিষয়ে লেখেন :

১ গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

> সোলতানপুরের উত্তর সীমায় বর্ত্তমান 'বাহক' বা 'কাহার' জাতি, দক্ষিণ সীমায় ক্ষৌরকার জাতি, পূর্ব্বসীমায় রজক জাতি, পশ্চিম সীমায় ধীবর জাতি প্রভৃতি গাজী সাহেবের আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনীত হয়। তাহাদের ভিটী ও জমি আদি গাজী সাহেবের প্রদত্ত বলিয়া পাট্টা ও দানপত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

দেখা যায়, গাজী সাহেব নিজেই শুধু নন, সুলতান নসরত শাহের মতো রাজবংশীয়দের বসবাসের যেমন সুব্যবস্থা করেছেন, তেমনি সমাজের নিম্নজাতি হিসেবে অনেকের চোখে যাদের পরিচিতি রয়েছে, তাদেরও উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

গাজী সাহেবকে নিয়ে কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে অত্র সোলতানপুর এলাকায়। সোলতানপুরে একটি প্রকাণ্ড পুকুর আছে, যা 'বাম পুকুর' নামে পরিচিত। গাজী সাহেব ঐ পুকুরের পাশ্ববর্তী একটি স্থানে (পাকা আস্তানা) বসে সাধনা বা ধ্যান করতেন। তাঁর সাধনারত অবস্থায় একটি বাম এসে তাঁর পাহারার ব্যবস্থা করত। সেই থেকে ঐ পুকুরকে বাম পুকুর নামে পরিচিত করানো হয়ে থাকে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে মহাত্মা গাজী আদম লস্করের সমাধি অবস্থিত বলে লেখক জানান।[২]

গাজী আদম লস্করের তিনপুত্রের নাম জ্যেষ্ঠানুসারে রেজা খান, ফররোখ খান, নসরত বা নফরত খান। শেষ দুই পুত্র অন্যত্র (গৌর প্রদেশে) গমনের কারণে তাঁদের 'পুন: প্রত্যাগমণের কোন তত্ত্ব' লেখক দিতে পারেননি। তবে সোলতানপুরে এখনও রেজা খানের বংশধরেরা বসবাস করছেন। লেখক নিজেকে ঐ বংশের অধস্তন পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেন। গাজী বড় আদম লস্কর থেকে প্রথম পুরুষের সূচনা ধরলে লেখকের অবস্থান দশম পুরুষ হিসেবে। লেখক রেজা খান পরবর্তী যে নামগুলি পুরুষানুক্রমে উল্লেখ করেছেন তা হলো – মোহাম্মদ মুসা খান, মুফতি মোহাম্মদ ফাজেল খান, মুফ্তি মোহাম্মদ এখওয়ানজি খান, মোহাম্মদ কালা গাজী, মুনশী মোহাম্মদ দায়েম, মুনশী জিনত আলী উকিল, মৌলভী শাহ আবদুর রহমান, তারপর তাঁর পুত্র বর্তমান লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ্। গাজী বড় আদম লস্করের সঙ্গে লেখকের পূর্বপুরুষের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য এভাবে তুলে ধরে প্রবন্ধ শেষ করেন।[৩]

'গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান' প্রবন্ধের কিছু ঐতিহাসিক তথ্যবিভ্রান্তি নিয়ে ও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের (১৮৬১-১৯৩৩) লিখিত এই প্রবন্ধের নতুন কোনো শিরোনাম ছিল না, তবে আগের প্রবন্ধের নামের সঙ্গে 'প্রতিবাদ' শব্দটি যোগ করে চমৎকার, তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ, ইতিহাসনির্ভর লেখাটি সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

লেখক প্রথমেই গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন বাদশাহ সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মক্কীর সুযোগ্য বীরপুত্র সুলতান সৈয়দ নসরত শাহ্ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ৯২৭ হিজরিতে (১৫২০ খ্রিস্টাব্দে) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন, আর তার প্রায় দেড়শত বছর পর ১০৬৮ হিজরিতে (১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে) আবুল মোজাফ্ফর মহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন. এই ঐতিহাসিক

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

তথ্য জানান। লেখক পরবর্তীকালে গাজী বড় আদম লস্কর এর অধস্তন পুরুষও পূর্ববর্তী প্রবন্ধের লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামতউল্লাহর দাবিকৃত ও প্রাপ্ত 'শাষারা' বা 'বংশলতিকা পত্র', যা আলমগীর ও নসরত শাহের মোহরযুক্ত সেটিরই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নসরত শাহ্ ও আলমগীরের রাজত্বকালের ব্যবধান প্রায় দেড়শত বছর এবং তাঁরা ভারতবর্ষের দুই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। সেখানে কীভাবে দুই বাদশাহের 'মোহরযুক্ত' শাষারা বা বংশতালিকা থাকতে পারে, তা এক বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার বলে প্রতিবাদকারী লেখক বলেন।

মূল প্রবন্ধের লেখক আবুল খায়রের ভাষ্য অনুযায়ী, গাজী আদম সাহেব যখন এদেশে আগমন করেন তখন গৌড়ের মুসলমান রাজাগণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। গৌড়ের এই দুর্দশার কথা গাজী সাহেবকে অবহিত করেন সুলতান নসরত শাহ। এমতাবস্থায় গাজী সাহেব একদল মুসলমান ও কয়েকজন হিন্দু সহযোগীসহ নসরত শাহকে নিয়ে পূর্ববাংলা অভিযানের জন্য সেখানে গমন করেন। লেখক রেয়াজুদ্দীন এ তথ্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ প্রবন্ধের সকল ঘটনাই অস্বাভাবিক এবং বিশ্বাসের অযোগ্য।'[১]৯৮৩ কি ৯৮৪ হিজরিতে (১৫৭৬/১৫৭৭ খ্রি.) গৌড়নগরী মহামারীতে জনশূন্য হয়ে যায়, আর ১০৭৭ হিজরিতে (১৬৬৭ খ্রি.) গাজী সাহেব গৌড়ে এসে সেখানকার মুসলমান রাজাগণকে আত্মকলহে লিপ্ত দেখতে পেলেন যা সম্পূর্ণ অবান্তর ও কাল্পনিক। তাছাড়া অবিবাহিত গাজী সাহেবের সাথে সুলতান নসরত শাহের পিতৃব্য কন্যার বিয়ে হওয়ারও প্রশ্ন আসে না, তা নিশ্চিত করেন রেয়াজুদ্দীন আহমদ। তাঁর প্রশ্ন, 'তখন গাজী সাহেব কি সুলতান নসরত শাহের আত্মার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ?'[২] এতদ্বিষয়ে প্রতিবাদকারী রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> নসরত শাহের পিতা সৈয়দ হোসেন শাহের কোন ভ্রাতা ছিলেন বলিয়াও ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে না, সুতরাং সুলতান নসরত শাহের পিতৃব্য কন্যা কোথা হইতে আসিলেন ? সম্রাট আকবরের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ সুলতান জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ বাবরশাহও সুলতান নসরত শাহ সমসাময়িক বাদসাহ ছিলেন।[৩]

সেই হিসেবে বলা যায়, লেখক (আবুল খায়র) গাজী সাহেবকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পাঁচ পুরুষ পূর্বে টেনে নিয়ে গেছেন আর নসরত শাহকে দেড়শত বছর পরে নামিয়ে দিয়েছেন। তারপর সুলতান নসরত শাহ যে কখনও সিংহাসনচ্যুত বা রাজ্য বিতাড়িত হয়েছিলেন, ইতিহাসে তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না বলে প্রতিবাদকারী লেখক জানান। এতৎপ্রসঙ্গে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নসরত শাহের রাজত্বকালের সময়সীমা ও পরিণতি নিয়ে আরো বলেন :

> সুলতান নসরত শাহ্ যে কখনও সিংহাসনচ্যুত বা রাজ্য বিতাড়িত হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি ১৬ বৎসর কিংবা তের বৎসরকাল মহাপরাক্রমের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। সুলতান বাবর কর্তৃক পরজিত ও বিতাড়িত লোদী বংশীয় সম্রাট বংশধরগণ গৌড়ে আসিয়া

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত

৩ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান: প্রতিবাদ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৬৮

তাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি দিল্লীর নিহত সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর কন্যাকে বিবাহও করিয়াছিলেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে সুলতান নসরত শাহ্ প্রায় ১৩ বছর রাজত্ব (১৫১৯-১৫৩১ খ্রি.) করার পর কোনও আততায়ী কর্তৃক নিহত হন ১৫৩১/১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বাংলায় শাসনকালের ভিতরই মোগল সম্রাট বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে উপমহাদেশে মোগল শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর সম্রাট হুমায়ুনের ক্ষমতারোহনের সময়েও তিনি (নসরত শাহ্) বাংলার শাসক ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে নসরত শাহ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে হুমায়ুনের বিরোধিতা কামনা করেন। সুলতান বাহাদুর শাহও এতে উৎসাহ দেখান। কিন্তু কোনো চুক্তি সম্পাদনের আগে নসরত শাহ পরলোকগমন করেন।[২]

প্রতিবাদকারী লেখক রেয়াজুদ্দীন আহমদ মূল প্রবন্ধ লেখক আবুল খায়রের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন, গৌড়ের মুসলমান রাজাগণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন, তাহলে গৌড়ে এক সময় কয়জন মুসলমান রাজত্ব করতেন ? এখানে 'গৌড়' শব্দটি ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। মুসলমান রাজাগণ বিভিন্ন কারণে কলহে লিপ্ত ছিলেন ঠিকই, তাবে সেটি ছিল দিল্লি, গুজরাট, বাংলা ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের মধ্যে, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। দিল্লির হুমায়ুন, বাংলার নসরত শাহ্, গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ সবাই ছিলেন মুসলমান, একই সময়ের রাজত্বকালে।

এবার গাজী আদম লস্করের নাম, পদবি ও জন্মস্থানের বিতর্কে আসা যাক। লেখক আবুল খায়র কর্তৃক গাজী আদমের 'আদি জন্মস্থান খায়বর' উল্লেখ করায় প্রতিবাদকারী রেয়াজুদ্দীন আহমদ জানতে চেয়েছেন, 'আদি জন্মস্থান অর্থ কি ? মানুষের একটিই জন্মস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে আদি শব্দের সার্থকতা উপলব্ধি হইতেছে না।' লেখক আবুল খায়র 'আদি' শব্দ পরিহার করে অথবা তার স্থানে 'পূর্বপুরুষের জন্মস্থান' বললে বিপত্তি ঘটতো বলে মনে হয় না বলে লেখকের অভিমত। তবে বিতর্ক থেকে যায় গাজী আদমের জন্মস্থানের নাম 'খয়বর' নিয়েও। প্রতিবাদকারী লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তারপর এ কোন খয়বর ? খায়বর দুইটি, এক খায়বর আরবের হেজাজ প্রদেশে মদীনা শরীফের নিকট অবস্থিত। ...আর এক খায়বর ভারতবর্ষও আফগানিস্তানের মধ্যস্থলে 'খায়বার পাস' বা 'খাইবারপাস' নামে অভিহিত। গাজী সাহেবের আদি জন্মস্থান কোন্ খায়বারে তাহাও বুঝা গেল না।
>
> তারপর গাজী সাহেবের পিতার নাম গাজী হামদানী। ইহাদ্বারা বোধ হয় তিনি হামদান বা হামাদানের অদিবাসী ছিলেন। পারস্যের অধিবাসীগণ জন্মস্থানের সঙ্গে নিজের নাম মিলাইয়া প্রধানত : ব্যবহার করেন। যথা শিরাজী, তেহরানী, এস্পেহানী, তাবরেযূ, সুস্তরী, নেশাপুরী, খোরাসানী, তুসী, আস্তববাদী, মস্হদী, ফিরোজাবাদী, গিলানী বা জিলানী ইত্যাদি।[৩]

লেখকের বর্ণনানুসারে জানা যায়, বড় আদম লস্কর সাহেবকে সম্রাট আওরঙ্গজেব 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু লেখকের পিতার নামের আগেও 'গাজী' উপাধি (গাজী মোহাম্মদ রেজা খান) দেখা যায়।

---

১ প্রাগুক্ত

২ আসকার ইবনে শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ১৬১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

আবার আদম লস্করের পিতার নামও শুধু গাজী হামদানীও হওয়ার কথা নয়, কারণ গাজী যেমন একটি উপাধি, হামদানীও তেমনি জন্মস্থানের সঙ্গে জড়িত একটি উপাধি, সুতরাং তাহার প্রকৃত বা মূলনাম কি, কিছুই বোঝা যায় না। প্রতিবাদকারী লেখক 'আতাবক' বংশ, 'লস্কর' উপাধি ও জন্মস্থান খায়বর নিয়ে আরও তথ্যবহুল বক্তব্য সাহিত্য-পত্রিকায় এভাবে তুলে ধরেন :

> তিনি পারস্যের আতাবক আজম সাআদ ইবনে জঙ্গীর পরিবারের লোক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ বংশীয় বাদশাহগণ ৬ষ্ঠ হিজরীতেই নির্মুল হইয়া গিয়াছিলেন। আদিম জন্মস্থান খায়বর-অথচ কোনও খায়বরের সঙ্গেই পারস্যের কোও সংস্রবনাই। আতাবক বংশ খাস পারস্যের অধিবাসী। 'আতাবক' রাজবংশীয় লোক হামদানীই বা হইলেন কেমন করিয়া ? ... পারস্য দেশবাসী কোনও মুসলমান নামের সঙ্গে 'লস্কর' শব্দের প্রয়োগ আদৌ দেখা যায় না। এ উপাধিটার সৃষ্টি ভারতবর্ষে।[১]

লেখক রেয়াজুদ্দীন আহমদ আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, এদেশে যাঁরা সামরিক বিভাগে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদেরই 'লস্কর' উপাধি দেখা যায়। এই গাজী আদম সাহেবের 'লস্কর' উপাধিটি কোথায় প্রাপ্ত, তা বোঝা যাচ্ছে না। 'আদম' নামেও একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, যার জন্য 'গাজী বড় আদম লস্কর' নামটি অনেকটা অস্বাভাবিক ধরনের। তাই লেখক রেয়াজুদ্দীন বলেছেন, 'শাষারাখানির হয় ঠিক পাঠোদ্ধার হয় নাই, না হয় উহা কৃত্রিম। কারণ, কোনও দিক দিয়াই উহার এক বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।'[২]

লেখক আবুল খায়র মোহাম্মদ সালামতউল্লাহ প্রবন্ধের বহুস্থানে সুলতান নসরত শাহের সাথে গাজী আদমের ঘটনাবহুল আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। লেখকের বংশতালিকা বা কুর্সিনামায় গাজী সাহেব থেকে তাঁর নাম পর্যন্ত মাত্র ১১তম পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছেন। গড়পড়তা চার পুরুষে একশত বছর ধরলে নসরত সাহের আমল থেকে ১৬/১৭ পুরুষ হওয়া উচিত। অবশ্য সম্রাট আওরঙ্গজেরেব সময় ধরলে ২৬৯/২৭০ বছরের মতো হয়, সেই হিসেবে এগার পুরুষ ঠিক হতে পারে। তবে এতেও তথ্যগত বিভ্রান্তি পুরোপুরি দূর হয় না। কারণ, সুলতান নসরত শাহকে তাঁর ঠিকুজি বা জন্ম-মৃত্যু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন লেখক আবুল খায়র ।

রেয়াজুদ্দীন আহমদ সুলতান নসরত শাহকে ইতিহাসের আলোকে যথার্থ মূল্যায়ন লেখক আবুল খায়র মোহাম্মদ সালামতউল্লাহ করতে পারেননি বলে মনে করেন, বরং নসরত শাহকে রাজ্যবিতাড়িত এবং লেখকের পূর্বপুরুষ গাজী বড় আদম লস্কর সাহেবের সাহায্য বা অনুগ্রহ প্রার্থী করে অত্যন্ত খাটো করে ফেলেছেন বলে মনে করেন। এতৎপ্রসঙ্গে রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন :

> যে মহাবীর সুলতান নসরত শাহ্ ত্রিহুতের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বধ করিয়াছিলেন, যাহার প্রবল সেনাদল সুলতান বাবরের সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনাপতি কুতুব শাহের অধীনে সুবে আউদের (অযোধ্যার) অন্তর্গত 'বাহরায়েচ' নগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, যাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি আলাউদ্দীন ও মখদুম আলম বিহারবিজয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ... যাঁহার নামে ময়মনসিংহ জেলার একটি

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত

পরগনা আজিও 'নসরতশাহী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে এমন নিসঃহায় অবস্থায় চট্টগ্রামে নিয়া একেবারে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া ফেলা ঐতিহাসিক হিসাবে গুরুতর অপরাধ।[১]

সুলতান নসরত শাহ ৯৪৩ হিজরিতে (১৫২২ খ্রি.) রাজপ্রাসাদের খোজা ক্রীতদাসদের হাতে নিহত হন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আসীন হন, তারপর তাঁকে হত্যা করে তাঁর পিতৃব্য মাহমুদ শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এই মাহমুদ শাহই প্রসিদ্ধ পাঠান বীর (পরে পাঠান সম্রাট) শের শাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে দেশ তাড়িত হয়েছিলেন।[২]

আবুল খায়রের মতে, ১০৭৬ হিজরিতে (১৬৫৫ খ্রি.) আদম লস্কর দিল্লিতে আসেন, সামন্ত রাজগণের কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করে নিতান্ত সম্মান ও যশের অধিকারী হন, তাঁকে গাজী উপাধিতেভূষিত করা হয়। কিন্তু সমাজ আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক কোনও ইতিহাসেই এই নামের কোনও সিদ্ধপুরুষ বা সেনাপতি দ্বারা কোনও সামন্তরাজের বিদ্রোহ দমনের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।[৩]

গাজী আদম লস্কর ১০৭৭ হিজরিতে (১৬৫৬ খ্রি.) গৌড়ে উপস্থিত হয়ে সেখানকার মুসলমান রাজাগণকে আত্ম-কলহে লিপ্ত দেখতে পেলেন, এ কথা আবুল খায়র মোহাম্মদ সালামতউল্লাহ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সম্রাট জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবরের শাসনামলে বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়েছে। তাই প্রতিবাদকারী লেখক রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রশ্ন করেন 'লেখক মৌলবী সাহেব কোন্ সাহসে আকবর শাহের প্রপৌত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন ? তখন গৌড়ের নাম মুছে গেছে, ঢাকায় তখন বঙ্গের রাজধানী আর নবাব শায়েস্তা খান তখন বাংলার শাসনকর্তা। ১০৭৩ হিজরিতে (১৬৫২ খ্রি.) নবাব মোয়াজ্জেম খান মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবাব শায়েস্তা খান বাংলার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন।[৪]

প্রতিবাদকারী লেখক রেয়াজুদ্দীন আহমদ অতঃপর অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন মূল প্রবন্ধ লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামতউল্লাহর উদ্দেশে :

> আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করি ১০৭৭ হিজরীতে গাজী সাহেব রাজ্য বিতাড়িত সুলতান নসরত শাহের সাক্ষাৎ কোথায় পাইলেন ? তিনি গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, একথা ত বেশ বুঝা যায়। সুলতান এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিলেন যে একজন প্রবাসী গাজী সাহেবের নিকট নিজের দুঃখ কাহিনী কহিয়া প্রতিকার প্রার্থী হইলেন ? আচ্ছা, তারপর তাহারা একদল মুসলমান ও কতিপয় মলবংশীয় হিন্দু (মলবংশীয় হিন্দু কি, আমরা ইহা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না) সমভিব্যবহারে পূর্ব্ব বাঙ্গালা অভিযানের জন্য তথায় গমন করেন। এই গমনটা কোথায় হইয়াছিল ? এই গমনটা স্থলপথে নাকি জলপথে হইয়াছিল ? আর গাজী সাহেবের শুভবিবাহটাই বা কোন স্থানে সম্পাদিত হয় ? রাজ্যভ্রষ্ট সুলতান নসরত শাহ কি পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়াই বেড়াইতে ছিলেন ? তাঁহার পিতৃব্য কন্যাটি কি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন ?[৫]

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯-৭০
২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭০
৩ প্রাগুক্ত,পৃ.৭০
৪ প্রাগুক্ত
৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

এখানে প্রশ্নের শেষ নয়। আসলে মূল প্রবন্ধ লেখক এমন প্রসঙ্গ, সময়, স্থান, ব্যক্তির ঘটনাপ্রবাহের অবতারণা ও বর্ণনা করেছেন যে, যে-কোনো পাঠকের পক্ষে প্রশ্ন উঠাই হয়তো স্বাভাবিক।

আবুল খায়র ১০৭৮ হিজরিতে (১৬৫৭ খ্রি.) আলফা হোসায়নী বাগদাদীর সঙ্গে সুলতান নসরত শাহের সাক্ষাতের কথা লিখেছেন। গত একবছর কাল গাজী সাহেব ও সুলতান সাহেব কোথায় ছিলেন, সে প্রশ্নও এসে যায়। ১০৭৭ হিজরির (১৬৬৬ খ্রি.) পূর্ববাংলা অভিযানের কী ফল হলো ইত্যাদি কোনো বিষয়েরই আদি অন্ত পাওয়া যায় না। সুলতান নসরত শাহ রাজ্যত্যাগী হয়ে যেন গাজী আদম সাহেবের মতো কেবল বিদেশীয় মুসাফিরদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন বলে মনে হতে পারে। ভ্রমণকারী, সওদাগর-এদের দ্বারা রাজ্যোদ্ধার কীভাবে সম্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে রেয়াজুদ্দীন প্রশ্ন রেখেছেন। আলফা হোসায়নী বাগদাদী নামটাও খাপছাড়া, হোসায়নী ও বাগদাদী উপাধি বাদ দিলে শুধু আলফা থাকে, যিনি বাংলায় এসেছিলেন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। রাজ্যচ্যুত সুলতান নসরত শাহ ও গাজী সাহেবের সাথে কীভাবে তাঁর সম্পর্কের সূচনা হলো, তাও স্পষ্ট নয় আবুল খায়রের লেখায়। আবার আলফা হোসায়নী বাগদাদীর পরিণতি কী হলো তার আর জানার উপায় থাকলো না।

গাজী বড় আদম সাহেব শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন বলে আবুল খায়র উল্লেখ করলেও দেখা যায় তাঁকে দুই বছর যাবৎ রাজনৈতিক গোলমাল এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই অতিবাহিত করতে হয়েছে। আবার সাধু পুরুষ ও কোলাহলশূন্য স্থান পছন্দ করা এবং অধিকাংশ সময় সাধনা ও আরাধনায় ব্যয় করে সর্বনিম্ন সময় ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমন করে 'গাজী' উপাধি পেয়েছিলেন, এটা অবিশ্বাস্য লাগে। এমনকি গাজী সাহেবের নিজ মহকুমার 'রাউজান' নামের উদ্ভব ও বিবর্তন নিয়েও ধাঁধা লাগে। এতদ্বিষয়ে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নামকরণের (রাউজান) উৎপত্তি নিয়ে বলেন :

> সুলতান গাজী সাহেবের উপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য লোকজনসহ "শরেয়অনা" বা বৃহদাকার নৌকাযোগে শহরের উত্তরদিকে গমন করিলেন। তারপর নদীর স্রোত উজান হওয়াতে গাজী সাহেবের নির্দ্দিষ্ট গ্রামের মহকুমার নাম হইল 'রাউজান' (তখন কি ঐ মহকুমা স্থাপিত হইয়াছিল এবং এখন যে অর্থে মহকুমা শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে তখন ব্যবহৃত হইত (?) অদ্ভুত ঐতিহাসিক আবিষ্কার।[১]

তবে গাজী বড় আদম লস্করের বাসস্তানের গ্রাম 'সোলতানপুর' নামটি নিয়ে তেমন বিতর্ক করার অবকাশ নেই। কারণ, যে কোনও সুলতানের নামে সোলতাপুর নামকরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ অভিযোগ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিহাসের নামে অবান্তর বিষয় লিখে প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা নষ্ট করছেন। দুই একটি স্থানের বা লোকের নাম একটু ওলট-পালট করে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করছেন। আমাদের প্রস্তাবিত লেখক সাহেব (আবুল খায়র মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ) সেই পন্থার অনুরণ করেছেন। আজকাল কৃত্রিম বা জাল শাষারা, জাল কুর্সিনামা, জাল উপাধি ইত্যাদির এত বাড়াবাড়ি হয়েছে যে, সত্য নির্ণয় কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত হাসানী, হোসায়নী, কোরেশী, হাশেমী, খালেকী, ফারুকী, আব্বাসী, খালেদী, ওসমানী, ওলুভী, জোবেরী, সুফীয়ানী, রোকনী, রুহানী, জালালী, রুমী, লোদী, লোহানী ইত্যাদি উপধিযুক্ত নতুন নতুন

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

নাম আজকাল সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হচ্ছে।[১] শতবছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হবার পরও (১৯১৯-২০২৩) আমরা লেখকের কথার প্রতিফলন এখনও দেখতে পাই।

তাই বলা যায়, গাজী বড় আদম লস্করের সঙ্গে মহাপরাক্রান্ত সুলতান নসরত শাহের যে কোন সংস্রব ছিল বা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন, একথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না। গাজী সাহেব সম্ভবত সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় এসেছিলেন বলে লেখক রেয়াজুদ্দীন আহমদ অনেকটা নিশ্চিত করেন।[২]

দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ ইতিহাসচর্চায় আবুল খায়র এবং তার বিপরীতে রেয়াজুদ্দীন আহমদের আলোচনা সাহিত্য-পত্রিকার মুক্ত ইতিহাস বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় 'ময়না' নামে সারা তয়পুরের লিখিত একটি ঐতিহাসিক চরিত্রনির্ভর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ময়না একজন নারীর নাম, যিনি ছিলেন উমাইয়া শাসক মারওয়ানের কন্যা। দীর্ঘ উমাইয়া শাসনামলের ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারওয়ান পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মারওয়ানের মৃত্যু হয়।[৩] ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ উমাইয়া শাসনের অবসানের পর আব্বাসীয় শাসনের সূচনা হয়। আব্বাসীয় শাসনে স্বাভাবিকভাবে উমাইয়া শাসক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনেকের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে।

উমাইয়া বংশীয়দের খেলাফতের অবসানে সেই হতভাগ্য পরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আব্বাসীয় ব্যক্তিগণের আক্রমণের বা প্রতিহিংসার শিকার হন। তৃতীয় আব্বাসীয় খলিফা মেহ্দীর রাজত্বকালে তাঁর মহিষী 'খেযরান' (যিনি পূর্বে খলিফার বাঁদি ছিলেন এবং পরে খলিফার স্ত্রী হন) একদিন রাজ-অন্তঃপুরে বসে আজ্ঞা প্রচার করেছিলেন, এমন সময় জনৈক বাঁদি এসে সসম্ভ্রমে নিবেদন করল, সম্রাজ্ঞীকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুন, বাইরে একজন নারী সাক্ষাতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, বহু জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও সে নিজ পরিচয় বা সাক্ষাতের কারণ ব্যক্ত করছে না, যদি অনুমতি দেন তবে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেই। খেযরান একটু চিন্তা করে মহিলাকে সামনে আনতে আদেশ দিলেন, কিছুক্ষণ পরে সেই বাঁদীর সাথে জীর্ণদশাগ্রস্ত এক রূপসী যুবতী খেযরানের সামনে উপস্থিত হলো। যুবতীকে দেখে মনে হলো, সে কোনো সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা। তার অভাবক্লিষ্ট চেহারা ও পোশাক দেখে তার বিপন্নাবস্থা বোঝা যাচ্ছিল। ময়না খেযরানকে অভিবাদনপূর্বক নিজেকে 'উমাইয়া বংশের' শেষ খলিফা মারওয়ানের দুর্ভাগ্যপীড়িতা তনয়া হিসেবে পরিচয় দিল। তার পরিচয় শুনে খেযরান চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তোকে চিনিয়াছি, তুই দূর হ! তোর সালামের প্রত্যুত্তরও আমার কাছে নেই।' সে আরো বলল :

> যে দিন ইব্রাহীম আব্বাসীয়ার শবদেহ বিনা 'গোর কাফনে' লুটাইতেছিল সেদিন আব্বাসীয়া পরিবারের প্রবীণা মহিলাগণ তোর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার সৎকারের অনুমতির জন্য তোকে তোর পিতার কাছে একটু অনুরোধ করিতে কত মিনতি করিয়াছিল। তোর মানবহৃদয় সে কাতরক্রন্দনে ব্যথিত হয় নাই। সেদিন তুই তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া হরম (অন্তঃপুর) হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলি। সে

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত

৩ সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, মফিজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৬, ২য় সংস্করণের ৪র্থ পুনর্মুদ্রণ, পৃ.৬৭-৬৯

> দিনের কথা তোর মনে পড়ে কি? আজ আবার কোন সাহসে তুই আমার দ্বারদেশে আসিয়াছিস! খোদা তা'লার অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি তাহার অনুগ্রহ রাশি হইতে তোকে বঞ্চিত করিয়া আজ দূর্দশা ও ক্লেশের এই চরম সীমায় উপনীত করিয়াছেন।[১]

খেযরানকে এইরূপ উত্তেজিত দেখে ময়না ভীত হলো না বরং সহাস্যে স্বীকার করল, খেযরানের সব অভিযোগ সত্য ও যথার্থ। তার দুষ্কর্মের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ রাজৈশ্বর্য তার নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছেন এবং ক্ষুধার্ত ও অর্ধনগ্ন বেশে খেযরানেরই দ্বারে তাকে উপনীত করেছেন বলে উচ্চারণ করলো। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও শোকরের পুরস্কারস্বরূপ খেজরানের হাতে এখন রাজদণ্ডের ক্ষমতা আর ভাগ্যে মহারানীর সম্মান।তাকে (ময়না) তার নিয়তির ফল নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে, এরকম বলে বিদায় হওয়ার সময় পিছন ফিরতেই খেযরানের মনে ময়নার কথাগুলির আশ্চর্য রকমের প্রতিক্রিয়া হলো।এর পর লেখকের বর্ণনায় :

> অনুতপ্ত হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ খেযরানকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি দৌড়াইয়া ময়নাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে টানিয়া কাছে বসাইয়া নানান প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মুহূর্তের ইঙ্গিতে দাসীগণ ময়নাকে সসম্মানে হাম্মামে (স্নানাগারে) লইয়া গেল এবং মূল্যবান পরিচ্ছেদে ভূষিত করিয়া নানা প্রকার সৌগন্ধি দ্রব্য দ্বারা প্রসাধন সম্পন্ন করিল।[২]

খেযরান ও ময়নার বন্ধুত্ব হওয়ার পর দুজনে অতঃপর একসাথে আহার করতে বসলেন পরম প্রীতির সাথে। আহার শেষে খেযরান ময়নাকে বললেন :

> ময়না! এ পৃথিবীতে এখন তোমার আপনার বলিবার কেহই নাই। আজ হইতে আমাকে তোমার সহোদরের চক্ষে দেখিও। এই বিস্তৃত হরমের আজ হইতে তুমিও একজন অধিশ্বরী। এখন হইতে তুমি আমার ভগিনী ও সহচরীরূপে এখানেই অবস্থান করিবে।[৩]

এই মহৎ কাজের জন্য খেযরানের মনে এক অভাবনীয় সুখ ও শান্তি বিরাজিত হলো যা বর্ণনার অতীত। খেযরান ভাবতে লাগলেন, এমনো দিন ছিল যখন ঐশ্বর্য ও গৌরব ময়নার মতো হতভাগ্য নারীকে অস্থির করে রেখেছিল। সূর্যের প্রখর উত্তাপ তার কোমল মুখ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু নিয়তির বিচিত্র লীলায় দুঃখের কালিমা ময়নার কোমল মুখায়বকে মলিন করে ফেলেছে। কালচক্রে আজ এই নারী খেযরানের শরণাগতা।

বিচিত্র কী যে, আব্বাসীয় বংশের অনেকে এদের পূর্ব পুরুষের যত্নে প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয়েছে। এখন কেবল যত্ন ও অর্থ দ্বারাই এর ক্লিষ্ট হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়া যায়। খেযরান আমীরুল মোমেনীনখলিফা মেহেদীর নিকট সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিল। খেযরানের মহত্ত্ব ও উদারতার বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে খলিফা পরম পুলকিত হলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ময়নার নিকট তাঁর (খলিফার) অভিবাদনসহ একশত থলেপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা খেয্রানের নিকট পাঠালেন।

---

১ বিবি সারা তয়ফুর, 'ময়না', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ.১১৬-১১৭
২ প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭
৩ প্রাগুক্ত

অতঃপর ময়না খেযরানের সান্নিধ্যেই থেকে গেল। খলিফা মেহেদী ('খেলাফত'কাল ৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ হারুন ('খেলাফত'কাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) তাকে পরম সম্মানও সমাদর করতেন। হারুন-উর-রশীদের খেলাফতের প্রারম্ভে ময়না ইন্তেকাল করেন এবং শোকাতুর খলিফা হারুন কর্তৃক তাকে রাজকীয় সম্মানে সমাহিত করা হয়। এতদ্বিষয়ে লেখকের মন্তব্যটুকু সমকালেও প্রণিধানযোগ্য :

> একদিন খোদাতা'লার অর্পিত অনুগ্রহ রাশির সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বগামিগণ শত্রুর সহিতও কত মহাদাচরণ করিয়াছেন, আর আমরা তাহার শতাংশের একাংশও আমাদের অভাব পীড়িত আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত করিতে পরাঙ্মুখ হই। এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা প্রভাবে আমাদের দরিদ্র আত্মীয় বন্ধুগণকে সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করা তো দূরের কথা-তাহাদের সহিত আত্মপরিচয়টুকু দেওয়াও অপমান জ্ঞান করি। তাহাদিগকে দেখিলে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লই। এইতো সমাজের অবস্থা।[১]

এরূপ ঐতিহাসিক মানবিক ঘটনার মধ্যে সবার জন্য শিক্ষণীয় উপাদান আছে বলে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক সারা তয়ফুর মনে করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'সুলতান সালাহ্উদ্দিন ও ক্রুসেড' প্রকাশিত হয়। 'ক্রুসেড' শব্দের অর্থ 'ধর্মযুদ্ধ' যা খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ব্যবহার করত। দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আটটি বড় বড় ও অনেকগুলি ছোটখাটো ক্রুসেড সংঘটিত হয়।[২] ক্রুসেডরত সমগ্র খ্রিষ্টান ইউরোপের মোকাবিলায় মুসলিম শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসেবে শত শত বৎসর ধরে মুসলিম জনগণ যে একটি ব্যক্তিকে প্রাণের সেবটুকু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ অনুভূতি দিয়ে স্মরণ করে আসছে, তিনিই সালাউদ্দিন (১১৩৭-১১৯২)।[৩] সেনা বিভাগের একজন সামান্য কর্মচারির পদ থেকে উন্নতি লাভ করে, অল্পকালের মধ্যে তিনি পশ্চিম এশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হন। ইউরোপীয় খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণের ভীষণ আক্রমণ থেকে মুসলিম রাজ্য উদ্ধার করে, ধ্বংসের কবল থেকে ইসলামকে রক্ষা করেন। সুলতান সালাউদ্দীন ক্রুসেড যুদ্ধে কিভাবে জয়ী হয়ে মুসলিম জগতে অতুলনীয় কীর্তি রেখে গেছেন, তাই আলোচনা করেছেন লেখক। তাঁর আবির্ভাব ও সফলতা লাভ করা কেমন করে সম্ভব হলো তা জানার জন্য পূর্ব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন লেখক কাজী ইমদাদুল হক।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশ বাগদাদে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে। ঠিক এর একশত বৎসর পরে খলিফাদিগণের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হতে আরম্ভ করে। খোরাসান, তুর্কিস্থান, পারস্য প্রভৃতি পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলি প্রথমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মিসর রাজ্যে আহমদ ইবনে তুলুন ৮৬৮ সালে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করতেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
২ ড. এম. আবদুল কাদের, *ক্রুসেডের ইতিহাস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, আগষ্ট ২০১৮, পৃ. ৭
৩ ড. এম. আবদুল কাদের, *সুলতান সালাহউদ্দীন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, আগষ্ট ২০১৮, পৃ. ৭

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমী বংশের এক শাখা শিয়া-মত প্রচার করে নতুন শক্তির ভিত্তি স্থাপন করলেন, তখন মিসরে আর আব্বাসীয় গোত্রের কর্তৃক টিকল না। মিসর, ইয়েমেন, হেজাজ এমনকি সিরিয়ার উত্তর সীমা পর্যন্ত সমগ্রদেশ এই শিয়াশক্তির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। এই নতুন রাজ্যে এক নতুন শিয়া খেলাফত স্থাপিত হলো এবং প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ফাতেমীবংশীয় শিয়া খলিফারা সেখানে অপ্রতিহত গতিতে রাজত্ব করলেন।

এদিকে পূর্বের রাজ্যগুলিতে বারবার বিপ্লব ঘটতে ঘটতে অবশেষে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১০৫৫ খ্রি.) সেলজুক বংশের আধিপত্য স্থাপিত হলো। বিখ্যাত তুঘরল বেগ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর বাগদাদে প্রবেশের মাধ্যমে সেলজুকশাসনের শুরু।[১] সেলজুক সুলতানগণ অপ্রতিহত প্রভাবে, দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের সাথে রাজ্যশাসন করেছিলেন। নিঃসন্তান তুঘরল বেগের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আর সালান সুলতান হন। ইনি গ্রিকদিগের আক্রমণ থেকে তৎকালীন রুম প্রদেশ অর্থাৎ এশিয়া মাইনর উদ্ধার করেন। আলপ-আর-সালানের পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র লেখক লেখেন :

> সুলতানদের আমলে মোসলেম রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন প্রণালীতে কতকটা ইউরোপীয় Feudal System দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রদেশগুলি প্রধানত : সেলজুক সুলতানগণের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এই সর্ত্তে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত যে, তাঁহারা যুদ্ধকালে সুলতানের পক্ষ সমর্থন করিবেন।[২]

এ রকম অবস্থার মধ্যে ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তি ক্রুসেড নামক ‘ধর্মযুদ্ধ’ আরম্ভ করবার নাম করে মুসলিম রাজ্যের উপর এসে পড়ে। ১০৯৭ সালে বসফরাস প্রণালি অতিক্রম করে সাত লক্ষ ক্রুসেডার একযোগে এশিয়া মাইনরে এসে প্রবেশ করে। পথে রুম-সালতানাতের গ্রাম ও নগরসমূহ ধ্বংস করতে করতে এসে এরা এ্যান্টিয়ক নগর অবরোধ করে। নয়মাস কাল এ্যান্টিয়ক অবরোধ করে ক্রুসেডারেরা তা দখল করে এবং দশ লক্ষ নরনারীকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর তারা জেরুজালেম দখল করে এবং সেখানকার সত্তর হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে ফেলে। জেরুজালেম দখল করার পর সীজারিয়া, ত্রিপলি প্রভৃতি সাগরতীরস্থ সমৃদ্ধশালী কয়েকটি নগর একেবারে বিধ্বস্ত করে তবে শান্ত হয়।[৩] এ সময়মুসলিম সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সালতানাতে বিভক্ত হওয়ার ফলে ক্রুসেডারেরা প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিকাংশ হস্তগত করে ফেলে।

এ দিকে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। এ কারণে ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিহত করার মত চেষ্টা সফলভাবে করতে পারেনি। অতঃপর সেলজুক বংশীয় অন্যতম সুলতান মাহমুদের দরবারে ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী নামক এক মহাবীরের অভ্যুদয় হয়। অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ শৌর্য্য ও তীক্ষ্ম বৃদ্ধি দেখে একে ‘আতাবেক’ উপাধি দিয়ে মসুল ও উত্তর মেসোপটেমিয়ার সুলতানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই আতাবেক জঙ্গীই সর্ব প্রথম ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হন এবং ক্রমশ তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে অনেকটা দেশ পুনরুদ্ধার করেন।[৪]

---

১ কাজী ইমদাদুল হক, ‘সুলতান সালাহ্উদ্দীন ও ক্রুসেড’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১২০

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী ১১৪৪ সালে ক্রুসেডারদের প্রধান কেন্দ্র দুর্গ এডেসা আক্রমণ করেন। যুদ্ধের আগে তিনি নগরবাসীকে বলে পাঠান যে, যুদ্ধে ক্রুসেডারেরা আত্মসমর্পন করে তাহলে তিনি তাদের প্রাণ ও সম্পত্তি উভয়ই বিধিমত রক্ষা করবেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা এতে রাজী হলো না। যুদ্ধ হলো এবং তিনি জয়লাভ করলেন। এর দুই বছর পর তিনি গুপ্ত ঘাতকদের হাতে নিহত হলে তার চারপুত্রের একজন নুরুদ্দীন পিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

এ দিকে এডেসা মুসলমানদের দখলে এসেছে শুনে ইউরোপে মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। বিপুল সমারোহে দ্বিতীয় ক্রুসেডের আয়োজন হলো। প্রায় নয় লক্ষ খ্রিস্টান এবার এশিয়া আক্রমণ করতে এলো। কিন্তুসৌভাগ্যক্রমে এবার তারা মুসলিম রাজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারলো না। ১১৪৮ সালে আতাবেক সইফ উদ্দীন ও নুরুদ্দীনের পরাক্রমে জর্জরিত হয়ে প্রায় সব সেনা উৎসর্গ করে দিয়ে ক্রুসেড নেতা ফরাসি ও জার্মান সম্রাটগণ ঘরে ফিরে গেলেন।[১]

অতঃপর নুরুদ্দীন অমিত বিক্রমে ক্রুসেডারদের থেকে দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর কেড়ে নিতে আরম্ভ করলেন। দামেস্কে এ সময় একজন দুর্বল নিষ্কর্মা সুলতান রাজত্ব করছিলেন, খ্রিস্টানরা তা অধিকার করার আশঙ্কায় দামেস্কের অধিবাসীর নুরুদ্দীনকে নিমন্ত্রণ করে আনে এবং তার অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করে। তখন নুরুদ্দীন প্রায় সমত্র সিরিয়া প্রদেশের সুলতান হলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে বাগদাদের খলিফা মুকতাফীর তাকে 'আল-মালিক উল-আদিল' (ন্যায়বান রাজা) উপাধি দান করেন। নূরুদ্দীন ও ক্রুসেডারদের মধ্যে স্বল্পকালব্যাপী শান্তি স্থাপিত হয়।[২]

সুলতান নূরুদ্দীনের অধীনে সালাহউদ্দীন প্রথমে একজন সামান্য সৈনিক কর্মচারি ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অসাধারণ গুণে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান নূরুদ্দীন তাঁকে সেনাপতি পদে উন্নীত করেন। পরে'আমীর-অল্-ইস্ফাহ সানার' উপাধি দিয়ে তাঁর পিতার উত্তরাধিকার করে মিসরে উজির করে পাঠিয়ে দেন। মিসরের খলিফাও পিতার উপযুক্ত পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।[৩] তখন থেকেই সালাহউদ্দীন মিসরের প্রকৃত অধিকারী হলেন।[৪] *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* এতদ্বিষয়ে আরো লেখা হয় :

> সুলতান সালাহ্উদ্দীন যে রাজ্যের উত্তরাধিকার পাইলেন, সমগ্র মিসর, আরব দেশের ইয়েমেনওহেজাজ এবং প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া প্রদেশের উপকূলভাগ তাহার অন্তর্গত ছিল। প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ এবং সিরিয়ার উপকূলস্থ অনেকগুলি নগর ইতিমধ্যে ক্রুসেডারদিগের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সাগরতীরস্থ কয়েকটি নগর ব্যতীত আর সমস্তই তিনি ক্রুসেডারদিগের ক্রূর হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বাঞ্চলে পারস্যের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩
২ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩ এবং *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
৩ *সুলতান সালাহ্উদ্দীন ও ক্রুসেড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৪ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৫ *সুলতান সালাহ্উদ্দীন ও ক্রুসেড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

অনেক ঘটনা পরম্পরায় অবশেষে ১১৮২ সালের শেষভাগে সুলতান সালাহ্উদ্দীন পশ্চিম এশিয়া ও মিসর দেশের একচছত্র সম্রাট বলে স্বীকৃত হলেন। রুম (অর্থাৎ এশিয়া মাইনর) এবং আর্মেনিয়ার সুলতানগণও তার বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল জেরুজালেম এবং প্যালেস্টাইনের উপকূলভাগের কিয়দংশমাত্র ক্রুসেডারগণের হাতে থেকে যায়। ১০৯৮ সালে জেরুজালেম বিজয়ের পর থেকে সেখানে ক্রুসেডারগণের এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। এক ইউরোপীয় খ্রিস্টান রাজা সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। সালাহ্ উদ্দীনের সমকালে ৪র্থ বলড উইন রাজা হন। তার সাথে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের এক সন্ধি হয়েছিল কিন্তু ক্রুসেডাররা তার এই সন্ধির শর্ত রক্ষা করেনি।সুতরাং সালাহ্ উদ্দীনকে আবার যুদ্ধে নামতে হয়। তিনি নিজে অপরাধীর শাস্তিবিধানের জন্য কারাক দুর্গ অবরোধ করলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র মালিক-উল-আফজালকে গ্যালিলি অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। কারাক অবরুদ্ধ হওয়ার খবরে ক্রুসেডারগণ দল বেঁধে মালিক-উল-আফজালকে আক্রমণ করবার জন্য গ্যালিলির দিকে অগ্রসর হলো। কাজেই সুলতানও পুত্রের সাহায্যার্থে সেদিন যেতে বাধ্য হলেন।[১] শত্রুপক্ষের বিশাল বহরের উল্লেখ করে কাজী ইমদাদুল হক *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> দল এমন ভারী হইয়াছে যে, সুলতান সালাহ্উদ্দীন ইতিপূর্বে এরূপ বিশাল শত্রুসেনার সহিত কখনো লড়িতে হয় নাই। টাইবেরিয়াস বা হিত্তিন নামক স্থানে ১১৮৭ সালের ৩ জুলাই তারিখে খ্রীষ্টান মোসলেম এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধেই ক্রুসেড রাজ্যের কপাল ভাঙ্গিল দশ সহস্র যোদ্ধার মৃতদহে ময়দানে রাখিয়া ক্রুসেডাররা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল।[২]

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, রাজা গী, কাফেলা লুণ্ঠনকারী, রেজিনাল্ডসহ অনেক বড় বড় যোদ্ধা বন্দী হয়েছেন। রাজা গীকে পরম যত্নে ও সম্ভ্রমের সহিত রাখা হলো কিন্তু কাফেলা লুট করে নিরীহ বণিকগণকে হত্যা করার অপরাধে রেজিনাল্ড ও অন্যান্য সন্ধিভঙ্গকারীগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

পর্যায়ক্রমে সুলতান সালাহ্উদ্দীন বিপুল বিক্রমের সাথে ক্রুসেড রাজ্যের নগরের পর নগর, দুর্গের পর দুর্গ দখল করে যেতে লাগলেন। ত্রিপলি, একর, সীজারিয়া, জাফা, বৈরুত প্রভৃতি প্রধান নগর সুলতানদের অধিকারে এসে পড়ল। তবে তখনও জেরুজালেমে আরো ষাট হাজার ক্রুসেডসৈন্য অবস্থান করছিল। এই জেরুজালেম সব ধর্মের পবিত্রস্থান বিধায় সাল্‌হউদ্দীন তাদেরকে যুদ্ধের পরিবর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন, পাশাপাশি তাদের স্বাধীনতাদানের সুবিধাসহ অর্থকড়ি প্রদানের আশ্বাস দেন, জমি প্রদান ও চাষাবাদের অনুমতিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু এ প্রস্তাব তাদের ভালো লাগলো না। তারা অর্থাৎ ক্রুসেডাররা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে সাল্‌হউদ্দীন দৃঢ়রূপে জেরুজালেম অবরোধ করে বসলেন। এর ফলে ভীত হয়ে ক্রুসেডারগণ সাল্‌হউদ্দীনের নিকট কৃপাভিক্ষা ও সন্ধির প্রস্তাব করল। তার হৃদয়ের স্বাভাবিকে মহত্বে সুলতান অবরুদ্ধ নগরবাসীকে মুক্তিদান করলেন। সুলতানের ভাই মালিক-উল-আদিল আরো সাত হাজার জনকে মুক্তি দান করেন। পুরুষ, মহিলা,শিশুদের জন্য যথাক্রমে মুক্তিপণ হিসেবে ১০, ৫ ও ১ দিনার নির্ধারিত হলেও

১ *সুলতান সালাহ্উদ্দীন ও ক্রুসেড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

তাদের দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হয়।[১] জেরুজালেমের রানী সিবিলা সঙ্গীসহ যখন বিদায় নিতে এলেন, তখন সালা্হউদ্দীন যথাযথ সম্ভ্রমের সাথে তাঁকে বিদায় দিলেন, তার স্বামী এবং পুত্রও বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে রানীর সঙ্গী হলেন। এতদ্বিষয়ে কাজী ইমদাদুল হক সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> সুলতান সালা্হউদ্দীন খ্রীষ্টান ক্রুসেডারগণের অমানুষিক অত্যাচারের ও ভীষণ হত্যাকান্ডের প্রতিদানে এইরূপ মহানুভবতার অত্যাচারের পরিচয় দিয়া, জগতের উতিহাসে যে তাহার নাম মহাপুরুষেমন্ডলীর শীর্ষস্থানে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।[২]

সুলতান সালা্হউদ্দীনের সদাশয়তার যে সকল ক্রুসেড যোদ্ধা জেরুজালেম থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তারা কিন্তু টায়ারে নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হলেন এবং আবার যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন । দেখতে দেখতে সিরিয়ার উপকূলভাগ খ্রিস্টান যোদ্ধায় ভরে গেল।

১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে একর নগর ক্রুসেডারগণের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং ক্রমাগত তিন বৎসর কাল এই অবরোধ চলতে থাকে। এই সময় সালা্হউদ্দীন তাঁর সৈন্যদলকে বহুদলে বিভক্ত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যদলের অবস্থান নিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখা হয় :

> একদল ছিল মিসরের সাগরতীর রক্ষা করিবার জন্য ; দ্বিতীয় একদল টায়ারের ক্রুসেড সৈন্য ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিল, তৃতীয় একদল ত্রিপলির সীমান্ত রক্ষা করিতেছিল, এবং চতুর্থ দল আন্তিয়কের রাজ বোয়মন্ডের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।[৩]

ক্রুসেডারগণের অনেক প্রতিরোধ ও আক্রমণ প্রতিহত করতে সুলতান সালা্হউদ্দিনকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্র তকিউদ্দীন এরূপ প্রচণ্ডবেগে ক্রুসেড সৈন্যের উপর পতিত হলেন যে, দেখতে দেখতে তারা হটে গেল এবং শত্রুসেনা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নগর দ্বারপথ মুক্ত করে দিলো।[৪] সালা্হউদ্দিন তৎক্ষণাৎ নগরবাসী সৈন্যের বল বৃদ্ধির জন্য কয়েকজন সেনানায়ককে সৈন্য ও প্রচুর রসদসহ 'একরে' পাঠিয়ে দিলেন।

পরবর্তীকালে ক্রুসেডারগণ আবারও সংগঠিত হয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। জার্মার্নির সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসার নেতৃত্বে তাঁরা এ আক্রমণ শুরু করে। এতে সালাহ উদ্দীনের বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে ফ্রান্সের কাউন্ট হেনরি সদলবলে এসে স্থলাভিষিক্ত হলেন। এতে ক্রুসেডারগণের মধ্যে আবার নতুন উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। সুলতান এতে খানিকটা বেকায়দায় পড়লেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৪ প্রাগুক্ত

প্রায় দুই বছর কোনো পক্ষের জয়-পরাজয় নিশ্চিত হলো না। এমন সময় খবর পাওয়া গেল ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড বিপুল একদল সৈন্য নিয়ে ক্রুসেড করতে আসছেন। অবরুদ্ধ 'একরে'র অবস্থা খারাপ দেখে সুলতান তাড়াতাড়ি এক জাহাজ রসদ রিচার্ডের পৌছাবার আগেই সেখানে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলেন। রসদসহ জাহাজ শত্রুর হাতে গিয়ে পড়ার উপক্রম হলে তখন পোতাধ্যক্ষ ইয়াকুব অল্ হালেবী নিজ হাতে জাহাজের তলা ভেঙ্গে জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন।

ক্রমাগত তিন বছর অবরোধের পর 'একরে'র দুর্গাধিপতি মশতুব সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফরাসিরাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মশতুব (মুসলিম পক্ষীয়) প্রতিজ্ঞা করলেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে সবাই প্রাণ বিসর্জন করবেন।

অবশেষে আর উপায় না দেখে মুসলিমরা শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। শর্ত হলো এই যে, জেরুজালেম থেকে যিশুখ্রিস্টের আসন ক্রুশদণ্ড এবং ১৬০০ খ্রিস্টান বন্দি মুসলমানরা প্রত্যর্পণ করবে এবং দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করবে ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রাণে মারবে না। অতঃপর খ্রিস্টানদেরকে নগরে প্রবেশ করতে দেয়া হলো।

শর্ত মোতাবেক মুসলমানদের অর্থ দিতে দেরি হওয়ায় রাজা রিচার্ড আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি সমুদ্রতীরস্থ নগর ও ক্রুশদণ্ড ফেরত চাইলেন। এ শর্তের বরখেলাফ মেনে নেয়া অসম্ভব বিধায় আবার সুলতানের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেল কিন্তু কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলো না। এমতাবস্থায়আবারও রিচার্ড সন্ধির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।[১] কিন্তু তার এ সন্ধির সাথে যে শর্তগুলি জুড়ে দেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে লেখক ইমদাদুল হকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো :

> তিনি দ্বিতীয়বার প্রস্তাবকরে পাঠালেন যে, তাহাঁর ভগিনী সিসিলির বিধবা রানীর সহিত সুলতানের ভ্রাতা সইফউদ্দীনের বিধবা হউক; বিবাহের যৌতুকস্বরূপ রিচার্ড দিবেন সাগরতীরস্থ নগরগুলি এবং সুলতান দিবেন খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে বিজিত প্রদেশ; সইফউদ্দীন ও সিসিলির রানী উভয়কে জেরুজালেমের রাজ্য ভার দেওয়া হউক।[২]

সুলতান দেখলেন যে, এরূপ প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে বাস্তবিকভাবে দেশের কল্যাণ হবে, দীর্ঘকালের অশান্তিরও অবসান হবে, তাই তিনি রাজি হলেন।

কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ এতে রাজি হলেন না। খ্রিস্টান রাজকন্যাকে মুসলিম রাজপুত্রের হাতে সমর্পণ করার কথায় তাঁরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বেগতিক দেখে রিচার্ড সুলতানের কাছে অনুরোধ করে পাঠালেন যে, তার ভাই খ্রিস্টান : ধর্ম গ্রহণ করে সিসিলির রানির পাণিগ্রহণ করলেন। সুলতান হেসে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার সন্ধির প্রস্তাব ভেঙে গেল। এই সুযোগে কনরাড নামক একজন খ্রিস্টান দলপতি স্বতন্ত্রভাবে সুলতানের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা চালায় কিন্তু তা রিচার্ডের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি গুপ্তঘাতক দিয়ে কনরাডকে নিহত করলেন। এরপর সুলতান ও রিচার্ডের মধ্যে একবার সন্ধি, আরেকবার সন্ধিভঙ্গের খেলা চলতে লাগলো। রিচার্ডের পক্ষ থেকে সুলতানকে এভাবে তিনবার সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়। সুলতান

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
২ প্রাগুক্ত

অসামাঞ্জস্যপূর্ণ শর্তের কারণে রাজি হতে পারলেন না। আবার যুদ্ধ শুরু হলো। ক্রুসেডাররা বৈরুত আক্রমণ করতে এসেছে খবর পেয়ে সুলতান জাফা দখল করে বসলেন। রিচার্ড যুদ্ধ এমন জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেণ যে, সুলতানের শর্তেই রাজী হয়ে গেলেন। ১১৯২ সালের সেপ্টেম্বর মুসলমান-খ্রিস্টান রেষারিষির একটা মিটমাট হয়ে গেল। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থ কয়েকটি নগরের অধিকারে সন্তুষ্ট থেকে ক্রুসেডারগণ ঘরে ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> খ্রিষ্টান ইউরোপ মোস্‌লেম এশিয়ার বিরুদ্ধে আটবার ক্রুসেড অভিযান করিয়াছিল; তাহার মধ্যে এই তৃতীয় ক্রুসেডই ইতিহাসে বিশেষরূপে স্মরণীয় হইয়া আছে। ইউরোপীয় রাজগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এই ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রায় সকল রাজ্য হইতেই ধনী নিধন উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক ক্রুসেড করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। খ্রিষ্টান ও মোসলেম উভয় পক্ষেরযে কত লক্ষ লক্ষ লোক এই দীর্ঘকাল ব্যাপী সমরে প্রাণ দিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।[১]

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে, ক্রুসেডের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়নি, তবে ইউরোপের জন্য তা অনেকটা সফলতা বয়ে এনেছিল।

মুসলিম জগৎ সে সময় ইউরোপ অপেক্ষা সভ্যতায় অনেক উচু অবস্থানে ছিল, এই সভ্যজগতের সংস্পর্শে এসে ইউরোপ সভ্য হতে শিখেছিল। খ্রিস্টীয় গোড়ামি ভেঙ্গে পড়ে লোক-সমাজে স্বাধীন চিন্তারস্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল। মুসলিম প্রাধান্যযুক্ত এশিয়ার সাথে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের নতুন ধারা প্রচলিত হয়েছিল। চিনি, তুলা এবং অপরাপর নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহার মুসলমানদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে ইউরোপ সভ্যতা ও সুখস্বচ্ছন্দের উৎকর্ষ করতে পেরেছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এমনকি যুদ্ধবিদ্যায়ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে ইউরোপ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ক্রুসেডের অবসানে এশিয়ার ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি সম্যকরূপে পরিদর্শন করার জন্য উৎসাহিত হয়ে দলে দলে ইউরোপীয় পর্যটক এশিয়ার নানা স্থানে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেন এবং নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের ভিত্তি স্থাপনে যত্নবান হন।

মুসলিম জগতে অবশ্য ক্রুসেডের ফল ভিন্নরূপ হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মুসলিম রাজ্য আত্মকলহে ও গৃহবিবাদে এমন খারাপ অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যে, তখন তাদের ওপর ক্রুসেড বজ্র আসে। এই সংকটকালে একে একে জেঙ্গী, নূরুদ্দীন ও সালাহউদ্দীনের ক্যারিসমায় মুসলিম শক্তি যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত হয়ে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে অটলভাবে দণ্ডায়মান হতে সমর্থ হয়েছিল। ক্রুসেড তরঙ্গ বারবার ভীষণ আঘাত করেও সে প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি। ক্রুসেডের প্রবলতম আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করে সুলতান সালাহউদ্দীন সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সর্বশেষ যে মন্তব্য করে লেখক দীর্ঘ প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটান, তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> ইউরোপ যদি সে সময় মোসলেম এশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিত, তাহা হইলে যে আজ জগৎ হইতে ইসলামের নাম একেবারেই মুছিয়া যাইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেই নিদারুন পরিমাণ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

> হইতে যে মহাপুরুষ ইসলাম ও মোসলেম জগৎকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, প্রত্যেক মোসলেমের পক্ষে তাহাঁর নাম প্রাতঃ স্মরণীয়।[১]

বলা বাহুল্য সেই মহাপুরুষই হলেন নিঃসন্দেহে সুলতান সালা্‌হউদ্দীন।

ক্রুসেডের পরিণাম এবং ফলাফল নিয়ে দশপৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায়, লেখেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। ক্রুসেডের পরিণাম স্বরূপ জগৎ যা লাভ করেছে, তার মধ্যে সার্বজনীন ধর্মবাদ (Universal Religion) অন্যতম বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় দর্শনের বিপরীতে স্বাধীনচেতা আরবরা অভিনব প্রতিভা নিয়ে দর্শনের চর্চা করছিল বলে লেখক জানান। আরবরা প্রথম 'সার্ব্বজনীন ধর্মবাদকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া জগতের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া ছিলেন'। এরাই প্রথমে অকুতোভয়ে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা লেখকের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> পরস্পর বিরোধী সকল ধর্মের অন্তরালে একই মহাসত্য ঝঙ্কার দিতেছে। খৃষ্টীয়, ইহুদি বা ইসলাম সকল ধর্মই সেই এক মহাসত্যের বহি:প্রকাশ মাত্র। ইহাদের গণ্ডী উঠাইয়া দিলেই আমরা সেই বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে পারি। বিজ্ঞান সে সত্যের সাক্ষী ও ভিত্তিভূমি, নীতিশাস্ত্র (Moral Principles) তাহার পন্থা বা পরিচালক।[২]

যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, মানুষ যতদিন পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ না করে ততদিন একে অন্যের বিষয় নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে এবং প্রায়ই করে থাকে। একদেশে বসবাস করে অনেক সময় অন্যদেশের মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় না। ক্রুসেড সেই দিক থেকে একে অপরকে জানার সুযোগটাও অবারিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*লেখা হয় :

> ক্রুসেড যুদ্ধও অনেকটা এইরুপ ঘটিয়াছিল, আরবগণের ধারণা ছিল, রিচার্ডের সৈন্যদল রাক্ষস বংশীয়, উহারা আস্ত মানুষ ধরিয়া বাধিঁয়া খায়। ইংরেজরাও জানিত, আরবের লোক মায়াবী, মন্ত্র বলে অসাধ্য সাধন করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় আরবগণ দেখিল যাহারা ইংরেজ হস্তে বন্দী হয় ইংরেজরা তাহাদিগকে বাধিঁয়া খায় না। আবার ইংরাজরাও দেখিল বন্দী আরবগণ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া কারাগার হইতে পলায় না।[৩]

এখানে যতই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একই হতে লাগল, ততই তাদের পরস্পরের সম্বন্ধে অন্ধ-বিশ্বাস দূরীভূত হতে লাগল। সালাহ্‌উদ্দীন ও রিচার্ডের মধ্যে সদলবলে সন্ধির চিত্র পরস্পরকে জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের মহত্বে মুগ্ধ হয়েছিল।

ক্রুসেডের ফলে দর্শনশাস্ত্রের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এর ফলে আরব্য দর্শন তার স্বকীয়তা খুঁজে পেয়েছিল। আরবি দর্শন ইউরোপীয় দর্শনের মত রাজধর্মের দাসত্ব না করে আপন পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। লেখক এ পর্যায়ে ইবনে সিনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
২ মোহাম্মদ বরকতুল্লা, 'ক্রুসেডের পরিণাম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৩৪
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

> এবনে সিনার মত চিকিৎসক ও দার্শনিক আরবে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে সুলতান মাহমুদ স্বীয় জামাতার সভার গৌরব বর্দ্ধনার্থ এবনে সিনাকে তদীয় রাজধানী খারেজম নগরে নিমন্ত্রণ করেন। যে সুলতান মাহমুদের অনুগ্রহ লাভের জন্য কবি ফের্দৌসী দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, হাকিম এবনে সিনা তাঁহার নিমন্ত্রন অনায়াসে উপেক্ষা করিলেন। পরের অনুগ্রহভাজন হইয়া অধীনতা স্বীকার এবনে সিনার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। তিনি খারেজম না যাইয়া জর্জ্জন প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।[১]

আরব দার্শনিকদের মধ্যে তেজস্বিতা শুধু ইবনে সিনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা অধিকাংশই এই প্রকৃতির ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদের (১১২৬-১১৯৮) নাম উল্লেখ করা যায়। এরিষ্টটলের রচনার বিশ্লেষণ তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক যে কথাটি বলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

> আরাস্তুতুলের যাবতীয় উপদেশাত্মক রচনার (didacte writings) ইনি এতই গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা টীকা লিখিয়া যান যে আরাস্ততলের মূলগ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণ সমূহ উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ এক সময়ে আদরের সহিত উহা পাঠ করিত। এব্নে বোশ্দ আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান; তন্মধ্যে ইমাম গাজ্জালীর মতের খণ্ডনার্থ যে খানি লিখিত হয় উহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। তদীয় আরও দুইখানি গ্রন্থ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এম. জে.মূলার কর্তৃক জর্ম্মন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই খানিতে দর্শনের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে।[২]

ইবনে রুশদ দেখিয়াছেন, বিজ্ঞান বা দর্শন ধর্মশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত নয়, এর একটি স্বতন্ত্র সত্তা বা সীমানা আছে। সকল ধর্মই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির উপর, ভক্তি এর একমাত্র মার্গ। দর্শন বা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত লৌকিক বৃদ্ধির ওপর, মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে বা দেখে তাই এখানে আলোচ্য। পরিশেষে লেখক বলেন :

> ক্রুসেডের মেলামেশির ফলে জগতের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, অনেক নৃতন সত্যেও আলো জগতের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে । সে সঙ্গে একথাও বলা চলে তখনকার যুগে আরব সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতাকে ছাড়াইয়া উঠায় আরবের নিকট ইউরোপ অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কি দর্শনজগতে কি সমাজ সংস্কারে-কি ধর্মরাজ্যে আরবীয় আদর্শ ইউরোপের সর্বত্র যুগান্তরের সূচনা করিয়াছিল। ক্রুসেডে এই যুগান্তরের প্রথম অঙ্ক আর তুর্কীদিগের ইউরোপ বিজয়ে ইহার চরম পরিণতি।[৩]

এভাবে ক্রুসেড, সুলতান সালাহউদ্দীনের বীরত্ব, ক্রসেড-পরবর্তী বিশ্বের রূপ, বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে কাজী ইমদাদুল হক ও মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত নারীদের কথা বললে মেহের-উন-নিসা তথা নূর জাহান এবং মমতাজ মহলের কথা মনে পরে আমাদের। কিন্তু এঁদের অনেক আগেই, এমন এক নারী ছিলেন যিনি আক্ষরিক অর্থেই 'কাব্যে উপেক্ষিতা'। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইতেও তাঁর তেমন উল্লেখ নেই। তিনি খানজাদা, উমর শেখ, মির্জার বড় মেয়ে ও প্রথম মোগল সম্রাট জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের বড় বোন। এত আশ্চর্য তাঁর জীবনের গল্প, এত আত্মত্যাগ তাঁর–বলা যায় তিনি না থাকলে ভারতে পৌণে দুশো বছর জাঁকিয়ে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

রাজত্ব করা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোগলদের পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তাঁকে কেন্দ্র করে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বাবর ও খানজাদ' নামে ঐতিহাসিক দুটি চরিত্র সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। খানজাদা বেগম (১৪৭৮-১৫৪৫) ও সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০) ছিলেন আপন ভাই-বোন। ঐতিহাসিকেরা মোগল সাম্রাজ্যে খানজাদের ভূমিকা সম্পর্কে সমকালে বিশেষ আলোচনা করেননি। বাবরের শাসনামলে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে বোন খানজাদের ভূমিকাকে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

খানজাদের স্বামীর নাম ছিল সাইবানি খাঁ (১৪৫১-১৫১০), তাদের বিয়ের আগে সমরখন্দ নিয়ে বাবরের সঙ্গে সাইবানির তিনবার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বাবর তিনবারই সমরখন্দ অধিকার করেন কিন্তু তা বেশিদিন অধিকার করে রাখতে পারেননি। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক আলি বখতেয়ার উভয়ের পূর্বপুরুষের পরিচয় উল্লেখ করেন এভাবে :

> সাইবানি খাঁ 'উজবেগ' জাতীয় লোক। সাইবানি বুজি খাঁর বংশধর। বুজি খাঁ আবার চেঙ্গিস খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আর বাবর তৈমুর লংয়ের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার মায়ের দিক দিয়া চেঙ্গিস খাঁর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। এই জন্যই সমরখন্দ লইয়া উভয়ের বিবাদ।[১]

সমরখন্দ ফিরে পাবার জন্য তাঁর বোন খানজাদকে সাইবানির সঙ্গে বিয়ে দেন বাবর, সেটা সাইবানির সমঝোতার শর্তানুযায়ী। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, এই পুত্রের নাম ছিল খুররম। সাইবানি তাঁর পত্নী খানজাদকে সন্দেহের চোখে দেখত, এই মনে করে যে খানজাদ তার ভাই বাবর এর প্রতি ভালোবাসা বা দুর্বলতার কারণে সাইবানির অনিষ্ট করতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাইবানি একপর্যায়ে খানজাদকে পরিত্যাগ করে এবং নিম্নপদস্থ এক ব্যক্তি সৈয়দ বা সাঈদ হাদার সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দেন। খানজাদের জীবনে দ্বিতীয় পর্বের দুঃখের সূচনা এখান থেকেই ।

এই সৈয়দের সাথে খানজাদের বিয়ে হয় ঠিকই কিন্তু তাঁর স্বামীসুখ হয় খুবই স্বল্পস্থায়ী। শাহ ইসমাইল এর সঙ্গে সাইবানি খাঁর 'মার্ভ' (বর্তমানে তুর্কমেনিস্তানের অন্তর্গত) এর যুদ্ধে (১৫১০খ্রিষ্টাব্দ) সৈয়দ নিহত হয়, খানজাদের প্রাক্তন স্বামী সাইবানিও একই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। প্রবন্ধকারের কথায়, 'কালের চক্রে দুই স্বামী একই যুদ্ধে একই দিনে একই সময়ে চলিয়া গেল'[২]।

খানজাদের আবার বিয়ে হল মেহদী খাজা নামক এক লোকের সঙ্গে। খানজাদের সঙ্গে মেহদীর বিয়ে এবং বাবরের কাছে পুনরায় খানজাদের ফিরে আসা সম্ভবত ১৫০৯-১৫১৯ দশকে ঘটেছিল।

সময়ের পরিক্রমায় খানজাদের পুত্র খুররম শাহ 'বলখ' এর শাসনকর্তা হন কিন্তু অধিককাল রাজত্ব করতে পারেনি। বৃদ্ধাবস্থায় শিশু আকবরকে লালন পালন করে তাঁর সময় কাটত। লেখক খানজাদের প্রসঙ্গ শেষ করেন এভাবে :

---

১ আলী বখতেয়ার, 'বাবর ও খানজাদ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১৫৮
২ প্রাগুক্ত

কাবুলের নিকট খানজাদের মৃত্যু হয়। যে ভ্রাতাকে তাকে খানজাদ প্রাণাধিক ভালোবাসিত, সেই বাবরের কবরের পাশেই তাহার আত্মা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে।[১]

সম্রাট বাবরের অনেক কথা ইতিহাস পাঠকের মধ্যে অনেকেই জানেন, কিন্তু তাঁরই সহোদর বোন খানজাদের কথা খুব কম লোকই জানেন। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে তাঁর জীবন-কাহিনির অনেক অজানা কথা সহজেই উদ্ধার হওয়া সম্ভব বলে লেখকের মতো আমরাও মনে করি। চাক্তাই তুর্কি ভাষায় লিখিত সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনী 'বাবুর নামা'তে জ্যেষ্ঠ ভগিনী খানজাদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে যদিও উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আরবদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আরবদের বিজ্ঞান চর্চা, আরব ইতিহাসের বিশেষ দিক, আরবদের আলো ইত্যাদি বিষয়ে আরবজাতির বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। আরবদের অজ্ঞান যুগ বা আঁধার যুগ বলতে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়কালকে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়কালের ইতিহাস নিয়ে ফজলুর রহীম চৌধুরী, বি-এ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> এই একশত বিশ বছরের আরবের সাহিত্য-পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আঁধার যুগের মানবগুলির শিরায় তপ্ত লোণিত বহিত, তাহাদের পেশীতে অতুল শক্তি ছিল এবং প্রাণে কর্ম্মের জন্য একটা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরযুগে নবী কাঠি বদল করিলেন আর একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।[২]

আরবরা অনেক দলে বিভক্ত ছিল। তবে তারা বিভিন্নভাবে তাদের আনন্দকে প্রকাশ করতো। অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার; যেমন : অশ্বের শাবক বাঘোড়ার বাচ্চা হলে তারা আনন্দ প্রকাশ করত।পরিবারে পুত্রসন্তান জন্মালে তারা খুব বেশি আনন্দ প্রকাশ করত, তাদের এই আনন্দ ভিন্ন মাত্রা পেতো, যদি তারা জানত তাদের মধ্যে কোনো কবির আবির্ভাব হয়েছে।

কাজের জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল কিন্তু সবসময়ে তাদের অভিলাষ সুপথে চালিত হত না। আরবরা জানত তাদের বীর হতে হবে, মহান-বীর আলেকজান্ডারের ন্যায় তাদের সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। তাই তাদের বীরত্ব দস্যুতা, পরস্পর অপহরণ অথবা লুণ্ঠনবলে অভিহিত হতো। চৌর্যবৃত্তি আরবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তারা দস্যুবীর শানফারা (কিংবদন্তী চরিত্র) এবং তার সহচর সাবেত বা তা 'আব্বাতা শার্বাণকেই বীরত্বের অবতার মনে করত।[৩]

প্রাচীন আরবরা দল বেঁধে থাকত। উচ্চবংশীয়, ধনি, বুদ্ধিমান, সৎস্বভাবাপন্ন এবং নিপুণ লোককেই তারা দলপতি নির্বাচিত করত এবং তাকে মেনে চলত। নিজের দলের জন্য তারা কোন অন্যায় কাজ করতে পশ্চাৎপদ হত নাবিশ্বস্ততাকে আরব বীরত্বের একটি অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতো। তারা বিশ্বসাঘাতকতাকে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

২ ফজলুর রহীম চৌধুরী, বি-এ, 'আঁধার যুগের আরব', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ১৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

বড় ঘৃণা করতো। তারা মনে করতো, তা ঘোর অপমানজনক, তার অপেক্ষা মরা ভালো।[১] নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> স্ত্রীলোককে আরবগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের উচ্চ সম্মান ছিল। তাহারা ইচ্ছামত স্বামী পছন্দ করিতো এবং যদি লাঞ্ছিত বা অত্যাচারিত হইতো তবে নিজেদের দলে ফিরিয়া আসিত। আরবগণ স্ত্রীলোককে ভৃত্য মনে করিত না, তাহাদের সহচরী বলিয়াই মনে করিত। সেই আঁধার যুগের রমনীগণ বিশ্বস্ততার অবতার ছিলেন। তাহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সদাশয়ত্ব, এবং উচ্চ হৃদয়ের কত শত উদাহরণ রহিয়াছে।[২]

এর বিপরীত চিত্র আবার শিউরে ওঠার মতো । যে নারী জাতির মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে, সেই নারীর গর্ভে জন্মানো কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে প্রাচীন আরবরা কসুর করত না। লেখক আরো বলেন :

> আঁধার যুগের আরবগণ কন্যা সন্তান হত্যা করিত; তাঁহারা মনে করিত তাহাদের পালন করিয়া কোন লাভ নাই। বসিয়া বসিয়া তাহারা অন্ন ধ্বংস করিবে, তাহারা হয়ত পরিবারে কোনরূপ দুর্নাম আনায়ন করিবে, কন্যাসন্তান হওয়া তাই তাহারা অভিশাপের ন্যায় মনে করিত। কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে শুনিলেই আঁধার যুগের আরবদের মুখখানা ম্লান হইয়া যাইত। তাই খোদা তাআলা বলিলেন, "তোমাদের সন্তান দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করিও না, আমিই তাহাদের ও তোমাদের ভরণপোষণ করিব, তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৩]

এছাড়াও শত্রুদের প্রতি আরবদের ব্যবহার অতি নিষ্ঠুর ছিল। যদি প্রহৃত ব্যক্তি আঘাত নীরবে সহ্য করত, তবে তাকে তারা কাপুরুষ বিবেচনা করত, তারা অপমান নীরবে হজম করার কথা চিন্তাই করতে পারত না। কোনো এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধের জন্য হয়ত দলে দলে যুদ্ধ বেধে যেত এবং বংশপরম্পরায় সে যুদ্ধ চলত। কোনো কোনো যুদ্ধ চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। হয়তো এ কারণেই ঐ যুগের আরবগণ তাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবের সাথে স্মরণ করত। লেখক পরিশেষে প্রবন্ধের এক পর্যায়ে যা জানান তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> আঁধার যুগের মানবগণ পূর্ব্ব পুরুষগণকে অতি সম্মানের সহিত স্মরণ করত। পূর্ব্বপুরুষ যে গৌরব রাখিয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। জীবন পাত করিয়াও তাহা করিতেই হইবে।, ইহাই ছিল আরবের প্রকৃতির বিশেষত্ব। নিজের গৌরবের জন্য তাহাকে তত ব্যস্ত দেখা যাইত না। পূর্ব্ব পুরুষের গুণাবলীকে সে পাষাণ প্রকার অথবা সমুন্নত গিরি চূড়ার সঙ্গে তুলনা করিত।[৪]

তাই দেখা যায় বর্শা, তরবারি ইত্যাদিকে তারা যেমন যুদ্ধের অস্ত্র মনে করত, সেইরূপ কবিতাকেও এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে জানত। কবিরা এ গৌরবের জন্য গর্ববোধ করতেন, তেমনি যুদ্ধবাজরাও কবিদের নিকট পরামর্শপ্রার্থী হতেন। এমনিই বিচিত্র ছিল হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব পূর্ববর্তী আরবজাতির চিত্র।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৫ প্রাগুক্ত

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৮, জানুয়ারি ১৯২২) শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো' নামে চার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে মহানবীর (সা.) জীবন, শাসনকাল ও চার খলিফার 'খেলাফত' বৃত্তান্ত সংক্ষেপে মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। তিনি (লেখক) প্রবন্ধের শিরোনামে নাম উল্লেখ না করলেও প্রবন্ধের শুরুতে 'অত্যাশ্চর্য পুরুষপুঙ্গব' হযরত মোহাম্মদ (সা.) এবং 'যাঁর মতাবলম্বী বীরগণ' ইসলামের চার খলিফা 'পৃথিবীতে অমর সভ্যতা স্থাপন' করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 'যার প্রতিভালোক জগতে একটা নতুন যুগ আনয়ন করেছিল'[১], সেই মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) আরব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে এবং এর উত্তরে সিরিয়ার মরুময় ভূমি, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের অবস্থান রয়েছে। আরবকে ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিশারদগণ পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন ১. তিহামা ২. হিজায ৩. নজদ ৪. আরূদ ৫. ইয়েমেন।[২] আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আরব উপদ্বীপ সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত: সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে সময়ে এরকম রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় প্রাচীন আরবদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মানদণ্ডে অতি উচ্চ অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতার প্রচন্ড অহমিকায় অন্ধ হয়ে তাঁরা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে বা পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কালের গর্ভে এমনভাবে হারিয়ে যায়, যেন কোনদিন তাদের অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন আরব জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১) আর আদাবুল বায়িদা বা প্রাচীনতম আরব এদেরকে মরুভূমির আরব বলা হয়। আদ, সামুদ, তমস, আমালিক প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত গোত্র আল আরাবুল বায়িদার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরানের বিভিন্ন স্থানে আদ ও সামুদ জাতির উল্লেখ আছে হজরত নুহ (আ.) এর অব্যবহিত পরেই ছিল আদ ও সামুদ জাতির রাজত্বকাল ও ধ্বংস পর্ব।

২) আল-আরাবুল আরিবা অর্থাৎ আদিম আরব জাতি। বনু কাহতান নামেও পরিচিত। ইয়েমেন বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘকাল বনু কাহতানের আধিপত্য ছিল।

৩) 'আল-আরাবুল মুসতা'রিবা বা সাধারণ আরব জাতি। হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধর। তাদেরকে বনু ইসমাইল বা বনু আদনানও বলা হয়। হেজাজ ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল 'আল-আরাবুল মুসতা'রিবার বসবাস।[৩]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনু কাহতান ও বনু ইসমাইল ছিল আরবের মূল অধিবাসী। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইহুদিও আরব উপদ্বীপে বাস করতো।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মুসলিম রাজত্বের পূর্বের আরবের চিত্র সাদামাটাভাবে তুলে ধরেছেন এভাবে :

> মুসলমান রাজত্বের পূর্বে আরবের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তৎকালীন অধিবাসীসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসভ্য জাতিতে বিভক্ত ছিল। তাঁহারা নিজ নিজ দলপতি ব্যতীত অন্য কাহারও বশ্যতা স্বীকার

---

১ বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ. ২৭৪

২ ড. রাগিব সারজানি, *ইসলামি ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, আবু মুসআব ওসমান অনুবাদিত, মাকতাবাতুল হাসান, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৫০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

> করিত না। স্বভাবতঃ একদল অন্যদলের সহিত কলহে প্রবৃত্ত থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন দলসমূহ প্রায়ই স্থায়ীভাবে কোনও প্রদেশে বসবাস করিত না। ইহাদের ভিতরে কোন কোন দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিত ও অন্যান্য কয়েকটি দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব স্থাপন করিত।[১]

এই 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসভ্য জাতি'র মধ্যেও নানান বিষয়ে বিচিত্র রকম বিভাজন ছিল। এ-প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন:

> এই অধিবাসীগণের রাজনৈতিক অবস্থার মতো ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনৈক্য ছিল। তাঁহারা সকলেই পৌত্তলিক ছিলেন। কেহ শুধু চন্দ্র সূর্যকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। কেহবা শুধু প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করিত।[২]

তৎকালীন আরবরা জাতীয়তার ধারণা পোষণ করত না। মোহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবের পূর্বে আরব-অঞ্চল অন্তর্কলহের রঙ্গমঞ্চ ছিল মাত্র। এ-সময়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মক্কা নগরী আরবে প্রধান স্থান বলে পরিগণিত হতো এবং কুরাইশ বংশই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

শৈশবেই (ছয় বৎসর বয়সে) মোহাম্মদ পিতামাতাকে হারান। তারপর দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং দাদা মারা যাবার পর তাঁর লালন-পালনের ভার চাচা আবু তালিবের উপর অর্পিত হয়। তখন মোহাম্মদের বয়স আট বছর। মোহাম্মদ সব সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং তাঁর এই চিন্তাশীলতার প্রভাব পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়।

চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সঙ্গে যথার্থভাবে মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি তাঁকে আপন সন্তানের চেয়েও অধিক স্নেহ করতেন। পরবর্তী একটানা ৪২ বছর তিনি মোহাম্মদকে স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আগলে রাখেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সব ধরনের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করেন। শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত মোহাম্মদ চাচা আবু তালিবকে সহায়তা করার জন্য মেষ চড়াতেন। বারো বছর বয়সে নবীজি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য সফরে শামে (বর্তমানে সিরিয়ার অংশ) গমন করেন।[৩] তরুণ বয়সের শুরুতেই নবীজি ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। এক বর্ণনায় আছে , সায়ীদ বিন আবু সায়িব মাখযুমির সঙ্গে মিলে তিনি বাণিজ্য করতেন।[৪]

পঁচিশ বছর বয়সে নবীজি কুরাইশ বংশের বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত ধনবতী নারী খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদের সম্পদ নিয়ে বাণিজ্যে গমন করেন। বাণিজ্য শেষে নবীজি মক্কায় ফিরে আসেন এবং প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যের মূলধন খাদিজাকে বুঝিয়ে দেন। একদিকে মোহাম্মদের অপূর্ব সততা ও বিশ্বস্ততা অপরদিকে বিস্ময়কর মুনাফাপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করে খাদিজা মুগ্ধ হন এবং তিনি তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনাব্বিহের কাছে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নাফিসা মহানবীকে খাদিজার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে নবীজি সম্মতি প্রকাশ করেন।[৫] মোহাম্মদের বাণিজ্য ও বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লেখেন :

> পিতৃব্যের সহিত সিরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে লোকসমূহের দুঃসহ জ্বালা নিশ্চিত হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হজরতের হৃদয়ে গভীর চিন্তার উদ্রেক হইত। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে তিনি খোদীজা নাম্নী এক রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। ইহার পর পঞ্চদশ বৎসরকাল তিনি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হজরত

---

১ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪
২ প্রাগুক্ত
৩ ইসলামি ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪
৪ সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৩৬, উদ্ধৃত, *ইসলামি ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩
৫ ইসলামি ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

> এক গভীর নিশীথে অনতিদূরে হেরা নামক পর্ব্বতগুহায় ভগবানের বাণী শ্রবণ করিলেন এবং লোকত্রাণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বিয়ের সময় মোহাম্মদের বয়স ছিল ২৫ বছর আর খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর, এটি প্রচলিত মত। তবে তাঁদের বিয়ের সময় খাদিজার বয়স কত ছিল তা নিয়ে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। খাদিজার বয়স ২৫ বছর, ২৮ বছর, ৩৫ বছর ও ৪০ বছর ইত্যাদি বিভিন্ন মত সিরাত ও জীবনীগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। তাদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বকাল ছিল ২৫ বছর। খাদিজার মৃত্যুর আগে মহানবী দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। খাদিজার ইতঃপূর্বে আরও দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং দুবারই তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[২]

চল্লিশ বছর বয়সে হযরত মোহাম্মদ (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা কালে তাঁর প্রতি ওহ অবতীর্ণ হয় এবং তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী অনুপ্রেরণার মাধ্যমে অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়াকে নবুয়ত বলে আর ওহী হচ্ছে সূক্ষ্ম গোপন ইশারা যা ইশারাদাতা বা ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া অন্য কেউ টের পান না। জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহতাআলা মোহাম্মদের উদ্দেশ্যে এই ওহি প্রেরণ করেন। লেখক বীরেন্দ্রনাথের লেখার ভিতরেও সেই ইঙ্গিত আমরা দেখেছি। নবুয়তপ্রাপ্তির পর প্রায় তিন বছর মোহাম্মদ একান্ত গোপনে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানাতেন। নবুয়তের চতুর্থ বছরে যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয় তখন থেকেই ব্যাপকভাবে অধিকাংশ মুসলমান এবং বিশেষভাবে দুর্বল মুসলমানগন কুরাইশদের ক্ষোভ ও ক্রোধের শিকার হতে থাকে। প্রত্যেক শাখা-গোত্রের গোত্রপতিগণ নিজ নিজ গোত্রের মুসলিম সদস্যদের উপর নির্যাতন শুরু করে।[৩] শুধু তাই নয়, যখন তারা জানতে পারলো যে, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করাই মোহাম্মদের ধর্মের মূল উদ্দেশ্য, তখন নিজ বংশীয়দের অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবু জেহেল বিন-হসম, ওলিদ, আস, উমাইয়া ও নজর-বিন-সয়ীদ প্রমুখ অন্যতম।[৪]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় এতদ্বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লেখেন :

> পৌত্তলিক কলহ-নিরত কুৎসামোদী কুরাইশগণ অদ্বৈতবাদের বাণী প্রথমে তাচ্ছিল্যের সহিত শুনিতে লাগিল। কিন্তু যখন মুহাম্মদ ক্রমে তাঁহার মত প্রচার করিতে লাগিলেন এবং কৃতকার্য হইতে লাগিলেন তখন মক্কাবাসী কোরাইশগণের ক্রোধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্রমে হযরতের মক্কায় অবস্থান বিপদসঙ্কুল হইল বলিয়া তিনি তাঁহার ভক্ত মদীনাবাসী গণের আহ্বানুসারে তথায় গমন করিলেন।[৫]

মোহাম্মদের মদিনায় গমনের আগে সে-নগরীর নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। মদিনায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সংঘাত ভুলে গিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে মোহাম্মদ (সা.) কে সাদরে গ্রহণ করলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন 'আনসার' বা সাহায্যকারীরূপে অভিহিত হলো।[৬] তৎকালে মদিনার অধিবাসী অধিকাংশ ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। হযরতের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে তাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন।[৭] আবার স্ব স্ব ধর্ম পালনেও উদারতার পরিচয় দিলেন মোহাম্মদ (সা.)। এ প্রসঙ্গে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লেখেন :

---

১ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪
২ ইসলামি ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬
৩ শেখ আবদুর রহিম, *হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত ও ধর্মনীতি*, প্রথম আবিষ্কার সংস্করণ, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.১১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮-৭৯
৫ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫
৬ আরব জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
৭ *হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত ও ধর্মনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪-১৬৫

> মদিনার অধিবাসীগণ পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু হযরতের খৃষ্টান ও ইহুদিদের প্রতি উদারতার কথা ভাবিলে বিস্ময় ও ভক্তিতে অভিভূত হইতে হয়। বিধর্ম্মীগণ তাহাদের স্বীয় স্বীয় মতানুসারে পূজা করিতে পারিত এবং স্বকীয় রীতিনীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইত।[১]

মদিনা ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর তিনি মক্কা বিজয়ের কথা চিন্তা করছিলেন। মক্কার যেমন তিনি স্বগোত্রীয়দের একাংশের সমর্থনের পাশাপাশি বহুলাংশের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, মদিনায় তিনি তা হলেন না। ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও মক্কার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হজ যাত্রার জন্য মক্কায় অবাধ প্রবেশের জন্যই হযরত মোহাম্মদ (সা.) 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে মক্কার সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং মক্কা আয়ত্তে এলেও বহির্বিশ্বেও তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রসারিত হবে।[২] তার ফলাফল কি হলো, তা বলতে গিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখক ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখলেন :

> ক্রমে মক্কার সহিত শান্তি স্থাপিত হইল ও পরিশেষে সমস্ত আরব প্রদেশে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হজরতের বশ্যতা স্বীকার করিল।
>
> অন্তর্ব্বিবাদের অবসান হইল। সাম্যের বাণী সমগ্র আরব প্রদেশ বিঘোষিত হইল।[৩]

নবীজি নিজে কেবল ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, রাজনৈতিক জ্ঞানেও পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন। তিনি পুরাতনের চিহ্ন লোপ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন না। পূর্বের তীর্থস্থানসমূহের বিলোপ না ঘটতে দিয়ে সেখানে নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করলেন। চতুর্দিকে ইসলামের বাণী নিয়ে তাঁর অনুসারীরা প্রেরিত হতে লাগলো, তখন মোহাম্মদ (সা.) বুঝলেন তাঁর দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে তাঁর মানসচিন্তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> সুতরাং তিনি মহাপ্রস্থানের পূর্বে মক্কা নগরীতে একবার তীর্থযাত্রা করিবার মনস্থ করিলেন। অদ্য পর্যন্তও কালের অক্ষয় বক্ষে তাঁহার শেষ বাণী জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এখনও যেন শুনিতে পাইতেছি আরাফাত পর্ব্বতের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া হজরত বলিতেছেন, 'স্মরণ রাখিও ভগবান তোমাদের কার্য্যসমূহের কৈফিয়ৎ চাহিবেন। মনে রাখিও তোমাদের এবং তোমাদের পত্নীগণের একে অন্যের উপর সমান অধিকার।'[৪]

মোহাম্মদ (সা.) এই বক্তব্য মক্কা থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটি সমতল এলাকা আরাফাত ময়দানে পেশ করেছিলেন। মুসলিম তীর্থ বা হজযাত্রীরা মিনা কাল থেকে ছয় কিলোমিটার দূর থেকে যাত্রা করে নিকটবর্তী পাহাড়ের সন্নিকটবর্তী সমভূমি আরাফাতের ভূমিতে এসে উপস্থিত হন। এই স্থানে মোহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের শেষ বছর বিদায় ভাষণ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ (সা.) এর বিদায় ভাষণ ইসলামের পরিপূর্ণতার নিদর্শন। মক্কায় হজ উপলক্ষে আগত তীর্থযাত্রীদের এখানেই শেষ ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তিনি এই স্থানেই ইসলামের সার্বিক দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছিলেন। এই দিনটিকে 'আরাফাত দিবস'ও বলা হয়। লেখকের বক্তব্যের ভিতরও এর অনুরণন ঘটেছে। তিনি প্রবন্ধের এই অংশ শেষ করেন এই কথা বলে :

> এই বাণী প্রচার করিয়া জগতের একটি অপূর্ব সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি অমরধাম চলিয়া গেলেন। কুৎসিত প্রথা ও অসভ্যতার শেষ হইল। আরবের মরুভূমিতে এক হরিশচন্দন বৃক্ষ আবির্ভূত হইল ও তাপিত জনসমূহকে সুশীতল ছায়া প্রদান করিতে লাগিলেন।[৫]

---

১ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
২ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৫ প্রাগুক্ত

হযরত মোহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পর তাঁর নেতৃত্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাময়িক সমস্যা দেখা দিল। তার সহজ কারণ ছিল, পরবর্তী নেতৃত্বে কে আসবেন তাই নিয়ে সংশয়। মহানবী এ নিয়ে কিছু নির্ধারণ করে যাননি। যাহোক আরবগণ সমবেত হয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর প্রিয় শিষ্য আবু বকরকে প্রধান বলে অভিবাদন বা গ্রহণ করলো। দায়িত্বে আসীন হয়ে আবু বকর জনগণের উদ্দেশে যে কথাগুলো বললেন তা লেখক উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

> আমি যদি আল্লাহ ও হযরতের বিধান লংঘন করি তবে আমার প্রধান হইবার অধিকার থাকিবে না। আমিও মানুষ। আমাকে তোমরা যথাযথ উপদেশ প্রদান করিবে।[১]

এইভাবে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবীর পরেইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত হয়ে নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।দায়িত্ব গ্রহণ করেই আবু বকরকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ মনোযোগ দিতে হলো। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছিল তা দমন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

মহানবী (সা.) মৃত্যুর পূর্বে সিরিয়ায় মুসলিম দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেখানে একদল সৈন্য প্রেরণের আদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উদ্দেশে নিকটবর্তী স্থানে সৈন্য সংগৃহীত হয়েছিল। মোহাম্মদের (সা.) শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ শান্তি স্থাপন করতে হযরত আবু বকর (রা.) বিপদগ্রস্ত হয়েও সৈন্যদেরকে অগ্রসর হতে আদেশ প্রদান করলেন। এছাড়া আরবের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ গোত্রের সংঘর্ষ বাধে। এই গোত্রগুলি 'হীরা' নামক একটি অর্ধ-আরব রাজ্যের অধীনে ছিল। হীরা রাজ্য সেই সময়ে পারস্যের প্রাধান্য স্বীকার করত। আরব-পারস্যের এই সংঘর্ষই পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। দজলা ও ফোরাত বিধৌত অঞ্চল স্মরণাতীত কাল থেকে সম্রাটগণের মধ্যে পরস্পরের ক্ষমতার লড়াইয়ের বিষয়বস্তু ছিল। দজলা-ফোরাত পূর্ব তুরস্কের আর্মেনীয় উচ্চভূমি থেকে উদ্ভূত নদীগুলো সিরিয়া ও ইরাক এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে, যা ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরান, সৌদি আরব, কুয়েত ও জর্ডানের অন্তর্গত। এটি 'শাত-ইল-আরব' নামেও পরিচিত। এই নদীর প্রসিদ্ধ নদীর তীরে অনেক সমৃদ্ধশালী নগর অবস্থিত ছিল। শক্তিশালী আসিরীয় সম্রাটগণের রাজধানী প্রাচীন নিনেভা (বর্তমানে ইরাকের মসুলের অনতিদূরে দজলার তীরে অবস্থিত) ছিল।[২] পারস্য সম্রাটগণের রাজধানী এবং মধ্যযুগে খলিফাদের রাজধানী বাগদাদও দজলার তীরে অবস্থিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* আবু বকরের (রা.) ভূমিকা ও পদক্ষেপ বিষয়ে লিখলেন :

> এই সময়ে সিরিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ পায় কিন্তু ইসলাম সেনাপতি তাহার শীঘ্রই বিলুপ্ত করিলেন। কিন্তু এই প্রকার শান্তি রক্ষাকালে আরব ও পারস্য প্রদেশের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত প্রদেশ আদিকাল থেকে সম্রাটগণের বিবাদস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়া চলিয়াছে। পারস্য ও আরবের মধ্যেও ওই স্থান লইয়া কলহের সূত্রপাত হইল।[৩]

উল্লেখ্য ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের দখল থেকে দজলা-ফোরাত আরবের অধীন হয়।[৪] শুধু তাই নয় আরবকে উপেক্ষা করার পরিণামের ফলে হেরাও আরবের দখলে আসে। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক বলেন :

> পারস্যের নবীন সম্রাট শিশু আরবকে অস্বীকার করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে শিশু বিষধরের দংশন জ্বালা অনুভব করিল। হেরা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান আরবদের করতলগত হইল।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৬

২ সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সারাসিনস)*, শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৯-২০

৩ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৪ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৫ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

এগুলো ঘটল হযরত আবুবকরের (রা) আমলে। তিনি মাত্র আড়াই বছর কার্যক্রমের পর ত্রয়োদশ হিজরির ২২ জমাদিউস সানি (২৩ আগষ্ট ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ) মানবলীলা সংবরণ করেন। লেখক বীরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'দুই বছর মাত্র প্রধানের কার্য করিয়া পঞ্চত্ত্ব প্রাপ্ত' হওয়ার কথা বলেছেন।

হযরত আবু বকরের সততা, মৃত্যুর পূর্বে উমরকে মনোনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে লেখকের বর্ণনা সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) 'হিস্ট্রি অফ সারাসিনস' বইটির বক্তব্যের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। ধারণা করা যায়, লেখক বীরেন্দ্রনাথ বইটি পাঠ করেছেন এবং তথ্যগুলি বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এতদ্বিষয়ে লেখকের বক্তব্যটি আমরা তুলে ধরছি :

> এই মহাপুরুষের সমুদয় জীবন সাধারণের নিমিত্তে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। গভীর নিশীতে আবু বকর নগরীতে পরিভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করিতেন এবং যথাসাধ্য দুঃখীগণের দুঃখ লাঘব করিতে যত্নবান হইতেন। সাধারণের ধন হইতে তিনি কপর্দক মাত্র গ্রহণ করিতেন না এবং নিজেই উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পরিশেষে তিনি বছরে ছয় হাজার দেরহাম সাধারণ ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন; কিন্তু মৃত্যুশয্যায় এই নিমিত্ত এত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন যে তিনি তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ওই পরিমাণ মুদ্রা সাধারণ ধনাগারে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়া যান । মৃত্যুর সময় আবু বকর ধর্মপ্রাণ অমৃত বিক্রম ওমরকে প্রধানের পদে মনোনীত করিয়া যান। জনসাধারণও তাহাকে প্রধান বলিয়া অভিহিত করিল।[১]

উমরের 'খেলাফত' প্রাপ্তি ইসলামের অনেক উপকার সাধন করেছিল। তিনি কঠোর নীতিজ্ঞান ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং অশেষ কর্মস্পৃহা ও চরিত্রবলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময় আলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে 'নিহাওয়ান্দ' নামক স্থানে পারস্যের সঙ্গে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে একটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি নোমানের নেতৃত্বে পারস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে তিনি নিহত হন। তথাপি মুসলমানরা পারস্যের ব্যাপক ক্ষতিসহ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই যুদ্ধ জেতাকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ' বলা হয়। যুদ্ধের পর পারস্য রাজ দারায়ূস স্থান হতে স্থানান্তরে পলায়ন করে ফিরতে লাগলেন। এইভাবে পারস্য রাজ্য মুসলমানদিগের অধিকারে এলো।[২] রাজ্য জয় করলেও অন্যধর্মের লোকদের ধর্মান্তরিত করা বা কোনোরকম হস্তক্ষেপ যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে করা হয়নি, তা বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> ওমর ইসলাম জগতের একটা অপূর্ব্ব রত্ন। তাঁহার চরিত্র বল অতুলনীয়। সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিপদ সঙ্কুল সাগরে ইসলাম ধর্মের ওমরই একমাত্র উপযুক্ত কর্ণধার ছিলেন। পারস্যের সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছিল কিন্তু ইসলাম কেশরীর নিকট পারস্য সম্রাট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য ইসলাম রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। কিন্তু বিজিত গণের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইলো না। যাঁহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল তাহাদের সহিত আরবগণ সমানভাবে মিশিতে লাগিল।[৩]

এই সময়ে প্রসিদ্ধ রোম সম্রাট শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। আবুবকরের সময়ই রোম সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্রমে উমর সিরিয়া জয় করেন এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।[৪] এই যুদ্ধ 'ইয়ারমুকের' যুদ্ধ নামে অভিহিত, যা ৩০ আগষ্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৪০০০০জন অন্যপক্ষে সারাসিনদের (আরব) সর্বমোট সৈন্য ছিল মাত্র ৪০০০ জন। তারপরও রোমকরা পরাজিত হয় এবং তাদের ১৪০০০০ সৈন্য নিহত হয়। অপরদিকে সারাসিনের ৩০০০ সৈন্য হারাতে হয়েছিল। যুদ্ধের ফল হিসেবে সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়া সারাসিনদের পদানত হয়।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত
২ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
৪ প্রাগুক্ত
৫ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

উমর (রা.) কঠোর অথচ ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী ও লোকচরিত্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন। এইসব গুণ থাকার জন্য তিনি দুর্দান্ত আরবের নেতৃত্বের জন্য বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজস্বের সুশাসনের জন্য দিওয়ান বা অর্থবিভাগের সৃষ্টি করেন। তিনি নিরাড়ম্বর, অত্যধিক নীতিপরায়ণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সর্বদা হীনতম প্রজারও নাগালের মধ্যে ছিলেন। তিনি রাত্রিতে প্রহরীহীন অবস্থায় প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঘুরে বেড়াতেন। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শাসক হিসেবে উমর (রা.) কে উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আমীর আলী।[১] লেখক বীরেন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রিকায় উমরের (রা.) অভাব অপূরণীয় বলে উল্লেখ করে জানান :

> সেই দূরদর্শী উন্নত-চরিত্র বীরের অভাব পূর্ণ হইল না। একমাত্র ওমরই স্বভাব দুরন্ত আরবের প্রধান হইবার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘদেহ বৃক্ষস্কন্ধ, অসুর বলে বলীয়ান ওমর সরলতার অবতার ছিলেন। তিনি সমগ্র আরব জাতির অধীশ্বর ছিলেন,যাহার অঙ্গুলিহেলনে সম্রাটের মস্তক অবনত হইয়া পড়িত সেই মহাপুরুষের শীত গ্রীষ্ম ঋতুর নিমিত্ত দুইটি মাত্র পোশাক ছিল। সেই সময়ের প্রধান পরাক্রমশালী ব্যক্তি এই ভাবে জীবনযাপন করিতেন।[২]

হযরত উমরের দশ বছর খিলাফতের আমলে ইসলাম চারিদিকে প্রসার লাভ করে এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতিও সম্ভবপর হয়। হযরত আবু বকর (রা.) মাত্র দুই বছর কাল শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। সেইজন্য অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে তাঁর জীবন কেটে গিয়েছিল, ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র আরবের বাইরে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু উমরের শাসন আমলে সমগ্র পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিসর মুসলমান শাসনের অধীনে আসে। এই সকল দেশ নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে উমর অসাধারণ বিচক্ষণতা ও সামরিক বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। উমরের 'খেলাফত' ইসলামের ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাসনব্যবস্থাতে অনেকটা স্থিতিশীলতা আনয়ন করেছিলেন।[৩] তিনি সত্তর বছর বয়সে এক আততায়ীর হাতে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে।[৪] তিনি মৃত্যুর আগে মদিনার ছয় প্রধানের উপর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

মহানবী (সা.) এর হাশিমীয় বংশের সঙ্গে অন্য প্রভাবশালী বংশ উমাইয়াদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মক্কা দখলের পর উমাইয়ারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। উমর (রা.) এর সময় উমাইয়াগণ মদিনায় এক শক্তিশালী দল গঠন করেছিল। উসমান ও আলীর মধ্যে কে উমর পরবর্তী খলিফা হবেন তা নিয়ে কয়েকদিন বিতর্ক ও আলোচনার পর উমাইয়া বংশের উসমান ইবনে আফফান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত হন। আলী সঙ্গে সঙ্গে উসমানের আনুগত্য স্বীকার করেন।[৫] এতদ্বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন :

> উমারের মৃত্যুর পর ওমাইদ বংশোদ্ভূত উসমান প্রধান বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই অংশ একটি পৃথক দলের সৃষ্টি করিল। সেই সরল অথচ সুদৃঢ় শাসন প্রণালী আর রহিল না। ফলে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ওসমান শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।[৬]

উসমানের শাসনামলে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে যে শত্রুতা আরম্ভ হল তা শতাব্দী অধিক কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। উসমান উমর কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তাদের অধিকাংশ অপসারিত করে সেখানে নিজ বংশের অনুপযুক্ত ও অকর্মণ্য লোকদেরকে নিযুক্ত করেন। অনেক ঘটনা পরম্পরায় উমাইয়াদের

---

১ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
৩ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৪ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৬ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

কোন্দল ও নানাবিধ কারণে উসমান তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ হন। অন্যদের বাধা থাকা সত্ত্বেও অবরোধকারীদের দুজন ঘরে ঢুকে বিরাশি ঊর্ধ্ব খলিফা উসমানকে হত্যা করে ১৭ জুন ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে।[১] উসমানের ১২ বছর 'খেলাফত'কালের সমাপ্তি ঘটে এভাবে।

উসমানের শোচনীয় মৃত্যুর ছয় দিন পর আলী বিনা বাধায় খলিফা হিসেবে ঘোষিত হলেন। পূর্ববর্তী তিন খলিফার শাসনকালে তিনি মন্ত্রিসভার একজন প্রধান সদস্য হিসেবে তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। উমরের সময়ে যেসব প্রধান শাসনবিধি প্রবর্তিত হয়েছিল তার অধিকাংশই তাঁর পরামর্শ অনুসারে হয়েছিল।

হযরত আলীর খিলাফতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর সাড়ে চার বছরের শাসনকালে অন্তর্বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধে পরিপুর্ণ ছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি. বসরা), সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রি. সিরিয়া) উল্লেখযোগ্য। আলীর খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণের শুরুতেই হযরত উসমান হত্যার বিচারের দাবি উঠলেও কুফা, বসরা ও মিসরে যে শাসনতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা নতুন আকার ধারণ করতে পারে ভেবে আলী (রা.) উসমান (রা.) হত্যার বিচারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি। বসরা, কুফা, মিসরের অনেক লোক উসমান হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল হয়ে উঠেছিল যে, বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে তখন কোনো শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শান্তি বিপন্ন হতে পারে, এই ছিল আলীর ধারণা। তাই হযরত আলী (রা.) বিচারপ্রার্থীদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। উসমান (রা.) এর পরিবার ও অনুসারীরা এজন্য আলীর উপর ক্ষুব্ধ ছিল।

এদিকে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার সঙ্গেও আলী বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। মুয়াবিয়া পূর্ববর্তী খলিফা হযরত উমরের সময় থেকেই সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু আলী মুয়াবিয়াসহ কুফা ও বসরার শাসনকর্তাদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দান করেন। এতে বিদ্রোহ দমন বা নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়ে দেখা গেলো।

মুয়াবিয়া কৌশল হিসেবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কূটনীতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এই দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) উদ্দেশ্যমূলকভাবে উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের গোপনে সমর্থন করছেন।এইভাবে মুয়াবিয়া জনমত সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।[২] বিদ্রোহী শুধু নয় তিনি নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণাও করলেন এবং সিরিয়ায় নিজেকে সুদৃঢ় করে মিসরও জয় করে নিলেন।

খলিফা আলীর অধিকাংশ অনুচরের মতো তিনি নিজেও ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি কুফার জুমা মসজিদে উপাসনারত অবস্থায় আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।[৩] লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উসমানের মৃত্যুর পর থেকে আলীর ক্ষমতারোহণ,মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও পরিণতি অল্পকথায় বিবৃত করেছেন এভাবে :

> উসমানের মৃত্যুর পর হযরতের জামাতা মহাত্মা আলি প্রধানের পদে মনোনীত হলেন কিন্তু ওসমানের পরিজনবর্গ ও অনুচরগণ বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত করিল। সিরিয়ার বিক্রমশালী শাসনকর্তা মাবিয়া এই অন্তর্বিদ্রোহে যোগদান করিলেন। পরিশেষে আলী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তৎকালীন মুসলমান সমাজে আলীর সমকক্ষ কেহ ছিলনা। যদি তিনি কিছুদিন অধিক শাসন করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তিনি মুসলমানগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। এই মনীষীর অকাল মৃত্যুতে ইসলাম জগতের সমূহ ক্ষতি হইল। সেই লোক স্বাধীনতা সাধারণতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমে মাবিয়া সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে একাধিপত্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন।[৪]

---

১ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
২ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১১
৩ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৪ 'ইসলাম গৌরব আরবের আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

হযরত আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জগতের সাধারণতন্ত্রের যুগ শেষ হলো। পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাব, প্রসার ও বিস্তৃতি কীভাবে ঘটেছিল তার বিস্তারিত পরিচয় ও বর্ণনা লেখক *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পরবর্তী তিনটি সংখ্যার তিনটি প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'ইসলাম গৌরব: সাধারণতন্ত্র যুগের সভ্যতা', দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ইসলাম গৌরব: ওমাইদ সভ্যতা', তৃতীয় সংখ্যায় "ইসলাম গৌরব : আব্বাসীয় সভ্যতা" শিরোনামে প্রবন্ধগুলি লেখেন। বিভিন্ন উপশিরোনামে লেখকের চারটি প্রবন্ধের মূল শিরোনাম ছিল একই 'ইসলাম গৌরব'। প্রতিটি লেখা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠ করলে দেখা যায় ইসলামের সূচনায় নবী মোহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অর্থাৎ চার খলিফার ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, শাসনকালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির কথা ভূমিকায় এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্যক্ত করেছেন। সেগুলির আলোকে লেখক ইসলামের আদর্শ ও খেলাফতের মূল ধারার বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন শাসকের শাসনধারার বৈচিত্র্য, স্থান-কাল, পরিবেশের মূল্যায়ন করার সবিশেষ চেষ্টা করেছেন ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে।

লেখক 'ইসলাম গৌরব : সাধারণতন্ত্র যুগের সভ্যতা' শিরোনামের প্রবন্ধের সেই সময়ের অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ (সা.) থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের সাধারণতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের একটি অংশে আলোচনা করেছেন। তারপর পর্যায়ক্রমে উমাইয়া বংশ ও আব্বাসী বংশের শাসনে পূর্বের ধারাবাহিকতা কতটুকু অক্ষুণ্ণ ও পরিবর্তিত হয়েছিল এবং শাসকরা জনমনে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা তুলে ধরেছেন। মোহাম্মদ (সা.) এর দীর্ঘ সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাবে বিভিন্ন দল উপদলকে একীভূত করে এক জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, প্রবন্ধের শুরুতে সেই কথাই লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> যে দশবছর কাল হযরত মদিনায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় মধ্যে তদীয় প্রভাবে কিরূপে কলহ নিরহ বিভিন্ন দলসমূহ একটি সুদৃঢ় জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী চিরদিন ইতিহাসেস্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আরব জগতে এই ত্রিংশ বৎসর সাধারণতন্ত্র শাসনের সময় এক অপূর্ব্ব পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও এই সময়ে মুসলমান সভ্যতার বিকাশ মাত্র হইতে ছিল তথাপি সমাজের নানাবিধ উন্নতি হয়েছিল।[১]

এই উন্নতির পিছনে প্রধান নিয়ামক সমাজের প্রধান ব্যক্তি খলিফা নামে অভিহিত হওয়া এবং তাঁকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি বা পরিষদ গঠন করা। শুধু অভিহিত হওয়া অর্থাৎ খলিফার আদর্শিক গুণাবলি বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

লেখক হযরত উমর, উসমান ও আলীর সময়কালে 'খেলাফত' নিয়মের অধীনে রাজকোষের অর্থ জনস্বার্থে ব্যয়িত হওয়ার যে বিধান ও কার্যকারণ চালু ছিল তা দু-এক কথায় ব্যক্ত করেছেন। উমর ও আলীর সময় অর্থ ব্যয়ের নিয়মিত ধারণাটি চালু থাকলেও উসমানের সময় কিছু ব্যতিক্রম হয়েছিল, লেখক তা উল্লেখ করেছেন। লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

---

১ বীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ইসলাম গৌরব : সাধারণতন্ত্র যুগের সভ্যতা, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৮১

> যে সমস্ত বিজাতীয় প্রজা ইসলাম ধর্ম্মে আশ্রয় লইত, আরবগণ আইনত : তাহাদিগকে সমকক্ষভাবে গ্রহণ করিত। সাধারণ ধনকোষ সাধারণের কল্যাণে নিমিত্ত ছিল, খলিফার কোন বিশেষ বৃত্তি নির্ধারিত ছিল না। ধনীগণের নিকট হইতে দরিদ্রদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত চাঁদা আদায় করা হইত।[১]

দীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী উমর এই শাসনপ্রণালির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। উসমানের সময়ে এত বিষয়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও তা অনেকটা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ ও অকালমৃত্যুর ফলে আলীও তা বিশেষ দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিতে পারেননি। দৃশ্যত একক 'খেলাফত' এবং মূল ক্ষমতা সেখানে থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশ আলাদা শাসক ছিলেন। লেখক বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাদের জানান :

> এই সময় সমস্ত দেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তার অধীনে ওই সকল প্রদেশে অবস্থাপিত হইয়াছিল। দেশের যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একটি লিখিত বিবরণ রক্ষিত হইত।[২]

তবে প্রত্যেক প্রদেশের বিচারক নিয়োগ দিতেন খলিফা। বিভাগীয় শাসকদের তাঁদের উপর কোনো ক্ষমতা ছিল না। এলাকাভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ জনসাধারণ দ্বারাই সম্পন্ন করা হতো। সময়ের তাগিদে এবং নিরাপত্তার অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য খলিফা উমর রাত্রিকালের জন্য রক্ষী নিযুক্ত করেন। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজটিও যথারীতি অব্যাহত ছিল। শাসনের সুবিধা ও যুদ্ধাবস্থা মোকাবেলা করার জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক ছিল।বিদেশ থেকে অন্যান্য উপকরণ সমূহের আমদানিও প্রয়োজনে করা হতো। এর পাশাপাশি সমাজের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> এই সময় সমাজের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সম্মানিত এবং তাহাদের নিমিত্ত পৃথক আবাসস্থান গৃহমধ্যে নির্ম্মিত হইত। সকলেই খুব পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নভাবে বাস করিত।[৩]

লেখক এভাবেই ঐ সময়ের রাষ্ট্র ও সমাজের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করেন। এরপরে উমাইয়া বংশের শাসনামলের তথা উমাইয়া 'খেলাফত' কালের চিত্র তিন পৃষ্ঠার আলোচনায় লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখক তাঁর পূর্বের প্রবন্ধের আলোচনার ভিতরে আলী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান ও দ্বিতীয় পুত্র হোসেনের খলিফা পদপ্রাপ্তির সুযোগ ত্যাগ ও মুয়াবিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলের ফলে মুয়াবিয়ার খলিফা পদ লাভ ও আধিপত্য বিস্তারের আলেখ্য আমরা ইতঃপূর্বে অবগত হয়েছি। তবে লেখক বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে উমাইয়াদের উত্থানপর্ব এবং বিশেষ কিছু পরিচয় তুলে ধরেছেন।

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রথম শাসক। তাঁর পিতার পূর্ণ নাম ছিল আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব বিন উমাইয়া আবদিস শামস। পিতার নামের উমাইয়া নামের অংশ বা পদবি থেকে উমাইয়া বংশের উৎপত্তি হয়েছে। মুয়াবিয়া মক্কা বিজয়ের দিনে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২ প্রাগুক্ত

৩ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, *খলিফাদের ইতিহাস*, এম. মনিরুজ্জামান ভাষান্তরিত, মল্লিক ব্রাদ্রাস, কলকাতা, বইমেলা ২০০০, পৃ. ২৮৬

করেছিলেন। আলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে মুয়াবিয়াকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁর চরিত্রের নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছেন বেশি। তবে ভালো-মন্দ মিলিয়ে একজন শাসক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যের দুটি দিকই তুলে ধরা উচিত বলে আমরা মনে করি। মুয়াবিয়া মোহাম্মদ (সা.) এর সংস্পর্শ লাভ করেছেন এবং নবীজির নির্দেশে ওহি লিপিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নবীজি হতে ১৬৩টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। খলিফা উসমান (রা.) এর পুরো 'খেলাফত'কাল এবং চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) ও তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.) এর সঙ্গে সংঘাতের সময়কালে মুয়াবিয়া(রা.) দামেস্কের গভর্নর পদে বহাল ছিলেন। পরে অনেক ঘটনা পরম্পরায় তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা নির্বাচিত হন। সুতরাং গভর্নর ও খলিফা পদ মিলিয়ে তাঁর নেতৃত্বদানের সময়কাল একটানা চল্লিশ বছরেরও বেশি। মুয়াবিয়া ইসলামি নৌবহরেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১]

মুয়াবিয়ার বংশধররা উমাইয়া বা ওমাইদ বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। উমাইয়া বংশের শাসনকাল ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। উমাইয়ারা মূলত মক্কার কোরাইশ বংশের শাখা থেকে উদ্ভূত। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কোরাইশ বংশের আব্দাদ্দার নামে এক ব্যক্তি মক্কা নগরীর অধিপতি হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্রগণের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিরোধ উপস্থিত হয়। এতে মক্কার শাসন দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতদ্বিষয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখা হয় :

> জল এবং ট্যাক্স বিভাগ আবদাদ্দারের ভ্রাতার এক পুত্রের উপর দেয়া হইল। ধর্ম্ম-স্থান সৈন্য পরিদর্শন প্রভৃতি কার্যভার তাহার পৌত্রগণ প্রাপ্ত হইল। আবদাদ্দারের ভ্রাতার বংশে ওমাইয়ার জন্ম হয় এবং আব্দদারের পৌত্রগণের মধ্যে হযরতের পূর্বপুরুষ আবদুল মুত্তালিবের জন্ম হয়।[২]

এভাবেই মূল কোরাইশ বংশ দুটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ক্রমশ বাড়তে থাকে। মুয়াবিয়ার পুত্র যাতে খলিফার পদ প্রাপ্ত হয়, তাঁর জন্য তিনি যেকোনো কাজই সম্পন্ন করতে দ্বিধা করতেন না। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর শাসন পরিচালিত হতো। তিনি কর্মঠ ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> এই সময় মুসলমানগণ আফ্রিকার অনেকাংশ এবং সিন্ধুদেশ ও পূর্ব্ব আফগানিস্তান অধিকার করিয়াছিল এবং মাবিয়া তদীয় পুত্র ইয়াজিদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন।[৩]

মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজিদের খলিফা পদ প্রাপ্তিতে একটা মূল পরিবর্তন ঘটল। এতদিন খলিফা সাধারণ জনগণ কর্তৃক মনোনীত হয়ে এলেও মুয়াবিয়া থেকে বংশানুক্রমে এই পদ খলিফার পুত্র পৌত্রগণ যে পেতে পারে, তা বোঝা গেল। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মুয়াবিয়া কিছুকাল রাজত্ব করেন, কিন্তু তিনি একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় মারওয়ান নামক একজন শাসনকর্তা ছলে বলে খলিফার পদ অধিকার করেন। তারপর সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল মালিক ওই পদ অধিকার করে শাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসনকালে মুসলমানগণের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলতে থাকে। আবদুল মালিক প্রথমে রাজ্যে টাকশালের সৃষ্টি করেন এবং মুদ্রার প্রচলন করেন। এই সময়ে সব হিসাবপত্র গ্রিক কিংবা

---

১ *ইসলাম গৌরব : সাধারণতন্ত্র যুগের সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

পারস্য ভাষায় লিখিত হতো। আবদুল মালিক সব বিভাগে আরবি ভাষার প্রচলন করেন। আবদুল মালিকের পর তাঁর ভাই কিছুদিন শাসন করেন, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ওয়ালিদ খলিফার পদ প্রাপ্ত হয়। এই সময় মুসলমান শাসন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আফ্রিকায়ও মুসলমান শাসনের বিস্তৃতি ঘটে। মুসলিম শাসনের ইউরোপ-আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃতির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> সমুদ্রও মুসলমান কেশরীর অপ্রতিহত গতি নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্পেনেও মুসলমান সৈন্যগণ সগৌরবে পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময়ে স্পেন দেশ 'গথ' নামক জাতির অধীন ছিল। এক পারে যখন আফ্রিকা মুসলমানদের উদার শাসন প্রণালীতে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছিল, তখন অপরপারে স্পেনবাসীগণ 'গথ' গণের বজ্র কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইতেছিল। এই সময়ে স্পেনের অধিপতি ছিল রডারিক।[১]

ওই সময় মুসা বিন তারিক (৬৪০-৭১৬) ও তারিক বিন জিয়াদ (৬৭০-৭২০) নামে পরপর দুই মুসলমান সেনাপতি স্পেনে গমন করেন এবং পশ্চিমা দেশ সমূহ অধিকারে সচেষ্ট হন। রাজা রডারিক এ সময়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। এরপর মুসা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন দামেস্ক থেকে খলিফা তাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। ফলে পশ্চিমা দেশে মুসলমানদের অগ্রগামিতা বাধাগ্রস্ত হয়। এসময়ের মুসলিম কর্তৃক স্পেন শাসনের কথা বলতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন:

> স্পেন মুসলমানগণ দ্বারা সুশাসিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ উৎপীড়ন হইতে নিস্তার পাইল। নানাবিধ উপায়ে নানা শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল। বস্তুতঃ স্পেনের অরণ্যানী একটি রমণীয় উদ্যানে পরিণত হইল।[২]

স্পেন বিজয়ের পেছনে আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। পরবর্তীকালে স্পেন আরবদের আবাসস্থল হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় আরব, স্পেনীয়, আফ্রিকাবাসী এই তিন জাতির মুসলমানদের ভেতরে বিরোধ ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময় উমাইয়া শাসনও দুর্বল হচ্ছিল। একমাত্র খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (দ্বিতীয় উমর নামে পরিচিত) খলিফার আসন গ্রহণ করে উদারভাবে রাজ্য শাসন করছিলেন। উমাইয়া রাজত্বের শেষ পর্যায়ে আব্বাসীয়রা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উমাইয়াদের বিরানব্বই বছর স্থায়ী শাসনে এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপের একাংশ মুসলিম রাজত্বের অধীনে আসে। তাদের শেষ সাত বছরের শাসনকাল দুঃশাসনের চরম সীমায় পৌঁছালে আব্বাসীয়রা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। লেখক বীরেন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে উমাইয়া শাসনের শুরু থেকে অবসান পর্যন্ত ও আব্বাসীয় শাসনের সূচনা প্রসঙ্গ এনে লেখাটি শেষ করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৯) বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ইসলাম গৌরব: উমাইদ সভ্যতা' নামে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই লেখাটিতে উমাইয়া খিলাফতের কিয়দংশের বিবরণ, আব্বাসীয় বংশের ইতিহাস, খলিফা হারুন অর রশিদের শাসন প্রণালী, খলিফা মামুন এর শাসনকাল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিবৃত হয়েছে। এই সময়কালে বিশ্বব্যাপী

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

ইসলামের বিস্তৃতি অন্যতম একটি আলোচিত অধ্যায়। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায় ইসলামের প্রসার কীভাবে ঘটেছিল লেখক সুনিপুণ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াবিয়া পূর্ববর্তী সময়কালে মদিনার জনসাধারণ খলিফা মনোনীত করত। কিন্তু মুয়াবিয়ার সময় থেকেই খলিফা নিজেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন এবং অমাত্যবর্গ ও সৈন্যসামন্ত তা মেনেও নিতেন। পূর্বে সাধারণ জনগণের নিমিত্তে ধনকোষ ব্যয় করা হত, কিন্তু এই সময় থেকেই তা খলিফাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে লাগল। নানাভাবে রাজকোষে অর্থ সমাগম ঘটত, তবে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। বিভাগীয় শাসকরা বিভাগীয় বরাদ্দ থেকে ব্যয় করে উদ্বৃত্ত অর্থ খলিফার নিকট প্রেরণ করতেন। শাসনকর্তাদের উপর রাজনীতি ও সৈন্যের ভার দেওয়া হতো, রাজস্বের ভার অন্য কর্মচারির উপর দেয়া হতো। পৃথক পৃথক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক কর্মচারি নিযুক্ত করা হতো। সকল প্রজাকেই সামরিক শিক্ষা নিতে হতো। সৈনিকরা উচ্চহারে বেতন পেত। রণপোত বাহিনিরও তখন অভাব ছিল না।

শহরগুলি দেখতে তখন অতিশয় চমৎকার ছিল। শহরের চারদিক প্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণির লোকদের একটি করে দল ছিল এবং তাঁরা একই স্থানেই বসবাস করত। দামেস্ক (বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী) ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত নগরী। মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্যতম পীঠস্থান দামেস্কের সবুজ প্রাসাদের মনোমোহন শোভা, সারি সারি মসজিদের গম্বুজের অপূর্ব সৌন্দর্য চোখ জুড়িয়ে যেত। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে মুসলমানদের সুরুচি ও গৃহের নান্দনিক সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে লেখেন:

> মুসলমানগণের ন্যায় সুমার্জ্জিত রুচিজ্ঞান সম্পন্ন জাতি অদ্য পর্যন্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কেবলমাত্র খলিফা এবং অমাত্যবর্গেরই সুন্দর সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ছিল তা নহে, সাধ্যমত সকলেই উত্তম গৃহ নির্মাণ করিত। বহু দূর হইতে খাল কাটিয়া শহরের সর্ব্বস্থানে জল আনা হইত।[১]

স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, খলিফাদের প্রাসাদের শোভা অতুলনীয় ছিল।স্বর্ণখচিত পোশাক পরিধান করে দাসগণ সবসময় আজ্ঞা বহন করত। অমাত্যবর্গ ও সৈন্যসামন্তে প্রাসাদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিত। দেখে যেন মনে হতো, প্রতিদিনই খলিফার প্রাসাদে আনন্দ ও ভোজ অনুষ্ঠান চলছে।

খলিফার দুটি দরবার ছিল, যেখানে তিনি প্রতিনিয়ত শুধু অমাত্যসহ সভা করতেন সেই স্থানকে 'খাস দরবার' বলা হতো এবং যে স্থানে সর্বসাধারণ উপস্থিত হতে পারত, তাকে 'আম দরবার' বলা হতো।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষ-মহিলারা তৎকালে যুগপৎ অংশগ্রহণ করতেন। শিক্ষা-দীক্ষায় মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন। সৌখিনতা ও সৌজন্যবোধের চর্চাও বিদ্যমান ছিল। লেখক এ-প্রসঙ্গে বলেন:

> গীতবাদ্য, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ হইতেই সেই সময়ের মুসলমানরা বঞ্চিত ছিল না। রমণীগণ কি বিদ্যায় কি অন্যান্য গুণে পুরুষদের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিতেন। শৌখিনতায় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় ছিলেন। এই সময়ে চামচ এবং রুমালের ব্যবহারের কথা জানা যায়।[২]

---

১ বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'ইসলাম গৌরব:উমাইদ সভ্যতা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৩৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

উমাইদ বা উমাইয়া বংশের ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় বংশের ক্ষেত্রে অনেক স্থানে এ ধারা চালু ছিল। তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যেও সভ্যতা-সংস্কৃতি এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়নি। লেখকের ভাষায়, 'দেশ-বিদেশের দিন গত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার দিন আগমন করিল'। আব্বাসীয় বংশের নয়জন খলিফা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চম খলিফা হারুন-অর-রশিদ এর নাম জগদ্বিখ্যাত। এই বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুর বাগদাদ নগরী নির্মাণ করেছিলেন। বাগদাদ নগরী গোলাকার ও চারিদিকে দুটি সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। মনসুরের পুত্র মাহদির সময়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের (অর্থডক্স খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী) সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ ঘটে। ফলে বাইজানটাইন রানী আইরিন মাহদির শাসনকালে কর দিতে বাধ্য হন। মাহদির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাদি খলিফার আসন গ্রহণ করেন। হাদিরর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হারুন খলিফার আসন গ্রহণ করেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। খলিফা হারুন রাতে সাধারণ পোশাক পরে প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করে বেড়াতেন। একদিকে তিনি যেমন সৎ দানশীল এবং উদারচেতা ছিলেন তেমনি রাজোচিত ঐশ্বর্যবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ও সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন এবং অনেকবার নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করে শত্রুকে পরাজিত করেন।

তখন শুধু এশিয়ায় নয়, ইউরোপের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে দস্যুর কবলে পড়ার ভয় থাকতো। কিন্তু মুসলমান সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পথিক-বণিকগণ এবং যাত্রীগণ নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী হিসেবে দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পেয়েছিলেন। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা বারমেক বংশের মন্ত্রীকে তিনি কাছে পেলেও পরবর্তীতে এদের ভূমিকা হ্রাস পেতে থাকে এবং খলিফার নিকট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। অথচ এক সময় মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া তিনি রাজকোষ থেকে সামান্যতম অর্থ গ্রহণ করতেন না। এই সময় বাইজেন্টাইন সম্রাট মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে হারুনের সফলতার পর আবার সন্ধি হয়,কিন্তু বাইজেন্টাইন এর ক্ষমতায় নাইসিফোরাস এসে আবার চুক্তি ভঙ্গ করেন। এরকম দুইবার সন্ধিচুক্তি আবার পুনরায় চুক্তিভঙ্গ করার ফল হিসেবে ৮০৮ খ্রিস্টাব্দে নাইসিফোরাসের বিদ্রোহ হারুন চূড়ান্তভাবে দমন করেন। প্রায় চব্বিশ বছর মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করে খলিফা হারুন অর রশিদ মৃত্যুবরণ করেন। একজন সফল প্রশাসকের যাবতীয় গুণাবলি তার ভিতর বিদ্যমান ছিল। লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন:

> এক সহস্র বছর পূর্ব্বে একজন শাসনকর্ত্তার নিমিত্ত কি করিয়াছেন ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নয় বার তিনি প্রজাদিগকে লইয়া তীর্থস্থানসমূহে গমন করিয়া প্রধানের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সভা অতিশয় সুবিখ্যাত ছিল এবং তথায় দূরদূরান্তর থেকে পণ্ডিতগণ আগমন করিত। তিনি কেবল সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, গীতবিদ্যার প্রতিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং গীতবিভাগেও নানারূপ উপাধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১]

শত শত বৎসর আগে যখন বিশ্ব অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিবৃত ছিল তখন রশীদের সভাপণ্ডিতদের কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক বিভিন্ন দেশ থেকে এনে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, কেউবা গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা লিখতেন। সুদূর চীন সম্রাট থেকে পশ্চিম ইউরোপের প্রতাপান্বিত রোমান সম্রাট শার্লেমাইন

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

(৭৪২-৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সকলেই রশীদের দরবারে দূত পাঠাতেন। একটা ঘটনা জানা যায় যে, শার্লেমাইনের নিকট রশীদ একটি অদ্ভুত ঘড়ি পাঠিয়েছিলেন। ঘড়িটির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন:

> যখন ঘন্টা বাজিবার সময় হইত, তখন একটি খুলিয়া যাইত এবং ঘড়ির ভিতর হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী বাহির হইত। আবার ঘন্টা বাজিয়া গেলে ভিতরে চলিয়া যাইত।[১]

সফল ও প্রতিভাধর খলিফা হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমিন খলিফার আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অনেকটা অকর্মণ্য ও ভোগবিলাসী ছিলেন। তাঁর আনন্দবিহারের জন্য টাইগ্রিস নদীর সর্বত্র পাঁচটি বজরা ভাসমান থাকত। এগুলোর কোনোটি সিংহের মতো, আবার কোনোটি সর্পাকৃতির ছিল।

হারুনপুত্র আমিন তার ভাই মামুনের পরিবর্তে নিজ পুত্র মুসাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এর ফলে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয় এবং বিখ্যাত মামুন খলিফার আসন গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে আমিন গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। সত্যিকার অর্থে খলিফা হারুন-অর- রশিদের পর তাঁর পুত্র আল মামুন একজন সফল সৃজনশীল শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। শাসক হিসেবে ভাই আমিনের ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে তিনি মুসলিম জগতের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উৎকর্ষতায় নিজেকে নিবেদিত করেন। লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে বলেছেন:

> এই সময় মুসলমান আকাশে জ্ঞান-সূর্য সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে। কি অঙ্কশাস্ত্র, কি বিজ্ঞান,কি সাহিত্য সর্ব্ববিষয়ে বিশেষভাবে তাঁহার সময়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইত।এই সভ্যতার ভগ্নাবশেষ মুসলমানদের সময় স্পেনে রহিয়া যায় এবং এবং সেখান থেকে ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, এ সম্বন্ধে ইউরোপ মুসলমান সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী।[২]

মামুন অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই সময় তিনি জাতি-ধর্ম বিচার না করে উপযুক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই কার্যভার অর্পণ করতেন। আজও সভ্যজগত এ বিষয়ে শ্লাঘা করতে পারেনা। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর বিভাজন মামুনের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ছিল না :

> মামুনের পরামর্শ সভায় ইহুদি, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম্মেরই প্রতিনিধি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য শত শত ইহুদি এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মন্দির ছিল। কিন্তু ইহুদি কি খ্রিষ্টান সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিয়া আপন-আপন ধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেন।[৩]

শুধু তাই নয় ধর্মান্ধতার ব্যাপারেও মামুন সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতেন। কোরান শাস্ত্রও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে মুসলমানরা যাতে অনুদার না হয়ে পড়ে, তার জন্য ইমামের বংশধরদের সঙ্গে একমত হয়ে স্বাধীনতা ও উদারতার বাণী ঘোষণা করেন। যার ফলে বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা তাঁর সময়ে চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। সব ধরনের ভাষা শিক্ষার বিষয়ে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে লেখেন :

> তাঁহার সময় একজন ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যমান ছিল। যখন খ্রিষ্টীয় জগত মনে করিত পৃথিবী সমতল, তখন মুসলমানগণ পৃথিবীর আকার পরিমাপ করিয়াছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৩ প্রাগুক্ত

> হইয়াছিল। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়েও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা করিবার নিমিত্ত কয়েকবার পণ্ডিতগণের সভা আহূত এবং খলিফা তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন।[১]

তবে এই অবস্থা বেশি দিন সচল থাকেনি। মামুনের মৃত্যুর পর তার ভাই মুতালিম খলিফার পথ প্রাপ্ত হন। তিনি আরব ও পারস্য দেশের অধিবাসীদের অবহেলা করতেন। তুরস্কের কয়েকজন সৈন্য তাঁর রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত হয়। আব্বাসীয় বংশের উত্থানের কারণই ছিল পারস্য ও আরবের একাংশের অধিবাসীগণ। তাদেরকে তিনি অনেকটা অবজ্ঞা করে তুরস্কের রক্ষীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই তুরস্ক সামন্তগণ ক্রমে একটি অমাত্যশ্রেণির সৃষ্টি করে এবং কিছুকাল পর্যন্ত মুসলমান জগতের ভাগ্যবিধাতা হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তুরস্কের নানা বংশ খলিফার উপর আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। এশিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি স্থান তখনো খলিফার শাসনাধীনে থাকলেও নামমাত্র খলিফা শাসনকর্তা হয়ে পড়েন।

এই সময় বিখ্যাত গজনবী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খলিফা কর্তৃক স্বাধীন বলে স্বীকৃত হয়। এরা মূলত ছিল জাতিতে তুর্কি। এই বংশের সুলতান মাহমুদ(৯৭১-১০৩০ খ্রি.) বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। গজনবী বংশের একটি শাখা থেকে সেলজুক বংশের উৎপত্তি হয় এবং সেলজুকদের প্রধান শাসনকর্তার নাম তুগরল বেগ। জনৈক ব্যক্তি সামন্তের অধীনে যখন প্রপীড়িত হচ্ছিলেন, তখন তিনি তুগরলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্যের প্রতিফলে তিনি খলিফার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। এভাবেই নামকরণে খলিফা থেকে সুলতানে উত্তরণ ঘটে, 'খেলাফত' হয়ে যায় সালতানাত।

সেলজুক বংশ ইতিহাসে একটি বিখ্যাত বংশ হিসেবে পরিচিত।এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুগরল বেগের পর তাঁর পুত্র আলপ-আরসলান সুলতান হন এবং রোমীয়গণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তাঁর পুত্র 'মালেক শাহ' (১০৭২-১০৯২) বীরগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর শাসনামলে মুসলমান সভ্যতা কিছুদিনের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। দেশেও নিরাপদ হয়েছিল। লেখক এ প্রসঙ্গে অতঃপর বলেছেন:

> বৈজ্ঞানিকগণ একত্র হইয়া পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া এক মহা উপকার সাধিত করিয়াছিলেন। এন্টিয়ক প্রভৃতি স্থান রোম সম্রাটের হস্ত হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছিল। কিন্তু মালেক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক গৌরব রবি অস্তমিত হইল।[২]

মালিক সাহেবের পর তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সেলজুক গভর্নররা এক একজন স্বায়ত্তশাসক হয়ে যান।[৩]

এই সময়ে প্রসিদ্ধ 'জিহাদ' আরম্ভ হয়। ইউরোপে এই সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও সকল দেশীয় নৃপতিগণই পোপের বশ্যতা স্বীকার করত। যখন রোম সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছিল তখন পোপগণ ক্রমে রোম সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে পড়েন। জেরুজালেম সহ কিছু স্থান খ্রিস্টানদের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান ছিল এবং প্রতি বৎসর বহু খ্রিস্টান ইউরোপের প্রান্ত থেকে এই সকল স্থানে আগমন করতেন।

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৩ মুহাম্মদ ইসমাইল রাইহান, *মুসলিম উম্মার ইতিহাস (অষ্টম খণ্ড) মাকতাবাতুল আযহার*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬১

জেরুজালেম আগে থেকেই মুসলমানদেরও বসতি ছিল এবং তারা জেরুজালেমকে পবিত্র ভূমি মনে করত। লেখক তৎপরবর্তী খ্রিস্টান আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন:

> ক্রমে স্থানীয় মুসলমানদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। পোপগণ ঐ সকল স্থানে মুসলমানদের নিকট হইতে অধিকার করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় রাজা এবং প্রজাগণকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করে। ফলে দলে দলে শ্বেতকায়গণ রাজা এবং বিখ্যাত সামন্তগণের অধীনে পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র কয়েকটি স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বহু লোক প্রাণত্যাগ করিলেন।[১]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'ইসলাম গৌরব: আব্বাসীয় সভ্যতা' নামে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নয় পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।এটি 'ইসলাম গৌরব' ধারাবাহিকের শেষ অংশ। লেখক এ অংশে আব্বাসীয় রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস ও স্পেনে মুসলমান সভ্যতা বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি পরিশিষ্টে এশিয়া ও ভারতে মুসলমান শাসনের প্রসঙ্গ এনে শেষ করেন। লেখক উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের কিছু মৌলিক পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে প্রবন্ধের সূচনা করেন। উমাইয়া খলিফাদের সময় শুধু আরবের অধিবাসীরাই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, কিন্তু আব্বাস বংশের রাজত্বের সময় আরব জনগোষ্ঠী অপেক্ষা অন্যান্য দেশেও বিশেষত সিরিয়ার মুসলমান অধিবাসীগণ উচ্চপদ এবং ক্ষমতার অধিকারী হতো। যে কোনও দেশের লোক হোক না কেন,এই আমলে সকল মুসলমানের সমান অধিকার পাওয়ার সুযোগ ছিল। এই কারণে আব্বাস বংশ জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে এবং দীর্ঘকাল (৭৫০খ্রি -১২৫৮খ্রি.)শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

খলিফা শুধু এই সময় শুধু শাসন বিষয়ে প্রধান ছিলেন না, তিনি ধর্মবিষয়ক প্রধানও ছিলেন। তাঁকে এক্ষেত্রে রোমের পোপ এবং সিজারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যেতেন কিন্তু জনসাধারণের সমর্থন না থাকলে তাঁর পক্ষে খলিফার আসন গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মুসলমানগণ সমবেত হয়ে খলিফার নিকট আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করত। এক কথায়, খলিফাই সব বিষয়ের প্রধান ছিলেন। তাঁর কর্মে বাধা দেয়ার শক্তি কারো ছিল না। তবে আব্বাস বংশের খলিফা মামুনের সময় (৭৮৬-৮৩৬) থেকে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। গভর্নর এবং বড়লাটের যেমন একটি মন্ত্রিসভা থাকে, খলিফারও ওরকম একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হতো। সকল প্রকার লোক ওই সভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারত। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে আরও বলেন :

> তাঁহাদের শাসন প্রণালী অনেক বিষয়ে সভ্য জগতের শাসন প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল সন্দেহ নাই। রাজকার্য্যে কোনও জাতি বা ধর্ম্মের বৈষম্য করা যাইত না।[২]

উজির খলিফার প্রধান সহায় ছিলেন। শাসনকার্য নানা ভাবে বিভক্ত ছিল। যথা কর বিভাগ,আয়-ব্যয় বিভাগ, ডাক বিভাগ, সৈন্য বিভাগ, পত্র বিভাগ ইত্যাদি। আবার এসবের ভেতরে এক প্রকার স্বায়ত্তশাসনও ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে জনসাধারণ নিজেদের শাসনকার্য নিজেরাই চালাতে পারত। যেখানে রাজকর্মচারীদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো, শুধু সেই স্থানে তাদের সাহায্য করা হতো। রাজকর্মচারীগণ

---

১ *ইসলাম গৌরব: উমাইদ সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২ বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'ইসলাম গৌরব: আব্বাসীয় সভ্যতা' *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২২৬

কৃষিবিষয়ক সব কাজেরই সর্বদা তত্ত্বাবধান করত। যে স্থানে জলাভাব হতো, সেখানেই আবশ্যক মতো তারা খাল কেটে দিতেন। ডাক বিভাগ খুব উন্নত ছিল, ঘোড়ার মাধ্যমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সরকারি এবং বেসরকারি সংবাদসমূহ বহন করে নেয়া হতো। এছাড়া শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বলতে গিয়ে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জানান:

> তৎকালে মুসলমানগণ শিল্প-বাণিজ্যেও সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কাঁচ, সাবান, কাগজ, রেশম, জরীর কার্য্য কোন বস্তুরই তখন অভাব ছিল না। দেশে প্রচুর পরিমাণে বার্লি, ধান্য এবং অন্যান্য সহস্র প্রকার ফসল জন্মিত। বস্তুত মুসলমান জগত এই সময় ধনধান্যে পূর্ণ ছিল।[১]

এছাড়া যতরকম রণবিদ্যা তৎসমস্তই আয়ত্ত করা সম্ভবহয়েছিল। রণক্ষেত্রে হাসপাতালেরও বন্দোবস্ত ছিল। রণপোতের অধ্যক্ষকে 'আমীর উল-মা' বলা হতো। এই শব্দ থেকে ইংরেজি 'অ্যাডমিরাল' (Admiral) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। শহরগুলিও খুব সুন্দর ছিল সেকালে।বাগদাদ নগরীতে বিশ লক্ষ লোক বাস করত। সুবিস্তৃত ময়দানের মাঝখানে খলিফার প্রাসাদ শোভা পেত এবং তার চতুর্দিকে অমাত্যদের সব বাগানবাড়ি অবস্থান করত।কলকাতার চৌরঙ্গী অপেক্ষা শতশত রাস্তা ছিল। প্রত্যেকটি রাস্তা এক এক জন কর্মচারিদের অধীনে থাকত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীর সংলগ্ন কতকগুলি ফটক দিয়ে বাইরে যাতায়াত করত। পাথর নির্মিত প্রাসাদ, নদীর বুকে সুসজ্জিত তরণীবাহিনি এবং নগরবাসীগণের মণিখচিত পোশাক-পরিচ্ছদের শোভা বর্ণনা করা যায় না।শুধু সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা বর্ধনে শিক্ষা-দীক্ষায়ও চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। নানারকম বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হারুন-অর-রশীদ এবং অন্যান্য আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ শিল্প ও বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য কতটা যত্নপরায়ণ ছিলেন তার অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। লেখক অতঃপর বলেছেন:

> আরবগণ সামুদ্রিক কম্পাস আবিষ্কার করেন। তাহারা দূর-দূরান্তর প্রদেশ ভ্রমণ পূর্বক নানা দেশ আবিষ্কার করত: আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং মালায়ার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এমনকি চীনদেশেও আরব বণিকদের অবাধ গতি ছিল।
>
> কি ইতিহাস কি বিজ্ঞান সাহিত্য কি দর্শনশাস্ত্র আরবগণ সকল বিভাগ এই প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।[২]

এরপর লেখক স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস এবং স্পেনে গড়ে ওঠা মুসলিম সভ্যতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে স্পেন গথজাতির কঠিন শাসনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। এসময় স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক আর আফ্রিকার মুসলিম সেনাপতি ছিলেন মুসা। মুসলমানদের স্পেন দখলের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জানান:

> এই রডারিক তাহার জুলিয়ান নামক এক কর্ম্মচারীর কন্যার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জুলিয়ান আফ্রিকার মুসলমানগণকে স্পেন অধিকার করিতে আমন্ত্রণ করেন। মুসা এ সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী তারেখ স্পেন গমনপূর্বক রডারিককে নিহত করতঃ স্পেন অধিকার করেন। মুসলমানগণের শাসনাধীনে স্পেন দেশ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

এছাড়া স্পেনে এই সময়ে কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নতি হয়। কর কমিয়ে দেয়া হয়। প্রজাগণ নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো। এসময় অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উমাইয়া খলিফা আবদুর রহমানের অধীনে কিছুদিন স্পেন শাসিত হয়। স্পেনের তৎকালীন রাজধানী কর্ডোভা তিনি পূর্ণ অধিকারে রাখেন। তবে বাগদাদের খলিফা মনসুরের সঙ্গে বিরোধের কারণে পুরো স্পেন দখল করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। খলিফা মনসুরের প্রেরিত সৈন্যদলকে হটিয়ে তিনি (আবদুর রহমান) স্পেনের একের পর এক শহর হস্তগত করতে থাকেন। এইভাবে পুরো স্পেন তার নিয়ন্ত্রণে আসে। আবদুর রহমানের পর তাঁর দুই পুত্র পরপর স্পেনের শাসন কর্তা হন। তবে তাঁরা আবদুর রহমান এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসক ছিলেন। তাঁদের সময় স্পেনের চারিদিকে বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর আবার স্পেনে সফল শাসকের আবির্ভাব ঘটে, তিনি তৃতীয় আবদুর রহমান নামে ইতিহাসে পরিচিত। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন:

> এই সময় একজন স্বনামধন্য খলিফা স্পেনের সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছিল। খৃষ্টানগণ নানা উপদ্রব করিতেছিল। কিন্তু তৃতীয় আবদুর রহমান এর সকল বাধা অতিক্রম করিলেন। তাঁহার এরূপ প্রতাপ ছিল যে, স্পেনের কোন কোন খৃষ্টান রাজা যা তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আবদুর রহমানের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আবদুর রহমান বহু দেশ জয় করিয়া অমিত বিক্রমে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দরবারে কনষ্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট, ফরাসী দেশের নৃপতি, জার্ম্মানী ও ইটালীর রাজা দূত পাঠাইয়াছিলেন। কি এশিয়া কি ইউরোপ সর্ব্বত্র তিনি শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার নিমিত্ত খ্যাত ছিলেন।[১]

তাঁর শাসনকালে পরে তাঁরই পুত্র দ্বিতীয় হাকাম শাসনক্ষমতায় আসেন। তিনি বই-পুস্তকের গভীর অনুরাগী ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁকে 'গ্রন্থকীট' বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর সংগ্রহশালায় লক্ষাধিক বই সংগৃহীত ছিল। যখনই কোনো দেশ থেকে নতুন বইয়ের সংবাদ আসত, বা কেউ নতুন পুস্তক রচনা করতেন, তখন খলিফা দ্বিতীয় হাকাম তার নিকট থেকে সেই বই ক্রয় করে নিতেন। কিন্তু হাকামের মৃত্যুর পর বই সংগ্রহের অবসান ঘটে। অতঃপর হাকামের স্ত্রী তাঁদের অল্পবয়স্ক পুত্র হিশামের পরিবর্তে আরেকজনকে রাজপদের জন্য মনোনীত করেন।তিনি ছিলেন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আল মনজুর, যাকে হাকামের স্ত্রী খুব স্নেহ করতেন। আস্তে আস্তে আল-মনজূর প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে উন্নীত হন। তিনি দাপটের সঙ্গে শাসন করার কারণে স্পেনের খ্রিস্টানগণ তার পতন কামনা করতেন। তার সঙ্গে খ্রিস্টানদের কয়েকবার যুদ্ধও সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে লেখক বলেন :

> খ্রীষ্টানগণ বারবার পরাজিত হইয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিত। ১০০২ খৃষ্টাব্দে যখন আল মনজুর এর মৃত্যু হইল তখন খৃষ্টান সন্ন্যাসীগণ লিখিয়া রাখিয়াছিল, আল মনজুর ১০০২ খষ্টাব্দে নরকে গমন করিল। ইহা হইতেই তাহাদের ভয়ের পরিমাণ কতকটা অনুমান করা যায়।[২]

আল মনজুরের মৃত্যুর পর স্পেনীয় মুসলমানগণের দুর্দশা ঘনিয়ে আসতে লাগলো। একজন শক্তিশালী মুসলিম শাসক ব্যতীত মুসলমানদের চলার পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সময় মুসলমানদের নিজেদের

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়। এই সুযোগে খ্রিস্টানগণ চারদিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। একের পর এক খলিফা শাসন ক্ষমতায় আসছিলেন ঠিকই, তবে তারা পুতুলের ন্যায় আসন গ্রহণ করতেন এবং আহত বা নিহত হতে লাগলেন। সর্বশেষ মুসলিম শাসক তৃতীয় হিশামকে কারাগারের অন্ধকারে এক টুকরো রুটির জন্য ক্রন্দন করতে হয়েছিল বলে জানা যায়।

কর্ডোভার জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে সব ধ্বংস করলো। এইসময় খ্রিস্টান রাজাগণও আক্রমণ করলেন। তখন স্পেনের মুসলমানগণ আফ্রিকার মুসলমানগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। আফ্রিকা তখন আল-মোয়াইদ বংশীয়দের অধীনে ছিল। তাঁদের অধিনায়ক ইউসুফ স্পেন আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করে গ্রানাডায় প্রবেশ করলেন। কিছুদিন পর আল-মোহাদ্দিস আল মোয়াইদগণকে আফ্রিকা এবং স্পেন থেকে বিতাড়িত করে আফ্রিকা থেকে স্পেন পর্যন্ত শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু পরে তারাও স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এদিকে খ্রিস্টানগণ একটি একটি করে দেশ জয় করছিল। এই সময়ে গ্রানাডার অধিপতি বনীনসর মুসলমানদের নেতা ছিলেন। তাঁর সিংহ বিক্রমে খ্রিস্টানগণ সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকত। বনীনসরের পুত্র বুয়ারদিল খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হন। পরে বুয়ায়দিল খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে খ্রিস্টানগণ তাঁকে গ্রানাডার রাজা করে সেখান থেকে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের বহিষ্কার করলেন। বুয়ারদিলের সঙ্গে খ্রিস্টানদের এরূপ চুক্তি ছিল যে যখন তাঁরা অন্য সমুদয় দেশ অধিকার করবে তখন বুয়ারদিল তাদেরকে গ্রানাডাও ছেড়ে দেবে। ক্রমে অন্য সমস্ত দেশ খ্রিস্টানগণ জয় করল। বাধ্য হয়ে এই পর্যায়ে বুয়ারদিল গ্রানাডা শত্রু হস্তে সমর্পণ করে দেশ ত্যাগ করলেন। যে পাহাড়ে উঠে তিনি দেশ ত্যাগ করেন, সেই পাহাড় 'মুসলমানদের শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস' নামে পরিচিত। এভাবে স্পেন খ্রিস্টানদের হস্তগত হলো। তবে সাধারণ মুসলমানদের বসতি তখনও স্পেনেই ছিল। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন :

> তবে সহস্র সহস্র মুসলমানগণ খৃষ্টান রাজগণের অধীনে বাস করিতে লাগিল। তাহারাই দেশের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির মূলে তাহারাই অবস্থিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় ফিলিপ যখন স্পেনের রাজা ছিলেন, তখন তিনি সমস্ত মুসলমানদেরকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে স্পেনের মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। কারণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন দেশের কৃষির উন্নতির লোপ পাইল।[১]

তবে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান হলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের সুদূরপ্রসারী প্রভাব দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিল। স্পেনে মুসলমান সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে ।

স্পেনের তৎকালীন রাজধানী কর্ডোভা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে। চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর, ভিতরে শত সহস্র প্রাসাদ নিয়ে কর্ডোভা সগৌরবে মাথা উন্নত করে থাকত।কর্ডোভা শহরের আয়তনও তখন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। নগরীর অধিবাসী মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে পৌঁছেছিল। এর ফলে জনসংখ্যার বিচারে কর্ডোভা পরিণত হয়েছিল

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

বাগদাদের পর তৎকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহরে। উল্লেখ্য তৎকালীন বাগদাদ নগরীর জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ।[১]

সমস্ত ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে বিদ্যার্থী কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করত। এই নগরী দশ মাইল দীর্ঘ ছিল। খলিফার প্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন:

> খলিফার প্রাসাদ-সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। পঞ্চাশৎ সহস্র অমাত্যের প্রাসাদ, এক লক্ষ সাধারণ লোকের আবাসস্থান, শতশত মসজিদ এবং নয়শত সাধারণের স্নানাগার যে স্থানে অবস্থান করিত তার শোভা কল্পনারও অতীত। স্নান করা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা মুসলমানদের প্রকৃতিগত অভ্যাস। একবেলা উপবাস করিয়াও তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত।কর্ডোভার সান্নিধ্যে আজ-জোহরা নামে তৃতীয় আবদুর রহমান একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদ নির্মাণ করিতে প্রত্যহ দশ সহস্র লোক খাটিত। চারি সহস্র স্তম্ভ এবং ১৫০০ দ্বার লইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সদা সর্বদাই কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকিত। এমনকি পুকুরের পানিতে মৎস্যের নিমিত্তে রোজ ১২০০০ রুটী লাগিত।[২]

প্রাসাদ সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি জ্ঞানালোকে এই কর্ডোভা নগরী উজ্জ্বল ছিল। প্রত্যেক বিষয়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয়া হতো। ইউরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্র এসে এখানে জ্ঞান লাভ করত। শিল্প-বাণিজ্যের নগরী হিসেবে কর্ডোভার পাশাপাশি গ্রানাডা ও অন্যান্য শহরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে। লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এতৎপ্রসঙ্গে লেখেন:

> ১৩০০০০ তন্তুবায় এক কর্ডোভাতেই বাস করিত। কাঁচ, হাতির দাঁত, মণিমুক্তা প্রভৃতির কারখানারও অভাব ছিল না। সেভিল, মারসিয়া, গ্রানাডা অস্ত্রশস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল গ্রানাডা শহর অতিশয় সমৃদ্ধশালী ছিল এই নগরে সকল প্রকার জিনিসই প্রস্তুত হইত। স্বর্ণযুগে পাহাড় থেকে সুপ্রিয় জল শহরের সকল স্থানে আনয়ন করা হইত।[৩]

শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষায় নারী-পুরুষের সমান ভাবে এগিয়ে যাওয়া ওই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল। এ-প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> রমণীগণ বিদ্যায় ও জ্ঞানে পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগকে সকলেই সম্মান করিত। ইউরোপে যাহাকে শিভালরী অর্থাৎ যাহার প্রধান চিহ্ন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাহা মুসলমানগণই প্রথমে জগতকে শিক্ষা দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্পেন দেশে মুসলমান সভ্যতার আলোক ক্রমে ফরাসি দেশে প্রবেশ করে এবং সমস্ত ইয়োরোপ আলোকিত করে।[৪]

লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখানে স্পেন পর্বের আলোচনা শেষ করে 'আফ্রিকায় মুসলমান জাতি' শীর্ষক প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন – উমাইয়ারা প্রথম আফ্রিকা জয় করেছিলেন। উমাইয়া-পরবর্তী আব্বাসীয় বংশের তৃতীয় খলিফার শাসন পর্যন্ত আফ্রিকা আব্বাস বংশীয়দের অধীনে ছিল। আব্বাসী খলিফার পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ইব্রাহিম ইবনু আগলাব উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়া রাজ্যের গভর্নর বাগদাদের খলিফা

১ড.রাগিব সারজানি, *'আন্দালুসের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড'*, আবু মুসআব ওসমান অনূদিত, মাকতাবাতুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ ২০১৮, পৃ.২৯৭

২ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২

৪ প্রাগুক্ত

হারুনর রশিদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা আদায় করে নেন। এভাবে আব্বাসী বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় আগলাবির বংশধরেরা পরবর্তী ১০০ বছর উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন। তারা আগলাবি রাজবংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত হন।[১]

এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় আরো একটি বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। উত্তর আফ্রিকায় আগলাবের রাজ্য আক্রমণপূর্বক ধূর্ত ব্যক্তির ক্ষমতাগ্রহণের আরেকটি চিত্র তুলে ধরেন লেখক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত:

> শিয়াগণের প্রধান ওবাইদুল্লার সহচর আবদুল্লা একজন চতুর এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল্লাহর কৌশলে ওবাইদুল্লা আগলাবের রাজ্য আক্রমণ করে খলিফার পদ গ্রহণ করেন। এই বংশ ফাতিমীয় বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[২]

এভাবে ক্রমে সমস্ত আফ্রিকা ফাতেমীয় বংশীয়দের হস্তগত হয়। ওবায়দুল্লাহর পর তাঁর পুত্র কাসেম খলিফার আসন গ্রহণ করেন। তিনি এক বৃহৎ রণপোত বাহিনির সৃষ্টি করেছিলেন। ইটালীয় দস্যুগণ তাঁর রাজ্য লুণ্ঠন করত বলে তিনি সমুদ্রপথে গমন করে দক্ষিণ ইটালি আক্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ সিসিলি জয় করেছিল।

একই সময়কালে মিসরের অধিবাসীগণ তখনকার শাসনকর্তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চতুর্থ ফাতেমী খলিফা মুইজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তখন মুইজ নিজে অধিকার করে সেখানে তাঁর শাসন কায়েম করেন। তিনি মিসরের কায়রোতে বিশাল নগর নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তার পুত্র আজিজের ক্ষমতায়থাকা পর্যন্ত ফাতেমীয় সাম্রাজ্য গৌরবের সঙ্গে শাসনকার্য চালিয়েছিল। কিন্তু আজিজ এর পুত্র হাকিম অনেকটা অস্থিরমতি ছিলেন তিনি প্রায়ই একাকী সাধারণ পোশাক পড়ে গাধার পিঠে চড়ে নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন তিনি একাকী পর্বতারোহণের পর নিখোঁজ হন, আর তার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তবে ফাতেমীয় শাসনকালে মিসর এবং রাজধানী কায়রো সমৃদ্ধি লাভ করে। এই বিষয়ে লেখক বলেন:

> কেইরো ফতিমিদ শাসন সময় অতিশয় সুরম্য পুরী ছিল। এই নগরী অসংখ্য প্রাসাদ, বাগান এবং মসজিদে পরিপূর্ণ ছিল। শত শত বিদ্যালয় এবং পুস্তকাগার শিক্ষা বিস্তার করিত। কেইরোতে একটি অদ্ভুত গৃহ ছিল। তাহাতে নানারকম দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা হইত।[৩]

ফাতেমীয়দের শাসন প্রণালী অনেক উন্নত ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সৈন্য সামন্ত রণপোত প্রভৃতি কোনো কিছুরই অভাব তাদের ছিল না। সর্বস্থানে শৃঙ্খলা বিরাজ করতো।

একই সময়কালে তুরস্কও রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। তারা তাদের রাজ্যের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। অপরদিকে গজনীর রাজাগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে শাসন করতে থাকেন। গজনীর পর ঘোরী বংশ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। মুহম্মদ ঘোরীর পর তাঁর পুত্র কুতুবউদ্দিন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৈমুর লঙ এসে পাঠান বংশের শাসনের যবনিকাপাত ঘটান। তৈমুর লঙ এর বংশ থেকে সম্রাট বাবরের আবির্ভাব হয়। বাবরের বংশধরগণ ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের শাসক ছিল।

---

১ মুহা. ইসমাইল রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ: নবম খণ্ড*, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৭

২ *ইসলাম গৌরব আব্বাসীয় সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

তাতার আক্রমণ প্রকৃত আরব সভ্যতার বিনাশ সাধন করেছিল। তাঁর পূর্বের উমাইয়া শাসন আরব সভ্যতার অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল। পরবর্তী আব্বাসীয়দের সময় আরব ছাড়া যখন অন্য জাতির মুসলমানগণ আধিপত্য লাভ করল, তখন সভ্যতার আকার অন্যরূপ ধারণ করেছিল। এই সময়ের সভ্যতাকে পারস্য সভ্যতা বলে, কারণ পারস্যই এই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই সভ্যতা পৃথিবীর একটি গৌরবও বটে। সামগ্রিকভাবে তৎকালীন মুসলিম সভ্যতা জগতের অন্যতম একটি গৌরব হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> মুসলমান সভ্যতার আরেকটি বিশেষ প্রশংসা করিবার জিনিস ইহার উদারতা। মুসলমান নগরীগুলিতে ইহুদিগণ তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দির নির্মাণ করিয়া নিরাপদে উপাসনা করিতে পারিত।আর অনেক সভ্য দেশে এক ধর্মাবলম্বীগণ পরাক্রমশালী হইয়া খুজিয়া বেড়াইত কোথায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আছে এবং তাহাদের আগুনে দগ্ধ করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। স্কটের আইভানহো পড়িলে একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ইউরোপে জুগিদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল তাহার তুলনা হয় কিনা জানিনা।[১]

লেখক অবশেষে এশিয়ার প্রশংসা করে প্রবন্ধ শেষ করেন এই বলে:

> এই এশিয়ায় খৃষ্ট, বুদ্ধ,মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই এশিয়া আত্মার সন্ধান পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইউরোপের পেটরা বুঝি নিঃশেষ হইল, কিন্তু অমর এশিয়ার জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এশিয়া-ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাত ধরিয়াছে। কে জানে এশিয়া জগতকে কি শিক্ষা দেবে।[২]

লেখকের এই প্রবন্ধ সমকালীন মুসলিম বিশ্ব ও উপমহাদেশের রাজনীতির একটি অন্যতম ঐতিহাসিক আলেখ্য।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মোহাম্মদ সানাউল্লার (১৮৯২-১৯৭৩), ‘বোগদাদ নগরীর ধ্বংস সাধন’ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক ‘বাগদাদ’ নগরীকে ‘বোগদাদ’ও বলা হয়। মধ্যযুগের আরবের একটি ধ্বংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে লেখক এ-প্রবন্ধটি লেখেন। মোহাম্মদ সানাউল্লাই প্রথম বাঙালি মুসলমান, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি-ফারসিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির (১৯১১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ‘সাম্যবাদী’ পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক ছিলেন।[৩] মোহাম্মদ সানাউল্লার লিখিত এ প্রবন্ধটিতে ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী অধ্যায় সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ও বিশ্লেষণের দিক উন্মোচিত হয়েছে। লেখক একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের একটি ঘটনাবহুল অধ্যায়ের উল্লেখ করে প্রবন্ধের সূচনা করেন। লেখক এই সময়কালের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে বলেন :

> অক্সাস নদীর পরপার থেকে তিনটি যাযাবর জাতি ক্রমাগত পশ্চিম এশিয়ায় আগমন করে। প্রথম সেলজুক তুর্কী, দ্বিতীয় চেঙ্গিজ ও হালাকুব অধীনে মঙ্গোল এবং তৃতীয় তৈমুরের সঙ্গে তাহার তুর্কী যোদ্ধাগণ। সেলবুকের পৌত্রদ্বয় তুগ্রল ও দায়ুদ১০৪০ খৃষ্টাব্দে গজনিরাজের নিকট থেকে মার্ভ জয় করিয়া লন এবং

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৩ *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১১, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫৩

অল্প দিনের মধ্যেই গজনি রাজের ক্ষমতা লোপ পায়। তুগ্রল খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সমস্ত পারস্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।[১]

ঐতিহাসিকভাবে ল্যাটিন নাম 'অক্সাস' নদী আমু বা আমো নদী নামেও পরিচিত। বর্তমান আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্থান, উজবেকিস্তানের ভেতর দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে এই নদীকে ঘিরে সাসানিয়ান সাম্রাজ্য ও রাশিদুন খিলাফতের মধ্যে বিশাল যুদ্ধসংঘটিত হয়। পশ্চিম এশিয়া বলতে জাতিসংঘের ভূবিন্যাস অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশের ৪৬টি দেশের মধ্যে ১৮টি দেশ অধ্যুষিত অঞ্চলকে বোঝায়। আবার স্বীকৃত-অস্বীকৃত ২৩টি দেশকে পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে অনেক ঐতিহাসিক দেখিয়ে থাকেন। তিনটি যাযাবর জাতির অত্র এলাকায় আগমন ও প্রভাব বিস্তারের কথা লেখক এ-প্রবন্ধে বলেছেন।

লেখক প্রথমে উল্লেখ করেছেন 'সেলজুক তুর্কী'দের কথা। সেলজুক রাজবংশ ছিল একটি তুর্কি সুন্নি মুসলিম রাজবংশ যারা কালক্রমে ফার্সি সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং মধ্যযুগের পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার তুর্কি-ফার্সি ঐতিহ্যে বিশাল অবদান রাখে। সেলজুক বংশের প্রধান উর্ধ্বতন পুরুষ হলেন সেলজুক বিন তুকাক। তিনি একশ সাত বছর বয়সে ইন্তেকালকরেন। একসময় সেলজুক পরিবারের হাল ধরেন সেলজুক বিন তুকাকের দুই পৌত্র তুগরুল বেগ মুহাম্মাদ ও চাঘরি বেগ দাউদ। তাঁরা সেলজুক বংশের সদস্যদের নিয়ে বোখারার মরু অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। কিন্তু বোখারার প্রশাসক তাদের অবস্থানে শঙ্কা ও বিরূপ ভাব প্রকাশ করলে তাঁরা সেখান থেকে তুর্কিস্থানের শাসক বুগরা খানের নিকট চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে বুগরা খানের সঙ্গে সেলজুক পরিবারের সংঘাত সৃষ্টি হয়। ঘটনা পরম্পরায় তাঁরা সামানিয়া রাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সামানিয়া সাম্রাজ্য ছিল মধ্য এশিয়ার একটি সুন্নি পারস্য সাম্রাজ্য। এই রাষ্ট্রে তখন আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন শক্তি গজনবি (সবুক্তগিন) পরিবার। এবার গজনবি পরিবারের সঙ্গে সেলজুক পরিবারের সংঘাত শুরু হয়। অবশ্য পরে সেলজুক ও গজনবি পরিবারের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং সেলজুক পরিবারের নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যগণ বিভিন্ন অঞ্চল ও নগরীর শাসনক্ষমতা লাভ করে।

১০৪০ খ্রিস্টাব্দে (৪২৯ হিজরি) পুনরায় গজনবি সেলজুক সংঘাত শুরু হয়। এসময় তুগরুল বেগ মার্ভের (বর্তমানে তুর্কমেনিস্তানের একটি শহর) কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে তুগরুল বেগ নিশাপুর (ইরানের খোরাশান প্রদেশের একটি শহর), তুরজান, তিবরিস্তান অধিকার করেন। সেলজুক পরিবার ধীরে ধীরে তৎকালীনপ্রাচ্যের সিংহভাগ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।[২]লেখক সানাউল্লাও এই তথ্যই দিয়েছেন।

আব্বাসি খেলাফতকালে খিলাফতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেসব স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তার একটি খোয়ারিজম রাজ্য। মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা খোয়ারিজম রাষ্ট্রেও তুগরুল বেগ

---

১ মোহাম্মদ সানাউল্লা, 'বোগদাদ-নগরীর ধ্বংস সাধন, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৯, অক্টোবর ১৯২২, পৃ. ২৩৯

২ ড. রাগিব সারজানি, *ইসলামি ইতিহাস: ২য় খণ্ড*, আবু মুসআর ওসমান অনুবাদিত, মাকতাবুল হাসান, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ৩১৫-৩১৭

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সেলজুকদের নতুন প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বুওয়াইহি পরিবার। কিছুদিন পর সেলজুক-বুওয়াইহি সমঝোতা সৃষ্টি হয় এবং সেলজুক পরিবারের প্রধান তুগরুল বেগ তৎকালীন বুওয়াইহি অধিপতি সুলতান মুহিউদ্দিন আবু কালিজারের কন্যাকে বিয়ে করেন। বুওয়াইহিরা তখন বাগদাদ শাসন করতেন। দুর্বল বাগদাদ অধিপতি তাঁর ক্ষমতা (তুগরুল বেগ) স্বীকার করে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেন বলে মনে করেন লেখক সানাউল্লাও। তুগরুল বেগের হাতেই বাগদাদের বুওয়াইহি শাসনের অবসান ঘটে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ ডিসেম্বর বাগদাদ অবরোধের মাধ্যমে। বুওয়াইহি রাজবংশের শেষ প্রতিনিধির শাসনাধীন বাগদাদের সাময়িক গভর্নর ও তুর্কি জেনারেল আল-বাসাসিরি রাজধানী ত্যাগ করেন এবং খলিফা আল-কাযিম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) আক্রমণকারী সেলজুকদের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেন। ১০৬২ খ্রি. তুগরুল বেগের (১০৩৭-১০৬২) মৃত্যু হলে তাঁর ভাইপো আলপ আরসলানের রাজত্বকাল (১০৬৩-১০৭২) এবং ভাইপোর ছেলে মালিকশাহের রাজত্বকালকেই (১০৭২-১০৯২) মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যে সেলজুক কর্তৃত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলা যেতে পারে। লেখক সানাউল্লা মালিক শাহের সমৃদ্ধে রাজত্বকালের উল্লেখ করে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> মালিক শাহের সময় সিরিয়া, মিসর, বোখারা ও সমরখন্দও তাঁহার রাজ্যভূক্ত হয়। ইহাঁদেরই সময়ে রাজনীতিকে নিজামুলমুলক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ও কবি ওমর খাইয়াম এবং শায়খুল জবল (পার্ব্বত্য দলপতি) হাসান সাবাহ জীবন অতিবাহিত করেন। এই সেলজুক তুর্কীদের একশাখা এশিয়া মাইনরে কোনিয়া বা রুমে একটি রাজ্য স্থাপন করেন।[১]

সেকালে এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া প্রথমে আরবদের এবং পরবর্তীকালে তুর্কি আক্রমণকারীদের কাছে পরিচিত ছিল 'রুম' নামে। তুর্কিরা এই অঞ্চল অধিকার করলে তাদের 'রুমিয়ুন' নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিকেরা একে 'বাইজান্টাইন'নামে অভিহিত করে থাকেন। সুলতান মালিক বেগের শাসনকালে সেলজুক সাম্রাজ্য অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এর পরবর্তীকালে এই সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট আমিরাতে পরিণত হয় এবং আরো পরে এই সাম্রাজ্যেরই উত্তরসূরি হিসেবে মোগল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লেখক প্রবন্ধের এ পর্যায়ে চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, তৈমুর লঙের শাসনকাল ও রাজ্যবিস্তৃতির ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তৈমুর নিজেকে চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী মনে করতেন, তবে এ বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের মতে, তিনি চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন না। তবে চেঙ্গিস খান ও আলেকজান্ডারের মতো তিনিও বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর এই তুর্কি মঙ্গোল সেনাধ্যক্ষ পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে তৈমুরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। লেখক সানাউল্লাহ তৈমুরের (১৩৩৭-১৪০৫) রাজ্যজয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সবিসয়ানা প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। ২৩ বৎসর বয়স হইতে তিনি রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত পারস্য, সিরিয়া, এশিয়া মাইনরের কিয়দংশ তুর্কীস্থান, কিপচাক বলগা প্রদেশ (রুশিয়া দেশের কতক অংশ) জর্জিয়া, মেশোপটামিয়া এবং উত্তরভারত তিনি জয় করেন। বহু মসজিদ,

---

১ *মোহাম্মদ সানাউল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

> প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি দ্বারা রাজধানী সমরখন্দ সুশোভিত করেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন দেশ জয় করিতে যাত্রা করেন কিন্তু পথিপথে মানবলীলা সংবরণ করেন।[১]

তৈমুরের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল চীনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা। ১৩৬৮ সালে তাঁর উত্থানকালে চীনে মোঙ্গল ইউয়ান বংশের পতন ঘটিয়ে স্থানীয় মিং বংশের শাসন শুরু হয়। তখন থেকেই তৈমুরের ইচ্ছা ছিল চীন দেশের মোঙ্গলীয় শাসনের পুনরুদ্ধার করা। এমনকি তিনিনিজেকে এশিয়ার একমাত্র অধিপতি দাবি করে মিং বংশকে তাঁর অধীনতা মেনে নিয়ে তাঁর দরবারে কর প্রেরণের আহবান জানান। কিন্তু, তিনি তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযানের প্রাক্কালে সমরখন্দ থেকে ২৫০ মাইল দক্ষিণে জাক্সারটাস নদীর তীরবর্তী ওতরা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

তৈমুরের বংশধরগণ বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করেন। শাহরুখ, উনুগবেগ, আবু সায়িদ ও সুলতান হোসায়েন মির্জ্জা সর্বপ্রকার শিক্ষা ও কলা-বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী আলি শের একজন সুদক্ষ কবি ছিলেন। অমর কবি আবদুর রহমান জামী ও হাতিফি এবং ঐতিহাসিক মিরখান্দ ও খান্দমির তাঁর সভায় থাকতেন। আবুসায়িদের পুত্র বাবর ভারতে এসে মোগলরাজ্য স্থাপন করেন। তুর্কি-মোঙ্গলীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং চেঙ্গিস খানের বংশধর না হওয়ার কারণেই তিনি 'খান' পদবি ব্যবহার করতে পারতেন না বলেই 'আমির' পদবি ব্যবহার করতেন। তৈমুর আনুমানিক ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে আমির হুসাইনের বিরুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। আমির হুসাইনের স্ত্রী সারা মুলক খানম ছিলেন চেঙ্গিস খানের বংশধর। হুসাইনের মৃত্যুর পর তৈমুর সারা মুলক খানমকে বিয়ে করেন। এরপরই তিনি মধ্য এশিয়ার চাকতাই গোষ্ঠীর একচ্ছত্র শাসক হয়ে ওঠেন। বিবাহসম্পর্ক এবং আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে চেঙ্গিস খানের বংশধর বলে মনে করা হয়। তৈমুরের প্রকৃত নাম ছিল তৈমুর বেগ। একটি যুদ্ধের সময় পায়ে আঘাত পেয়ে তাঁর একটি পা অকেজো হয়ে যায়। এরপর থেকেই তাঁর নাম তৈমুর লং হয়। ফার্সি ভাষায় 'লং' শব্দের অর্থ 'খোঁড়া'। তিনি ইতিহাসে এজন্য তৈমুর লং হিসেবে পরিচিত। লেখক সানাউল্লা তৈমুরের পদ-পদবির বিতর্কের কারণে কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করেননি। লেখক সানাউল্লা অতঃপর তৈমুরের প্রায় দুইশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী দোর্দন্ত প্রতাপশালী শাসক চেঙ্গিস খানের (১১৬৩-১৮ আগস্ট ১২২৭) শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করেন। চেঙ্গিসের প্রকৃত নাম তেমুজিন। ১২০৬ খ্রি. তিনি সমগ্র মোঙ্গলের অধিপতি হলে তাঁর নামের সঙ্গে 'খান' যুক্ত হয়। লেখক চেঙ্গিস খানের জন্মসাল ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে লিখেছেন, সম্ভবত এটি ছাপার ভুল, কারণ আমরা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর জন্মসাল ১১৬২ খ্রি. বা ১১৬৩ খ্রি. পাই। তাছাড়া চেঙ্গিসের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মেলালে ১১৩৫ খ্রি. জন্মসাল ধরলে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। চেঙ্গিস খান ও তাঁর পুত্ররা কীভাবে একের পর এক রাজ্য বা এলাকা জয় করেন তা জানাতে গিয়ে লেখক বলেন :

> ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া কারাকোরাম নগরীতে 'খাকান' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। সমস্ত তাতার ও চীন অধিকার করিয়া খিবা দখলের জন্য তাঁহার দুই পুত্র ওকতাই এবং জগতাইকে প্রেরণ করেন। খিবাধিপতি জালালুদ্দীন পরাস্ত হইয়াও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

২ মুহাম্মদ ওমর ফারুক, *ইতিহাসের নিরিখে তৈমুরীয় শাসনব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা*, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩০*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯৮৯-৯৯০

> রানা প্রতাপের ন্যায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। জালালুদ্দীন প্রথমে বলখ, তৎপুর নিশাপুর, সিস্তান ও গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঙ্গিসের সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উক্ত স্থানগুলি অধিকার ও তত্রতা অধিবাসীদিগকে নিহত করে।[১]

চেঙ্গিস খানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া কারাকোরাম নগরী একটি পার্বত্য অঞ্চল, যা বর্তমান পাকিস্তান, ভারত ও চীনের সীমানা জুড়ে বিস্তৃত। মূলত পাকিস্তানের গিলগিত-বালতিস্তান, ভারতের লাদাঘ এবং চীনের জিনজিয়ান প্রশাসনিক অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম পার্বত্যাঞ্চলসমূহের মধ্যে কারাকোরাম অন্যতম। তবে আরেকজন গবেষক বলেছেন চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত কারাকোরাম নগরী।[২] যে 'খিবা' দখলের জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র ওকতাই খান (১১৮৬-১২৪১) এবং জগতাই খানকে প্রেরণ করেন, তা বর্তমান উজবেকিস্তানের খাওয়ারিজম অঞ্চলের একটি শহর। 'খিবাধিপতি' বা খাওয়ারিজমের সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জের ধরেআব্বাসীয় শাসক খলিফা নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.) চেঙ্গিস খানকে খাওয়ারিজম আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। জালালুদ্দীন বলখ বা বালখ নিশাপুর, সিস্তান, গজনীর যে-সব এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন তা বর্তমানে উত্তর আফগানিস্তানের ওয়াজিরাবাদ, ইরানের খোরাসান প্রদেশের শহর, ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা নিয়ে বিস্তৃত।

বর্তমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরানেও টিকতে না পেরে জালালুদ্দীন বর্তমান ভারতে আগমন করলে সিন্ধু নদীর তীরে চেঙ্গিস খানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এখানেও জালালুদ্দীন পরাজিত হয়ে নদী সাঁতরে প্রাণরক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তান চেঙ্গিসের হাতে ধরা পড়েন এবং দাস-দাসীরূপে বিক্রি হন বলে লেখক জানান। চেঙ্গিসের নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী এভাবে জয় করতে করতে অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় পরাজিত হওয়ার বিষয়ে লেখকের ভাষ্য নিম্নরূপ :

> মঙ্গোলরা তৎপর কান্দাহার, মূলতান, আজাবরাইজান, ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত জয় করিয়া ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাতারে প্রত্যাগমণ করে। ইত্যবসরে অদম্য জালালুদ্দীন ভারত হইতে পুনরায় পারস্যে গমণপূর্বক তাব্রিজ হইতে মঙ্গোলদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেন কিন্তু ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় পরাস্ত হন।[৩]

কান্দাহার (বর্তমান আফগানিস্তানে), মূলতান (পাকিস্তানের পাঞ্জাবে), আজারবাইজান, ইরান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও রাশিয়ার অববাহিকা দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর প্রবাহিত হয়েছে। 'তাতার' বর্তমান রুশ ফেডারেশনের একটি প্রজাতন্ত্র, যেটির সাংবিধানিক নাম তাতারস্তান, মস্কো থেকে দূরত্ব ৮০০ কি.মি.। পূর্ব ইউরোপীয় সমভূমির কেন্দ্রে তাতার অবস্থিত। তাতার জাতি হিসেবে অতীতে পরিচিত ছিলো মোঙ্গল, তুর্কি, সেলজুক ইত্যাদি বিভিন্ন গোত্রে। বর্তমানে রাশিয়া, সাইবেরিয়া ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপে বসবাসকারী গোত্রসমূহকে তাতার জাতি বলা হয়। জালালুদ্দীন ভারত থেকে ইরানে যেয়ে ইরানের অন্যতম শহর তাবরিজ থেকে মোঙ্গলদের বহিষ্কার করতে সক্ষম হন।

---

১ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

২ ড. রাগিব সারজানী, *ইসলামি ইতিহাস* (২য় খণ্ড), আবু মুসআর ওসমান অনুদিত, মাকতাবাতুন হাসান, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ৩৫২

৩ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

চেঙ্গিস খান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণের পর ক্রমান্বয়ে তার পুত্ররা তাঁর নিয়ন্ত্রাণাধীন বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতায় আসীন হন। তাঁর পুত্র ওকতাই (১১৮৬-১২৪১) তাতারের শাসকর্তা হন। এই সময়ে তাঁর আর এক পুত্র টুলি খানের পুত্র মাঙ্গু খান পারস্যের অধিপতি হন। মাঙ্গু খানর ভাই ছিলেন হালাকু খান। হালাকু খানকে তাই মাঙ্গু খাঁ পারস্য শাসন করতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করতে পাঠান। ১২৯৪ সালে মাঙ্গু খানের মৃত্যু হয়। তাঁর আর এক ভাই বাতু খান (১২২৭-১২৫৫) মস্কো ও হাঙ্গেরি জয় করেন এবং তাঁর বংশধরগণ বহু শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখেন। বাতু খানের অন্য ভাই শাখরানি খান সাইবেরিয়া দখল করেন এবং ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেন।[১]

বাতুখানের পর তাঁর পুত্র বার্কা খান সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। ১২৬২ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সমর্থক অনুসারীরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে। ১২৯৪ সালের মধ্যে চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয়। কোরিয়া থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত ভূভাগ নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারীরা। ১২৬০ এর দশক থেকে তাদের ভাঙন শুরু হয় এবং ১২৯৪ সালের মধ্যে ১. ইউনয়ান সাম্রাজ্য ২. চাগতাই খানাত ৩. সোনালি সাম্রাজ্য ৪. ইলখানদের রাজত্ব নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাগদাদ অবরোধ স্থায়ী হয়েছিল এবং অবরোধের পর বাগদাদ মোঙ্গলদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের ভাই মাঙ্গু খান (শাসনকাল ১২৫১-১২৫৯) মেসোটপেমিয়া, সিরিয়া ও ইরানে শক্ত কর্তৃত্ব স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হালাকু খানকে 'খেলাফত'সহ বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য জয় করার দায়িত্ব দেন। এ সময় আত্মসমর্পণ যারা করবে না, তাদের ধ্বংস করে দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়। তবে এ চূড়ান্ত অভিযানের পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে, যখন হালাকু খান তাঁর খ্রিস্টান স্ত্রী ডুকুবা খাতুনকে নিয়ে অক্সাস নদী পার হয়ে পারস্যে উপনীত হন। সেই সময় মোঙ্গলদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ইটালি, গ্রিস, ফ্রান্স এমন কি ইংল্যান্ড থেকে বহু পাদ্রি মধ্য এশিয়ায় উপস্থিত হন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> মঙ্গোল আমিরদিগকে নিজ ধর্মে আনয়ন করিতে তাঁহারা যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁহারা কেহ কেহ আপন আপন কন্যা বা তদ্রূপ অন্য কোন রমণীকে তাঁহাদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতেন। কিন্তু বড় কেহ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু তাহারা কালক্রমে সকলেই ইসলাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২]

হালাকু খান নিজে প্রথমে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হলেও পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর অভিযানের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিল পূর্বপুরুষের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং প্রভাবশালী 'খেলাফত' বা শাসকদের উচ্ছেদসাধন করা। এ ব্যাপারে চীনের প্রকৌশলী ও সৈনিকদের একাংশ হালাকু খানের সহায়ক হিসেবে ছিল। লেখক হালাকু খানের অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন :

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত

> দুইটি উদ্দেশ্যে হালাকু কারাকেরাম হইতে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ আলামুত পর্বতের হুসেন সাবাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেল্লা বংশ ধ্বংশ করা এবং দ্বিতীয়ত বোগদাদের খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করা।[১]

হালাকু খান এ উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগ সমরখন্দে অতিবাহিত করেন। কেশ নামক স্থানে পারস্যের নবনিয়োজিত শাসনকর্তা আরগন খাঁর সঙ্গে ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হালাকু প্রথমে ইসমাইলি শিয়াদের আলামুস পর্বত কেল্লা দখল করার আয়োজন করতে লাগলেন। আলামুতে তখন হাসান সাব্বাহর (১০৫০-১১২৪) শেষ উত্তরাধিকারী রুকনদ্দীনের (১২২৩-১২৭৭) প্রাধান্য ছিল। তিনি তাঁর ইসলাম বিরুদ্ধ কার্যকলাপ দ্বারা মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। হালাকু প্রথমে কোহস্থানে তাদের তুন ও খাফ নামে দুটি দুর্গ অধিকার করেন এবং দশ বছরের কম বয়স্ক বালক-বালিকা ছাড়া আর সব অধিবাসীকে হত্যা করেন। রুকনদ্দীনের যুদ্ধ করার সামর্থ্য ছিল না বিধায় তিনি অনেকগুলি দুর্গ হালাকুকে সমর্পণ করে এই সন্ধি করলেন যে, দুর্গস্থ সৈন্য ও অধিবাসীদেরকে হত্যা করা যাবে না। হালাকু তারপরও তাদেরকে এমনকি শিশুদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করেন। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আলামুত দুর্গ লুণ্ঠিত ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। হালাকুর সচিব আতামালিক জুইয়ানি আলামুত পুস্তকাগার থেকে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ ও মানমন্দির থেকে বহুযন্ত্র সংগ্রহ করে রাখেন। ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে তাঁকে প্রহরীসহ কারাকোরামে মোঙ্গল সম্রাট মাঙ্গু খানের নিকট পাঠনো হয়। পথিমধ্যে তাঁকে নির্যাতিত হতে হয়। মাঙ্গু খানের নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাঁকে প্রাণনাশের আদেশ দিয়ে মতপ্রকাশ করেছিলেন। কারণ ছিল, কেন এত লোককে হত্যা করা হয়েছে। তিনি হুকুম দেন, যেন তাঁর অবশিষ্ট অনুগামীকে বিনাশ করা হয়। এইরূপ বহুসংখ্যক বালককে হত্যা করা হয়। লেখক তারপরও এই ক্ষুদ্র বংশের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন :

> কিন্তু পারস্য, জাঞ্জিবর ও সিরিয়াতে তাহাদের বহুলোক এবং ভারতবর্ষে খোজা ও চিত্রাল নামে দুইটি সম্প্রদায় এখনও বর্তমান। কেহ কেহ বলেন, হিক হাইনেস দি আগা খাঁ খালামুত অধীশ্বরের বংশ সম্ভুত।[২]

ইসমাইলিয়া শিয়াদের পতনে গোঁড়া মুসলমানরা তার বিরোধীরা খুশী হলেও এরপর হালাকু খান যে কাণ্ড করেছিলেন তা অতীব ভয়ংকর ও লোমহর্ষক। হতভাগ্য রুকনউদ্দীনের প্রাণদণ্ডের পর হালাকু হামদানে অবস্থান করেন। এরপর তাঁর পরবর্তী অভিযান শুরু হয় বাগদাদের খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহর পতন ঘটানোর জন্য। ৬৫৬ হিজরিতে (১২৭৮ খ্রি.) ২ লক্ষ মোঙ্গল সৈন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ উদ্দেশ্যে বাগদাদ পৌছায়। খলিফা আল-মুসতাসিমকে তাঁদের সঙ্গে আপোস করার নির্দেশ দেয়া হয়। খলিফার সেনাবাহিনী তাঁদের সম্মুখীন হয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে কিন্তু পরাজিত হয়।[৩] এ বিষয়ে লেখক বলেছেন :

> সেখান হইতে বোগদাদাধিপতি খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাকে আত্মসমর্পণ করিতে এবং পাঁচশত বর্ষব্যাপী এসলামের রাজধানী বোগদাদাকে মঙ্গোলদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে সংবাদ পাঠাইলেন। ইহার দুইমাস পর ১২৫৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হালাকু স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।[৪]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৩ আল্লামা জালালউদ্দিন মুয়ূতি, *খলিফাদের ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৩০

৪ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

হালাকু খানের সঙ্গে তখন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: ১. আবুবকর বিন সাদ জঙ্গি, যিনি সিরাজ নগরের আতাবক শাসকর্তা এবং বিখ্যাত কবি ও লেখক শেখ সাদির পৃষ্ঠপোষক, ২. মুসলিম আতাবক শাসনকর্তা বদরউদ্দিন লুলুত, ৩. 'তারিখে জাঁহা গোশা'র লেখক ও হালাকুর সেক্রেটারি ঐতিহাসিক আতা মালিক জুইয়ানি এবং ৪. জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত নাসিরউদ্দীন তুসি। হালাকু খান যখন হামদানে ছিলেন তখন খলিফা মুসতাসিম তাঁর নিকট শরফুদ্দিন আবদুল্লা এবনুল জওজিকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু খলিফার উত্তর সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বাগদাদে আগে থেকে একদল সৈন্য হালাকুর অধীনে রওনা হয়। আর একদল জজুর অধীনে মোসালের (মসুল) নিকট তকরীত (তিকরিত, যেটি বর্তমান ইরাকের সাবেক শাসক সাদ্দাম হোসেনের জন্মভূমি) থেকে রওনা দিয়ে বাগদাদের পশ্চিমদিক আক্রমণ করতে সংকল্প করলেন।[১]

আরেকটি ভাষ্য মতে, হালাকু খান খলিফা মুসতাসিমের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু খলিফার নবীন দুআইদার (লিপিকর ও বার্তাপ্রেরক) আইবেকসহ অনেকে খলিফাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। তাঁরা খলিফাকে বোঝান যে, উজির ইবনুল আলকামি মূলত এর মাধ্যমে হালাকু খানের আস্থাভাজন হতে চাচ্ছেন। তাঁরা খলিফাকে সামান্য কিছু উপহার পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা যৎসামান্য উপহার পাঠালে হালাকু-খান অপমানিত বোধ করেন এবং খলিফার কাছে বার্তা পাঠিয়ে আইবেক ও সুলায়মান শাহকে তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন কিন্তু খলিফা তাদেরকে পাঠাতে সম্মত হননি। এতৎপ্রসঙ্গে খলিফা মুসতাসিমের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে মোহাম্মদ সানাউল্লাহ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> যখন খলিফা কি করিবেন সেই বিষয়ে ইতস্তত : করিতেছিলেন, তখন মোঙ্গলরা বাগদাদের চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলিল। ১২৫৮ সালের ২২ জানুয়ারী তারিখে প্রকৃত প্রস্তাবে বোগদাদ অবরুদ্ধ হয়। ৩০ তারিখে আক্রমণ করা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে খলিফা বহু মূল্যবান উপঢৌকণ ও আত্মসমর্পণের প্রস্তাবসহ ইব্নুল জওজিকে হালাকুর নিকট প্রেরণ করেন। ইহার কিছু দিন পর হালাকুর আশ্বাসবাণী ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া খলিফা তাঁহার দুই পুত্রসহ হালাকুর নিকট উপস্থিত হন। হালাকু নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া মারিয়া ফেলা হয়।[২]

খলিফা মুসতাসিম কাজি, ফকিহ, সুফি এবং রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাতশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে হালাকু খানের সঙ্গে সাক্ষাতের লক্ষ্যে বের হন বলে জানা যায়। প্রতিনিধিদল হালাকু খানের তাঁবুর কাছে পৌঁছালে প্রহরীরা খলিফাকে বাধা প্রদান করে এবং মাত্র সতেরো জনকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। খলিফা সতেরজনকে বাছাই করে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। বাকিদেরকে বাহন থেকে নামিয়ে সঙ্গে থাকা আত্মরক্ষার সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয় এবং একে একে সকলকে হত্যা করা হয়। এরপর খলিফাকে হালাকু খানের সামনে উপস্থিত করা হয়। হালাকু খান তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথিত আছে, হালাকু খানের সামনে ভীত খলিফার কথা বারবার জড়িয়ে আসছিল, এরপর খলিফা খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি ও উজির ইবনুল আলকামিসহ অন্যদের সঙ্গে বাগদাদে ফিরে আসেন। খলিফাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা হয়। তিনি রাজপ্রাসাদ হতে সোনাসহ নানা মূল্যবান সম্পদ উপস্থিত করেন। খলিফা এসব নিয়ে হালাকু খানের নিকট উপস্থিত হয়েও নিজেকে রক্ষা

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২
২ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

করতে পারেননি। খলিফাকে হত্যা করার পরামর্শ উজির ইবনুল আলকামি ও নাসিরুদ্দিন তুসিই হালাকু খানকে দিয়েছিল বলে গবেষকরা জানান।

খলিফাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অনেকেই বস্তায় ভরে পদাঘাত করার কথা বললেও কেউ কেউ শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা বলেন। আবার অনেকেই বলেন, খলিফাকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়।[১] লেখক সানাউল্লাহ অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিকের বরাতে 'বস্তা'র বদলে 'গালিচা'র কথা উল্লেখ করে খলিফার মৃত্যু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মঙ্গোলদের অদ্ভুত নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন :

> অধিকাংশ মোছলেম ঐতিহাসিকেরা বলেন যে খলিফাকে একখানি গালিচার মধ্যে পুরিয়া দন্ডদ্বারা আঘাত করিতে করিতে তাহার প্রাণ সংহার করা হয়। কারণ কোন রাজার রক্তপাত করা নাকি মঙ্গোলদের সামাজিক আইনবিরুদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যেও যদি কোন রাজপুত্র বিশেষ অপরাধ হেতু মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইত। তাহা হইলে তাঁহার ঘাড় ভাঙিয়া দেওয়া হইত, রক্তপাত করা হইত না।[২]

খলিফার উজির ইবনুল আলকামির ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতায় হালাকু খান খলিফাকে হত্যা, বাগদাদ দখল ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। হালাকু বাহিনী এসময় পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে বাগদাদ ঘেরাও করে ফেলে। বাগদাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, খুবই নগণ্য। অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারও ছিল না। তাঁদেরকেও অন্যান্য সৈন্যদেরকে কিছুদিন আগে জায়গির হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে বাজারঘাট ও বিভিন্ন মসজিদের দরজায় ভিড় করে ভিক্ষা করছিল। পেশাদার কবিরা তাঁদের মধ্যে ঘুরে ফিরে সান্ত্বনামূলক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শোকপ্রকাশক কবিতা পাঠ করছিলেন। উজির আল আমিরের সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি থাকার কারণে এ সবকিছু হচ্ছিল তাঁর নির্দেশনায়।

পরবর্তী বছর সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাফিজিদের সঙ্গে বিরাট সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তখন কারখসহ রাফিজিদের বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট হয়। এমনকি ইবনুল আলকামির নিকটজনের অনেকের ঘরেও লুটপাট হয়। এতে তাঁর ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে খলিফার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে, যার পরিণতি এত ভয়াবহ যে, বাগদাদ নগরীর পত্তনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। এ কারণেই মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করার পর সবার আগে হালাকুর উদ্দেশে যে বের হয়ে আসে, সে হলো এই ইবনুল আলকামি।[৩] এ-প্রসঙ্গে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* মোহাম্মদ সানাউল্লাহ লেখেন :

> ১২৫৭ খৃ: অব্দের প্রথম ভাগে বোগদাদ বাসী সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ইহার ফলে ভয়ানক লুটতরাজ ও সম্পত্তি ধ্বংস হয় এবং কতকগুলি শিয়ার প্রাণনাশও হয়। এই ঘটনায় শিয়ামন্ত্রী ইবনুল আলকামি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হালাকুকে এবার আক্রমণ করিতে পুনঃ পুনঃ এবং তিনি এই রূপ সুন্নি মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করেন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হালাকু তাঁহার বিপুল সৈন্যসহ বাগদাদে উপস্থিত হন।[৪]

---

১ *ইসলামি ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬
২ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
৩ *ইসলামি ইতিহাস: ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫
৪ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

মোঙ্গলরা বাগদাদে প্রবেশ করেছিল মহররম মাসের বারো তারিখে, এরপর একটানা চল্লিশ দিন ধরে চলে হত্যাযজ্ঞ। খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করা হয় সফর মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার, তখন খলিফার বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর চার মাস। তাঁর 'খেলাফত'কারে সময়সীমা ছিল পনের বছর আট মাসের সামান্য বেশি। তাঁর সঙ্গে তার বড় পুত্র আবুল আব্বাস আহমাদকে হত্যা করা হয়, যার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। এরপর হত্যা করা হয় মেজো পুত্র আবুল ফজল আবদুর রহমানকে, যার বয়স ছিল তেইশ বছর। কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক ও তিন কন্যা ফাতিমা, খাদিজা ও মরিয়মকে বন্দি করা হয়।[১] খলিফার বড় পুত্রের সঙ্গে হালাকু কন্যার বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উভয়ের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টার কথাও লেখক সানাউল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন, যদিও তা হয় নি, বরং তাঁদেরকে এ উদ্দেশে ডেকে এনে হালাকু খান খলিফা ব্যতীত সবাইকে শিরশ্ছেদ করেন এবং খলিফাকে হাতির নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হয় বলে লিখেছেন।[২]

খলিফার পরিবারের লোকজনের বাইরে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করা হয় হালাকু খান কর্তৃক। এদের মধ্যে ছিলেন খলিফার বাসগৃহের শিক্ষক মুহিউদ্দিন ইউসুফ বিন শায়খ আবুল ফরজ ইবনুল জাওযি, যিনি খলিফার উজির ইবনুল আলকামির ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাগদাদের মহান শায়খ ও খলিফার রাজশিক্ষক সদরুদ্দিন আলি ইবনুল নাইয়ারকেও হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদধারী ব্যক্তি দুআইদার আস-সাগির মুজাহিদুদ্দীন আইবেক, শিহাবুদ্দিন সুলায়মান শাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিভিন্ন আমির এবং নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বেছে বেছে হত্যা করা হয় খতিব, ইমাম ও কোরআনের হাফেজদেরকে।[৩] হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে লেখক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ উল্লেখ করেন :

> ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাগদাদ লুণ্ঠন আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহকাল প্রবলবেগে চলিতে থাকে। ন্যূনপক্ষে ৮ লক্ষ লোক নিহত হয়। পাঁচশত বৎসরব্যাপী আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে বাগদাদে যে সমস্ত ধনরত্ন, শিক্ষা, শিল্প ও বিজ্ঞানের সে পূর্ব্বগৌরব পুনরায় লাভ করিতে পারে নাই। সহস্র সহস্র অমূল্য গ্রন্থরাজি যে কেবলমাত্র ধ্বংস পাইয়াছিল তাহা নহে, অসংখ্য পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ-যাঁহারা নষ্টগ্রন্থ পুনঃপ্রণয়ন করিতে সক্ষম হইতেন এবং যাঁহাদের দ্বারা গবেষণার স্রোত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত তাঁহারাও নিহত হন।[৪]

'কেতাবুল ফাখরি' নামক গ্রন্থটি বাগদাদ ধ্বংসের কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, লেখক ইবনে তিকতিকিও (১২৬২-১৩১০) অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন বলে লেখক সানাউল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন।

বাগদাদের পতন সম্পর্কে খলিফার শিয়া মন্ত্রী উবনুল আলকামি কী কাজ করেছেন সে বিষয়ে লেখকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। সুন্নি লেখক মিনহান সিরাজ তাঁর 'তবকাতে নাসিরি' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, খলিফার জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল আব্বাস আহমদ শিয়াদিগের যে অনিষ্ট করেছিলেন তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত মন্ত্রী প্রবর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করে দিয়েছিলেন এবং খলিফাকে আত্মসমর্পণ করতে উত্তেজিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে শিয়া লেখক ইবনে তিকতিক (১২৬২-১৩১০) তাঁর 'কেতাবুল ফাখরি'তে এই দোষ প্রক্ষালন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, বাগদাদ সমর্পণের পর

---

১ *ইসলামি ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯
২ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
৩ *ইসলামি ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯
৪ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

নাসির উদ্দিন তুসিকে (১২০১-১২৭৪) হালাকুর সামনে উপস্থিত করেন। হালাকু ৫৬টি গ্রন্থের লেখক তুসির চেহারা ও কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং ধ্বংসবিধ্বস্ত বাগদাদের শাসন করবার ভার আলি বাহাদুরের হাতে ন্যস্ত করে মন্ত্রীকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নাসির উদ্দিন তুসি ধর্মহীন হালাকুর অনুগ্রহ লাভের জন্য স্বীয় জাতি ইসমাইলিয়া শিয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মন্ত্রী বা উজির ইবনুল আলকামি হালাকুর মিথ্যা অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামির জন্য সুন্নিদের ওপর প্রতিশোধ নিতে অতিশয় উৎসুক হয়েছিলেন। তারপর নবনিয়োজিত হালাকুর মন্ত্রী তাঁর স্বধর্মী নাসিরউদ্দিন তুসির সহায়তায় বাগদাদ ও খলিফা মুসতাসিমকে মোঙ্গল হস্তে সমর্পণ করেন। এর পুরস্কারস্বরূপ হালাকু তাঁকে বহুবিধ সম্মান প্রদশন করেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে কার্যোদ্ধার করবার দরকার ছিল ততদিন পর্যন্ত তাকে কাছে রেখে পরবর্তীকালে দূরে নিক্ষেপ করেন। খলিফার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই ইবনুল আলকামি প্রাণত্যাগ করেন।[১] হালাকুর মত পরিবর্তন পূর্বক বাগদাদ অভিযানে উৎসাহিত করার ব্যাপারে নাসিউদ্দিন তুসি ও ইবনুল আলকামির ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> হালাকু কনটান্টিপোল অধিকার করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু নাসির উদ্দিন তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিয়া বাগদাদের আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। নাসির একজন নামজাদা জ্যোতির্ব্বিদও ছিলেন, তিনি হালাকুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, নক্ষত্রাবলী তাঁহার স্বপক্ষে আছে এবং আব্বাসি বংশ চেঙ্গিজের বংশের দ্বারা বিলুপ্ত হইবে। নাসিরের কয়েকটি ভবিষ্যতবাণী ইতিপূর্বে সার্থক হইয়াছিল বলিয়া হালাকু তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বাগদাদ অভিযান করেন।[২]

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), আবুল ফিকা (১২৭৩-১৩৩১), আল মাকরিজি (১৩৬৪-১৪৪২) ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫) প্রমুখ আরব ঐতিহাসিক সকলেই মন্ত্রী আলকামির বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মাহমুদ মিরখন্দ (১৪৩৩-১৪৯৮ খ্রি.) ও ওসসাক (মৃত্যু: ১৩২৩ খ্রি.) এই দুজন লেখক মোঙ্গলদের অধীনে কাজ করতেন। এঁরাও মন্ত্রীর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করেছেন।[৩] এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় হালাকু খানের নৃশংসতার ফল যে কী ভয়াবহ হয়েছিল, তা জানাতে গিয়ে লেখক সানাউল্লাহ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন :

> শত শত বৎসর ধরিয়া যে অমূল্য-শিল্প ও অধ্যয়নজনিত ধন-রত্নাদি সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা কয়েকদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনদিন পর্যন্ত রাস্তায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল এবংটাইগ্রীস নদীর জল কয়েক মাইল পর্যন্ত লাল হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য, মসজিদ ও কবর তাহাদের স্বর্ণ নির্ম্মিত গুম্বুজের জন্য ভূমিস্যাৎ করা হইয়াছিল। পাঠাগারে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থাদি ভস্মীভূত এবং নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১৬ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল।[৪]

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান বাইতুল হিকমাহ গ্রন্থাগার, যেটি খলিফা হারুনুর রশীদের (শাসকনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) আমলে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাঁর পুত্র আল-মামুনের (শাসনকাল ৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) এর

---

১ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬

সময় যেটি সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেটিও হালাকু খানের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। ইবনে তিকতিকি, মিনহাজ সিরাজ (১২৬০ পরবর্তী), ইবনুল আসির, সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪) সহ আরো অনেক মধ্যযুগের এ আধুনিক কালের ঐতিহাসিক ও পর্যটক তৎকালীন অবস্থার ভয়াবহ ও জঘন্যতম আলেখ্য লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করেছেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, বাগদাদ ধ্বংসের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে এডওয়ার্ড গিবনের (১৭৩৭-১৭৯৪) মতো ওস্তাদের দরকার, যিনি রোম সাম্রাজ্যর উপর বিশাল ইতিহাস প্রণয়ন করেন ১৭৭৬-১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের পরিসরে।

বাগদাদ ধ্বংসের ফল এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। বাগদাদ থেকে মিসরে 'খেলাফত' স্থানান্তরের পাশাপাশি মূল ভাষা আরবি থাকলেও এর প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং মুসলিম সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে, যদিও বিশ্বের অন্যদিকে এর বিস্তৃতিও ঘটতে থাকে ভিন্নভাবে। লেখক সানাউল্লাহ বাগদাদের করুণ পরিণতির পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> বাগদাদ ধ্বংসের পর হইতে আরবী আর সার্ব্বজনীন ভাষা রহিল না। পারসীকেরা মাত্র দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় লিখিবার জন্য আরবী ব্যবহার করিতে লাগিল। অন্যান্য বিষয়ে প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন হইল। তবুও সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশে আরবীর প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিল, রাজনীতিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে, বাগদাদের খেলফত বিলুপ্ত হইল। এযাবৎ বাগদাদের খলিফা ঐহিক ও পারত্রিক দ্বিবিধ ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন। এক্ষণে বাগদাদ হইতে খেলাফত মিসরে স্থানান্তরিত হইয়া মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী থাকিল। মুসলমান সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইল। (বিশেষত পশ্চিম এশিয়াতে) ও সামানিয় তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে গমন করিল এবং ধীরে ধীরে ইউরোপে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।[১]

আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ হালাকু খান কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্ব খলিফাশূন্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মামলুক সুলতান বাইবার্স (১২২৮-১২৭৭) তাঁর শাসনকালে ১২৬০-১২৭৭) খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সে খেলাফতের কেন্দ্র আর বাগদাদ ছিল না, নতুন কেন্দ্র হলো কায়রো। দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর খেলাফত-কেন্দ্র বাগদাদের পরিবর্তন আর এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে।

আল মালিক আল জহির রুকন আল দিন বেইবার্স আল বানদুকদারি আবু আল ফুতুহ ছিল বাইবার্সের পূর্ণ নাম। তিনি ছিলেন তুর্কি কিপচাক বংশোদ্ভুত মিসরীয় মামলুক সুলতান। তিনি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে 'আইন জালুতের যুদ্ধে' মিসরীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সে যুদ্ধে মোঙ্গলদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, যেটি ছিল মোঙ্গলদের প্রথম পরাজয়। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বংশধরদের শাসনকালের অবসান সূচিত হতে থাকে।।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'ইসলাম ও সভ্যতা' নামে আব্দুর রহমানের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা, আইনজীবী কর্নেল রবার্ট গ্রীন

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-১৮৯৯) লিখিত 'Islam and Civilization' নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

কর্নেল আর. জি. ইঙ্গারসোল কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না। খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনের মাধ্যমে জগতে সভ্য হওয়া যায় ও উন্নতি সাধন করা যায় এরকম ধারণা অনেকে পোষণ করতেন। খ্রিস্টানদের নিকট সমগ্র জগৎ বর্তমান সভ্যতার অসাধারণ উন্নতির জন্য ঋণী, এরকম একটি মতও প্রচলিত ছিল। তৎকালের ধারণাটি যে সঠিক নয়, সে বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক আব্দুর রহমান ইঙ্গারসোলের রচনার আলোকে তা তুলে ধরেন। ইঙ্গারসোল খ্রিস্টান বা মুসলমানদের বা অন্য কারো পক্ষ না নিয়ে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন ইসলাম ও বর্তমান সভ্যতাকে। সেই আলোকে শিক্ষা ও গবেষণায় আরবদের অবদানের কথা উল্লেখ করে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি আবরবাসিগণ মঙ্গোলিয়া, কাতার, পারস্য, মেসোপটোমিয়া, সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, ফেজ ও স্পেনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্য অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ছিল। তাঁহারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা মানমন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[১]

খলিফা আল মামুনের (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.) সময় 'মান মন্দির' নির্মাণ বেশ সাড়া ফেলেছিল।

এ-প্রবন্ধে বিজ্ঞানের চর্চা, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি শিক্ষা আরবদের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হয় বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁরা ঘন সমীকরণ (cubic equation) জানতেন এবং জরিপ বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা তারকামালার তালিকা এবং মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ তারকাগুলির নামও প্রদান করেন। তাঁরা পৃথিবীর আকার নির্ধারণ সূর্যের বাৎসরিক পরিভ্রমণের পথের বক্রতা (obliquity) স্থির এবং বৎসরের সীমা নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর খগোল বিজ্ঞানের (নভোমণ্ডল) যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। নানা প্রকার ঘড়ি প্রস্তুত করতেন এবং তাঁরাই প্রথমে দোলক (pendulum) উদ্ভাবন করেছিলেন। রসায়নবিদ্যা তাঁদেরই সৃষ্টি এবং গন্ধিকজাত অম্ল (sulphuric acid) যবক্ষারিক অম্ল (nitric Acid) এবং সুরাসাব (Alcohol) তাঁরাই আকিষ্কার করেছেনএবং পদার্থসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) স্থির করেছিলেন। ভেষজ বিদ্যা এবং ওষুধ প্রস্তুত করার পুস্তক তাঁদের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়। বলবিজ্ঞানে (mechanics) তাঁরা পতনশীল পদার্থের নিয়ম (law) নিরূপণ করেছিলেন। বলবিজ্ঞানের বল (mechanical power) এবং মধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ শক্তিও তাঁরা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। এসব ছাড়াও সুতা, কাগজ, ইস্পাত প্রস্তুত করার কৃতিত্ব তাঁদের বলে লেখক অবহিত করেন। এরকম নানাবিধ আবিষ্কার, নির্মাণ, উদ্ভাবন, নিরূপণ, প্রচলনের পাশাপাশি শিক্ষাদীক্ষায় আরবদের প্রভৃত অবদানের কথা ইঙ্গারসোলের প্রবন্ধের আলোকে লেখক আব্দুর রহমান সাহিত্য-পত্রিকায় তুলে ধরেন। সমকালে ইঙ্গারসোল 'The great Agnostic' বা অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে সমকালীন বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্প্রসারণে মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও ইতিবাচক মূল্যায়ন বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যকে এভাবে উদ্ধৃত করেন লেখক আব্দুর রহমান :

---

১ আব্দুর রহমান, 'ইসলাম ও সভ্যতা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬, পৃ. ১৮৩

> মোহাম্মদের শিষ্যগণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন, হস্তলিখিত পুস্তকাবলী (manuscripts) সংগ্রহ করিতেছিলেন, প্রকৃতিদেবীর ঘটনা সমূহ আলোচনা করিতেছিলেন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে মনোযোগ দিতেছিলেন। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে আমরা মূরদিগের নিকট অর্থাৎ মোহাম্মদের শিষ্যগণের নিকট বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ঋণী।[১]

সমগ্র ইউরোপের অন্ধকার যুগে যখন অজ্ঞানতা, মূর্খতা এবং ঘোর তমসা ছিল, তখন জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এসে মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে জ্ঞানলাভ করতে হতো বলে ইঙ্গারসোল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। বিশ্ব সভ্যতার ধারায় ইঙ্গারসোলের অভিমত এবং লেখক আব্দুর রহমানের অনুবাদ ইতিহাস-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭ জানুয়ারি ১৯২১) সৈয়দ আকবর আলীর 'ইসলাম ও তুর্কী জাতি' নামক পাঁচ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে ইসলাম প্রচার ও সম্প্রসারণের ইতিহাসে তুরস্কের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি Thomas Walker Arnold (১৮৬৪-১৯৩০) এর The preaching of Islam (১৮৯৬) নামক গ্রন্থের 'Spread of Islam in Europe under Turks' শীর্ষক রচনা অবলম্বনে লিখিত বলে প্রবন্ধশেষে লেখক উল্লেখ করেছেন।

যেকোনো ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো শক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির ভূমিকা থাকে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মুসলমান রাজশক্তিরও তেমন সম্বন্ধ রয়েছে। একসময়ে স্পেনের মুসলমান রাজশক্তির অধীনে ধীরে ধীরে পশ্চিম ইউরোপে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হয়েছিল। কালক্রমে সেই রাজশক্তির তিরোধানের পর সেখান থেকে ইসলাম একপ্রকার নির্বাসিত হয়ে যায়। তারপর আবার ইউরোপের অন্যদিকে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে।

যে-সকল দেশে ধর্মান্ধতাযুক্ত শক্তিহীন জাতি দলিত ও লাঞ্ছিত, যে-সকল দেশে সাম্যের তিরোভাবে ইতর,দরিদ্র, মুর্খ ও নিম্নশ্রেণির জাতি ও ব্যক্তির উপর অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিত দলের নিত্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, সেসব স্থানে ইসলামের বার্তা দ্রুত পৌঁছে যায়। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিতর ইসলামের প্রচার তখন কীভাবে হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন রেখে লেখক জানান:

> যে সকল দেশে প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্মের অপলাপে ঈর্ষা, দ্বেষ ও প্রতিহিংসার মূর্ত্তি রক্তিম নয়নে বিদ্যমান, সেই সকল দেশ কি ইসলামের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে? শ্লাভ জাতির বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানতায় পূর্ব্ব ইউরোপ আচ্ছন্ন। তাহাদের ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত অত্যাচারে নিঃসহায় ইহুদি জাতি সন্ত্রস্ত ও চকিত,ভিনিশিয়ান ও ফ্রাঙ্ক জাতির দ্বারা গ্রীক প্রভৃতি দুর্ব্বল জাতি প্রপীড়িত, এমন সময় সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালা নিঃসহায় ও প্রপীড়িত জাতি ও ব্যক্তির বহু বর্ষ ব্যাপী দুঃখ কষ্টের জন্য ঘুচাইবার অন্য উপায় বিধান করিলেন।[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২ সৈয়দ আকবর আলী, 'ইসলাম ও তুর্কী জাতি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭, পৃ. ২৪৭

নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির পাশে ইসলাম সর্বদা এসে দাঁড়িয়েছে।তাই উপরোক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তুর্কি জাতির মাধ্যমে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর পথ সুগম হয়। তুর্কিরা ইসলামকে আবার ইউরোপের পূর্বাঞ্চল থেকে গ্রিক ও স্লাভ প্রভৃতি জাতির মধ্য দিয়ে ইউরোপে নিয়ে যায়। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী দেশে বসবাসরত মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা তুর্কি জাতি কর্তৃক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসেছিল। তাই ইসলামের প্রসারের পিছনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তুর্কি জাতির নিকট অনেক ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ইসলামের প্রচারের পেছনে তুর্কিদের ভূমিকা যেমন অসামান্য, তেমনি স্পেন ও এশিয়ায় আরবদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার পর তা রক্ষার ভার গ্রহণ করে তুর্কিরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি ইসলামকে আবার পুনঃসঞ্জীবিত করে তুর্কিরা ইসলামকে বসফরাস পারে নিয়ে গিয়ে পূর্ব ইউরোপে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে।

তুরস্ক কর্তৃক ইউরোপে বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন হয়নি। তবে তুর্কিবিদ্বেষী অনেক ইউরোপীয় লেখক তুরস্কের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছিলেন, লেখক একথা বলেছেন। কিছু দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব জাতি পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে তুরস্কের প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হবেন বলে লেখক জানান। এতদ্বিষয়ে তিনি আরো বলেন:

> ক্রুসেড যুদ্ধে ইউরোপে যাবতীয় খৃষ্টান শক্তি ভাঙ্গিয়া আসিয়া তুর্কীর উপর পড়ে। এই যুদ্ধে যদি সুলতান সালেহ উদ্দীন খৃষ্টানদের উপর জয়লাভ করিতে না পারিতেন তবে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত মুসলমান প্রধান দেশগুলি খৃষ্টানদের হস্তে পতিত হইত। তখন এশিয়ায় ইসলামের দশা যে কি হইত তাহা কে বলিতে পারে। এই যুদ্ধে,- যুদ্ধ বিজয়ের সঙ্গে তুর্কীদের মে মহত্ব ও ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য এশিয়া ক্ষেত্রে প্রথম আরম্ভ হয় তাহাতে ইউরোপ বাসীকে বিস্মিত করিয়া তোলে।ডুইল প্রদেশের ওডো নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী (Odo of Deuil, a monk of St. Denis) ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইয়ের পুরোহিত ছিলেন।তিনি দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজার সহিত প্রাচ্য দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের একটি বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা তুর্কীজাতির মহত্ত্বের সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। এই যুদ্ধে কোন এক সময় এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া প্রদেশের গিরিবর্ত্তে খৃষ্টান যোদ্ধারা তুর্কীদিদের হস্তে বিষমরূপে পরাজিত হন (১১৪৮)।হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ এ্যাটালিয়া (Attalia) নামক সমুদ্র উপকূল বন্দরে উপনীত হন। তাঁহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল; ধনী ও সুস্থ ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থ দিয়া গ্রীকদিগের বাণিজ্য পোতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১]

এসময় ফরাসিরাজ সপ্তম লুই তাঁর স্বপক্ষীয় গ্রিকদের প্রচুর অর্থ দিয়ে পরিত্যক্ত, রুগ্ণ, আহত ও দুর্বল ফরাসি সৈন্যদের রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তুর্কি সৈন্যদেরকে রুগ্ণ ও নিঃসহায় ফরাসি সৈন্যদের অবস্থান বলে দেয়। যুদ্ধের স্বাভাবিক ধরন অনুযায়ী তুর্কি সৈন্যরা তাৎক্ষণিকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করে। অসহায় ফরাসি সৈন্যদের উপর চেপে বসা যুদ্ধের এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লেখক বলেন:

> তুর্কী সৈন্যেরা ভীম বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে নিহত করে। কিন্তু যখন তাহারা ফরাসি সৈন্যদের দুরবস্থা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহাদের হৃদয় দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া

---

১ প্রাগুক্ত

> গেল। তাহারা রুগ্ন দিগকে ঔষধ ও পথ্য দ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল ও মুক্ত হস্তে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত্তকে অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করিতে লাগিল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শত্রু পক্ষের এইরূপ দয়া ও মহত্ত্ব দর্শনে পরিত্যক্ত ফরাসি সৈন্যগণ এতদূর বিমোহিত হইয়াছিল যে তাহারা স্বেচ্ছায় তুর্কীদিদের দলভুক্ত হইয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। Ode সাহেব ইহাতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, তিন সহস্রাধিক লোক স্বপক্ষ ও স্বধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠুর গ্রীকদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় শত্রুদলে মিশিয়া তাহাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিল, যদিও শত্রুপক্ষরা তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করে নাই। শত্রুরা তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু কৃপার বিনিময় তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অপহরণ করিয়াছিল।[১]

তুর্কির মহত্ত্ব যেমন পরিত্যক্ত ফরাসি সৈন্যদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি ইউরোপেও অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিতদের দ্বারা নিপীড়িত ও দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে সেইরূপ আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর ভুরি ভুরি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে বলে লেখক মনে করেন। এর থেকে বোঝা যায়, তুর্কি শাসন মোটেও জাতিগত বিদ্বেষমূলক ছিলনা। এর প্রমাণস্বরূপ তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কর্তৃক খ্রিস্টান পুরোহিতদের ওপর দায়িত্ব অর্পণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লেখক বলেন:

> সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল অধিকার (১৪৫৩)এবং নগরে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের পর তিনি গ্রীকদিগের ধর্ম্ম রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভক্তি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, খৃষ্টান শাসনকালে খৃষ্টান প্রজাদের রাজস্ব বিষয়ে যে সকল সুবিধা ছিল তাহা সমস্তই তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। তুর্কী শাসনের প্রারম্ভে জিনেডিয়স (Ginnadios) নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টানদিকের প্রধান পুরোহিত ও অভিভাবক হইয়াছিলেন। সুলতান নিজ হস্তে তাহাকে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, রাজকীয় পরিচ্ছদ ও অশ্ব প্রদান করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রধান পুরোহিতের বিচারালয়ে খৃষ্টানদিগের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা হইত ও অপরাধীদের শাস্তি হইত। তুর্কী রাজ কর্মচারীরা ঐ বিচারালয়ের বিধি ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য সাহায্য করিতেন। ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা 'গ্রাণ্ড সাইনড' নামক পুরোহিতদিগের মহাসভার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিত মহোদয় প্রয়োজন মত যখন ইচ্ছা তখনই সভা আহুত করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান প্রজাদিগের উপর কোন তুর্কী কর্ম্মচারী বা তুর্কী শাসন কর্ত্তার দ্বারা কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে এতে প্রধান পুরোহিত মহোদয়ের উহা সুলতানের গোচরীভূত করা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।[২]

এভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য ও বিকেন্দ্রীকরণে সুলতানের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ইতিপূর্বে গ্রিকরা ফ্রাঙ্ক ও ভিনিসিয়াদিগের দ্বারা বড়ই অত্যাচার-অবিচার জর্জরিত হয়েছিল। তৎকালীন ইউরোপের 'ফিউডাল সিস্টেম' নামক জমিদারি বন্দোবস্তের দ্বারা গ্রিক প্রজাদেরকে বড়ই নিঃস্ব ও ক্রীতদাসে পরিণত করে তুলেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তুর্কিদের সাম্যপতাকার তলে আশ্রয় নেয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারা বিজয়ী তুর্কিদেরকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে অভ্যর্থনা করেছিল। তুর্কিদের অধীনে তারা যে সাম্যবাদ, উদারতা,শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল,অপর কোন রাজার অধীনে তা কখনো পায়নি।

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত

তার জন্য তাদের নিকট খ্রিষ্টানদের শাসন অপেক্ষা সুলতানের শাসন অধিক পছন্দনীয় ছিল বলে লেখক মনে করেন।

লেখক চারজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের লিখিত ইতিহাসের ভিতর তুর্কিদের নৈতিক উন্নতি ও খ্রিস্টানদের অবনতির বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁরা হলেন কারামসিন (Karamsin), মার্টিন ক্রুসাস (Martine crusias), ফ্রেন্টেস (Phrantzes), ফিনলে (Finlay)। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের (১৪৩২-১৪৮১) পূর্ববর্তী তুর্কি সুলতান বায়েজিদ (১৩৬০-১৪০৩) এবং দ্বিতীয় মুরাদের (১৪০৪-১৪৫১) শাসনকাল থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অত্যাচারিত ইহুদি ও অন্যান্যরা তুর্কি সুলতানের রাজ্যে কীভাবে এসে আশ্রয় লাভ করে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল, সে প্রসঙ্গে ও এক অমুসলিম ধর্মগুরুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখক বলেন:

> স্পেন হইতে অত্যাচার প্রপীড়িত ইহুদি জাতি এবং রুশিয়া হইতে ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত অত্যাচারে প্রপীড়িত কসাক জাতি দলে দলে আসিয়া সুলতানের রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিতে লাগিল। রুশিয়া হইতে পলাতক উৎপীড়িত পলাতকদিগের ম্যাবেরিয়াস নামক একব্যক্তি এ্যানটিয়কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। ধর্ম্মান্ধ পোল কর্তৃক রুশিয়াদিগের হত্যা সম্বন্ধে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন-“God perpituate the empire of Turks forever and forever! for they take their imports and enter into no account of religion, be their subjects Christians or Nazarens, Jews or Samaritans.” অর্থাৎ খোদাতালা তুর্কীদের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করুন। তাহারা রাজস্ব গ্রহণ করে মাত্র কিন্তু খৃষ্টান হউক বা ইহুদি হউক, কোনও জাতির ধর্ম্মের বিচার করে না। এমনকি ইটালি দেশে যে সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতা ও উদারতা বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিল, তাহারাও ব্যগ্রভাবে তুর্কীদের মুখাপেক্ষায় চাহিয়া রহিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তুর্কীদিগের দ্বারা ইসলাম ইউরোপে বলপূর্ব্বক প্রচারিত হয় নাই।[১]

তুর্কিদের সাম্যভাব ও উন্নত চরিত্রে অপরাপর জাতি মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তুর্কি জাতি ইউরোপের দুর্বল, মূর্খ ও অত্যাচার প্রপীড়িত খ্রিস্টান জাতির সামনে উদারতা, বিবেকের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের নিকট যেমন বরণীয় হয়েছিলেন, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের প্রচারক মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছিলেন। আর সেই জন্য মুসলমান সমাজ তুর্কিদের প্রতি অধিক অনুরক্ত।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৭) মুয়াররিখ খানের ‘সুলতান সুলায়মান’ নামে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির এই সংখ্যার প্রথম লেখা ছিল এটি। সুলতান সুলায়মানের শিরোনামে The Great, the Mangnificient কথাটি লিখিত হয়। প্রবন্ধটি *The Historian History of the world* এবং *The Story of Nations-Turkey* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে লিখিত বলে লেখক উল্লেখ করেন। প্রবন্ধটি কয়েকটি উপ-শিরোনাম সমন্বয়ে প্রথম কিস্তির লেখায় দীর্ঘ আলোচনা করন লেখক। ‘সুলতান সুলায়মান’ শিরোনামের মূল অংশের পরে যথাক্রমে জেনিসারি সৈন্য, বেলগ্রেড ও রোড্‌স জয়, এসিয়ার যুদ্ধযাত্রা, ফ্রান্সের সহিত মিলন, মোহাকের যুদ্ধ, ফ্রান্সের উপর তুরস্কের প্রাধান্য, হাঙ্গেরিতে যুদ্ধযাত্রা ও ভিয়েনা অবরোধ, তুরস্ক নৌবাহিনী,

---

১ প্রাগুক্ত

পারিবারিক অবস্থা, সুলতান সুলায়মানের শেষ যুদ্ধ এবং মৃত্যু, সুলতান সুলায়মানের সাম্রাজ্য, ইত্যাদি ভাগে প্রবন্ধটি আলোচনা করা হয় সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায়। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি যথাক্রমে সুলতান সুলায়মান: শাসন প্রণালী, শিক্ষা বিভাগ, সুলতান সুলায়মানের রাজত্বে সাহিত্য, শিল্পাকলা ও স্থাপত্য ইত্যাদি উপ-শিরোনামে প্রবন্ধটি লিখিত হয়।[১] সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ রচনাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

সুলতান সুলায়মানের (১৪৯৪-১৫৬৬) পরিচিতিতে বলা হয়েছে তিনি উসমান রাজবংশের দশম সম্রাট এবং প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট সলীমের উপযুক্ত পুত্র। এই সম্রাট সলীমও এক মহাপরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি সিংহাসনারোহনের সময় তুরস্ক সাম্রাজ্রকে যতদূর বিস্তৃত দেখেছিলেন, তাঁর মাত্র নয় বৎসরের রাজত্বে সেই সাম্রাজ্যকে প্রায় দ্বিগুণ আকারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়কালে মিশর, সিরিয়া, আরব এবং মেসোপটেমিয়া তাঁর পদানত হয়। এই সুলতান সলীম ইসলাম জগতে উসমান বংশের প্রথম খলিফা। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্ডারের সঙ্গে সুলতান সুলায়মানের তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে লেখক মুয়াররিখ খান উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

> ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীক সম্রাট ফিলিপ যেমন তদীয় ভুবনবিজয়ী পুত্র আলেকজান্ডারের জন্য যশের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তুরস্ক সুলতান সলীমও সেইরূপ দিগ্বিজয়ী পুত্র মহাযশা মহামনা সম্রাট সুলায়মানের কির্ত্তীস্তম্ভের সাজ সরঞ্জাম মৌজুদ রাখিয়া গিয়াছিলেন।[২]

সুলতান সুলায়মান ২৬ বছর বয়সে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক সিংহাসন অলংকৃত করেন এবং অতুলনীয় গৌরবের সঙ্গে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল রাজ্য শাসন করেন। লেখক মুয়াররিখ খান বলেছেন, সুলায়মান ইউরোপীয় রাজন্যগণের সঙ্গে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, সেগুলি এতই বৃহৎ ব্যাপার ও ইউরোপকে এতই আন্দোলিত করেছিল যে, এর প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যে এক একটি গ্রন্থ রচনা করা যায়। এই বিখ্যাত যুগের দুই-চারটি বড় ঘটনার উল্লেখ তিনি এস্থলে করতে চান বলে উল্লেখ করেন। মোহাকের বিষম যুদ্ধ, রোড্স জয়, ভিয়েনা এবং মাল্টার অবরোধ এইগুলি খুবই গুরুতর ঘটনা বলে লেখক মনে করেন। উসমান বংশ তথা অটোমান সাম্রাজ্যে ইউরোপের রেনেসাঁসের মতো কঠিন সময়ে সুলতান সুলায়মানের মতো অমিততেজ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি উদীয়মান ইউরোপকে স্তম্ভিত করে তুরস্কের গৌবর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতদ্ববিষয়ে লেখক মুয়াররিখ খান সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> সুলায়মান এক আশ্চর্য্য যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমস্ত ইউরোপ এবং এসিয়া যেন পরস্পর যোগাযোগ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মহাতেজা অক্ষয় কির্ত্তীবিশিষ্ট সম্রাটদিগকে জগতে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ উন্নতি বিধান করিয়াছিল। এই যুগই অমর সম্রাট শার্লিমানের (Charlemagne) সম সাম্রাজ্যধিকারী সম্রাট চার্লস পঞ্চমের (Charles V) ফ্রান্সের ৯ম ফ্রান্সিসের (Francis ix), ইংলন্ডের হেন্‌রী ৮ম (Henry VIII) এবং মহারাণী এলিজাবেথের (Elizabeth Queen of Quoens), পোপ দশম লিওর (Pope Leor x), রুষ শক্তিসংস্থাপক ভ্যাসিলি আইভ্যানোভিসের (Vasili) পোল্যান্ডের সিগিসমান্ডের (Sigismund of Paland) পারস্যের শাহ্

১ মুয়াররিখ খান, 'সুলতান সুলায়মান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ৮৪
২ প্রাগুক্ত, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ. ২

> ইসমাইলের, ভারতে মোগল সম্রাট আকবরের এবং তুরস্কে সুলতান সুলায়মানের রাজত্ব যুগ বলিয়া গৌরব করিতে পারে।[১]

সুলতান সুলায়মানের সিংহাসনারোহনের (১৫২০ খ্রি.) প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব থেকেই মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজশক্তির সঙ্গে তুরস্ক জাতির যুদ্ধ চলছিল। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯ মে প্রবল প্রতাপ সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কনসট্যান্টিপোল জয় করেন। গ্রিস, সার্বিয়া, বসনিয়া এবং এস্তোনিয়া প্রভৃতি তুরস্ক সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোহাম্মদের তৃতীয় পুত্র সুলতান সলীম ইউরোপীয় যুদ্ধে তত মনোযোগ না দিয়ে পারস্যরাজ শাহ্ ইসমাইলকে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্টে সম্পূর্ণ পরাজিত করে তাবরিজে সগৌরবে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া এবং ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মিসর জয় করে কায়রোতে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। সুলতান মোহাম্মদ ও সুলতান সলীমের নাম ইতিহাসে কোথাও কোথাও যথাক্রমে সুলতান মাহমুদ ও সুলতান সেলিম নামে উল্লেখিত হয়েছে।[২]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে করা ও মানবিকীচর্চা খ্রিস্টান জগত তথা ইউরোপে অপূর্ব এবং অতুলনীয় উন্নতি লাভ করে এবং পাশাপাশি যুদ্ধ এবং সামরিকবিদ্যা অতি উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হয় বলে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক উল্লেখ করেন। আগে প্রয়োজন হলে সাধারণ প্রজা থেকে নতুন সৈন্যদল গঠিত হতো, কাজেই তাদেরকে পূর্ণভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার ও সুসজ্জিত করার সময় থাকত না। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সম্রাটেরা সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত এবং স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া ইতালি জয়ের জন্য যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা এবং আরো বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সমরবিদ্যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক জগতের সূত্রপাত করে। এসব থেকে খ্রিস্টান জাতিসমূহ বীরত্ব ও ধৈর্যের শিক্ষা পেয়ে প্রতিদ্বন্ধী মুসলিম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অদম্য উৎসাহ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই খ্রিস্টান জগৎ ও ইসলাম জগৎ এর মধ্যে কোনটি প্রবলতর হবে, তা একরূপ মীমাংসিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই সময়ে ইউরোপের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অধীনে নেদারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, স্পেন, শস্য শ্যামলা নেপলস সিসিলি এবং নবাবিষ্কৃত আমেরিকা তাঁর শাসনাধীনে ছিল, যা পূর্বকালের সম্রাট শার্লিমানের চেয়ে বেশি আয়তনের সাম্রাজ্যের অধিকারী বলে ধরা হয়। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে মহাপরাক্রমশালী জার্মান সাম্রাজ্যে সিংহাসনে আরোহন করেন। পরে মেক্সিকো ও পেরু সাম্রাজ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের বিশাল আকরসহ তাঁর অধীনস্থ হয়। এসময় ফরাসি ও জার্মান জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে তুর্কি শক্তির জন্য তা অনুকূল ছিল বলে মনে করার কারণ ছিল না। এ-প্রসঙ্গে লেখক মুয়াররিখ খান সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তুরস্কের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্ধিতা, শিয়া সুন্নির পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং সিরিয়া ও মিসরে বিদ্রোহাশঙ্কা বিদ্যামান ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের গৌরবের বিষয়ও বলিতে হইবে- খৃষ্টান জগৎ এত উন্নত, এত একতাবদ্ধ ও এত সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্বেও এই ষোড়শ শতাব্দীতে ওসমান বংশা খৃষ্টান জগতে স্বীয় জয়ের গৌরবমণ্ডিত পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগের অসংখ্য

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২ লর্ড কিনরস, *দি অটোমান সেঞ্চুরিস, দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য তার্কিস এম্পায়ার*, অনুবাদ, জেসি মেরি কুইয়া, রোদেলা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৮৯ ও ১২৬

> সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ সমূহ বিস্তৃত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া উহাকে আরও বৃহত্তর করিয়া তুলিয়াছিল। তুরস্কের শক্তিশালী উন্নত কার্য্যকরী সামরিক পদ্ধতি, তুরস্ক জাতির উন্নত জাতীয়তেজ এবং তাহাদের রাজ্যের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানই এই কৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু এই যুগে ওসমান বংশের গৌরব পরাক্রমে চির বিখ্যাত হওয়ার আদি কারণ এই ছিল যে তুরস্ক সাম্রাজ্য মহাযশা মহাতেজো সুলতান সুলায়মানের শাসনাধীনে ছিল।[১]

সুলতান সুলায়মান তৎকালীন ইসলাম জগতের প্রতিভা সম্পন্ন পরিচালক এবং নিজের উদ্ভাবিত আদর্শ ভবিষ্যতের জন্য বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য গঠনকারী উজ্জ্বল ব্যক্তি। তিনি তাঁর সময়োপযোগী তেজ ও উদ্যম কাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুলতান সুলায়মানকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা মহাপরাক্রমান্ত সুলায়মান (Sulaiman the Great) এবং মহাতেজা ও মহানুভব সুলায়মান (Sulaiman the Magnificient) নামে অভিহিত করেন। তাঁর স্বদেশীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সুলায়মান কানুনী (Sulaiman the law-giver), আইনদাতা সুলায়মান এবং সুলায়মান সাহেব কিরান (Sulaiman the lord of his age) অর্থাৎ তাঁর সময়ের জগতে সর্বপ্রধান পুরুষ এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি উসমান বংশের দশম সম্রাট ছিলেন এবং তাঁর সামাজ্যের বিস্তৃতি এই সময় সাধিত হয়। তিনি সুদর্শন শিক্ষানুরাগী, সাহিত্যমনা, কবি, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বাদশার হারেম বা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে বের হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেননি বরং তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ সুলতান বায়োজিদের জীবিতাবস্থাতেই তিনি কাফার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা সলিমের নয় বছরের রাজত্বকালেও তিনি রাজ দরবার বা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে দূরে অবস্থান করেন নি। একনিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোমল ও কঠোর গুণাবলি সম্রাট সুলায়মানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুলতান সুলায়মান যুগসিংহ (Lord of the Age) নামে অভিহিত হতেন। সুলতান সুলায়মানের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তাঁর পূর্বসূরিদের দখল থেকে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করেন। বেলগ্রেড, রোড্স, হাঙ্গেরি একে একে অনুগত করেন নিজের অধীনে। হাঙ্গেরির রাজা লুইয়ের তুর্কি-দূত হত্যাই মূলত তুর্কি-হাঙ্গেরি সংঘর্ষের প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুলায়মান তাই সুবিধার জন্য বেলগ্রেড দখলের প্রস্তুতি নিলেন। সুতরাং তিন হাজার সমরাস্ত্রবাহী, দশ হাজার রসদবাহী উট এবং সেই সাতে তিনশো কামানধারী গোলন্দাজ নিয়ে অগ্রসর হন সুলায়মান। সপ্তাহ তিনেক অবরুদ্ধ থাকার পর প্রাণপণ প্রচেষ্টাতেও টিকতে পারলো না শত্রুপক্ষ। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট পতন ঘটলো বেলগ্রেডের। লেখক এ-প্রসঙ্গে পরবর্তী জয়ের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন :

> এই বেলগ্রেড জয়ের ফলস্বরূপ ভিনিস ভয়ে ভীত হইয়া করদরাজ্য হইল এবং জ্যান্তি ও সাইপ্রাসের জন্যও কর দিতে প্রতিশ্রুত হইল। এখন সুলতান রাজ্য শাসন ও উহার আভ্যন্তরীন সুশৃঙ্খলা বিধানে মনযোগী হইলেন। রোডস দ্বীপ সুলতান সুলায়মানের এক অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য ১৫২২ খৃ ২৮ জুলাই সুলতান সুলায়মান অপূর্ব্ব বিজিত, বিখ্যাত রোড্স পূর্ণ বিক্রমে আক্রমণ করত অবরোধ করেন।[২]

---

১ সুলতান সুলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

রোড্‌সকে আশ্রয় করে জলদস্যুরা ইস্তাম্বুল ও মিসরে চলাচলকারী তুর্কি বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন করতো। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে মুখ থুবড়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের বাণিজ্য, তাই আট হাজার জেনিসারিসহ তিনহাজার রণতরীসমৃদ্ধ শক্তিশালী নৌবহর রোড্‌স অভিমুখে প্রেরণ করেন সুলতান। সুলতান সুলায়মান নিজে এক লাখ সৈন্য নিয়ে এশিয়া মাইনর হয়ে রওনা হলেন। রোড্‌স দ্বীপের বীর নাইটগণের প্রচেষ্টায় প্রায় ছয়মাস অবরোধেই অতিবাহিত হয়। সুকঠিন প্রতিরোধ প্রাচীরে একসময় ফাটল ধরলো, আর নাইটরাও আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক মুয়াররিখ খান সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তুরস্ক জাতি ইঞ্জিনিয়ারীং নিপুণতায় জগদ্বিখ্যাত ছিল, যাহারা দুর্গ অবরোধ ক্রিয়ায় ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল এবং যাহারা তদানীন্তন সমস্ত জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার জানিত, সেই অদম্য তুরস্ক জাতিকে রোড্‌স দ্বীপের বীর নাইটগণ কতদিন বাধা দিয়া রাখিবে ? অবশেষে বৃথা লোক ও শক্তিক্ষয় হইতেছে দেখিয়া এবং দুর্গ ও আত্মরক্ষা আর সম্ভবপর নহে বুঝিয়া এ্যান্ড মাষ্টার ২১ শে ডিসেম্বর তারিখে সম্মানযুক্ত সর্ত্তে সদলবলে আত্মসমর্পণ করেন।[১]

রোড্‌সবাসীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন সুলায়মান। ফলে সম্মানসূচক সন্ধি স্থাপিত হলো উভয়পক্ষে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলো নাগরিকেরা। কর থেকে অব্যহতি দেয়া হলো পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে অটোমানদের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে স্থাপিত হলো রোড্‌স। পরবর্তীকালে হাঙ্গেরি কীভাবে সুলতানের শাসনাধীনে এলো, সে-প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন:

> এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা ১ম ফ্রান্সিস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ৫ম চার্লসকে অগ্রগতি হইতে বাধা দিবার নিমিত্ত সুলায়মানকে হাঙ্গারি আক্রমণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে তুরস্কের চিরশত্রু পারস্যরাজ, চার্লস ও হাঙ্গারী রাজ্যের রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে একত্র মিলিয়া যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।[২]

১৫২৬ সালে এক লাখ সৈন্য ও তিনশো কামান নিয়ে অভিযান শুরু হলো। সংখ্যা ও যোগ্যতায় তুর্কিরা এগিয়ে থাকায় জয়মাল্য তাঁদের গলাতেই হলো। তুর্কি কাহিনির নিয়ন্ত্রনে এলো গোটা হাঙ্গেরি। ১৪০ বছরের জন্য সেটি পরিণত হলো উসমান বা অটোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশে।

সুলতান সুলায়মানকে সর্বদা ইউরোপীয় যুদ্ধ থেকে এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে এবং নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাসক শাহ্ তামাস্পের (১৫১৪-১৫৭৬) বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ সুলতান সুলায়মান প্রধানমন্ত্রী ইবরাহীমকে নিয়ে নামেন পারস্য অভিযানে। প্রায় বিনা প্রতিরোধে অধিকার করেন বাগদাদ ও তাবরিজ। বাগদাদ অবরোধ করে ১৫৩৬ সালের দিকে ইস্তাম্বুল ফিরে যান। আরেকবার অভিযান চালান ১৫৪৮ সালে। সুলতান ইউরোপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ তামাস্প এনজুরাম দখল করে নেন। এ বিষয়ে লেখক জাতিগত বিরোধের দিকটি তুলে ধরে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> পারস্যের সঙ্গে উভয় পক্ষে জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া যুদ্ধ বরাবর চলিতে থাকে। অবশেষে ১৫৫৪ খৃ. সুলতান পারস্যের আরমেনিয়া প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং নাখিতদেবান এরিবান ও কারাবাগ জয় করেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

> এই সব জয়ের ফল স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে সুন্নি তুরষ্ক জাতি এবং শিয়া পারস্য জাতির মধ্যে ১৫৫৫ খৃ. ২৯ শে মে তারিখে এমেসিয়াতে এক সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ইহাতে উভয় জাতির মধ্যেচিরন্তন বিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া যায় এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে শেষ যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থানে স্থাপিত হয়।[১]

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) মধ্যবর্তী শাত-ইল-আরবে সুলতান শাসন এসময় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। আবার সুয়েজ বন্দর দিয়ে তুরস্কের কর্তৃত্ব ক্রমশ লোহিত সাগর পারস্যোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে বিস্তৃত হয় এবং এই সব সাগরে তুরস্কের জাহাজগুলিতে অর্ধচন্দ্রখচিত ইসলামি পতাকা উড়তে থাকে। ১৫২৬ খ্রি. সুলায়মান লোহিত সাগরে প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং আরব জলদস্যুদেরকে শাস্তি প্রদান করত পবিত্র ভূমি আরব ও ইয়েমেনের উপর তুরষ্ক সুলতান সুলায়মানের শাসন দৃঢ়ীভূত করেন। শুধু তাই নয়, ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে সুলতান সুলায়মানের বিস্তৃতি নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক বলেন :

> যখন প্রবল প্রতাপ দিল্লীসম্রাট হুমায়ুন সেকেন্দর শাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন সেকেন্দর শাহের পুত্র কনষ্টান্টিনোপোলে উপস্থিত হন। গুজরাত রাজ বাহাদুর শাহের দূত পর্তুগীজদিগের হস্ত হইতে ডীউ (Diu) পুনরাধিকার করিবার জন্য সুলতান সুলায়মানের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন। সুলায়মান মিসরের শাসন কর্তাকে এক নৌবহর সজ্জিত করিয়া ডীউ পুনরাধিকার করিবার আদেশ দেন। ... ১৫৪৭ খৃ. ভারতীয় রাজপুত্র আলাউদ্দীনের দূত পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থী হইয়া সুলতান সুলায়মান সমীপে উপস্থিত হন। ১৫৫১ খৃ. তুরস্ক নৌসেনাপতি পিরি রইস ভারত সাগরে তুরষ্ক পতাকা উড্ডীয়মান করেন, ওমান উপসাগরের তীরস্থ মাসকেট নগর দখল করেন এবং ওমান অবরোধ করেন। তদীয় উত্তরাধিকারী মুরাদ এবং ১৫৫৩ খৃ. সিদি আলী (Surnamed Katib-al-Rami) ও পর্তুগীজদের সহিত যুদ্ধ করেন।[২]

তুরস্কের স্থলবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনীও অনেক শক্তিশালী ছিল সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে। তাঁর সময়ে অটোমান বাণিজ্য তরীগুলো মোগল ভারতের বন্দরগুলোতে এসে নোঙর করতো। তুর্কি নৌবাহিনীর কীর্তি, বীরত্ব এবং পরাক্রমে সুলতান সুলায়মানের যশ ও প্রতিপত্তি ভূমধ্যসাগরে, লোহিতসাগরে ও এই সব সাগরের তীরবর্তী রাজ্যসমূহে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তুরস্কের নৌবাহিনির দক্ষতার কথা বলতে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক বলেন :

> তুরস্ক নৌসেনাপতিদের নিপুণতা, সাহস ও বীর্য্য, তুরস্কের জাতীয় পতাকাকে প্রায় স্থলের ন্যায় জলেও অজেয় করিয়াতুলিয়াছিল। খয়রউদ্দীন পাশা তুরস্কের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নৌসেনাপতি ছিলেন। তিনি ইউরোপে বারবারোসা নামে বিখ্যাত হন। প্রধানতঃ ইহায়ই বীরত্বে উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী রাজ্যসকল সুলতান সুলায়মানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়; তুরস্কের নৌশক্তি অসংখ্য যুদ্ধজাহাজ ও তদুপযোগী অস্ত্রশাস্ত্র দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়। টিউনিস, আলজিরিয়া এবং ত্রিপলীর জলদস্যুগণ সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কার্য্যকরী শক্তিরূপে পরিণত হয়।[৩]

তাই বলা যায়, জল ও স্থলপথে পৃথিবীব্যাপী তুরস্কের এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে। সুলতান সুলায়মানের রাজত্বে যে ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সব বিষয়ে উন্নতি বিদ্যমান

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

ছিল, তা পরবর্তী অন্য কোনো সুলতানের রাজত্বে রক্ষিত বা পুনরায় অর্জিত হয়নি। তাঁর সাম্রাজ্যের নামগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে অনুসন্ধানী ইতিহাস-গবেষক মুয়াররিখ খান লেখেন :

> প্রাচীন কার্থেজ, মেনকিজ, পায়ার, নিনেভা, ব্যাবিলন এবং পামিরার স্থানাবলী তুরস্কভূমি হইয়াছিল। আলেকজান্ড্রিয়া, জেরুজালেম, ডামস্কস, স্মার্না, নিস, ব্রুসা, এথেন্স, ফিলিপ্পি, এড্রিয়ানপল নগরাদি এবং পরবর্ত্তী কালের এলজিয়ার্স, কায়রো, মক্কা, মদিনা, বসরা, বগদাদ, বেলগ্রেড নগরাদি যাহা পূর্ব্বোক্তগুলির অপেক্ষা কোনও অংশে কম বিখ্যাত ছিল না। তুরস্ক সুলতানের আজ্ঞা পালন করিত। নীল, জর্ডন, ওরোনটিস, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রীস, টানাইস, বোরিষ্থিনিস, ড্যানিউব, হেব্রাস এবং ইল্লিসিয়াস প্রভৃতি নদীসমূহ অশ্বলাঙ্গুল বিশিষ্ট তুরস্ক পতাকর ছায়ার নীচ দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইত। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশ, প্রপনাটিস, পেলাস, মিউটিস, ইউকাজিন এবং লেহিতসাগর তুরস্ক সাম্রাজ্যের হ্রদাবলীতে পরিণত হইয়াছিল। তুরস্কের অর্দ্ধচন্দ্রখচিত জাতীয় পতাকা এটলাস ও ককেশাস পর্ব্বত স্পর্শ করিয়াছিল। এথোস, সিনাই, আরারট, কারমেন, টউরাস, আইডা, অলিম্বাস, পিলিওন, হিমাস, কার্পেথিয়ান এবং প্রক্রোসিরৌনিয়ান শৈলাবলীতে তুরস্ক পতাকা বায়ুভবে দুলিত হইত। এই সাম্রাজ্য ৪০০০০ বর্গ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত ছিল।[১]

এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিষয়ে লেখক মুয়াররিখ খান সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭) বিস্তারিত আলোচনা করেন। সুলতান সুলায়মান সাম্রাজ্যকে একুশটি প্রদেশ বা 'গভর্নমেন্টে' বিভক্ত করেন। এই একুশটি প্রদেশকে পুনরায় ২৫০টি 'সঞ্জকে' (সানজাক বা জেলা) বিভক্ত করেন বলে লেখক জানান। সালজাকে ভাগ করা হয় কাজাস-এ। কাজাসের শাসনকর্তাকে 'কাজ' সানজাকের 'পাশা' এবং প্রদেশের শাসককে 'গভর্নর' বলা হতো। এঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে সুলতানের রাজকোষ পূর্ণ থাকত। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ (১৪৩২-১৪৮১) উসমান বংশের 'আদি বিধান' প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিধান (Kanun Namah i.e. Fundamental Law) তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। একে সুলতান সুলায়মান কীভাবে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান, তা বলতে গিয়ে লেখক জানান :

> সুলতান সুলায়মান কানুনীর (Sulayman of the law giver) হস্তে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শাসন বিভাগ উন্নত হয়। তিনি অন্যতম বিজেতা ও শাসন কর্ত্তার ন্যায় বিধানশাস্ত্র হতে পরবর্ত্তীকালে লোকের স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত আছেন। তিনি অতি যত্নের সহিত তুরস্কের জিয়মৎ (Grand Fielf-জমিদার) এবং তিমার (Small Fief) বিশিষ্ট ফিউডাল প্রণালী স্থাপন করেন (Feudal System), যাহাতে রাজার সহিত জমিদার, তালুকদার ও প্রজার সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধিবদ্ধ থাকে।[২]

তিনি কর ব্যবস্থা সংশোধন ও অতিরিক্ত কর বাতিল করেন। রাষ্ট্রীয় নিয়োগে আত্মীয় বা পরিবারের চেয়ে মেধাকে মূল্যায়ন করার জন্য দেয়া হয় তাগিদ। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাঁর পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার ছিল। সুলতান সুলায়মানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
২ প্রাগুক্ত, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ৮৫

তুর্ক সীমান্তের নিকটবর্ত্তী খৃষ্টান রাজ্যের অধীবাসীরা তাহাদের গৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তুরস্কধীনে বাস করিতে ব্যগ্রতা দেখাইত। এই উদার তুরস্ক গভর্ণমেন্ট কতই না অত্যাচারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুলতান সুলায়মানের সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক বলেন, "আমি দেখিয়াছি অসংখ্য হাঙ্গেরীর কৃষকেরা স্ব স্ব কুঁড়েঘরে অগ্নি সংযোগকরত : নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিসহ, চাষের গরু ও ছাগল প্রভৃতি পরিশ্রমোযোগী অস্ত্রাদি লইয়া তুরস্ক রাজ্যে স্বেচ্ছায় পলায়ন করিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত যে মোসলেম রাজ্যে কর স্বরূপ দশোত্তরা(Payment of the tenth) ব্যতীত তাহাদীগকে অন্য কোন প্রকার কর যা উৎপীড়নাধীন হইতে হইবে না।"[১]

তাই দেখা যায়, সুলতান সুলায়মান সর্বপ্রথম ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সকে যে সনদ প্রদান করেন তাতে তুরস্ক সরকার বৈদেশিক বণিকদের শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তা রক্ষার ভার নেন। তাঁর শাসনকালের শেষাবধি সবক্ষেত্রে এ ধারা অব্যহত ছিল। সুলতান সুলায়মানের রাজত্বকালে মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তাঁর নিজ নামানুসারে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সর্বাপেক্ষা মনোহর সুলায়মানী মসনজিদের নির্মাণকাজ শেষ করেন। এর মনোমুগ্ধকর উচ্চ স্তম্ভরাজি সেন্ট সোফিয়াকেও হার মানিয়েছে। তাঁর পিতার নামানুসারে সলীমিয়া মসজিদ এবং তাঁর ভাই মোহাম্মদ ও জাহাঙ্গীর ও নিজ কন্যা খানুন সুলতানা মিকরামার নামেও মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান সুলায়মানই চল্লিশ খিলান বিশিষ্ট বিখ্যাত জলাশয় বা নহর (Oqueduct of the Forty Aches) নির্মাণ করেন। এই কৃত্তিম জলাশয় থেকে চল্লিশটি ফোয়ারার পাইপ যোগে জল যোগান হতো বলে একে চল্লিশ ফোয়ারার নহরও বলা হয়। মসজিদ ও গির্জার মিনারের সাদৃশ্য এবং সুলায়মানের শাসানধীন এলাকার বিখ্যাত মসজিদের মিনার বা চূড়াগুলির ঐতিহ্য তুলে ধরে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

প্রাচীন কালের গির্জা হইতে মসজিদ মিনারা (মসজিদ সংশ্লিষ্ট সে প্রকোষ্ঠোপরি আরোহণ পূর্ব্বক মোয়াজ্জিন নামাজের জন্য বিশ্বাসী দিগকে আহবান করে) দ্বারাই চিনা যাইত, নতুবা উভয়ের মধ্যে অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইত না। এই সব মিনারার লম্বা ও পাতলা আকৃতি কনষ্টান্টি নোপলের পূর্ণ চিত্রকে কি সুন্দরই না করিয়াছে। প্রত্যেক মসজিদের একটি হইতে চারিটি মিনারা আছে। পরবর্ত্তীকালের সুলতান প্রথম আহম্মদের নির্ম্মিত বিখ্যাত মসজিদে ছয়টি মিনারার গৌরবান্বিত চূড়া বিদ্যমান আছে; ইতিপূর্ব্বে মক্কা শরিফের কাবাগৃহের অনুকরণে ছয় মিনারা কোন মসজিদ বিদ্যমান ছিল না।[২]

মসজিদের নির্মাণশৈলীতে বিজিত রোমান শিল্পকলার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সুলায়মানের আমলে। ভাস্কর বিদ্যার উন্নত নিদর্শন মসজিদগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে যা মনে হয়, তা লেখকের ভাষায় :

মনে হয় যেন কোন অজানা স্বর্গরাজ্যের সীমান্ত দেশ অবলোকন করিতেছি এবং সেই অজ্ঞাত মহিমায় বিশ্ববিধাতা খোদাতাআলার সান্নিধ্য অনুভব করিতেছি। ইহার শুভ্র শূণ্যতার মধ্য দিয়া মানসচিন্তা সরলভাবে পরমারাধ্যের দিকে ধাবিত হয়, এখানে সুস্পষ্ট, চিত্তোম্মাদী, দুর্দ্দমনীয় মনোভাব ঐ একমাত্র আল্লাহ্তাআলার দিকে ঘনিভূত হয়।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৩ প্রাগুক্ত

তবে এখানে শুধু মসজিদই ছিল না, এর চারিদিকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মসজিদের অবস্থান থাকত, অবশিষ্ট স্থানে বহু প্রকোষ্ঠ ও ঘর চক্রাকারে নির্মিত হতো। এটি পাহাড়ের মধ্যে একটি শহরের মতো ছিল, সেখানে উপাসনা, পঠন-পাঠন, চিকিৎসা, সামাজিকতা ইত্যাদি সবকিছুর সুবিধাদি ছিল। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> কোরআন শরীফ পড়িবার স্বতন্ত্র হল, প্রাইভেট সম্পত্তি রাখার স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ, লাইব্রেরী, কলেজ, মেডিকেল স্কুল, প্রাইমারি বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, পথিকদিগের আশ্রয় গৃহ, স্নানাগার, সংক্ষেপত ইহার এক মসজিদকে এক ছোট সহর মনে করা যাইতে পারিত। ইহা আতিথেয়তার ও বদান্যতার ভান্ডার ছিল। কেন্দ্রস্থানীয় নামাজার্থ সর্বোচ্চ প্রকৃত মসজিদের চতুর্দ্দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দালানগুলি বৃক্ষাবলীর ছায়াচ্ছাদিত হইয়া যেন পর্ব্বতের চারিদিকের পাদদেশে ফিরিয়া অধিষ্ঠিত থাকিত।[১]

একজন মহাপরাক্রান্ত, মহানুভব শাসকরূপে তুরস্ক সুলতান সুলায়মানের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহ্য লেখক মুয়াররিখ খান এভাবে তুলে ধরেছেন।

সুলায়মানকে যে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সেটি সফল শাসক হিসেবে তাঁর প্রাপ্য ছিল, যদিও পরবর্তীতে অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবস্থান ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'আরব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' নামে ইতিহাসধর্মী একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির লেখক কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, যিনি 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে লিখেছেন। প্রবন্ধটিতে মূলত আরব এবং ইরানের মধ্যে অতীতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল, সংক্ষেপে তা-ই তুলে ধরা হয়েছে। ইরান সাম্রাজ্য আরব জাতির নিকট কীভাবে অতীতে 'আত্মসমর্পণ' করেছিল, সেটি ইতিহাসনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে লেখক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ইরান ও আরবের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে-সব যুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য যেকোনো যুদ্ধের তুলনা হয় না বলে লেখক প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেন। এই যুদ্ধের ফলে ইরানের সহস্র বছরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর আরবরা কী এমন বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা ছিল, যার জন্য বিশাল ইরান তথা পারস্য সাম্রাজ্যকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল, তাই এই প্রবন্ধের লেখক মুজফ্ফর আহমদ তুলে ধরেছেন।

লেখক অনেকটা গল্পের ভঙ্গিতে যুদ্ধের এই কাহিনি তুলে ধরেছেন। আরবদের পরিচয় ছিল, মরুভূমির বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত সাধারণ জনতা হিসেবে। পরবর্তীকালে স্বদেশের মুখরক্ষার জন্য ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তারা এক হয়ে গিয়েছিল। তাদের এক হওয়া এবং শক্তি সঞ্চয় করে বীরত্ব অর্জনের কথা বলেন লেখক মুজফফর আহমদ। আরবরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা হয় পারস্য জাতিকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে অথবা একে একে সব আরববাসী জীবন উৎসর্গ করবে, তবুও পারস্যের অধীনতা স্বীকার করবার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না। অস্ত্রশস্ত্রে শক্তিশালী না হয়েও আরবদের একতাই তাদের মনোবল যুগিয়েছিল। এতদ্বিষয়ে লেখক দ্বৈপায়ন সাহিত্য-পত্রিকায় লিখেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

> ভগ্ন বর্শা ও মরিচাধরা তরবারী ছিল তাহাদের সম্বল, আর এই সম্বল লইয়াই তাহারা শুধু যে ইরানের আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা নয়, পরন্তু ইরানের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবিক যে জাতি জীবন বলিদান করিতে শিখে, তাহাদের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারে না।[১]

আরবদের ইরান বিজয় 'মুসলিমদের পারস্য বিজয়' নামে ইতিহাসে পরিচিত। আরব মুসলিমরা ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সাসানীয় অঞ্চলে (মেসোপটেমিয়া, ককেসাস,পারস্য ও বৃহত্তর খোরাসান) আক্রমণ করে। এসময় খালিদ বিন ওয়ালিদ (৫৯২-৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) হামলা চালান। এই যুদ্ধের বিবদমান পক্ষ ছিল সাসানীয় সাম্রাজ্য বনাম রাশিদুন 'খেলাফত'। তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চল ছিল সাসানীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। সিরিয়ার রোমান যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদকে বদলি করে পাঠানো হলে ইরানিদের পাল্টা আক্রমণে মুসলিমরা তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটে। ৬৩৬ সালে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু হয়। 'কাদিসিয়ার যুদ্ধে' বিজয়ের মাধ্যমে সাসানীয় অঞ্চলের 'রাশিদুন খিলাফতে'র নামে মুসলিমরা স্থায়ীভাবে আধিপত্য লাভ করে। ইরানে তার আগে জরথ্রিয়ান ধর্মের প্রভাব ছিল। ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উক্ত ধর্মের প্রভাব কমে আসে। লেখক তাঁর এই লেখাটিকে 'কাদিসিয়া যুদ্ধের ইতিহাস' বলতে চাননি। তবে বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে লেখক তৎকালীন আরব জাতির দেশপ্রেমের একটি নিদর্শন তুলে ধরেছেন 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র পাঠকদের উদ্দেশে।

কাদিসিয়া যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন খলিফা উমরের 'খেলাফত'কাল (৬৩৪-৬৪৪) চলছিল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সঙ্গে আরব মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানরা জয়লাভ করেন, ইতিহাসে এটি 'বুয়াইবের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন সেনাপতি মুসান্না। ইসলামের ইতিহাসে সেনাপতি হিসাবে খালিদ এর পরেই মুসান্নার স্থান। 'বুয়াইবের যুদ্ধে'র কয়েকমাস পরে মুসান্না 'সেতুর যুদ্ধে' আহত হন এবং মারা যান। পরবর্তীতে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে উমর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।তাঁর নেতৃত্বে কাদিসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ (সা.) এর মামা। ইরানিদের পক্ষে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন রুস্তম ফারুকজাদ।[২]

এই যুদ্ধে আরবরা তাদের হৃদয়ের যাবতীয় শক্তি যুদ্ধে ঢেলে দিয়েছিল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। 'কাদিসিয়ার যুদ্ধের' সেনাপতি সা'দ কোন এক অপরাধের জন্য আবু হাজেন নামক এক সৈনিককে বন্দি করে রেখেছিলেন। যে ঘরে সে শৃঙ্খলিত ছিল, সে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের যুদ্ধক্ষেত্র দেখছিল। দেখতে দেখতে তার মনের ভিতরে চঞ্চলতা দেখা দিল। তাঁর স্বদেশবাসীগণ দেশের সম্মান বজায় রাখার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করছে, আর তিনিএই দিনে বন্দি হয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ, একথা ভেবে বেদনায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল।

---

১ দ্বৈপায়ন (মুজফফ্‌র আহমদ),'আরব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, অক্টোবর ১৯১৯, পৃ. ২৫৪

২ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, *আরব জাতির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৮২-৮৩

আবু হাজেনের এরকম ভাবনার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি যখন বাইরে গেল, তখন এক পর্যায়ে সেনাপতি সা'দের স্ত্রী সালমাকে বাইরের রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখল। আবু হাজেনের প্রাণের মধ্যে তখন এমন অনুভূতি কাজ করছিল যে,সা'দ সম্পর্কিত যে কাউকে পেলে সে তাকে তার মনের কথাটি ব্যক্ত করবে। সে সালমাকে মা বলে ডাক দিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, তাঁর মাতৃহৃদয়ের নিকট একটি প্রার্থনা আছে, দেশ ও ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসে আরব জননীরা সন্তানদেরকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারে, তেমনি আর কেউ পারেনা বলে আবু হাজেন জানায়। সালমাকে আরব নারী হিসেবে তার বেদনা বুঝবেন বলে আবু হাজেন প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সে জানায়, আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আরবের ভাগ্য পরীক্ষা হচ্ছে আর হাজেনের বন্ধুদের সকলে প্রাণপণে দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, আর সে হতভাগা বন্দিশালায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে, তার জীবনের সকল সার্থকতা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেয়ার জন্য সালমার নিকট অনুরোধ করে। বেঁচে থাকলে ফিরে এসে পুনরায় স্বহস্তে শৃঙ্খল পরিধান করবে বলে সালমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। সালমা আবু হাজেনকে 'বাবা, তুমি প্রকৃত আরব সন্তান। তোমার প্রাণের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি নিরুপায়, একজন কয়েদিকে বিনা আদেশে শৃঙ্খলমুক্ত করা আমার ক্ষমতার বাইরে' বলে।একথা শুনে আবু হাজেনের বুক ফেটে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হলো। সে তন্ময় চিত্তে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। কবিতাটির ভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক দ্বৈপায়ন সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন:

> হায়! বিধাতা আমার পক্ষে এতদপেক্ষা হৃদয়বিদারক শোক আর কি হইতে পারে! আজ আমার সমকক্ষ অশ্বারোহীবৃন্দ নিজ নিজ শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিতেছে আর আমি কিনা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এখানে পড়িয়া আছি ! উত্তেজনায় আমি যখন দাঁড়াইতে চাই, তখন শিকল আমায় দাঁড়াইতে দেয় না। আমার প্রতিকূলে দ্বার এমনভাবে অর্গলাব্ধ হইয়া আছে যে ডাকিতে ডাকিতে আমার গলার আওয়াজ বসিয়া যায়, কিন্তু হায়! তথাপি কেহ দরজা খুলিয়া দেয় না।[১]

এই কথাগুলো শোনার পর সাদ-পত্নী সালমার মনে আঘাত করল, তিনি ভাবলেন, যার প্রাণে এত আকাঙ্ক্ষা, দেশের কাছে জীবন দিতে যার এত আগ্রহ, সে কেন শৃঙ্খলিত হয়ে থাকবে। সালমা নিজের ঝুঁকি নিয়ে আবু হাজেনের বেড়ি খুলে দিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবু হাজেন সোজা আস্তাবলের দিকে ছুটল। সেখানে সেনাপতি সা'দের ঘোড়া বাঁধা ছিল । সেই ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে যেয়ে বীরবিক্রমে শত্রুদের আক্রমণ করল। যেদিকে যায়, সেদিকেই শত্রু ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল। আরব সৈন্যগণ বিস্মিত হয়ে এ ওর দিকে তাকাল, ভাবল এ বীরপুরুষ এলো কোথা থেকে? স্বয়ং সা'দের বিস্ময়ের সীমা রইল না।তিনি ভাবলেন, আবু হাজেনের মতো মনে হচ্ছে এই বীর যোদ্ধাকে, কিন্তু বন্দি এ ব্যক্তির তো এখানে আসার কথা নয়।

সন্ধ্যার পর অক্ষত দেহে ফিরে এসে আবু হাজেন তার প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নিজ থেকেই শৃঙ্খল পরিধান করলো। সালমা সকল কথা তার স্বামী সা'দকে জানালেন। সা'দের মন আনন্দে অধীর হয়ে উঠল, তিনি নিজেই কারাগারে গিয়ে হাজেনকে বন্ধনমুক্ত করলেন। তার বীরত্ব দেখে সাদের প্রাণ আনন্দ আর গৌরবে ভরে উঠেছিল। হাজেনের নায় জাতিগত প্রাণ ও দেশভক্ত যুবক তার সেনাদলে আছে ভেবে গর্ব অনুভব

---

১ 'আরব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

করলেন। হাজেনের মত যুবক যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, আর তাকে দেখে সেদেশের যুবকরা প্রাণে এত শক্তি সঞ্চয় করেছে সেদেশের নিকট ইরানকে মাথা নত করতেই হবে। এই বলে হাজেনকে তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।[1]

হাজেনের মতো দেশপ্রেমিক বীর সেনানীরা ছিল বলেই 'কাদেসিয়ার যুদ্ধে' ইরানের বিপক্ষে আরবদের জন্য জয় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। লেখক এই দেশপ্রেম ও তার উদাহরণ দিতে গিয়ে আবু হাজেনের ঘটনা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'রমাধ্যমে। লেখকের লেখার সূত্র হিসেবে জনৈক উর্দু লেখকের পাণ্ডুলিপির সহায়তা নিয়েছেন বলে লেখাটির ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় দ্বৈপায়নের লেখা 'বুইয়ব এর যুদ্ধ' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। 'বুইয়বের যুদ্ধ''কাদিসিয়ার যুদ্ধে'র আগে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থানের নাম অনুসারে যুদ্ধের নামসমূহ ইতিহাসে গৃহীত হয়েছে। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্য কর্তৃক আরবদের প্রতি তৃতীয়বারের মতো আক্রমণের ফলে যে যুদ্ধের সূচনা হয় ইতিহাসের তাই 'বুইয়বের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধকে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা যাবে না। বলা যায়, এক ভূখণ্ডের সাথে আরেক ভূখণ্ডের লড়াই, যেখানে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আরব ভূমি রক্ষার্থে এক হয়েছিল।এতৎপ্রসঙ্গে লেখক দ্বৈপায়ন লিখেছেন:

> ইরানের অভিযান ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। আরব ভূমিকে পদানত করাই ছিল তাহার অভিপ্রায়। তাই আরবরা বর্ণ-ধর্ম্মের বিভেদ ভুলিয়া ইরানীদের সম্মুখীন হইল। খৃষ্টান-মুসলমান সেদিন আর কোন পার্থক্য রহিল না। যে দেশে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে দেশের ফল-শস্যে তাহাদের শরীর বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই দেশের-সেই তাহাদের জন্মভূমি আরবের মানস-মোহিনী মূর্ত্তি তাহাদের হৃদয়-পটে জাগিয়া উঠিল।[2]

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা তাদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থ দূরে রেখে এক কাতারে শামিল হয়। আরব ভূখন্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন ছিল, লেখক এই রচনায় সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

আরব ও ইরানের মধ্যে এর পূর্বে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে 'সেতুর যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ওই যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন মুসান্না ও আবু উবায়দা। আবু উবায়দা বীরবিক্রমে আরব পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হন। সেতুর যুদ্ধে আরবদের বিপর্যয়ের ফলে সেনাপতি মুসান্না আরো সতর্ক হন। আরবদের বিভিন্ন গোত্র থেকে তিনি আরব সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বাহিনীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়।[3]দ্বৈপায়ন বলেছেন, বিগত ইরান যুদ্ধে পরপর 'সপ্তপতাকাধারীর' পতন হওয়া সত্ত্বেও যিনি আরবের ধ্বজা তুলে রেখেছিলেন, সেই বীরপুরুষ মুসান্না ছিলেন আরব বাহিনীর সেনাপতি।[4]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬
২ দ্বৈপায়ন, 'বুইয়ব এর যুদ্ধ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ৩২৬
৩ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২
৪ *'বুইয়বের যুদ্ধ'*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২৬

খলিফা উমরের প্রচেষ্টায় সকল স্থান থেকে সৈন্য সংগৃহীত হয়, এই বাহিনীর মধ্যে একটি খ্রিস্টান উপগোত্রও ছিল। তারা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আত্মদানের অঙ্গীকার করেছিল। মুসান্না এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। এভাবে তিনি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে এরকম যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্যে গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, পারস্যের রাজধানী থেকে একদল সৈন্য ইতিমধ্যেই আরবদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছে। এসময় তিনি অন্যতম সেনাপতি জারিরকে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে বলে তিনি বুইয়বের দিকে সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। খলিফা উমরের নির্দেশ ছিল পুনরায় ফোরাত অতিক্রম করে তিনি যেন বিপদে না পড়েন। গত যুদ্ধে এই কারণে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। এবারেও সমগ্র পারস্য বাহিনী তিন সারিতে বিভক্ত হয়েছিল এবং এবারেরও প্রত্যেক সারির অগ্রভাগে হাতি দ্বারা সজ্জিত ছিল।[১] তাছাড়া 'প্রসিদ্ধ দ্বাদশ সশস্ত্র অশ্বারোহীও ছিল ইরানীদের দলে'।[২]ইরানিদের এই বিশাল সেনাদলের প্রধান সেনাপতির নাম ছিল মেহরান।

উভয় পক্ষ যখন পরস্পর মুখোমুখি হলো, তখন মুসান্না নিজ বাহিনীর লোকদের ডেকে বললেন, আজ তাদের মহা পরীক্ষার দিন। আরব জাতির উপর যাতে কলঙ্কের ছাপ না পড়ে, সে ব্যাপারে তিনি সবাইকে সতর্ক হতে বললেন। লেখক দ্বৈপায়ন সেনাপতি মুসান্নার বক্তব্য সাহিত্য-পত্রিকায় তুলে ধরেছেন এভাবে:

> তিনি বলিলেন, আজ আরব ও আযমে দ্বন্দ্ব (পারস্যকে আরবরা আযম বলিয়া থাকে), হয়তো আজ স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিব, নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিব। উত্তেজনা ও প্রেরণার বশে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। টিকিতে না পারিয়া পারস্যের বিশাল সৈন্যসজ্ঘের ভিতর অস্ত্র চালনা করিয়া দিলেন। ভীষণ তেজে অস্ত্র চালাইয়া তিনি একেবারে বিপক্ষ সৈন্যব্যূহের মধ্যস্থলে যাইয়া পহুছিলেন। তাঁহাকে একাকী এইরূপে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।[৩]

এই যুদ্ধে আরবদের পক্ষে মুসান্নার ভাই মসউদ এবং খ্রিস্টান আরবদের দলপতি উনস বিন হিলাল প্রাণপণে মেহরানের নেতৃত্বাধীন ইরানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসান্নার ভাই মসউদ আহত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে পড়ে যান। এতদ্বিষয়ে লেখক যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি:

> সঙ্গীরা তাঁহাকে তুলিতে যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া মসউদ বলিয়া উঠিলেন, -তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তের স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল-সাবধান। এদিকে একপদও অগ্রসর হইও না। তোমরা আমায় বাঁচাইতে চেষ্টা করিও না। আমি মরিতেছি বটে, কিন্তু আমার দেশ যে এখনো বাঁচিয়া আছে। তোমরা-দেশের সুসন্তানেরা, দেশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দেশের শত্রু নিপাতে অগ্রসর হও।[৪]

একইভাবে খ্রিস্টান আরবদের দলপতি উনস-বিন-হিলাল মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তীরের আঘাতে তাঁর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। রক্তে তাঁর ঘোড়ার পিঠ পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকে তিনি মসউদের মতো ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনিও শত্রু হনন করে যাচ্ছিলেন। বিদ্যুতের মতো যেন তাঁর হাত চলছিল আর বাতাসের বেগে তিনি ছুটছিলেন। সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলা তাঁর কথাগুলি লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছেন এভাবে:

---

১ *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃ. ৮২
২ বুইয়বের যুদ্ধ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২৬
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৩২৭

> হে বীরগণ, হে জন্মভূমির প্রিয় সন্তানগণ, তোমারও অসির তলে আজ মাতৃভূমির গৌরব বন্দী হইয়া আছে। মারিতে না পার,মরিয়া যাও, তথাপি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না।[১]

যার ফলস্বরূপ জন্মভূমির মুখ রক্ষা করার জন্য আরবরাযুদ্ধ করে যাচ্ছিল। শত্রুর মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ইরান সেনাপতি মেহরানের দৃঢ়তা যুদ্ধকে সহজে কোনো পরিণতির দিকে নিচ্ছিল না । আরবরা বুঝল, ইরানের পতাকা অবনমিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধের শেষ হবে না। তাই তারা পতাকাকেই শেষ লক্ষ্য করল। পতাকার পতন মানে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, তাই ইরানিরা পতাকার চারদিক থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। লেখক এর পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে, যাতে আরবদের দেশপ্রেমের দিকটি উচ্চকিত হয়ে উঠেছে:

> ইরানরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল বেতনের জন্য, আর আরবরা যুদ্ধ করিতেছিল প্রাণের টানে, স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য। প্রাণের প্রেরণার নিকটে অর্থের লালসা দাঁড়াইতে পারিবে কেন ?[২]

এরপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেল। পতাকার সন্নিকটে পৌঁছাবার জন্য কয়েকজন আরব-বীর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। হীনতা স্বীকার করে বাঁচবার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুই শ্রেয়, একথা আরবরা মনে ধরে রেখেছিলেন। আরবদের এ মনোভাব বুঝতে পেরে ইরান সেনাপতি মেহরান পতাকা উত্তোলন করে অশ্বপৃষ্ঠে বসেছিলেন। সহসা এক আরব বীর(যাকে লেখক তোগলব বংশীয় যুবক বলেছেন) তরবারির আঘাতে তাঁকে ফেলে দিয়ে সেই ঘোড়ায়চেপে বলে উঠলেন 'আমি আরব সন্তান, ইরান ধ্বজার অবনমনকারী''[৩]

মেহরান এভাবেই প্রাণ হারালেন। যুদ্ধে মুসান্নার ভাই আহত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়েছিল। বহু মুসলিম যোদ্ধা এতে প্রাণ হারায়। অন্যদিকে ইরানিদের প্রচুর শস্য ও গবাদিপশু আরবদের হস্তগত হয়। এই বুইয়বের যুদ্ধের মূল নায়ক মুসান্না যুদ্ধের কয়েক মাস পর প্রাণ হারান। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতিরূপে অভিহিত করেছেন। লেখক মুজফ্ফর আহমেদ 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে প্রবন্ধটি 'জনৈক প্রখ্যাতনামা লেখকের উর্দ্দু পান্ডুলিপি হইতে সঙ্কলিত' বলে প্রবন্ধের ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৮, জুলাই ১৯২১) চারুচন্দ্র মিত্রের (১৮৭৯-১৯৪৩) 'মক্কা বৃত্তান্ত' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিচিত মক্কা নিয়ে একজন অমুসলিমের লেখা লেখক এবং পত্রিকাটির অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের আদিকাল থেকে মক্কা পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল, লেখক বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তের আলোকে তা তুলে ধরেছেন। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* চার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় আমরা মক্কা নগরীর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যাত্রা শুরু করে কাবা শরীফ স্থাপন পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ লেখকের আলোচনায় প্রত্যক্ষ করি।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত

আরব দেশের অন্তর্গত হেজাজ প্রদেশের প্রধান নগরীর নাম মক্কা। এলাকাটি ভূমণ্ডলের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন মহানগরী। আরবীয় শৈলমালার উপত্যকায় নগরটি অবস্থিত। এর চতুর্দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণিতে পরিবেষ্টিত। লেখক প্রবন্ধের শুরুতেই মক্কা নগরীর পরিচয় এভাবেই দেন। একশত বছর আগে লিখিত মক্কা নগরীর বর্ণনার সঙ্গে বর্তমানেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে মক্কার জনসংখ্যা সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। তখন জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছিল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। মক্কা নগরীর অবস্থান ও সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> ইহা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদাধিক এক ক্রোশ এবং প্রস্থে আজিয়াদ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে কোয়াই কায়ান শৈলের শিরোভাগ পর্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। পর্ব্বত প্রাকারের অভ্যন্তরস্থ মক্কা নগরীতে অধুনা প্রস্তরনির্ম্মিত বহুবিধ সৌধরাজি বিরাজিত থাকায় নগরটীকে সম্যক শোভান্বিত করিয়াছে।[১]

মক্কার অপর একটি নাম 'বক্কা' কিন্তু উভয় শব্দই একত্রে সম্মিলনবাচক। আরব পণ্ডিতগণ বলেন যে, মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা বিবি হাওয়া স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে পতিত হন। হযরত আদম (আ.) সিংহল দ্বীপে ও বিবি হাওয়া হেজাজ প্রদেশে নিপতিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। পরস্পরকে অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা যে স্থানে এসে সম্মিলিত হন সেই স্থানকেই বক্কা বা মক্কা নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং মক্কা নামটি যে হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে পরিচিত, তা এই মতানুসারে স্থির করতে হয়। এছাড়া আরেকটি মত হচ্ছে, অতি প্রাচীনকাল থেকে বহু লোকজন নানা দূরদেশ থেকে এখানে এসে এই স্থানে সুপবিত্র বাক্কা দর্শনার্থে সম্মিলিত হয়ে থাকেন বলে একে মক্কা বা বক্কা বলে।

অপর আরব পণ্ডিতগণের মতে হযরত আদমের বহু পূর্ব থেকেই মক্কা ঈশ্বরানুগত পুণ্যভূমি ছিল। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে এই প্রান্তরে অবস্থিত পর্বত চূড়ায় ঈশ্বরের পূজা ও প্রার্থনার জন্য মাঝে মধ্যে লোকজনের সমাগম হতো, আবার কাজ শেষে তারা সকলেই স্থান ত্যাগ করতো। এভাবে মক্কা বহুকাল যাবৎ নির্জন এলাকা হিসেবে নিপতিত ছিল। এর পরের অবস্থা বর্ণনা করে লেখক চারুচন্দ্র মিত্র বলেন :

> এইরূপ বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মহাত্মা আদম হইতে বিংশতি পুরুষে স্বনামধন্য হজরৎ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর আবির্ভাব হয়। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম ছিল বিবী সারা। বিবী সারার সন্তান সন্ততি না হওয়ায় তিনি পতি-প্রবরকে স্বীয় মিসরীয় দাসী বিবী হাজেরাতে উপগত হইয়া সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে হজরৎ ইব্রাহিমের ঔরষে এবং বিবী হাজেরার গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ইস্মাইলের জন্ম হয়। হজরৎ ইব্রাহিম বিবী সারার একান্ত অনুরাগী থাকিলেও বর্ত্তমান পুত্র বাৎসল্যে হজরৎ ইস্মাইল ও বিবী হাজরোর প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।[২]

এমতাবস্থায় পরবর্তীকালে আমরা লেখকের বর্ণনায় দেখি, সন্তানহীনা বিবি সারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পুত্রসহ সতিন হাজেরা বিবিকে নির্বাসনের জন্য হজরত ইব্রাহিমকে (আ.) বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। হজরত ইব্রাহিম (আ.) নবজাতক পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী বিবি সারার অনুরোধ উপেক্ষা

---

১ চারুচন্দ্র মিত্র, 'মক্কা বৃত্তান্ত', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৮, পৃ.৮৭
২ 'মক্কা বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত,ম পৃ.৮৮

করতে পারেননি। কারণ বিবি সারা তাঁর অন্তরকে একান্ত অধিকার করে রেখেছিলেন। অগত্যা তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পুত্রের সঙ্গে হাজেরা বিবিকে এই কন্টকাকীর্ণ নির্জন প্রান্তরে পরিত্যাগ করেছিলেন।[১] হজরত সারার অনুরোধে হজরত হাজেরাকে অনুর্বর উপত্যকায় ফেলে আসার ঘটনা সঠিক নয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.) খোদাতাআলার আদেশে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে মক্কায় রেখে আসেন, যা ভবিষ্যতের অসীম কল্যাণের জন্যই করেছিলেন। তাঁদের পরিত্যাগের সময় কিছু খাদ্য ও পানীয় জল দিয়ে গিয়েছিলেন। একপর্যায়ে পানীয় জল নিঃশেষ হয়ে গেলে শিশু জলাভাবে তৃষ্ণায় অধীর হয়ে কাঁদতে থাকে। বিবি হাজেরা ব্যস্ততা সহকারে জলান্বেষণে বের হয়ে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাথরের কাছে বারবার যাতায়াত করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো স্থানে পানির চিহ্ন লক্ষ না করায় পানি প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হয়ে শোকার্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতন হওয়ার পর্যায়ে পুত্রের দিকে পিঠ রেখে কিছুদূরে বসেছিলেন। খাবার পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত ছেলের মৃত্যু সচক্ষে দেখতে অক্ষম হয়ে এইরূপে বসে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাতরস্বরে অনন্যমনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। নি:সহায় তৃষ্ণার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ এবং শোকার্ত মায়ের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা কাতর প্রার্থনা আল্লাহর নিকট পৌঁছাল। মাতা-পুত্রের কান্না দেখে কে যেন বিবি হাজেরার কানের কাছে বললো যে, বিবি হাজেরা, ওঠো, দ্রুত পুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে শিশুকে কোলে তুলে নাও, তোমার সমস্ত দু:খ দূর হবে। একথা শুনে বিবি হাজেরা তৎক্ষণাৎ দ্রুত পায়ে সন্তানের নিকট যেয়ে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার লক্ষ করে বিমোহিত হলেন।[২] এ-প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

> যে স্থানে শায়িত তনয়ের পদদ্বয় ছিল, শিশু তৃষ্ণার্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তথায় পদাঘাত করায়, মতান্তরে ফেরেশতার পদাঘাতে একটা সুশীতল-নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিণী উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে বারি-স্রোত প্রবহন করিতেছে। সন্তপাজননী "ঈশ্বর তুমিই ধন্য" এই কথা বলিয়া প্রাণধিক কুমারকে বক্ষে ধারণপূর্বক প্রথমে তাহাকে জলপান করাইলেন, পরে নিজে জলপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং চক্রাকার মৃৎবন্ধনী দ্বারা নির্ঝরিণীর জলের গতি "জেম্ জেম" বলিয়া রোধ করায় উহা একটি কূপে পরিণত হইল।[৩]

মিসরীয় ভাষায় 'জেম' শব্দের অর্থ 'তিষ্ঠ' অর্থাৎ 'থাক বা 'থাকুক' বোঝায়। অর্থাৎ 'থাক থাক' এই কথা বলে তার পানির গতি রোধ করায় ঐ কূপ 'জেম জেম' বা 'জম জম' নামেই অভিহিত হয়ে আসছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

এরকম অবস্থায় বিবি হাজেরা পুত্রের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। ইব্রাহিম (আ.) মাঝে মধ্যে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতেন এবং তাঁদের খাবার-দাবার দিয়ে যেতেন। এভাবে মাতা-পুত্রের জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো। লেখক বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বা আদি পুস্তকে এই ঘটনা কীভাবে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করে বলেন :

> বিবী হাজেরার নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত মুসা বর্ণিত জেনেসিস বা আদি পুস্তকে যেরূপভাবে লিখিত আছে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদিগের অনুমান হয়। যাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত উক্ত পুস্তকের ষোড়শ, সপ্তদশ ও একবিংশ অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ণনায় অসামঞ্জস্য ওপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ... যুক্তির দ্বারা ঘটনার অসামঞ্জস্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহারা সামঞ্জস্য সংস্থাপনের অক্ষম হইয়া,

---

১ হযরত মোহাম্মদ স.-এর জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২ 'মক্কা বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

> আমাদিগের উপরে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন সুতরাং বাইবেলে বর্ণিত বিবরণ ভ্রমাত্মক বলিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছে।[১]

লেখক এ বিষয়ে 'জেনেসিস' ও 'বাইবেলে' বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহকে ত্রুটিপূর্ণ বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন। এই ভুলগুলি নিয়ে লেখক নিজের "কোর্ব্বানী বিবরণ বা ঈদুজ্জোহাপর্ব্ব" প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখেছেন বলে আমাদের জানান।

পুত্রসহ 'জেম্ জেম্' (জম জম) উৎসের নিকট বিবি হাজেরার অবস্থানকালে একদা ইয়েমেন প্রদেশের 'জরহাম' বংশীয় কয়েকজন বণিক সেই প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পানীয় জলের খোঁজে 'জেম্ জেম্' এর (জম জম) নিকট উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, পরম রূপবতী এক মহিলা এক সুন্দর বালকসহ তাঁর পাশে বসে আছেন। তাঁরা এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং অগ্রসর হয়ে হাজেরা বিবিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, যে তিনি দেবী না মানবী ? এই নির্জন প্রান্তরে তিনি কীভাবে এলেন ? এটি শুনে বিবি হাজেরা আত্মবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে তাঁদের নিকট বর্ণনা করলেন। আগন্তুকগণ জম জমের শীতল পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। এই স্থানটি তাঁদের নিকট মনোরম বোধ হওয়ায় তাঁরা হাজেরা বিবির নিকট এই প্রস্তাব করলেন যে, যদি তিনি অনুমতি করেন, তাহলে তাঁরা সপরিবারে এখানে এসে বসবাস করবেন। তিনি উত্তরে বললেন, তাঁর কোনো আপত্তি নেই, তবে জম জম উৎসে আমার পুত্র ইসমাইলের স্বত্বাধিকার থাকবে। বিবি হাজেরার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বণিকগণ দেশে গমন করে সপরিবারে সমভিব্যাহারে সেখানে পুনরায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন।

সেকালে উক্ত জরহামদিগের সাথে 'কাতুরা' নামক আর এক শ্রেণির লোক সেখানে এসেছিলেন, তাঁরা সেখানকার নিম্নভূমিতে বাসস্থান নির্মাণ করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন। এভাবে নির্জন প্রান্তর ক্রমশ মানুষের আগমনে জনাকীর্ণ হয়ে বর্তমান মক্কা মহানগরীতে পরিণত হয়েছিল। লেখক আরবের বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অতঃপর এ বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> জরহামদিগের নেতার নাম মোদাদ ও কাতুরাদিগের নেতার নাম সমিদা ছিল। পাঠক পাঠিকাগণ স্মরণ রাখিবেন যে, এই জরহাম বংশের সহিত আরব দেশীয় আদিম জরহাম শ্রেণীর কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী।[২]

এই অভ্যাগত 'জরহাম'দের সঙ্গে একস্থানে বসবাস করায় ক্রমশ হাজেরা বিবির অনুগতের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তার এক পর্যায়ে জরহাম-দলপতি মোদাদের কন্যার সঙ্গে পুত্র ইসমাইলের বিয়ে দিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

হজরত ইসমাইলের (আ.) দুই বিয়ে হয়েছিল এবং দুই বিয়েই উক্ত 'জরহাম' বংশীয় কন্যার সঙ্গে হয়েছিল বলে লেখক উল্লেখ করেন। তবে হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর ইচ্ছায় পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.) প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে পরবর্তী কুমারী কন্যার সঙ্গে বিয়ে করেন, এ কথা জানিয়েছেন গবেষক শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)। তবে কোন এক মিসরীয় কন্যার সঙ্গে হজরত ইসমাইলের বিয়ে নিয়ে যে মত

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

প্রচলিত আছে, তা সমীচীন নয় বলে লেখক চারুচন্দ্র মিত্র বলেন। ইব্রাহিমের বংশধরদের ভাষা নিয়ে লেখক বলেন :

> প্রথমাবস্থায় ইসমাইলের ভাষা হিব্রু ছিল, কারণ তাঁহার পিতা ইব্রাহিম ইবিরীয় ও তাঁহার মাতা হাজেরা বিবী মিসরীয় ছিলেন। সুতরাং কি পিতা, কি মাতা কোন পক্ষেই আরবী ভাষার সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল না। পরে জরহাম বংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা হওয়ায় তিনি আরবী ভাষা ও রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া আরবীয় সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিলেন।[১]

বিবি সারার গর্ভে পরবর্তীতে হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর যে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম ইসহাক। ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ হজরত ইসহাকের (আ.) বংশীয় এবং আরবগণ হজরত ইসমাইলের (আ.) বংশীয়।[২] মক্কা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ কোরাইশ বংশ হজরত ইসমাইল (আ.) থেকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই বংশে প্রাতঃস্মরণীয় হজরত মোহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এই মক্কা নগরীতে ইসলাম ধর্মের উপাসনার কেন্দ্রস্থল কাবা শরিফ প্রতিষ্ঠিত আছে, লেখক যাকে 'সুপবিত্র কা-আবা মন্দির'[৩] বলেছেন। হজরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আ.) কর্তৃক এই উপাসনালয়ের আবিষ্কার হয়েছিল। এটি বর্তমান কাবা বা মসজিদ-উল-হারাম নামে প্রসিদ্ধ। মক্কা নগরীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মোহাম্মদের (সা.) পূর্ববর্তী ইসলামের ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য এ-প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় চারুচন্দ্র মিত্রের (১৮৭৯-১৯৪৩) ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ 'খেলাফৎ বিবরণ' প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে খলিফা, ইমামের সংজ্ঞা, চার খলিফার সময়কালের মূল ঘটনা, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ এবং পরিস্থিতি বিচার ও সমকালীন অবস্থার সঙ্গে তুলনা চমৎকার মনোজ্ঞ ও সাবলীল ভাষায় লেখক তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের শুরুতে খলিফা ও ইমামের পার্থক্য, ইসলামে তাঁদের ভূমিকা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তা তুলে ধরেন চারুচন্দ্র মিত্র :

> ইসলাম ধর্ম্ম-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরুগণকে যেমন ইমাম উপাধিতে ভূষিত করা হইত সেইরূপ ইসলাম রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজ-শক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণকে খলিফা নামে সম্মানিত করা হইত। আরবীয় অধ্যাপকগণ যেরূপ খলিফা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহাতে বুঝা যায় উহার অর্থ উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ হজরৎ মোহাম্মদের তিরোভাবের পর হইতে পারম্পর্য্যক্রমে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সর্ব্বপ্রধান ইসলাম রাজ-শক্তি ও ধর্ম্মাচার্য্য-শক্তির যাহাঁরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহারাই খলিফা নামে অভিহিত হইবেন।[৪]

যিনি ইসলাম জগতের খলিফা-পদে আসীন হন, তাঁকে ভোগবিলাস দূরে রেখে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে জীবন-যাপনের মূল শর্ত পালন করতে হয়। ইসলাম ধর্মের বিধানানুসারে বিয়ে-সংসার-সন্তান নির্বাহ করবার অধিকার থাকলেও কোন রূপ বিলাস-ব্যসনের অধিকার খলিফাদের মোটেই নেই। ইসলাম ধর্ম-রাজ্য বা ইসলামি রাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত ধন-দৌলত সযত্নে রক্ষা করবেন এবং তার উপযুক্ত সৎব্যবহারের জন্য সচেষ্ট থাকবেন, এই ছিল খলিফার মূল দায়িত্ব। খলিফার নিজ সংসার পরিচালনার জন্য তিনি উপযুক্ত মাসোহারা,

---

১ হযরত মোহাম্মদ স.-এর জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ও ২৫

৩ 'মক্কা বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪ চারুচন্দ্র মিত্র, 'খেলাফৎ বিবরণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ১৯২

বৃত্তি বা হাদিয়া পাবেন মাত্র, এছাড়া রাজভাণ্ডারের ধন-সম্পত্তিতে তাঁর বৈধ অধিকার নেই। রাষ্ট্রে জনহিতকর বিধানসমূহ প্রবর্তন করে একজন খলিফার সুশাসনের মাধ্যমে প্রজাপালন করতেও দায়বদ্ধ থাকতে হয়।[১] খলিফাদের নিয়ে এই বক্তব্যের সূত্র ধরে পাঠকদের উদ্দেশে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র লেখক চারুচন্দ্র মিত্র বলেন :

> চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ইসলামীয় খেলাফৎ অর্থাৎ ধর্ম্ম-বাক্যের খলিফাগণের স্কন্ধে কিরূপ গুরুভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। এই খলিফা-রাজত্ব প্রজাতন্ত্র রাজত্বের রূপান্তর মাত্র। কারণ বংশ পারম্পর্য্যে খলিফাধিকার আদৌ প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহা নির্ব্বাচনের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। প্রথম খলিফা চতুষ্টয় এইরূপেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে পঞ্চম খলিফা খেলাফতী পরিত্যাগ করিলে ইসলাম ধর্ম্মরাজ্য নামে খেলাফত থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে সলতনতে পরিণত হইয়াছিল।[২]

এই পঞ্চম খলিফা বলতে মু'য়াবিয়াকে বোঝানো হয়েছে, যিনি আলীর 'খেলাফত' কালীন সময়ের ভিতরই নিজেকে মুসলিম বিশ্বের একাংশের খলিফা দাবি করেন। হিজরি চল্লিশ (৬৬০ খ্রিস্টাব্দ) সাল মূল খলিফা আলীর পক্ষে ছিল মারাত্মক একটি বৎসর। এই সময়েই মুসলিম রাষ্ট্রে একই সঙ্গে দুইটি 'খেলাফতে'র অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমদিকে দুটি গোত্র উমাইয়া ও হাশিমীদের মধ্যে কলহ সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে তা 'খেলাফত'-লাভের জন্য এক সাধারণ অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। সিফফীনের যুদ্ধের (৬৫৭ খ্রি.) পর থেকেই যে প্রশ্ন 'খেলাফত'কে আলোড়িত করতে থাকে, তা হলো মুসলিম শক্তির কেন্দ্র হবে কোথায়, কুফায় (ইরাকে) না দামেস্ক (সিরিয়া) না অন্য কোথাও ? শেষ পর্যন্ত দামেস্কেই 'খেলাফতে'র কেন্দ্রে পরিণত হয়। আলীর মৃত্যুর (২৪ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গেই প্রাথমিক যুগের 'খেলাফতে'র অবসান ঘটে এবং মুসলমানদের শাসনভার উমাইয়া বংশের মুয়াবিয়ার দখলে চলে যায়।[৩] তখন নামে 'খেলাফত' থাকলেও তা 'খেলাফতে'র মূল আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল তা বলাই বাহুল্য বরং পর্যায়ক্রমে তা রাজা বা সুলতানের শাসনে পরিণত হয়, তা-ই লেখক বলতে চেয়েছেন। লেখকের ভাষায়, তারপর থেকেই "খলিফা ও এমামগণের জন্য কুচক্রিগণের সুতীক্ষ্ণ ছোরা ও কালকূট সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।"[৪]

মোহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফতে'র রাজধানী সর্বপ্রথম মদিনায় স্থাপিত হয়েছিল। চতুর্থ খলিফা 'বীর-কেশরী' আলীর 'খেলাফতে'র শেষভাগে তা কুফা নগরে স্থানান্তরিত হয়। গুপ্তঘাতকের হাতে আলী ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান মুসলিম রাজ্যের খলিফা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।তবে খিলাফতের অন্যতম দাবিদার মুয়াবিয়ার জন্য তিনি পাঁচ-ছয়মাস 'গৌরবহীনভাবে' 'খেলাফত' চালানোর পর তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হাসান খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেও সমঝোতা করে তিনি সে পদ ত্যাগ করেন এই শর্তে যে, মুয়াবিয়ার পর তিনি খলিফা পদে আসীন হবেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর মুয়াবিয়া বিজয়ী বেশে কুফায় অবস্থানের পাশাপাশি ইসলামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। দামেস্কে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় হাসান মদিনায় এসে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে থাকেন। আট বছর পর তাঁর এক স্ত্রী তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। সম্ভবত এর পিছনে মুয়াবিয়ার কোনো

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত
৩ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১
৪ খেলাফত বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

হাত ছিল না বলে এক গবেষক বলেন।[১] মদিনায় থাকাকালীন হাসান 'ইমাম' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে সেটাকে সম্মানীয় পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। লেখক চারুচন্দ্র মিত্র এতদ্বিষয়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় লেখেন:

> খলিফা-পদ পরিত্যাগ করত : তিনি ইসলাম জগতের এমাম পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পোপ যেমন প্রধান ধর্ম্মগুরু সেইরূপ ইসলাম ধর্ম্ম-জগতে এমাম সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন।[২]

হাসানের হাত থেকে মুয়াবিয়ার খেলাফত লাভের পর তিনি কার্যত খেলাফতকে 'সালতানাত' অর্থাৎ 'সাম্রাজ্যে' পরিণত করেন। নামে খলিফা থাকলেও পরবর্তীকালের খলিফাগণ সম্রাটের ন্যায় বিলাসব্যসনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলে লেখক বলেন।[৩]

ইতিহাসে বংশীয় ধারাক্রম অনুযায়ী পরবর্তী শাসনকাল উমাইয়া খেলাফত, আব্বাসীয় খেলাফত নামে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম হাসানের পরবর্তীকালে মুয়াবিয়ার সময়কালে 'খেলাফত' 'উমাইয়া খেলাফত' নামে পরিচিতি পায়। মহানবীর (সা.) মূল শাসনতান্ত্রিক আদর্শ থেকে ক্রমবিচ্যুতি প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র মিত্র বলেন :

> সুতরাং এই সময় হইতে হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র-মূলক ধর্ম্ম-রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দামেস্ক নগরের খলিফাগণকে উম্মীয় বংশীয় খলিফা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।[৪]

৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দামেস্কে উমাইয়া (লেখকের ভাষায় 'উম্মীয়') 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তা আব্বাস বংশের হস্তগত হলে এই বংশের দ্বিতীয় খলিফা 'সম্রাট' আল মনসুর (৭১৪-৭৭৫ খ্রি.) দামেস্ক থেকে বাগদাদ মহানগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। বাগদাদের খলিফাদেরকে 'আব্বাসীয় খলিফা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই নগরে বহুকাল (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) খেলাফতের রাজধানী অবস্থিত ছিল।[৫]

হজরত মোহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পর হিজরি একাদশ অব্দে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা পদে নির্বাচিত হন। ইনিই নবীজির স্ত্রী বিবি আয়েশার পিতা ছিলেন। আবু বকর দুই বৎসর তিন মাস দশ দিন যাবৎ খলিফা পদের দায়িত্বে থেকে তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর দুই বছর পর তিনিই সর্বপ্রথম কোরান শরীফের সুরাসমূহ একত্রিত করতঃ সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর কবরস্থানের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সময়ে খেলাফতের রাজধানী মদিনাতে ছিল।[৬]

কোরান শরীফ কীভাবে খলিফাদের আমলে সংরক্ষিত হয়েছিল, তা লেখক চারুচন্দ্র মিত্র খলিফাদের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের ভেতরই উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু বকর (রা.) কোরানের সুরাসমূহ একত্র করেছিলেন, সেটি আবার হজরত উমরের (রা.) সময় পেটিকাবদ্ধ করে হজরত মোহাম্মদের (সা.)

---

১ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
২ খেলাফৎ বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৩ প্রাগুক্ত
৪ প্রাগুক্ত
৫ প্রাগুক্ত
৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

স্ত্রী বিবি হাফসার নিকট রেখেছিলেন। খলিফা উমর (রা.) দশ বৎসর আট মাস চারদিন খলিফা ছিলেন। তাঁর সময়ে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল, ইতিহাসের এই সত্য লেখক চারুচন্দ্র মিত্র উল্লেখও করেছেন। হিজরি ত্রয়োবিংশত অব্দের শেষ ভাগে প্রার্থনারত অবস্থায় 'ফিরোজী' নামক এক গুপ্তঘাতকের হাতে উমর নিহত হয়েছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর নিহত হওয়ার পর হজরত উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্যান্য যত বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ও কাজ করুন না কেন, কোরান শরীফ সংরক্ষণের জন্য তিনি যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন। এতদ্বিষয়ে কোরান সংরক্ষণের জন্য তাঁর সুনিপুণ ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক চারুচন্দ্র মিত্র লেখেন :

> ইনি (ওসমান) খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া দেখিতেছিলেন যে হজরত মোহাম্মদের প্রচারিত মূল কোরআন শরীফ পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে তিনি বিবি হাফজার পেটিকায় সংরক্ষিত কোরআন শরীফ অবলম্বনে তাহা বিশুদ্ধভাবে সঙ্কলনপূর্বক উপযুক্ত লোক দ্বারা তাহার সাতখানি অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া সমস্ত মুসলমান রাজ্যে প্রেরণ করিয়অছিলেন এবং প্রচলিত প্রমাদপূর্ণ কোরআন সমূহে সংগ্রহ করতঃ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ সংকলন করায় ইনি 'জামেউল কোরআন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[১]

একজন গবেষক যথার্থই বলেছেন, 'তিনিই প্রথম (উসমান) ছিলেন যিনি পবিত্র কোরানের মূল একটি পাঠে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।'[২] তৃতীয় খলিফা উসমান নিহত হলে আলি ইসলাম ধর্মরাজ্যের খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সুস্থিরচিত্তে খেলাফত পরিচালনা করতে পারেননি। কারণ, সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রবল শত্রু দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। লেখক চারুচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিবি আয়েশা, তালহা, জোবায়ের এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া সর্বপ্রধান ছিলেন। হজরত মোহাম্মদের (সা.) প্রিয়তমা কন্যা বিবি ফাতেমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিবি আয়েশা কখনোই সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরে হজরত মোহাম্মদের (সা.) তিরোভাবের পর তিনি প্রকাশ্যভাবেই শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[৩]

আলির 'খেলাফত'কালে কোরাইশ বংশের দুই প্রধান তালহা এবং জুবায়েরকে কুফা (বাগদাদের ১৭০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত) এবং বসরার (ইরাকের ২য় বৃহত্তম শহর) শাসনকর্তৃত্ব দিতে অস্বীকার করায় আলির সঙ্গে ঘোর বিদ্বেষ ও শত্রুতা তৈরি হয়। আলির প্রতি আবু বকরের কন্যা আয়েশা বিদ্বেষ পোষণ করতেন বলে তিনি 'অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' দেয়ার মতো তালহা-জুবায়েরকে সমর্থন করলেন। তালহা-জুবায়ের তাঁদের আনুগত্যের শপথ বিস্মৃত হয়ে প্রথমে মক্কায় এবং পরে ইরাকে চলে যান। নবী পত্নী আয়েশাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বিদ্রোহীদল খলিফাকে আক্রমণ করবার উদ্দেশে এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। আলি তাঁদেরকে আত্মকলহ নিবৃত্ত করার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ফলে তাঁদের মধ্যে খুরায়রা নামক স্থানে এক অনিবার্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে তালহা ও

---

১ প্রাগুক্ত

২ আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতি, *খলিফাদের ইতিহাস: তারিখুল খুলাফা*, এম. মনিরুজ্জামান ভাষান্তরিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা বইমেলা ২০০০, পৃ. ১৯৯

৩ খেলাফৎ বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

জুবায়ের নিহত হন এবং আয়েশা বন্দি হন। পরে বিশেষ বিবেচনায় আয়েশাকে সম্মানের সঙ্গে মদিনায় পাঠানো হয়।[১] এই ঘটনা ও যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেন:

> বসোরার নিকটবর্ত্তী খোবাইল নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ বিবি আয়েশা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহনপূর্ব্বক হজরৎ আলির বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত যুদ্ধে ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক "উষ্ট্র সমর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে তালহা ও জোবায়ের নিহত এবং বিবি আয়েশা বন্দিনী হন। কিন্তু মহাত্মা আলি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নাই। মাত্র তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করতঃ বিদায় দিয়াছিলেন।[২]

তবে মোহাম্মদ নামে আয়েশার এক ভাই এরপর আয়শাকে বহুসংখ্যক মহিলা ও পুরুষ রক্ষীদ্বারা পরিবেষ্টন করে নিজ ঘরে এনেছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।[৩] কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, জুবায়ের অবস্থা বেগতিক দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকালে নিহত হন এবং তালহা এক তীরের আঘাতে প্রাণ হারান। নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহীদের একাংশ পলায়ন করলে আয়েশার নেতৃত্বে পুনরায় যুদ্ধ চলতে থাকে। তাঁরা (বিদ্রোহীরা) পথের মধ্যে আয়েশা সিদ্দিকাকে উটের পিঠে দেখতে পায়। আয়েশার বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকলে তাঁর ভাই মোহাম্মদ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন বলে উক্ত গবেষক উল্লেখ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৪]

মুয়াবিয়া প্রথমে আলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমঝোতা-যুদ্ধে যেমন জড়ান পরবর্তীকালে আলিপুত্র ইমাম হাসানের সঙ্গেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। আলির ভেতর সমঝোতামূলক মনোভাব সবসময় কার্যকর ছিল, মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে সেটি তাঁর গুরুদায়িত্বের পর্যায়েও পড়ে। তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু সমূলে শত্রু নিধন করতে হবে, এরকম বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল না। তাঁর ও মোয়াবিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে 'খারিজী' নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। লেখকের মতে :

> মাবিয়ার সাহিত প্রথম যুদ্ধে আলি শত্রুগণকে এককালে ধ্বংস না করায় এবং মধ্যস্থ নিযুক্ত কারিয়া মীমাংসায় সম্মত হওয়ায় তাঁহার পক্ষীয় দ্বাদশ সহস্র অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরে অষ্ট সহস্র লোক পুনরায় তাঁহার দলবদ্ধ হইয়াছিল। অবশিষ্ট চারি সহস্র লোক নহরেওয়ান প্রদেশে গমণপূর্বক তদ্দেশবাসিদের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদিগকেই খারিজী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।
>
> নহরেওয়ান প্রদেশে খারিজিদিগের অত্যাচারের সংবাদ অবগত হইয়া হজরৎ আলি সসৈন্যেও তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক ধ্বংস করিয়াছিলেন। মাত্র নয়জন পলায়ন করিয়াছিল।[৫]

---

১ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২ 'খেলাফৎ বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩ প্রাগুক্ত
৪ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৫ 'খেলাফৎ বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

খারিজিদের আচার-ব্যবহার সেকালে এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, খলিফা আলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদেরকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হলেও অল্প কয়েকজন আর-বাহ্‌রায়ন ও আল আহ্‌সায় পালিয়ে রক্ষা পেলো। এখানে তারা ধর্মোন্মত্ত খারিজী দলের ভিত্তি স্থাপন করলো এবং তারা বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে রক্তাক্ত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো।[১]

চারুচন্দ্র মিত্র আলোচনার এ পর্যায়ে হজরত আলির চারিত্রবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মহানবীর (সা.) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং পরবর্তীকালে শিয়া মতের উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা করেন।

আলি নিরতিশয় পরার্থপরায়ণ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদারতা ও ত্যাগ স্বীকার তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তাঁর চরিত্রে কখনোই কোনোরূপ বিকৃতভাব লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে খুব বিনয়ী হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দান্ত প্রতাপশালী ছিলেন। সেকালে তাঁর মতো রণ-কুশলী সেনাপতি আর দ্বিতীয় ছিল না বললেও চলে। একথার পাশাপাশি লেখক আরো বলেন :

> রণ-ক্ষেত্র তাঁহার অমিত পরাক্রম দৃষ্টে ইসলাম সম্প্রদায়ের জনসাধারণ অতীব বিস্মিত হইয়া তাহাকে “বীর কেশরী” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।[২]

তিনি হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর বংশসম্ভূত নিকটাত্মীয় ছিলেন। সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই হলেও দশবৎসর বয়স থেকে তাঁর পুত্রতুল্য ও শিষ্য হিসেবে একই সংসারে প্রতিপালিত হন। তিনি মহানবীকে পিতার মত ভক্তি করতেন এবং আজীবন ছায়ারূপে তাঁকে অনুসরণ এবং সব কাজেই তাঁর ডান হাতের মতো ছিলেন। নবীজির জন্য আলি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। লেখক এ-প্রসঙ্গে বলেন:

> মহাত্মা আলীর অসাধারণ চরিত্রগুণে প্রীত হইয়া হজরৎ মোহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রাণাধিক্য গুণবতী ও রূপবতী দুহিতা বিবি ফাতেমাকে তাঁহার করে সমর্পণ পূর্বক নবদম্পত্তিকে পুত্র ও কন্যা জ্ঞানে সস্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন।[৩]

এসব কারণেই মহানবীর প্রতিষ্ঠিত ‘খেলাফতে’ সর্বাগ্রে আলির ন্যায্য অধিকার ছিল বলে মনে করা হয়। তৎকালে এরকম ধারণা করা বহুলোকের খুব স্বাভাবিক ছিল। ‘খেলাফতে’র মনোনয়ন প্রশ্নে আলি নিজে কখনই এরকম আগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে পোষণ বা প্রকাশ করেননি। যদিও তাঁর অনুসারীদের একাংশ ভক্তির অন্ধতাবশত আলিকেই মহানবী (সা.) এর ‘খেলাফতে’র পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন, যাকে কিনা আবু বকর, উমর, উসমান এর পরে ‘খেলাফত’ লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আলির অনুসারীদের ভিতর থেকে শিয়া মতের উদ্ভব হয়েছিল, যাঁরা মনে করে আলীই যথার্থ উত্তরাধীকারী। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের বিবেচনায় আবু বকর, উমর, উসমানের ‘খেলাফত’ মূল্যহীন। শিয়াদের মতে, ‘খেলাফত’ ও ইমামতি নবীর বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান থাকবে।[৪] চারুচন্দ্র মিত্রের মতে :

> এ জন্যই শিয়া সম্প্রদায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়কে অন্যায়াধিকারী বিবেচনায় তাহাদিগের খলিফাত্ব স্বীকার করেন না। হজরৎ আবুবকরের খলিফা পদ প্রাপ্তির সময়ে হজরৎ আলি যদি কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তি

---

১ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২ ‘খেলাফৎ বিবরণ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৩ প্রাগুক্ত
৪ *হিস্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

উত্থাপন করিতেন তাহা হইলে হয়ত তৎকালেই খেলাফত লইয়া ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কিন্তু চরিত্রগত ত্যাগাতিশয্য হেতু তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন। কোন কোন লোকে তাঁহাকে উত্তেজনাপূর্ণ পরামর্শ দিলেও তিনি তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। পরে হজরৎ ওমর ও হজরৎ ওসমান ক্রমান্বয়ে খলিফা পদে নিযুক্ত হওয়ার কালেও তিনি নীরব ছিলেন। কারণ উক্ত খলিফাদ্বয় বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং আত্মত্যাগে তিনি বৃদ্ধের সম্মান রক্ষা করেছিলেন।[১]

পরবর্তীকালে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি নানাবিধ সংকটের মধ্য দিয়ে 'খেলাফত'কাল অতিক্রম করেন। তার ভেতর মোয়াবিয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্যতম। লেখক চারুচন্দ্র মনে করেন, মোয়াবিয়া প্রেরিত গুপ্তঘাতকের হাতে আলি নিহত হন,[২] তবে এ তথ্য সব ঐতিহাসিক দ্বারা সমর্থিত নয়। তবে আলির হত্যাকাণ্ড খারিজিদের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার পক্ষে মতটাই বেশি জোরালো বলে লক্ষ্য করা যায়। খারিজিগণ শপথ গ্রহণ করে, একই দিনে কুফা, দামেশক এবং ফুসতাতের মসজিদে নামাজ পড়ার সময় আলি, মুয়াবিয়া এবং আমরকে (যার পরবর্তী খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা) হত্যা করবে। আমর সেদিন অসুস্থ থাকায় নামাজে যোগদান করতে না পারায় রক্ষা পেলেন। মোয়াবিয়া আহত হলেন কিন্তু চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। এদিকে খলিফা আলির জন্য কয়েকজন লোক মসজিদের দরজায় অপেক্ষা করছিল, তিনি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন খলিফার প্রতি তরবারি নিক্ষেপ করল। কিন্তু তরবারি মসজিদের দরজার কাঠে বাধা পেলো। এরপর ইবনে মুলজাম নামক এক ব্যক্তি খলিফার মাথায় ভীষণভাবে আঘাত করেন। হত্যাকারীকে বন্দী করা হয়। মৃত্যুপথযাত্রী খলিফাকে সকলে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হাসান তার খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবে কী না। নির্বাচনে বিশ্বাসী খলিফা জনসাধারণকে এটি বিবেচনা করতে বলে হাসান এবং হোসেনকে তাঁর কাছে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে কনিষ্ট পুত্র হানিফার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বললেন। অতঃপর আলীর মৃত্যু হলো ২৪ জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে।[৩] লেখক চারুচন্দ্র মিত্রও আলীর শোচনীয় তিরোভাবের পর সাধারণের সম্মতিক্রমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা হাসান খলিফা পদে নির্বাচিত হন বলে লেখেন।[৪]

চারুচন্দ্র মিত্র প্রবন্ধের শুরুতে ইমাম হাসান প্রসঙ্গে 'খেলাফত' গ্রহণ এবং ত্যাগ নিয়ে কিছু কথা লিখেছিলেন, তা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে হাসানকে নিয়ে তাঁর জীবনের করুণ পরিণতি উল্লেখ করে লেখক জানান :

মহাত্মা হাসান খলিফা ত্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে লইয়া সপরিবারে কুফা হইতে মদিনায় যাইয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় তিনি ইসলামের ধর্ম্মসমাজের এমাম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অল্পকালের মধ্যেই মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে তাঁহাক অকালে নিহত হইতে হইয়াছিল।[৫]

১ 'খেলাফত বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭
২ প্রাগুক্ত
৩ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১
৪ 'খেলাফৎ বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

ম্যাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের প্ররোচনায় হাসান বিষপ্রয়োগে নিহত হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন। কথিত আছে, তাঁর এক স্ত্রী কর্তৃক বিষপ্রয়োগে তিনি নিহত হন কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে স্থির নিশ্চিত নন বলে তিনি তাঁর হত্যাকারীর নাম বলতে অস্বীকার করেন।[১] হাসানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর 'খেলাফত' লাভের সম্ভাবনার অধ্যায় পুরোপুরি তিরোহিত হয়। লেখক বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, মাবিয়ার রাজত্বকাল থেকে 'খেলাফত' 'সালতানাতে' পরিণত হয়েছিল। এতদ্বিষয়ে মুসলিম বিশ্বে মোহাম্মদ (সা.)-পরবর্তী খেলাফতের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বলেন :

> আমাদিগের অনুমান হয় যে, ইসলাম ধর্ম্ম জগতের পরবর্ত্তী নেতৃবৃন্দ যদি স্বার্থ, ঈর্ষা ও নৃশংসতার বশবর্ত্তী না হইয়া হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে বজায় রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদের কখনই পতন হইত না। বরং অধুনা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ যেরূপ পার্থিব উন্নতির চরম চূড়ায় আবোহন করিয়াছেন। তাঁহারাও সেই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। এমন কি হয়ত সমগ্র ভূমণ্ডলে তাঁহাদেরই সার্ব্বভৌমিক তেজ প্রচারিত হইত। কিন্তু কালের কুটীলা গতিকে বাধা দিবার কাহারও সাধ্য নাই।[২]

এ কথা ঠিক, আবুবকর ও উমরের অধীনে রাজ্যবিস্তারের ঢেউ আরব গোষ্ঠীসমূহকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায়। যে মুহূর্তে পাশ্চাত্য জগৎ তাদের পদতলে অবনমিত হয়ে পড়লো, সেইক্ষণেপারস্পরিক বিদ্বেষ তাদের বিজয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো এবং পরিশেষে তাদের সাম্রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ হস্তচ্যুত হওয়ার পথে সহায়তা করলো।[৩] লেখক পরিশেষে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে পাশ্চাত্য কীরূপে বিশ্বের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করে শেষ করেন :

> এক্ষণে তাঁহাদেরই পরিত্যক্ত মূলমন্ত্র অবলম্বনে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ অমিত বলশালী হইয়াছেন। সংসারবিরাগী মহাত্মা ইসা এই শক্তিশালী বীজমন্ত্রের প্রবর্ত্তক নহেন; ইহা একেশ্বরবাদ প্রচারক সমাজ ও সাম্রাজ্য নির্ম্মাতা হজরৎ মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম নেতৃগণের অবিমৃশ্যকারিতায় সুচতুর ইসা শিষ্যগণ ইহাকে তাহাদের নিকট হইতে সমগ্র মানব জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন। ধন্য ইউরোপীয় ইসা শিষ্যগণ! তোমরাই ধন্য!! তোমাদের বুদ্ধি ও কৌশল ধন্য !!![৪]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় গোলাম মোস্তফার 'ভারতে মোসলেম নৌ-শক্তি' নামক চার পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক মধ্যযুগে সিন্ধুদেশে আরব অভিযান ও বাণিজ্যের প্রসারকালে মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষে নৌ-শক্তির পরিচয় বিধৃত করেছেন। দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় আরবরা নৌ-বিদ্যায় যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্পেন, পর্তুগাল-সহ সমদ্রতীরবর্তী দেশসমূহ নৌ-পথে বিজয়ে তাঁদের অবদানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবের রণতরী সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের সুদূর উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করে তাদের অভিযান পরিচালনা করতো বলে লেখক জানান। সিংহল থেকে ভেনিস পর্যন্ত জলপথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। লেখক ভারতে প্রথম আরব অভিযানের প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

---

১ মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
২ 'খেলাফৎ বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
৩ মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৪ 'খেলাফৎ বিবরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবেরা প্রথম সিন্ধুদেশ জয় করে। সিংহল হইতে একখানি জাহাজ নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে হেজাজের খলিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। উক্ত জাহাজ সিন্দুর উপকূল ভাগে কতিপয় জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। খলিফা সিন্ধুরাজের নিকট ইহার ক্ষতিপূরণ দাবী করেন, কিন্তু সিন্ধুরাজ তাহা দিতে অসম্মত হওয়ায় খলিফা মহম্মদ ইবনে কাসিমের অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করেন। কাসিম রণতরীর সাহায্যে সদলবলে দেওয়ান বন্দরে আসিয়া উপনীত হন। একখানি রণতরী এত প্রকাণ্ড ছিল যে, উহা চালাইবার জন্য ৫০০ লোক লস্করের প্রয়োজন হইত। সিন্ধুদেশের নদনদী পার হইবার জন্যও তাহাকে নৌ-সেতু নির্মাণ করিতে হইয়াছিল।[১]

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জলপথ অবারিত করা এবং প্রয়োজনে নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করার চিত্র মধ্যযুগের আরব শাসকদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। বাগদাদের খলিফাদের শাসনকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতির পিছনে বিভিন্ন অঞ্চলে নৌ-বন্দর স্থাপন অন্যতম একটি কারণ ছিল। তাদের মিসর জয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া এবং বসরা নগরী স্থাপন ইত্যাদি ঘটনাগুলি নৌ-শক্তি বৃদ্ধির কারণেই সম্ভব হয় বলে লেখক জানান। এই সময়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভৌগলিক ব্যক্তিত্ব মাসুদী (৮৯০-৯৫৬ খ্রি.) ভারত ভ্রমণ করেন। লেখক অনেক পর্যটক ও ভ্রমণকারীর সূত্র এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। লেখক ঐতিহাসিক ‘তবকাত-ই-আকবরী’র (রচনাকাল ১৫৯২-৯৩ খ্রি.) রচয়িতা নিজামুদ্দিন আহমদের (মৃত্যু: ১৫৯৪ খ্রি.) বর্ণনানুযায়ী সুলতান মাহমুদের (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) সময়কালে সামুদ্রিক যুদ্ধের বর্ণনা সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করেন। সুলতান মাহমুদের সপ্তদশ অভিযানের বর্ণনা নিজামুদ্দিন আহমদের ‘তবকাত-ই-আকবরী’র আলোকে লেখক এভাবে সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন :

সুলতান মাহমুদ যখন সসৈন্যে মূলতানে উপস্থিত হন, তখন তিনি ১৪০০ নৌকার এক বহর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। প্রত্যেক নৌকায় তিনটি করিয়া লোহার দণ্ড ছিল, একটি সম্মুখভাগ, দুইটি দুই পার্শ্বে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহা কিছু নৌকার সংস্পর্শে আসুক না কেন, তাহাই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক নৌকায় ২০ জন ধনুর্ব্বাহী সৈনিক (Archers) ছিল। এই উপায়ে সুলতান জাটদিগেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। জাটেরা এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত পরিবারবর্গ বিভিন্ন দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহারা ৪০০০ নৌকার (কাহারও মতে ৮০০০ হাজার) এক বহর প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাট্‌দিগের যে নৌকাই সুলতানের নৌকার সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল, তাহারাই উপরোক্ত বর্দ্ধিত লৌহদণ্ডের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে অধিকাংশ জাট্‌সেনা জলমগ্ন হইল, আর যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা তরবারির দ্বারা নিহত হইল।[২]

জাট্‌রা মূলত কৃষিভিত্তিক একটি সম্প্রদায়, হিন্দু, মুসলিম ও শিখ এই তিন ধর্মের লোকই আছে জাট্ গোষ্ঠীতে। জাট্‌দের শায়েস্তা করার জন্য সুলতান মাহমুদ শেষবার ভারত আক্রমণ করেন ১০২৭ সালে। জাট সম্প্রদায়কে কঠোরভাবে দমন করে তিনি গজনী ফিরে যান। মাহমুদ এরপর আর ভারতে আসে নি। অধিকাংশ জাটরা বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করে।

১ গোলাম মোস্তফা, ‘ভারতে মোসলেম নৌ-শক্তি’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২৩৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

আল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.), আবুল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১ খ্রি.), মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪ খ্রি.), ইবনে বতুতার (১৩০৪-১৩৬৯ খ্রি.) বর্ণনানুযায়ী ভারতের মুসলিম নৌ–শক্তির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন লেখক গোলাম মোস্তফা।

একাদশ শতাব্দীতে ভারতের সামুদ্রিক কার্যকুশলতা এবং শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় কথা বলেছেন আল-বিরুনী। লেখক আল-বিরুনীর তথ্যানুযায়ী নৌযানের বিবরণ লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> গুজরাট ও মালবার তৎকালে শিল্প বাণিজ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এখান হইতে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য এবং মনি-মুক্তা ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, রুম এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হইত। এই ব্যবসা পরিচালনা উদ্দেশ্যে জাঙ্ক (Junks) নামক এক প্রকার সুবৃহৎ জাহাজ ব্যবহৃত হইত। এই জাহাজ যখন পাল তুলিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া ধাবমান হইত, তখন ইহাকে পর্ব্বতের মত দেখাইত।[১]

সমুদ্রগামী জাহাজের শক্তি ও শৈলীর কথা আল-বিরুনীর বর্ণনাকে লেখক গোলাম মোস্তফা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই যুগে ভারত ভ্রমণকারী বিদেশি পরিব্রাজকদের মধ্যে দামেস্কের আবুল ফিদা ও ইটালির মার্কো পোলো বিখ্যাত ছিলেন। মার্কো পোলো জাহাজগুলির নির্মাণশৈলী ও প্রকারভেদ নিয়ে যা বলেছেন, সে সম্পর্কে লেখক গোলাম মোস্তফা সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> মার্কপলো ভারতীয় জাহাজ সমূহের নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ দেবদারু কাঠে প্রস্তুত হইত, দো-হারা তক্তা থাকিত এবংতাহার তলদেশে চূর্ণ এবং এক প্রকার গাছের তৈল দ্বারা (সম্ভবত : গাব গাছ) প্রস্তুত একরূপ মিশ্র উপাদান লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে তলদেশ খুব মজবুত থাকিত।[২]

নির্মাণপ্রণালি ছাড়াও জাহাজের আকৃতি, মেরামত ও পরিচালনা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। একটি জাহাজ চালাবার জন্য অন্তত ৩০০ জনের মত লোকবলের দরকার হতো বলে জানা যায়। লেখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে তৎকালীন ভারতে বিবিধ নৌ-অভিযান এবং মুসলিম শাসন ও যুদ্ধের প্রাক্কালে জলপথের অভিযান ও শক্তিকে মুসলিমদের নৌ–শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর এরকম একটি ঐতিহাসিক অভিযান লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় এভাবে তুলে ধরেন :

> ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে লক্ষণাবতীর বিরুদ্ধে সুলতান ফিরোজ শাহ দুইবার অভিযান করেন। এত্যেকবারই 'কিশ্‌তিহা-ই-বান্দকুশা' (বাঁধভঙ্গকারী জাহাজ) নামক জাহাজ ব্যবহৃত হয়। উক্ত জাহাজ সমূহে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য লইয়া তিনি 'একদালা' ও 'সোনার গাঁ' নামক দ্বীপদ্বয়ের সংলগ্ন নদীসমূহ পার হন। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে থাটা (Thata) অভিযানে তিনি সিন্ধুনদীর উপর দিয়া ৫০০০ নৌকার একবহরে ৯০০০০ অশ্বারোহী এবং ৪৮০টি হস্তীসহ অগ্রসর হন।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা দেখি মুসলিম শাসকদের আমলে ভারতে নৌ-শক্তির প্রাবল্য ছিল। তবে স্থলপথও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মঈন উদ্দীন হোসায়ন (১৮৯০-১৯৬৮) বিশ্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রবন্ধ 'আলহামরা' প্রকাশিত হয়। 'ভুবনবিখ্যাত আলহামরার নাম অনেকে জ্ঞাত' হলেও এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাঠক পাঠিকাদের অবগত করানোর জন্য লেখক প্রবন্ধটি লিখেছেন বলে জানান। আরবি শব্দ 'আলহামরা' অর্থাৎ 'লোহিতবর্ণ' থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে, কারণ এর 'হর্ম্ম্যপ্রাচীর গুলি' কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এবং কাব্যিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন পর্যটকের নিকট আলহামরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের স্থান। স্পেনের রোমাঞ্চকর ইতিহাসের নিদর্শনসমূহের মধ্যে আলহামরা অন্যতম একটি নিদর্শন। সত্য মিথ্যা কত উপাখ্যান, আরবি ও স্পেনীয় কত গান এবং গাঁথা, দুঃসাহসিক ঘটনা, প্রেম এবং যুদ্ধের কত কাহিনিই না আলহামরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

আলহামরা স্পেনের মুসলিম নরপতিদের রাজকীয় বাসভবন ছিল। মুর সুলতানদের এই রাজপ্রাসাদ আড়ম্বর, জাঁকজমক এবং বিলাসিতার জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। আলহামরাকে কেন্দ্র করে স্পেনে মুসলিম আধিপত্য টিকিয়ে রাখার সর্বশেষ প্রচেষ্টা চলে। আলহামরা রাজপ্রাসাদ একটি বৃহৎ দুর্গেরই অংশবিশেষ। দুর্গ-প্রাচীরে বহু গম্বুজ বসানো এবং একটি পাহাড়ের চতুর্দিক বেষ্টন করে এর অবস্থান। বাইরে থেকে দেখলে আলহামারাকে কেল্লা ও প্রাচীরের বহুল সমাবেশ বলেই মনে হয়। মনে হয় যেন কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য কিছুই নেই। ভিতরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কিছুই বাইরে থেকে কল্পনা করা সম্ভব নয়।[১]

আলহামরা নির্মাণের সময়কাল, নামের উদ্ভব এবং এখানে যুদ্ধ, আশ্রয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে লেখক মঈনউদ্দীন হোসায়ন লিখেছেন :

> ঠিক কোন সময়ে এবং কাহার দ্বারা গ্রানাডা শৈলে ইমারৎ আদি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কোন এক যুদ্ধের ঘটনা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে ইহার নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ২৭৭ হিজরীতে উমাইয়া খলিফা আবদুল্লাহর রাজত্বকালে, সাওআর স্পেনীয় বিদ্রোহীগণ হইতে আত্মরক্ষার্থে স্বীয় কয়েস বংশীয় আরব সৈন্যসহ আলহামরা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন; এবং বহু কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।[২]

তবে আমরা জেনেছি, আলহামরার প্রথম নির্মাতা বা সূচনাকারী এ রাজ্যের প্রথম রাজা বা শাসক প্রথম মুহম্মদ ইবনুল আহ্মার আল-গালিব। তিনি ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে একটি অতি প্রাচীন উমাইয়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর কাজটি আরম্ভ করেন। পরে তাঁর বংশীয় আবু আল হাজ্জাজ ইউসুফ ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করতে থাকেন এবং পরে তাঁরই বংশধর পঞ্চম মুহম্মদ আল গণী ১৩৫৪-১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই ত্রিকাল বিজয়ী নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তাই বলা যায়, আলহামরার নিমাণ শুরু ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ, যাব ব্যাপ্তিকাল সুদীর্ঘ ১১১ বছর।[৩]

---

১ ওয়াশিংটন আরভিং,*আলহামরা*, মুয়াযযম হুসায়ন খান ও হাসান ইকবাল অনূদিত, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৬

২ মঈনউদ্দীন হোসায়ন, 'আলহামরা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কর্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৪৩

৩ ড. ওসমান গণী, *স্পেনের মূর খেলাফৎ*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮

কেন এরকম পৃথিবীবিখ্যাত স্থাপনা নির্মাণ করা হলো, তা নিয়ে সর্বস্তরের মুনষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন এবং সে রাজ্যের রাজধানীতে একটি অনন্যতর বহুমুখী প্রাসাদ নির্মাণ করে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য মূল ছিল বলে মনে হয়। এর কারণ, পটভূমি, ক্ষমতার লড়াই ও পালাবদল, উত্থান-পতন ইত্যাদি বিষয় বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> গ্রানাডাকে রাজধানী করিয়া তাঁহারা এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই রাজ্যের সংস্থাপক মোহাম্মদ প্রথম বিন আল আহমদই এই ভুবনবিখ্যাত রাজকীয় হর্ম্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই হর্ম্ম্যের বহিঃস্থ প্রাচীর ও দুর্গ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। এবং ইহাদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তৃতীয়, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ও মোহাম্মদ পঞ্চম আল গানী বিল্লাহ এই তিনজনই সমাধিক প্রশংসার্হ, কারণ ইহারাই এই হর্ম্ম্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও হর্ম্ম্যকে সুন্দর কারুকার্য্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। নার্মারদগণের রাজত্বকালে এই প্রাসাদ সাম্রাজ্য ঘন ঘন গৃহবিবাদের কেন্দ্রস্থলে রূপে পরিগণিত হইয়াছিল।[১]

উপর্যুক্ত মোহাম্মদ পঞ্চম আলগানী বিল্লাহ ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের সর্বশেষ শৃঙ্গ নির্মাণের গৌরব অর্জন করেন। যখন এই অকল্পনীয় প্রাসাদ তৈরি হলো, তখন স্পেনে মুসলমান বা মুর শাসনের (১২৩৮-১৪৯২) শেষ অধ্যায় রচিত হচ্ছিল। ১৩৩ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে মুর শাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে এবং খ্রিস্টান শাসনের সূচনা ঘটায়। এতদ্বিষয়ে লেখক মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাঁহার আত্মীয় ইসমাইল দ্বিতীয়কে আলহামরা প্রাসাদে অবরোধ করত তাঁহাকে বন্দি করেন এবং অবশেষে বধ করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহন করেন। বস্তুত এই আলহামরাতে বহু রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছিল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী প্রদোষকালে ডন পেডরো ডি মেনডোজা (Don Pedsro De Mendoza) আলহামরা আলকাজবা নামক সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে রৌপ্য নির্ম্মিত ক্রস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তদ্দারা শেষ মোসলেম সাম্রাজ্যেরঅবসানের চিহ্ন নির্দেশ করিয়াছিলেন। সিংহাসনচ্যুত সম্রাট একাদশ আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ শত্রু কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পাদুম পর্ব্বতের যে স্থান হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরষগণের অতি সাধের এই হর্ম্ম্যের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন আজিও সেই স্থানকে 'মূরের শেষ নিশ্বাস' বলা হইয়া থাকে।[২]

স্পেনের রাজা-মহারাজাদের চরম উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও চূড়ান্ত গৃহবিবাদই স্পেনকে মুসলমানদের হাতে এনে দিয়েছিল। ঠিক অনুরূপ কারণে একই পথে আবার স্পেন মুসলমানদের হস্তচ্যুতও হয়েছিল। তবে স্পেনের মুর খেলাফতের দুটো বড় দান পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ীভাবে রেখে গেল : দর্শন-ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন এবং ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। আর আলহামরার অসংখ্য গুণাবলি বা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে, যা আজও বিশ্বকে ভাবিয়ে তোলে। এই প্রাসাদে পৃথকভাবে আলো ও বাতাসের কোনো ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল না। ওখানে আপনা-আপনি আলো ও বাতাস দিবা রাত্রি বইতে থাকত। বহু দরবারের (Court) সমন্বয়ে গঠিত আলহামরা পৃথিবীর স্থাপত্য শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। সত্যিই পৃথিবীর অনন্য এক শৈল্পিক নিদর্শন আহহামরা।

---

১ 'আলহামরা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
২ প্রাগুক্ত

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৫) আতা-উল-হাকিম রচিত 'আল-মামুনের দরবারস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী' নামে বারো পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত বলে ফুটনোটে উল্লেখিত আছে। খলিফা আল-মামুনের পুরো নাম আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন ইবনে হারুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.), তিনি সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন। ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে আল-মামুন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্যলিপ্সার চেয়ে জ্ঞানস্পৃহা অধিক ছিল বলে ইতিহাসে খ্যাতি রয়েছে।

তাঁর রাজ্যের শাসনভার প্রধানমন্ত্রী ফজল-বিন-সাহলের (মৃত্যু ৮১৮ খ্রি.) ওপর ন্যস্ত করে তিনি খোরাসানের রাজধানীতে (মার্ভে) দার্শনিক আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রাজত্বকালকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়। ৮১৩ থেকে ৮১৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রধান ফজল বিন সাহল রাজকার্য পরিচালনা করেন এবং ৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে ৮৩৩ খ্রি. আমৃত্যু আল-মামুন নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। সফল শাসক ও সব্যসাচী জ্ঞানানুরাগী হিসেবে খলিফা আল-মামুনের গুণের কথা বলতে গিয়ে লেখক আতা-উল-হাকিম সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> কেবল ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাপালনের জন্য যে মামুন বিখ্যাত ছিলেন এমন নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে তাঁহার যেরূপ ঐকান্তিক যত্ন ও অসীম উৎসাহ ছিল, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের বা কোনও সময়ের কোনও নরপতির সেইরূপ আগ্রহ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি শিক্ষা ও সভ্যতাকে সকল সুখের আকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সময়ে মোসলেম চিন্তার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ ও সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁহার রাজত্বকাল 'জ্ঞানযুগ' নামে কথিত হইয়াছে।[১]

তাঁর সময়ে দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশসাধনই মামুনের রাজত্বকালের অমর কীর্তি। তাঁর বিদ্বজ্জনানুরাগ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। খ্রিস্টান চিকিৎসাবিদ কুসটা-বিন-লিউক, প্রসিদ্ধ হাদিস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খ্রি.), ফারসী কবি আব্বাস, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), দার্শনিক আল-কিন্দী (৭৬৭-৮২০ খ্রি.), মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনী লেখক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩) এই আমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের উপস্থিতি তাঁর রাজত্বকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। এতদ্বিষয়ে লেখক বলেন :

> তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জ্ঞানানুসন্ধানকারিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও সকলকে সমান অধিকার প্রদান করিতেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীগণকে আহবান করত: রাজদরবারে আনয়ন করিতেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত বেতন, বৃত্তি, কিম্বা জায়গীর নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও তত্ত্বজ্ঞানের গবেষনায় নিযুক্ত করিতেন এবং প্রত্নতত্ত্বসমূহ সংগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিতেন। মধুকর যেমন পুষ্পসমূহ হইতে মধু আহরণ করিয়া

১ আতা-উল-হাকিম, 'আল মামুনের দরবারস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৩৯

> আপন মৌচাকে সঞ্চিত করিয়া রাখে, তদ্রূপ রাজপ্রতিনিধিগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্বেষণ ও নষ্ট গৌরব উদ্ধার করত বাগদাদ নগরের পুস্তকাগারসমূহপরিপূর্ণ করিতেন।[১]

মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভিতরই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদ, আহমদ ও হাসান নামে তিনজন ব্যক্তি ছিলেন মামুনের বিশেষ সহচর। তাঁরা রোমের দিকে দূত পাঠান, বিজ্ঞান ও দর্শনের যেখানে যা কিছু পুস্তক পাওয়া যায়, যেকোনো মূল্যে তা সংগ্রহ করার জন্য। তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে ভাষাবিদ পণ্ডিতদের অগ্রিম ভাতা দিয়ে ডেকে এনে সেগুলোর অনুবাদ কাজে নিয়োজিত করেন। জিব্রাইল বিন বখতিলু ও অনুবাদের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছিলেন। এরূপে গ্রিক, ফারসি, কালভি, কিবতি ও শামি ইত্যাদি ভাষার প্রাচীন ও নতুন গ্রন্থসমূহ ভাষান্তরিত করে আরবি ভাষায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেন আল-মামুন।[২]

খলিফা আল-মামুনের যুগ ছিল জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ। তিনি নিজে ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁর যুগের অনুবাদকরা বৈজ্ঞানিক ও গবেষক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছিরেন। তিনি গ্রিক দার্শনিক এরিষ্টটলের গ্রন্থের অনুবাদের জন্য ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দীকে (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) নিযুক্ত করেন। আল-কিন্দী এই কাজ অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। দর্শন ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে আল-কিন্দীর পাণ্ডিত্য বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> তাঁহার ন্যায় অসীম প্রতিভা সম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত অতি বিরল ছিল। তিনি দর্শন শাস্ত্র (Philosophy), অঙ্কশাস্ত্র (Mathematics), খগোলতত্ত্ব (Astromomy), চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine), রাজনীতিশাস্ত্র (Politics), সঙ্গীত-বিদ্যা (Music), বায়ুতত্ত্ব (Meteorology) ও আলোক-বিজ্ঞান (Light) সম্বন্ধে অনুমান দুইশত পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রীক, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন।[৩]

আল-কিন্দী ব্যতীত বহুসংখ্যক শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত মামুনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টান, হিন্দু ও ইহুদি ধর্মের অনুসারী এসব পণ্ডিতের মনোনয়নে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পাশাপাশি যোগ্যতাও বিচার করেছিলেন খলিফা আল-মামুন। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের নামগুলি হলো :

> খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ইয়াকুব আল-কিনদী, কশতা-বিন-লোকা, হুনাইন বিন-ইসহাক, মাইসু, ইউহনা মাসুবি, ইবনে আল-বতরিফ, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী দুবান, ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী মাশাস্তাহ, জরীল কোহাল, হুজ্জাজ বিন ইউসুফ কূফী, বিজ্ঞান চর্চ্চা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক আবু হেসান সালমা, আবু জাফর ইয়াহ ইয়া বিন আদী, জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ মোহাম্মদ বিন-মুছা, মোহাম্মদ, আহমদ, হাসন নামক মুছা বিন সাকেরের পুত্রত্রয়, আলী বিন আয়াস, আহমদ জওহরী ও ইহাহ-ইয়া বিন আবুল মনসুর, গণিতশাস্ত্রবিশারদ আহমদ বিন কাছির, 'মাদখেল-ইনা-ইলমু বায়নাতুল আফলাক' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার ফরগানী, আবদুল্লা-বিন-ছাহাল-বিন নাওবত, ছহল-বিন-হেরাউন, খালেদ বিন আবদুল মালেক, আল মরুজী, সনদ বিন আলী,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৩৪০
২ আল্লামা শিবলী নোমানী, 'আল মামুন', *আখতার ফারুক অনূদিত*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬৭
৩ *আতা-উল-হাকিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

আস্-বিন-ছইদ আল জহ্হরী ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন হিসাবে আড়াই হাজার টাকা হইতে কম ছিল না।[১]

উপর্যুক্ত পণ্ডিতদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় সাহিত্য-পত্রিকার এই রচনায়। এছাড়া আল-মামুনের সময়কালে সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণগণের নামগুলির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশিত হয় সাহিত্য-পত্রিকায় :

> মামুনের সময় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণ প্রসিদ্ধ ছিলেন :- ব্যাকরণ বিশারদ ফরয়া, আবু ওবায়দা, আসমারি না আলুব আবু ওমর, আস-সায়বাণী আখফশ, ফজরব, শব্দবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত রাবদী, নফর বিন শামীল, কুলসুম ও ইবনুল-এরাবী। এই সকল গভীর জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণের যত্ন ও অধ্যবসায়েই আরবী ভাষার এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। যদি তখন এই পণ্ডিতবর্গের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে আরবী ভাষা বহু পূর্ব্বে মৃতপ্রায় হইত।[২]

শুধু আরবি ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণই নয়, পারস্য ভাষা তথা ফারসি ভাষারও নতুন ধারা সৃষ্টি হয় আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর সময়ে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ফারসি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করে আরবি ভাষার সংমিশ্রণে ফারসি ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের ফলে ফারসি ভাষার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।[৩]

নিঃসন্দেহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় খলিফা আল মামুনের অবদান ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'চীনে ইসলাম' নামে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের দুই পর্বের অনূদিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Islam in China' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত বলে ফুটনোটে জানানো হয়। প্রবন্ধটি রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস (১৮৯৪-১৯১৭) কর্তৃক লিখিত, যিনি বৌদ্ধধর্মের উপর ব্যাপক ধারণা রাখতেন এবং তিব্বতি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি দুবার তিব্বত সফর করেন, প্রথমবার ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পরেরবার ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় সফরে তিনি তিব্বতের জীবনযাপন ও সংস্কৃতি নিয়ে অসংখ্য নোট রেখেছিলেন, যা পরে (১৮৮৫ খ্রি.) বই আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি তিব্বতের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক এবং চীনে ইসলামের আগমন কীভাবে ঘটে তা অনুসন্ধান করেন।

তিব্বতে বৎসর বা সাল গণনার জন্য একসময় 'আবর্ত্ত' পদ্ধতি চালু ছিল। ১০০ বছরে যেমন এক শতাব্দী, ৬০ বছরে তেমন এক 'আবর্ত্ত' প্রচলিত ছিল্ তদানীন্তন গ্রিক ও পারসিক বৌদ্ধরাও এটির ব্যবহার করতেন। তিব্বতরাজ্যের বিস্তৃতি এবং পাশ্ববর্তী চীন ও আরবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় আবুল কালাম মোহম্মাদ শামসুদ্দীন লেখেন :

> পূর্ব্বে তিব্বতবাসিগণ তাহাদের দেশে ১২ বছর ব্যাপি চীনিয় আবর্ত্ত ব্যবহার করিত। তিব্বতরাজ ষ্ট্রংসারের (Strong-Tsar) সহিত ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট টাই সাঙ্গের (Tai-Tsung) কন্যা ওয়েন চাঙ্গের (Wen-

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

Chang) বিবাহ হয়। এই সময়েই উপর্যুক্ত চীনিয় 'আবর্ত্ত' তিব্বতে প্রচলিত হয়। এই বিবাহ হইতেই চীনিয় সভতা ও শিক্ষা তিব্বতে পরিচিত হয়। এই সময় হইতেই তিব্বতের রাজশক্তি এতই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে ক্রমে তিব্বত আরবের খলিফাগণের ও চীন সম্রাটের বিশেষ আশঙ্কার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। খলিফা হারুনর রশিদের সময় তিব্বতরাজ্য চীনের বৃহৎ প্রাচীর হইতে বোখারা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।[১]

প্রাচীন তিব্বত সাম্রাজ্য বর্তমান তিব্বত, পাকিস্তানের পূর্ব্বাংশ, ভুটান ও নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তবে বিভিন্ন সময়ে চীনের অংশবিশেষ নিয়ে এই রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে, তা আমরা সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি। চীন, ভারত ও তিব্বতের সম্পর্কের দ্বৈরথে আরবের আগমন কীভাবে ঘটেছিল, তা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আলোচ্য একটি অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। চীনের ইসলামের ইতিহাস শুরু হয় যখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (৫৯৪-৬৭৪ খ্রি.), জাফর ইবনে আবি তালিবসহ চারজন সাহাবী ৬১৬/৬১৭ খ্রিস্টাব্দে চীনে এসে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এতৎপ্রসঙ্গে অত্র অঞ্চলে আরবদের সামরিক শক্তিমত্তাসহ চীনে আগমন বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> এই সময় মুসলমান সৈন্যদল ইউরোপে ও এশিয়ায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ... যে আরব শক্তি তিব্বত ও ভারতকে চীনের সাহায্য গ্রহণের জন্য বাধ্য করিয়াছিল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চীনকে পরাজিত করিয়াচিল, সে শক্তি অবজ্ঞার পাত্র নহে। টেঙ্গ ইতিহাসে চীন দরবারেআরব খলিফার কতিপয় দূতের আগমনের বিবরণ লিখিত আছে, তন্মেধ্যে নতুন বংশ প্রবর্ত্তক আবু লোক (আবুল আব্বাস), বাগদাদ নির্মাতা আবুচাফ (আবু জাফর) ও আলুন (হারুনর রশীদ) প্রভৃতি খলিফা প্রেরিত দূতের আগমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

পরবর্তীকালে (৭৬৩-৭৮০ খ্রি.) দেখা যায় পরাক্রান্ত তিব্বতীগণ তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন আক্রমণ করেন এবং তৎকালীন চীনের দুটি রাজধানী (সিয়ামফ ও হোনানফু) অধিকার করেন। তখন চীন সম্রাট খলিফা আবু জাফরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এর পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করে সাহিত্য-পত্রিকায় বলা হয় :

> এই সময় তিব্বতীয়গণ বোখারার সীমানা পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত করিয়া আরবগণের ভয়ের কারণ হইয়া দাড়াঁইয়াছিল। আরব খলিফা এক লক্ষ সৈন্য চীনাদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তাহাদের সাহায্যে চীন সম্রাট তীব্বতিয় সৈন্যগণকে তাহার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন ও অচিরেই নিজ রাজধানীদ্বয় পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সকল আরব সৈন্য চীনিয় রমণী বিবাহ করিয়া চীন দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই চীনিয় মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ।[৩]

চীনের পক্ষ নিয়ে তিব্বতের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়ে চীনে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও বৈবাহিক কারণে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে আসার ফলে বর্তমান চীনের

---

১ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, 'চীনে ইসলাম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ১৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

কয়েকটি প্রদেশ কীভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেড়েছিল, তা বলতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> যে সকল আরব সৈন্য ইউনান ও সেচুয়ানে তিব্বতীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল প্রদেশেই চীনিয় রমণী বিবাহ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর তুরকিস্থান হইতে মুসলমানগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে এদেশে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন এবং চীন গবর্ণমেন্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে ঢুকিতে লাগিলেন। এইরূপে চীনদেশে, বিশেষত ইউনানে মুসলমান উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরব, ইরানি অথবা তুরকি প্রভৃতি যাহারা চীনদেশ দেখিতে আসিয়াছিলেন বা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই দেশ হইতে স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তাঁহারা চীনিয় রমণী বিবাহ করিয়া চীন দেশেই নিজেদের পরিবার গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।[১]

তাই বলা যায়, প্রথমত বাণিজ্যিক এবং দ্বিতীয়ত বৈবাহিক কারণে চীনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁদের চীনে আগমনের ঘটনাবহুল বর্ণনা ভ্রমণকাহিনির মতো চিত্তাকর্ষক মনে হয়। তবে তাদের আগমন সরাসরি স্থল বা সড়কপথে হওয়ার সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের চীনে আগমন ঘটেছিল মূলত জলপথে, 'চীনে ইসলাম' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে সেই বর্ণনাই দেয়া হয়েছে। আরব বণিকরা পারস্য উপসাগরে নিজেদের জাহাজের মাধ্যমে চীন অভিমুখে রওনা হতেন। ওমান উপসাগরের মাস্কট নামক বন্দরই তাঁদের চোখে পড়লে সেখান থেকে তাঁরা জল ও পশুপাখি জাহাজে তুলে নিতেন। এখান থেকে জাহাজগুলি গভীরতর সাগরের বুকে ধাবিত হতো। এই গভীর সাগরে একমাস চলার পর জাহাজ ক্রমে দক্ষিণ ভারতে এসে নোঙ্গর করত। আবার এখান থেকে পর্যায়ক্রমে সিংহলের তীরভূমি হয়ে পুনরায় মধ্য সাগর অতিক্রম কের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নোঙ্গর করত। তারপর এখান থেকে আবার মালাস্কা দ্বীপ ঘেষে রওনা হয়ে মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূল ঘুরে, এভাবে সোজা উত্তরদিকে দশ দিন চলে জাহাজ অবশেষে শ্যাম উপসাগরে এসে উপনীত হতো। এখানে থেকে দশ কিংবা বিশ দিন চলে 'কোদর' নামক দ্বীপে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হতো, এখানে ভালো পানীয় জল পাওয়া যেত এবং তা জাহাজে তুলে রাখা হতো। আবার এখান থেকে চীন সাগরে এক মাস চলে কঠোর পরিশ্রমী আরবিয় বণিকগণ প্রসিদ্ধ কান-সু বন্দরে উপস্থিত হতেন। এটিই হেঙ চওফু (Hang ch-wfu) নগরের প্রাচীনতম বন্দর। আবরদের চীনে আগমন এবং তখনকার চীনা শাসকদের সহায়তার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে লেখক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বলেন :

> খুব সম্ভব আবরগণ হিজরি অব্দ আরম্ভ হইবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কান্টো (canto) নগরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। টেঙ্গ বংশ যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে (৬১৮ খ্রি.-৯০৭ খ্র.) মুসলমানগণ বণিকরূপে চীনবাসী কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদর পাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা চীনবাসীর অনেক অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ সমাদর হইয়াছিল। তাঁহারা নিরাপদে বাস করিতে পারিতেন, গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, বিবিধ কারুকার্য্যপূর্ণ মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.১৫-১৬

> অধিকন্তু নিজেদের নির্ব্বাচিত শাসন কর্ত্তার অধীনে বাস করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারা যে কতকটা স্বাধীনভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।[১]

টেঙ্গ বা তাং রাজবংশের শাসনামলে সলিমন নামে একজন বণিক ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চীনে এসেছিলেন, চেঙ্গদের ইতিহাসগ্রন্থে তা উল্লেখিত আছে বলে সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম 'হি-লাই-সাঙ্গ-পু' (Hsi-lai-tsang-pu) বা 'ইসলাম আগমনের ইতিহাস' যেখানে তাং রাজা টাইসাঙ্গ বা তাইজং (Tai-Tsang) এর মুসলিম সংস্কৃতিপ্রেমের কথা উল্লেখিত আছে। তুর্কি পোশাক তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল আর ঐ সময়ের অনেক চীনা মহিলা পারস্যের নারীদের পোশাক পছন্দ করতেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ওহাব আবু কাবশা (Wahab-Abu-Kabsha) নামে মোহাম্মদের (সা.) আত্মীয় মক্কা থেকে অনেক উপঢৌকনসহ চীন সম্রাট তাইজং বা টাইসাঙ্গের উদ্দেশ্যে জলপথে রওনা হন। একবছর অতিক্রম করে ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীনের তৎকালীন রাজধানী (Changan) নগরে এসে উপস্থিত হন। তিনি সম্রাটের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে ক্যান্টন নগরে সমজিদে নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। এই কাজ শেষ করে তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। একই বছর মোহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যু ও আবু কাবশার পরবর্তী ঘটনাবলি বর্ণনা করে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি হজরতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। কিছু কাল আরবে অবস্থানের পর, যখন হজরত আবু বকর কর্ত্তৃক কোরআন সংকলন সমাপ্ত হইল, তখন তিনি পুনরায় এই পবিত্র গ্রন্থ লইয়া চীনাভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ক্যান্টন নগরে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। এই নগরের একাংশে তাঁহার দেহ সমাধিত করা হইল। এখন পর্য্যন্ত তাহার কবরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা এখনও পূর্ব্বপ্রান্তের মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আছে। চীনে সর্ব্বপ্রথম ইনিই মসজিদ নির্মাণ করেন বলিয়া আজিও সমগ্র মুসলমান ইহার নিকট ঋণী।[২]

এছাড়া 'সং' বা 'সুঙ্গ' বংশের (Sung Dynasty ৯৬০-১২৮০ খ্রি.) ইতিহাসে আরো বিশজন আরব দূতের চীনদেশে আগমনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁর (রাজত্বকাল ১২০৬-১২২৭) আমলে অনেক ধ্বংস সাধিত হয় এশিয়া মহাদেশে। তাঁর মৃত্যুর পর অত্র অঞ্চলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তাঁর পুত্র মঙ্গু খাঁ (১২০৯-১২৫৯) ও কুবলাই খান (১২১৫-১২৯৪) মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করে রাজকার্যাবলিতে নিযুক্ত করেছিলেন। কুবলাই খানের শাসনকাল ও চীনে মুসলিম বিশেষ জাতিসত্তার উদ্ভবের পরিচয় দিতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয়:

> কুবলে খাঁন ইউনান বংশ প্রবর্ত্তন করেন। এই ইউনান বংশ চীন সিংহাসনে ১২৬০ খৃ.-১৩৬৮ খৃ. পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাটগণ পশ্চিম হইতে আগত বিদেশীয়গণকে চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই সময়ের মধ্যে আরব, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ দল বাধিয়া আসিয়া চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই সকল মুসলমান আসিয়া সেই অষ্টম শতাব্দীতে চীনে আগত আরবীয় মুসলমানগণের সহিত মিলিত হইলেন। এখন সকলে মিলিয়া চৈনিক

---

১ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, 'চীনে ইসলাম', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ১২০-১২১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

মুসলমান বংশ গড়িয়া তুলিলেন। ইহারা চীনে 'হুই-হুই' (Hui-Hui) নামে খ্যাত। ইউনান বংশের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, অনেক চৈনিক মুসলমানই বড় বড় রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সৈয়দ আজলের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। ইনি হজরত মোহাম্মদের বংশীয় ছিলেন। ইউনান দেশ জয় করিয়া ইনি তথাকার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১]

সৈয়দ আজল শামস আল দীন ওমর (সাই-ডিয়েন-চি, ১২১১-১২৭৯) ছিলেন মোহাম্মদের (সা.) ২৬তম বংশধর। চীনে ইসলাম ও কনফুসিয়ান দর্শনের মেলবন্ধনকারী হিসেবে তাঁকে মনে করা হয়।

উপর্যুক্ত 'হুই' জাতি চীনের বর্তমান দশটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতির মধ্যে প্রধানতম জাতি। চীনা ভাষায় ইসলামের প্রতিশব্দ 'সিন সিং কিয়া' বা 'সত্য বা পবিত্র ধর্ম'। বর্তমান চীনে পঞ্চান্নটি সংখ্যালঘু জাতি রয়েছে, মুসলিম-অমুসলিম মিলিয়ে। অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু জাতি হলো উইঘুর, কাজাঘ, কিরঘিজ, তাজিক, তাতার, উজবেক, তুংশিয়াং, সালার এবং পাত্তয়ান।[২]

বর্ত্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনে ইসলামের আবির্ভাবের ইতিবৃত্ত ও অবস্থান আমরা সাহিত্য-পত্রিকায় 'চীনে ইসলাম' প্রবন্ধের মাধ্যমে আলোকপাত করলাম।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মোহাম্মদ কে চাঁদের সাত পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'খলিফাদিগের শাসনকালে ডাক-প্রথা' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত হয়। যেসব বিজ্ঞান সম্মত উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে আধুনিক সভ্যতা অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে, তার মধ্যে ডাকবিভাগ একটি। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ডাক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক জিনিসপত্র বা পণ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের মহা উপকার সাধিত হয়েছে। তবে এটি একবারে আধুনিক কালের নতুন সৃষ্টি তা বলা যাবে না। সাহিত্য-পত্রিকায় এতদ্বিষয়ে লেখক কে, চাঁদ (করমচাঁদ) লেখেন :

> খৃষ্টের জন্মের বহু শতবর্ষ পূর্ব্বে মিসরদেশবাসী এবং গ্রীক ও রোম প্রকৃতি জাতির মধ্যে ডাক প্রেরণের নিয়ম প্রচলিত ছিল। অতঃপর আরবেরাও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।
>
> কথিত আছে যে বাইজেন্টাইন ও পারস্যদেশবাসীগণের অনুকরণেই খলিফা মোয়াবিয়া (৬৬১-৬৮৩ খৃ.) কর্ত্তৃক আরবদিগের মধ্যে ডাক-বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।[৩]

নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর আরবদের ডাক ব্যবস্থা পুরোপরি আরবদেশে প্রবর্তিত হয়। আরবিতে ডাক পদ্ধতিকে 'বারিদ' বলা হয়। 'বারিদ' কথাটি ল্যাটিন (Veredus) ডাক-জন্তু (Post-animal), ডাক-ঘোড়া (Post-horse) শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রাচ্য তত্ত্ববিদলেখক R. Hartmannও মনে করেন খলিফা মুয়াবিয়া (রা.)ই ডাক বিভাগের সুবন্দোবস্ত করতে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৩-৭০৫ খ্রি.) এটি রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খলিফা আল্ ওয়ালিদ (৭১৫-৭২৪ খ্রি.) ডাক প্রেরণের জন্য খোরাসানের পথে 'থান'গুলিও নির্মাণ করেছিলেন।

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

২ চুং নিং, *চীনে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দশটি সংখ্যালঘু জাতি*, তিয়েন মাই অনূদিত, পেইচিং, চীন, ১৯৮৯, পৃ. ১

৩ মোহাম্মদ কে চাঁদ, 'খলিফাদিগের শাসনকালে ডাক-প্রথা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩২৫

এমনকি আব্বাসীয়গণও তাঁদের বিদ্রোহের সময়ও (৭১৫-৭২৪ খ্রি.) ডাক মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা হারুন-অর-রশিদই (রাজত্বকাল ৭৮৬-৮১৪) তাঁর প্রসিদ্ধ মন্ত্রী এহিয়ার সাহায্যে নতুন ধরনে ডাক বিভাগ কার্যোপযোগী করেছিলেন। সংবাদ বহন করা ছাড়াও শাসনকর্তারাও ডাক পরিচালিত বাহনে যাতায়াত করতেন বলে লেখক উল্লেখ করেন। সাহিত্য-পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখা হয় :

> কেবল সংবাদাদি বহন করাই ডাক বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল না। সমস্ত কর্ম্মচারী, এমন কি ছোট ছোট সৈন্যদল বহন এবং কোর্ট ও গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য (baggage) স্থানান্তরিত (বা প্রেরণ) করাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই হেতু তার সাজসরঞ্জামগুলিও বড়ই মজবুত ছিল। গভর্ণর (শাসনকর্ত্তা) গণও তাঁহাদের অনুচরবর্গও তাঁহাদের উপর শাসনকর্ত্তৃত্ব ভারার্পিত প্রদেশসমূহের এই ডাকযোগেই যাইতেন।[১]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষটি প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত হয়েছে তা হলো, খলিফদের শাসনকালে ডাকবিভাগ রাজকার্যের একটি স্বাধীন শাখাস্বরূপ ছিল এবং সরকারি পত্রাবলি ও যাত্রীদল বহন করা ছাড়াও এর কাজ ছিল দূরবর্তী অধিকৃত দেশে সমূহের শাসকগণের তত্ত্বাবধান করা। ডাক বিভাগের কর্মচারিদের দায়িত্বের ভিতরও কীরূপ বৈচিত্র্য ছিল, তা বলতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> ডাকবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের দুই শ্রেণীর মধ্য নওয়াকিউম (nowaquium)ই পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ইনি সরবারী মোড়ক (প্যাকেট) ও পত্রগুলি গ্রহণ করিয়া সেগুলি প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতেন। যথা 'ফরবানেকয়ুন' (Farwaneqqun)-ই প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এক রকম প্রধান পোষ্টমাষ্টার স্বরূপ ছিলেন। ইনি পোষ্টমাষ্টারদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া সমস্ত সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারিগণের সম্বন্ধে তাঁহার নিজ রিপোর্ট (সংবাদ) বোগদাদের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতেন।[২]

লেখক এতৎপ্রসঙ্গে বাগদাদের (তৎকালীন সময়ে বোগদাদও বলা হতো) খলিফা মোওয়াক্কিলের সময় (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) পোস্টমাস্টারের রিপোর্ট হস্তগত হয়েছে বলে দাবি করেন। আবার খলিফা মামুনের শাসনকালের (৮১৩-৮৪৭ খ্রি.) সময়ে খোরাসানের রিপোর্ট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন লেখক। ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণের জন্য তৎকালে ঘোড়া ও মানুষ উভয়ই নিয়োজিত থাকতো। পারস্য দেশে মানুষ নিজেই বাহক ছিল বলে উল্লেখ করা হয় সাহিত্য-পত্রিকায়। সব সরকারি অফিসে সমগ্র মানুষের সঠিক পোর্টাল ডিরেক্টরি ছিল, যাতে সব আড্ডা বা মনজিল (কার্যালয়) গুলির এবং একটি থেকে অপরটিতে দূরত্ব স্পষ্টত লিখিত থাকত। সমগ্র সাম্রাজ্যে ডাকবাহী পশু ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্দিষ্ট দূরবর্তী স্থানসমূহে থাকার জন্য এইরূপ রাজধানীর সাথে প্রদেশগুলির যোগাযোগ সহজতর হতো। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মাহদী ইয়েমেন থেকে মক্কা পর্যন্ত এবং মক্কা থেকে বাগদাদ পর্যন্ত এইরূপ ডাকপথের ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাকের ঘোড়া থেকে সাধারণ ঘোড়া আলাদা ও চিহ্নিত করার জন্য ডাকের ঘোড়ার লেজ একটু আলাদাভাবে কেটে দেয়া হতো। সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক ডাক বিভাগের বিভিন্ন খাতের ব্যয় প্রসঙ্গে আরো বলেন :

> এব্নে খোর্দ্দাদবেহ্ যিনি খলিফা মোতাসিমের সময় (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) স্বয়ং পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, সেন্ট্রাল সাম্রাজ্যে ৯৩০ টি আড্ডা (মনজেল) ছিল। জীবগুলির

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

> আহার, নূতন জীব ক্রয় করা, ডাক হরকরা ও ডাক বিভাগের কর্মপরিষদগনের বেতন দেওয়া প্রভৃতি করতে তাঁহার সময়ে বাৎসরিক ১৫৪০০০ দিনার (প্রায় ২৩$\frac{\square}{\square}$লক্ষ ফ্রাঙ্ক) খরচ হইত। ওম্মিয়া বংশীয় খলিফা হিশামের সময় এক ইরাক প্রদেশেরই ডাকবিভাগের খরচ ছিল ৪০ লক্ষ দেরহাম।[১]

এছাড়া খলিফার আবাসস্থানে যে কার্যালয় বা দেওয়ান ছিল সেই কার্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ 'সাহেব আল বারিদে'র হাত দিয়েই প্রদেশ থেকে প্রেরিত সমস্ত চিঠিপত্র চালান করা হতো। সমস্ত সরাসরি অফিসে সব সাম্রাজ্যের সঠিক পোস্টাল ডিরেক্টরি ছিল, যাতে সমস্ত অফিসগুলির একটি থেকে অপরটির দূরত্ব স্পষ্ট লেখা থাকত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডাক এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা ছিল। লেখক অতঃপর এখানে ইবনে সিনার ভ্রমণবৃত্তান্তের আলোকে খলিফার আমল থেকে ভারতবর্ষের ডাক ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় যা উল্লেখ করেন, তা এই :

> ভারতবর্ষে দুই প্রকার ডাক বিদ্যমান, এক প্রকার ঘোড়ার আর এক প্রকার মানুষের। মানুষের ডাককে 'দাওয়া' বলে। প্রত্যেক এক ক্রোশের মধ্যে তিনজন লোকে ডাক লইয়া যায়। প্রত্যেক $\frac{\square}{\square}$ ক্রোশ অন্তরে এক একটি গ্রাম। গ্রামের বাহিরে হরকরার এক একটি গ্রাম নির্দিষ্ট আছে। তথায় এক একজন হরকরা থাকে। প্রত্যেক হরকরার নিকট দুই গজ লম্বা একটি লাঠি ও লাঠির অগ্রভাগে তাম্রলিপ্রিত একটি ঘুঙুর বান্ধা আছে। হরকরার এক হস্তে ঐ লাঠি ও অপর হস্তে লম্বিত ব্যাগ, এই অবস্থায় সে দৌড়াইতে থাকে। অপর হরকরা দূর হইতে তাহাদের ঘুঙুরের শব্দ শুনিয়া প্রস্তুত হয় এবং ডাকে পৌছিয়া মাত্র সে তাহার নিকট হইতে ব্যাগ ও লাঠি লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। এমন কি সময় সময় খোরাসান হইতে বাদশাহের জন্য টাটকা টাটকা ফলও ঐ ডাকে আনীত হয়। ঘোড়ার ডাককে 'আওলাক' বলে।[২]

ইবনে বতুতা চৌদ্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। সেই সময়ের ডাক প্রথার আধুনিকায়ন হয়ে এখনও সগর্বে প্রচলিত রয়েছে। মিসরের ফাতেমিয়া খলিফাগণের সময় (৭৮৫-৯৭১ খ্রি.) ডাক বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষকে 'মোকদ্দমা ই-বারিদিয়ে' বলা হতো বলে আমরা সাহিত্য-পত্রিকা থেকে জানতে পারি। তাদের ডাকপ্রথা ইবনে বতুতা বর্ণিত রূপেই চলমান ছিল।

বিভিন্ন সময়ে গোলযোগের জন্য ডাককার্যের ব্যাঘাতও ঘটত। ক্রুসেড যুদ্ধের পরে শ্রেষ্ঠ মামলুক সম্রাট আল্-জাহির বারবার্স (প্রথম) পূর্বদেশে ইসলামের শক্তি সম্মিলিত করতে থাকেন, তখন তিনি পুনরায় ডাকবিভাগের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ডাকবাহক অশ্বারোহনে কায়রো থেকে দামেস্ক চারদিনে কখনও কখনও এমনকি তিনদিনে এবং কখনও পাঁচদিনে পৌছাত। পরবর্তী মামলুক সুলতানরা ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় শাসনকর্তারা যে ডাকবিভাগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করেননি 'থান' গুলিই তার প্রমাণ। এই 'থান'গুলি আজও পর্যন্ত প্রাচীন (পূর্বতন) রাস্তাগুলি অর্থাৎ দামেস্ক থেকে পশ্চিম দেশ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ Viamaris (সমুদ্র পথ) এর উপর দৃষ্ট হয়।

মুসলমান জগতে সংবাদ প্রেরণের জন্য যে পারাবত নিযুক্ত করা হতো ইতিহাসে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। গ্রিক ও রোমানদিগেরও এই নিয়ম জানা ছিল। খলিফা মোতাসিমের রাজত্বকালে একটি বার্তাবহ দ্বারাই

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

বাগদাদে 'বাবেক' অবরোধের সংবাদ প্রেরিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, আলোচ্য এই প্রবন্ধটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হয়।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৬) খোন্দকার গোলাম আহ্‌মদের 'ভারত মোস্‌লেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা' শীর্ষক পাঁচ পৃষ্ঠার রচনায় ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি বিশেষ দিকের আলোচনার ভিতর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, ভাষা , ধর্ম, সাধক, ঐতিহাসিকদের প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি এনে এটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেখক ভারতবর্ষ মুসলমান আগমনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা করে ভারত অধিকারে অন্য ধর্মালম্বীদের ক্ষতি হয়নি, বরং উন্নতির দিকটি প্রতীয়মান হয় বলে মনে করেন। লেখক মুসলমান জাতি ভারতবাসীর উন্নতি সাধন এবং সুখ বৃদ্ধির জন্য ভারতে আগমন ও অধিকার করেছেন, একথা বলেননি বরং মুসলমানদের আগমনের হেতু ও পূর্বাপর অবস্থার পরিচয় চানক্য ও হর্ষচরিতসহ অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> গৃহবিবাদে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ছারখার হইতেছিল, পররাজ্য ধ্বংস, পরধন হরণ প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ভারতে যখন দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতের বহু রাজপুত্র রাজ্য লোভে যখন পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা করিতেছিলেন, অধর্ম্মের যখন এরূপ প্রাধান্য হইয়াছিল যে, রাজপুত্রগণ নিজ নিজ মাতার শয্যা গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া শরণার্থী পিতাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজশক্তি যখন আপন আপন পুত্র কন্যার বিবাহ সভাতেও এক একটি মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া ভারতের পবিত্র অঙ্গ মানবরক্তে কলঙ্কিত করিতেছিলেন, সীতা ও সাবিত্রীর জন্মভূমিতে রাজমহিষীগণ যখন নারীজাতির পবিত্রতায় পদাঘাত পূর্ব্বক কামান্ধা ও লোভান্ধা হইয়া পতিপুত্র হত্যা করিতেছিলো, মুসলমানরা ঠিক সে সময়েই ভারতে আগমন করিয়া হিন্দুদিগকে পবিত্র ভ্রাতৃভাব ও একতা শিক্ষা দিয়াছিলেন।[১]

মুসলমানরা এসময় আরবি, ফারসি ভাষার বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনা করে সে কালের গতি পরিবর্তন করেছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেন। জাতিভেদ প্রথা হিন্দু ধর্মে এত অধিক বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে, উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদেরকে অতি অধম মনে করতেন। এসময় ইসলামই ভারতবর্ষে সাম্যবাদের প্রচার করে বলে যে, মানুষ মাত্রই সমান, ঈশ্বরের চোখে ধনি, গরিব, উচু, নীচু প্রভৃতির কোনোই প্রভেদ নেই। লেখক ঐসময়কার ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও শিল্প স্থাপনার উদাহরণ দিতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> শের শাহের গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, দিল্লীর কুতুবমিনার, জুম্মা মসজেদ, আগ্রার তাজমহল, কাশ্মীরের জামে-সেকন্দার প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষের প্রতি নগর, প্রতি প্রান্তর, প্রতি জনপদ, প্রতিবন, প্রতি উপবনে, ইসলামের স্থপতিবিদ্যার প্রভৃত উন্নতির জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। মুসলমানদের সময়েই ভারতে বারুদ প্রথম ব্যবহৃত হয়, মুসলমানরাই ভারতে কাচ ও কাগজের প্রচলন করেন। মুসলমানদিগের নিকট হিন্দুরা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর পরিধেয় ব্যবহার শিক্ষা করেন।[২]

---

১ খোন্দকার গোলাম আহ্‌মদ, 'ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২২৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

এছাড়া মুসলমান শাসকদের বিলাসপ্রিয়তার ফলে ভারতে আতর, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের আবিষ্কার হয়। রামায়ণ মহাভারত ব্যতীত ভারতের প্রায় সব ইতিহাসই প্রথমে মুসলমান কর্তৃক লিখিত হয়েছে বলে লেখক জানান। মুসলমান শাসনের সময়ে ভারতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বিস্তার প্রভৃতির পরিমাণ ও ফলাফল স্থিরীকৃত হয় এবং ভারত-রাজ্য বিভিন্ন সুবা, পরগণা প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়। মুসলমানদের দ্বারাই বঙ্গদেশে জমিদারি সেরেস্তার সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবরের প্রিয় পারিষদ 'আইন আকবরী' প্রণেতা মহানুভব আবুল ফজলই ভারতে সর্বপ্রথম রাজকীয় আইনের সৃষ্টি করেন। মুসলমানদের দ্বারাই ভারতে উর্দু ও হিন্দি ভাষার প্রচলন হয়। শুধু উর্দু ও হিন্দি নয়, বাংলা ভাষার সৃষ্টিও মুসলিম আমলে হয়, এতৎপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> মুসলমান রাজত্বকালেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করেন। মুসলমানদিগের শাসনকালেই ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে চৈতন্যদের জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। মুসলমানেরাই বিভিন্ন মসলা সংযোগে উৎকৃষ্টতর আহারীয় রন্ধনের প্রথা ভারতে প্রবর্ত্তন করেন। ভাবময়ী পারসী-সাহিত্যের সুধাময় প্রভাবেই অমৃতময় কবিতা প্রবাহ বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল। সম্রাট কূলতিলক আকবর শাহের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের পার্সী অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাট শাহজাহান কৃত 'তখ্‌তে তাউস্' অর্থাৎ ময়ুর সিংহাসন জগতের এক অদ্ভুত পদার্থ। তাঁহারই স্থাপিত ধবলময়ী তাজমহল দর্শন করিবার জন্য শত শত বিদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে আগমন করিয়া থাকেন।[১]

শুধু তাই নয়, ভারতের বিলুপ্ত সঙ্গীত সংস্কৃতির পুনরুত্থানও মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। সম্রাট আকবরের আগমনে তানসেন (১৫০০-১৫৮৯ খ্রি.) পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিখ্যাত হন। বাদশাহ জালালউদ্দীন বঙ্গদেশে গৌড় নগর থেকে গড় মান্দারণ পর্যন্ত রাজবর্ম প্রস্তুত করে এবং তার পাশে বড় দিঘি খনন ও বৃক্ষরাজি রোপন করে বঙ্গদেশে যাতায়াতের ও বাণিজ্যের সুবিধা করে দেন। মুসলমান বাদশাহগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে খাল ও তড়াগ্ খনন করে ভারতবাসীর জলকষ্ট নিবারণ করেন। মোহাম্মদ তোগলক ৫৯০ মাইল দীর্ঘ যমুনার সুপ্রসিদ্ধ খাল খনন করান। প্রজাবৎসল মুসলমান বাদশাহ্‌গণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে খাল ও তড়াগ (বড় পুকুর/দিঘি) খনন করে ভারতবাসীর জলকষ্ট নিবারণ করেন। মুসলমান শাসনকালে বিজিত হিন্দু জাতি যেরূপ উচ্চ পদ লাভ করেছিলেন, জগতের ইতিহাসে তার উপমা পাওয়া যায় না বলে লেখক মনে করেন। তাছাড়া কোরান ও ইসলামের প্রভাব অমুসলিমদের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা সাহিত্য-পত্রিকায় গিয়ে লেখক বলেন :

> পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবাবেই রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অনেক শিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুধর্মের অংশ, আমরা কিন্তু একথা একেবারেই স্বীকার করি না। প্রত্যুতঃ একেশ্বরবাদী ও সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মপুস্তক হইতেই যে ইহা এক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লিখিয়াছেন- "স্বর্গনরক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঐক্য হইতে

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮

পারে, অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়। কেননা, মুসলমানগণ অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, কোন রূপ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ ইত্যাদির সংস্রব রাখেন না।"[১]

রামমোহন রায়ের বহুভাষায় পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। তাঁর পাটনায় দুই-তিন বছর অবস্থানকালে আরবি ভাষায় ইউক্লিড ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রন্থপাঠে তাঁহার স্বভাবত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি বিশেষভাবে শাণিত হয়। এতদ্বিষয়ে তাঁর জীবনী রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯১৩) বলেন:

> আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্য ও মুসলমান মৌলবীদের সংস্রবে আসাতে তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুফীদিগের গ্রন্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন। এই আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। পরিণত বয়সে তাহার প্রিয় হাফেজ, মৌলানা রুমী, শাম্‌স তাব্রিজী প্রভৃতি সুফী কবিগণের গ্রন্থ হইতে ভুরি ভুরি কবিতা উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন।[২]

তাই দেখা যায়, ইসলাম যেমন অমুসলিম মনীষীদের সমৃদ্ধ করেছে তেমনি ভারতবর্ষের প্রকৃত অর্থে মঙ্গলসাধনই করেছে। কোনো মুসলমান নিজ স্বার্থসিদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতার জন্য কোনো সময়ে কোনো মানবসন্তানের উপর অত্যাচার করে থাকলে তার জন্য ইসলামকে দায়ী করা যৌক্তিক নয়। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২), রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) প্রমুখ সুলেখকদের চেষ্টায় ও ব্যবহারে অচিরেই যেকোনো রকম হিন্দু-মুসলিম পারস্পারিক বিদ্বেষভাব অচিরে দূর হবে বলে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক মনে করেন। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের রচনায় মুসলিম বিদ্বেষের চিত্র ফুটে উঠার দিকে ইঙ্গিত করেন।

ভারতে মুসলমানদের আগমন এবং তাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে লেখক খোন্দকার গোলাম আহমদ তিনজন বিশিষ্ট লেখকের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, যা তৎকালীন জনপ্রিয় দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) তাঁর 'পৃথ্বীরাজ' (১৯২৮) নামক ঐতিহাসিক মহাকাব্যের উপক্রমণিকার এক স্থানে যা লিখেছেন তা উদ্বৃত করেন এভাবে :

> যাহাঁরা সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিবেন তাঁহারা বুঝিবেন যে, মুসলমানরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুরা অধঃপতিত হন নাই, হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুসলমানেরা এদেশে আসিতে ও স্থায়ীভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন।[৩]

বিভিন্ন ধর্ম, উপধর্ম, জাতিভেদ প্রথা একের প্রতি অন্যের অত্যাচার এবং নৈতিক অবনতি হিন্দুদিগকে একদিকে যেমন দুর্বল করেছিল অপরদিকে একেশ্বরবাদী ধর্ম, জাতীয় একতা, সকলের প্রতি সমভাব ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণকে এক পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধদের অতীত অবস্থার বর্তমান পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক এতদ্বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উক্তি সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

২ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

> তিন চারি শত বছর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্ম্মান্বিত ও ভূত প্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেদের অধঃপাতে নিয়া গিয়াছিল এবং দেশটাকেও অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্তের ফল। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিবার জন্য মুসলমানদিগকে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।[১]

শুধু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই নয়, তৎকালীন সময়ে সুপরিচিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক আঙ্গরিকা ধর্ম্মপাল মুসলমান কর্তৃক ভারত অভিযানের কারণ প্রসঙ্গে বলেন :

> সহস্রাধিক বছর ধরিয়া ভারতবাসিগণ সত্যধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ছিল, সেই কারণেই ভারতে শান্তি স্থাপন এবং তদ্দেশীয়গণকে শাস্তি দিবার জন্যভারতের ইতিহাসে মুসলমান জাতি কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইয়াছিল।[২]

ঠিক এই সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ বিশেষজ্ঞ ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৯) ভারতবর্ষে মুসলিম আগমন বিষয়ে লিখেছেন :

> হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণনা দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। ... হিন্দুর এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান তাহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্মী প্রেমিক জাতিকে শান্ত ও শিক্ষক রূপে ভারতে প্রেরণ করেন।[৩]

তাই শাস্তা বা শাসক হিসেবেই শুধু নয়, সত্যিকার অর্থের জাতির শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক হিসেবে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটেছিল যাতে, সব ধর্ম ও মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বলে লেখক জানান। লেখক পরিশেষে বলেছেন :

> আমার সমস্ত বঙ্গদেশে কোটী কোটী ব্রাহ্মণেও হিন্দুদিগকে উন্নত পদে অধিষ্ঠিত এবং সামাজিক সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত দেখিতে পাই তাহার মূল কারণ মোসলেম অধিকার। ইসলামের সুধাময় প্রভাবেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে কতকটা সামাজিক স্বাধীনতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।[৪]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মুজফ্‌ফর আহমদের 'আরবী ভাষা' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে মূলত অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবি ভাষার প্রসারতার দিক ও গুরুত্বের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। আরবি ভাষার বিস্তৃতি শুধু পৃথিবীর নির্দিষ্ট একটি এলাকা বা জনগোষ্ঠীর ভিতর সীমাবদ্ধ নয় বরং এর ব্যাপকতা তথা ক্রমঅগ্রসরমানতা লক্ষ করার মতো, প্রবন্ধে এই বিশেষ দিক তুলে ধরা হয়েছে। রেভারেন্ড এস. এম. জুয়েমার (Rev. S. M Zwemer Samuel Marrius :১৮৬৭-১৯৫২) প্রণীত Arabia : The Cradle of Islam নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন হিসেবে লেখক মুজফ্‌ফর আহমদ এটি প্রকাশ করেন। জুয়েমার একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি এবং ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে আরবি ভাষা সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

---

১ উদ্ধৃত, *নারায়ণ*, আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
৩ উদ্ধৃত, এডুকেশন গেজেট, ২২ বৈশাখ ১৩২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

মুসলমানদের আপনার বলিতে যা কিছু আছে সমস্তেরই দোষ প্রদর্শন করিতে এই পাদ্রী পুঙ্গব জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইসলাম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ বলিয়া বঙ্গের গভর্ণমেন্ট তাঁহার 'ইসলাম' নামক গ্রন্থখানি বাজেয়াফত করিয়াছেন। কিন্তু জুয়েমারের ন্যায় ব্যক্তি আরবী ভাষা সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহা আমাদের "স্কলার"দের চোখের সামনে ধরার জন্য এটুকু সৎকলন করিয়া দিলাম।[১]

পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের পরস্পরের ব্যাপক বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা লেখক লেখার শুরুতে উল্লেখ করেন। উপনিবেশ স্থাপনা ও প্রচারের ভিত্তির উপর বিশ্বময় বিস্তৃতির জন্য দুটি ভাষার যুগ-যুগান্তর ধরে প্রতিযোগিতার কথাও এ লেখায় বলা হয়েছে, ভাষা দুটি হলো ইংরেজি ও আরবি। যাঁদের মাতৃভাষা আরবি, তারা ছাড়াও অধিক লোক যারা কোরানের ভাষা আরবিতে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ আবার ধর্মে মুসলমান হিসেবেই দেখা যায়। কোরানের পঠন-পাঠন বর্তমান অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেই সূচনা হয় বলে আমরা এ রচনার মাধ্যমে জানতে পারি। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় বলেন :

পূর্ব্বাকাশ উষার রক্তিমচ্ছটায় চিত্রিত হওয়ার পূর্ব্বেই ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে কোরআনের ১ম অধ্যায়ের আবৃত্তি হইয়া থাকে। তারপর পিকিং এর মুসলমানগণের নামাজে ও সমস্ত চৈনিক ভূখণ্ডে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। ইহা হিমালয়ের অন্তর্দ্দেশ ও পামিরের মালভূমিতেও পরিশ্রুত হয়। কয়েক ঘন্টা পর পারস্যবাসিগণ এই আরবী শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে।[২]

এরপর পর্যায়ক্রমে সমগ্র আরব উপদ্বীপ, নীলনদ অধ্যুষিত এলাকা অতিক্রম করে 'আজান' ও 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে ক্রমশ সুদান, সাহারা ও পাশ্ববর্তী রাজ্যসমূহে প্রতিধ্বনিত করে 'পরিশেষে মরক্কোর মসজিদ সমূহে বিলীন' হয়ে যায় বলে লেখক জানান।

কোরানের ভাষা আরবি হওয়ায় ভাষা হিসেবে আরবির গুরুত্ব যেমন বাড়তে থাকে এশিয়া, আফ্রিকা পেরিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত, তেমনি পঠন-পাঠন, শিক্ষা-গবেষণায় ভাষাটি চলমান ছিল বলে জুয়েমারের গ্রন্থসূত্রে লেখক উল্লেখ করেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাঠ্য মাধ্যম হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে লেখক বলেন :

আরবী কোরআন তুরস্ক, আফগানিস্তান, যাভা, সুমাত্রা, নিউগিনি ও দক্ষিণ রুসিয়ার বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে অধীত হইয়া থাকে। আরবী ভাষা কেবল নিজ আরবে কথিত হয়নি, পরন্তু আরব উপদ্বীপের ভাষায় সীমানা বাগদাদের উত্তরে ৩০০ মাইল উত্তরে দিয়ার বকরও মার্দ্দিন পর্যন্ত বিস্তৃত। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় আরবী ভাষাই কথিত হইয়া থাকে। এমন কি কেপ কলোনিতে পর্য্যন্ত মোহাম্মদের ভাষার নিয়মিত পাঠকের অভাব নাই। অতি প্রাচীন সময়, ১৩১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পাদ্রী রেমন্ডলাল (Raymond Lull) এক কল্যাণে আরবী ভাষা অধীত হওয়া আরম্ভ করিয়াছে। আর আজ কায়রো অপেক্ষা লিডেনেই (Leiden) যথাযথরূপে আরবী ভাষার শিক্ষা হইতেছে। সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য আরবী সাহিত্যের গবেষণা হইতেছে ক্যাম্ব্রিজে-দামেস্কে নহে।[৩]

---

১ সংকলক: মুজফ্‌ফর আহমদ, 'আরবী ভাষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৪১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

তাই দেখা যায়, আরবের মরু প্রদেশে উদ্ভুত আরবি ভাষা আরবের যাযাবর জাতির শিবিরে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলেও পাশ্চাত্যে এর চর্চা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। আরবি ভাষার গুণাগুণের কথা বলতে গিয়ে ফরাসি ভাষাবিশেষজ্ঞ আরনে রেঁনা'র (১৮২৩-১৮৯২) বক্তব্য উদ্ধৃত করে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> সেমিটিক ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী ভাষা, কি শব্দ সম্পদে, কি বর্ণনামাধুর্য্যে, কি উহার লজিকের ভিত্তির উপর ব্যাকরণের সূত্র গঠনে আর আর সকল ভাষাকে অতিক্রম করিয়াছে।[১]

আরবি ভাষার জনপ্রিয়তা ও প্রসারতার মূলে কোরান একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। কোরানই আরবিকে স্থান বিশেষে প্রচলিত কথা ভাষায় পরিণতি লাভ করা থেকে উদ্ধার করেছে। তাই আরবি ভাষা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনুশীলন প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় সবশেষে বলেন :

> যিনিই আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই আরবেই জন্মগ্রহণ করুন কিংবা ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা লাভ করুন, উহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন।[২]

তাই জুয়েমারের বক্তব্য এবং লেখক মুজফ্ফরের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, কোরানের কারণেই আরবি ভাষা পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় ও প্রসারিত হয়েছে।

মধ্যযুগে পৃথিবীব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ইতিহাসে ইবনে সিনা ও আল-গাজ্জালী অনন্যসাধারণ দুই মনীষী। তাঁদের নিয়ে মূল্যবান রচনা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় মোহাম্মদ কে. চাঁদের পাঁচ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'ইবনে সিনা' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে ইবনে সিনার জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন লেখক, যা অনিবার্যভাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অন্যতম অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। দর্শন, সাহিত্য, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁর বিচরণ ও পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজ দার্শনিক রজার বেকন (১২২০-১২৯২) তাঁর দর্শনশাস্ত্র (opusmayus) গ্রন্থে ইবনে সিনাকে (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) দর্শনশাস্ত্রের নায়ক ও রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম প্রথানুযায়ী প্রথমত ইবনে সিনা কোরান শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন বাল্যকালে, তারপর সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ জন্মে। লেখক মোহাম্মদ করমচাঁদ তাঁর পর্যায়ক্রমিক শিক্ষা ও অধ্যয়ন নিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তিনি একজন ফল বিক্রেতার তত্ত্বাবধানে পাটীগণিত অধ্যয়ন করেন। নাতিলী নামক জনৈক দার্শনিকই তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষক ছিলেন। ... তিনি বালক ইবনেসিনাকে ইউক্লিড ও অলম্যাজস্ত পড়াইয়াছিলেন। ইবনে সিনা কোনও শিক্ষকের সাহায্য না লইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং যখন অত্যন্ত অনভিজ্ঞ তখনই রোগীদিগকে দেখিতে আরম্ভ করেন। আরিষ্টটলের মনোবিজ্ঞান প্রথমত তাঁহার পক্ষে অতি দুরূপ বোধ হইয়াছিল। তিনি অর্থবোধ না করিয়াও ইহা চল্লিশবার পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে আল-ফারাবির ভাষ্যগুলির সাহায্যে ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৩ মোহাম্মদ কে চাঁদ, 'ইবনে সিনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ৯০

দার্শনিক-বিজ্ঞানী আল-ফারাবীর (৮৭২-৯৫৬ খ্রি.) বর্ণনার সাহায্যে তিনি অ্যারিস্টটলের মনোবিজ্ঞান বুঝতে সক্ষম হলেও দেখা যায়, নিজ উদ্যোগে কোনো শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। আবার মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা অচিরেই প্রমাণিত হয় এং শীঘ্রই তৎকালীন রাজপরিবারের সুনজরে পড়েন। কিশোর বয়সে এরকম সুখ্যাতি ও পাঠাভ্যাস ইবনে সিনাকে নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে নেয়। লেখক সেই সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> যখন তাঁহার বয়সমাত্র আঠার বৎসর, সেই সময় বোখারার সামানিদ সুলতান মনসুরের পুত্র নুহোকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া তিনি তাঁহার একজন পরম বন্ধু হইয়াছিলেন। ইহাতে সুলতানের একটি পাঠাগারে প্রবেশ লাভ করিবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। এই পাঠাগারটি অতি মূল্যবান পাঠাগার ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পদিন পরেই ইহাকে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।[১]

ইবনে সিনা বোখারার রাজদরবারের সরকারি পদেও নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এখান থেকে অপসারিত হয়ে একজন উপযুক্ত শুভানুধ্যায়ীর সন্ধানার্থে বহুসংখ্যক শহর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি জর্জ্জানে উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে অল-জযজানির সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অল-জযজানিও অতঃপর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এখানে তিনি কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইবনে সিনার স্বহস্তে লিখিত বিবরণ মোফাখ্‌খের উদ্দীন আবুল আব্বাস এবনে আবি ওসারিয়া কর্তৃক রক্ষিত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থখানির নাম 'আইন অল-আন্ বা', অর্থাৎ 'চিকিৎসকগণের ইতিহাস' বইটি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে A-Muller কর্তৃক কনিংসবার্গে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে সিনা 'শেখজি' নামেও তৎকালে পরিচিত হন। তিনি হামাদানের আমির শাম্‌স-উদ্-দৌলাকে আরোগ্য করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ আমির তাঁকে উজির হিসেবে নিয়োগ দেন কিন্তু সামরিক বাহিনী কর্তৃক পদচ্যুত হন অথবা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। হামাদান পরিত্যাগের ইচ্ছায় একজন ওষুধ বিক্রেতার বাড়িতে আত্মগোপনে থেকে তিনি ইস্পাহানের আমিরের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তবে বিষয়টি হামাদানের আমির শামস-উদ-দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী তাজ-উদ-দৌলা তা জানতে পেরে তাকে খুঁজে বন্দি করে রাখেন। এই বন্দিশালায়ও তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। অনেক বিপদ অতিক্রম ও কৌশল অলম্বনের পর তিনি জযজানি ও দুইজন ভৃত্যের সহযোগিতায় সুফির বেশ ধারণ করে বন্দিদশা থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। পরে তিনি ইস্পাহানের শাসনকর্তার পুত্রের নিকট নিরাপদ আশ্রয়প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। রাত্রিকালে এখানে তিনি দার্শনিক সভা করতেন, কখনো কখনো আমির স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। এর ভিতরই তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলি লেখা শেষ করে ফেলেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর অনুচারবর্গসহ হামাদান ভ্রমণকালে পথেই ৫৮ বৎসর বয়সে অসুস্থ হয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনের নানা বাধাবিপত্তির ভিতর চিরাচরিত জ্ঞানচর্চা ও পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের চিত্র লেখক করমচাঁদ সাহিত্য-পত্রিকায় এভাবে তুলে ধরেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

তাহার জীবনের প্রত্যেক মুহুর্তেই সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রযুক্ত হইত। দিবাভাগে তিনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন বা তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দিতেন। সন্ধ্যাকালে বন্ধুবর্গ ও ভালবাসার পাত্রগণের সহিত সামাজিক আমোদ প্রমোদে রত থাকিতেন। রাত্রিকাল তাঁহাকে লেখনীহস্তে রচনায় নিযুক্ত থাকিতে এবং পাছে ঘুমাইয়া পড়েন এই হেতু অতি নিকটেই মদিরাপূর্ণ পিয়ালা রাখিতে দেখা যাইত। যদি রাজ সভায় তাঁহার আবশ্যকমত অবসর এবং নিকট একটি পাঠাগার পাইতেন তাহা হইলে তিনি 'চিকিৎসাবিধি' এবং প্রসিদ্ধ 'বিজ্ঞান কোষ' খানি লিখিতেন। ভ্রমণকালে তিনি সংক্ষিপ্তসার এবং ছোট ছোট গ্রন্থগুলি রচনা করিতেন। কারাগারে তিনি কবিতা ও ঐশভক্তি প্রদর্শী ধ্যানের বিষয় লিখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক স্থান হইতে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতেন তাহা কিরূপ পাণ্ডিত্যসহ পুঞ্জীভূত করিতে হয় এবং সুবোধ্যভাবে প্রদর্শন করিতে হয় তাহা জানিতেন।[১]

ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনে সিনার লেখনি পরিচালিত হয়েছিল,তবে দর্শনশাস্ত্র তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ইবনে সিনার গ্রন্থসংখ্যা অনেক। ধর্মতত্ত্ব বিচার, কোরানের ভিন্ন ভিন্ন সুরা, শেষ বিচার, অলৌকিক ব্যাপার (মোজেযা), স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল ও রক্ষা কবচ সম্বন্ধে এক একটি 'রেষালা' অর্থাৎ অধ্যায় বা পুস্তিকা লিখেছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রে আশ-শেফা (আরোগ্য বিধান) তাঁর অতি বিরাট ও প্রকাণ্ড গ্রন্থ। বইখানি ন্যায়, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক কল্পদ্রুম বলা যেতে পারে। বর্তমানে কলা এবং বিজ্ঞানকে আলাদা বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেকালে তা ছিল না। বিজ্ঞানের প্রায় সবশাখাই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ধরা হতো।

ভ্রমণ বা পর্যটনকালে ইবনে সিনা বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের সময় 'শেখজি' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। 'শেখজি' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে তিনি 'নাজাৎ' (আরাগ্য) নামে একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বের করেন। তাঁর আরেকটি দার্শনিক গ্রন্থের নাম 'কিতাব অল ইশরারৎ ওয়াল তনবিহাৎ' অর্থাৎ 'উপপাদ্য ও প্রতিজ্ঞা গ্রন্থ' যা সংক্ষেপে 'ইশারাৎ' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থগুলি হলো, 'ফলাসফা অল-আরুদী', 'ফলাসফা-আল-আলাই', যে যে সাহায্যকারীর নামে উৎসর্গীকৃত আদেরই নামানুসারে এরূপ নাম প্রদত্ত হয়েছিল। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে ইবনে সিনার খ্যাতি ছিল সমধিক। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর বৃহদায়তন গ্রন্থ নিয়ে লেখক মোহাম্মদ কে. চাঁদ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

ইবনে সিনা প্রধানতঃ জর্জ্জানে থাকিয়াই তাঁহার বিরাট 'কানুন ফিল-তিব্ব' (চিকিৎসাবিধি) নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। এই খানি মধ্যযুগের একমাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার বহুসংখ্যক টীকা লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেই আদৃত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চিকিৎসাগ্রন্থ অনুসারে ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। এই চিকিৎসা কানুন খানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুইভাগে শরীরতত্ত্ব নিদানতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা আলোচিত হইয়াচে, অবশিষ্ট তিনভাগে চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভৈষজ্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একখানি শিক্ষাগ্রন্থ 'মনজুমা' (Mauznma) নামক কাব্যখানি ৩১১৬ পঙ্ক্তিতে লিখিত। শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) নামক তাঁর আরেকটি কবিতা সংকলনের তথ্য পাওয়া যায়।

আরবি সাহিত্যে যে সম্প্রদায় 'অল-ফলাসিফা' (দার্শনিক্য) নাম ধারণ করেছিল, ইবনে সিনা সেই দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর দর্শনশাস্ত্রকে একাধিক ক্ষুদ্র অংশে (অন্তত ছয়টি) ভাগ করা হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্র (Logic), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (Psychology), মনোবিজ্ঞান (Metaphysics), গূঢ়জ্ঞানতত্ত্ব (Mysticsim) এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics) ইত্যাদি। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এরূপ বিভাগ করা হয়েছিল।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৫) মুজফ্‌ফর আহমদের সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'ইমাম-আল্-গাজ্জালী' প্রকাশিত হয়। একজন মুসলিম মনীষী পৃথিবীর সামনে যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তাতে তাঁকে শুধু একজন ইসলাম ধর্মের সেবক বলা সঙ্গত নয়। তিনি একাধারে আইনজ্ঞ, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষক ও সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব ও তাঁকে নিয়ে অনেক শিক্ষিত মুসলমানদের অজ্ঞতা বিষয়ে আক্ষেপ করে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দর্শন শাস্ত্রকে বিশেষজ্ঞের গণ্ডীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন। সুফী সাহিত্যের তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁহারই গবেষণা ও সাধনার ফলে সুফীমত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনিই নতুন সাজ পরাইয়া ইল্ম-উল-কালামকে এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বড় দুঃখ এই যে, মুসলমানগণ তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। আর ভারতবর্ষে ত এমন শিক্ষিত মুসলমান অনেকেই আছেন, যাহারা ইমাম সাহেবের নাম পর্য্যন্ত জানেন না।[১]

পারস্যের (ইরান) আফগানিস্তান সন্নিহিত প্রদেশ খোরাসানে ইমাম-আল-গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) ৪৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু হামীদ মোহাম্মদ। উত্তরকালে তিনি 'হুজ্জ-উল-ইসলাম' বা 'ইসলামের প্রমাণ' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন। ইমাম-আল-গাজ্জালী ইসলামের 'ফিকাহ শাস্ত্রে'র পণ্ডিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজ শহরের প্রথম শিক্ষাগুরু আহমদ বিন মোহাম্মদ রাজকানী এবং পরবর্তীতে খোয়াসানে ইমাম আবু নসর ইসমাইল এর নিকট আরো গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি 'ধর্মবিধি' ও 'থিওলজি' বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তিনি নিশাপুর গমন করেন। তাঁর এখানে আগমন আর নতুন নতুন শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> নিশাপুর বহুকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ছিল। ইমাম সাহেব যখন সেখানে যান তখন ইমাম-উল-হারমায়ন তত্রত্য নেজামীয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষকতায় তাঁহার যশঃ সৌরভ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। নিশাপুরে আসিয়া ইমাম গাজ্জালী এই পণ্ডিত প্রবরের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইমাম-উল্-হারমায়নের প্রকৃত নাম আবদুল মালিক এবং উপাধি 'জিয়াউদ্দীন' বা 'ধর্ম্মজ্যোতি' ছিল। ইসলামের পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদিনাকে 'হায়মায়নে শরিফায়ন' বলা হয়। আবদুল মালিক জিয়াউদ্দীন তথায় বহুকাল অবস্থান করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছিরেন। তখন মক্কা ও মদিনার লোকগণের

---

১ মুজফ্‌ফর আহমদ, 'ইমাম-আল্-গাজ্জালী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১৩৯

> আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের তিনিই মীমাংসা করিয়া দিতেন। এইজন্য তিনি 'ইমাম্-উল-হারমায়ন' নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।[১]

ইমাম-উল-হারমায়ন ৪৭৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করার পর ইমাম-আল-গাজ্জালী নিশাপুর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং অতঃপর তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। এমন গৌরবান্বিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ২৮ বৎসর বয়সে যখন নিশাপুর ত্যাগ করেন 'তখন তাঁহার সমকক্ষ ইসলাম জগতে আর কেহই ছিল না।'[২] গাজ্জালী ধর্মবিধি, থিওলজি, তর্কবিজ্ঞান, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র এবং সুফিগণের বিভিন্ন মত ও রীতিনীতি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন বিধায় ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন।

বাগদাদের প্রধান উজির নিজাম-উল-মূলক তাঁর পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তবে তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি ছিল বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তাই গাজ্জালী যখন বাগদাদে উপস্থিত হন, তখন তিনি পরম সমাদরে তাঁকে আপন দরবারে গ্রহণ করেন। এখানকার প্রসিদ্ধ ওলামাগণের সঙ্গে ইমাম গাজ্জালীর নানা বিষয়ক আলোচনা হওয়ার পর তাঁর জ্ঞান গরিমায় সবাই মুগ্ধ হন। নিজাম-উল-মূলক তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ গাজ্জালীকে ৪৮৪ হিজরিতে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। তখন ইমাম গাজ্জালীর বয়স ৩৪ বছর। এই বয়সের আগে আর কোনো অধ্যাপক নিজামিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করতে পারেননি। এভাবে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বৎসর অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। বাগদাদ তখন স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্রভূমি ছিল। জগতের সব ধর্মমতের লোকই এখানে আপন আপন ধর্মমতের অবাধ আলোচনা করতে পারতেন। তিনি তাঁর অনুসন্ধান প্রবৃত্তির ফলে সকল মতই বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি গ্রিক দর্শনও বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অধ্যয়নের পর তাঁর চিন্তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> নানা মতের সংস্রাবে আসিয়া তাঁহার মনের ভিতর তুমুল সংগ্রাম হইতেছিল। চারিদিক হইতে সংশয় আসিয়া তাহাকে ফিরিয়া ফেলিতেছিল। দুই মাস কাল তিনি সংশয়বাদী হইয়াই রহিলেন। তিনি দেখিলেন কোন যুক্তিই তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ অসীম। যাহার উপর তাঁহার অনুগ্রহ হয় তাহার উপরে তিনি জ্যোতি প্রেরণ করেন। এই জ্যোতির বিকাশে ইমাম গাজ্জালীর সংশয় কাটিয়া গেল। তিনি তাঁহার চিন্তাশক্তি আবার ফিরিয়া পাইলেন এবং সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩]

এবার তিনি ইলম-উল-কালামের (Scholastic theology) অনুসারীদের, তালিমি সম্প্রদায়ের, সুফিগণের ও দার্শনিকদের মতামত নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেন। সুফিবাদের ক্ষেত্রে তিনি মুহাসিবী, জুনায়দ, শিবলী ও আবু ইয়াজিদ-উল-বিস্তানীর গ্রন্থসমূহ অতীব অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, এটি শিখে আয়ত্ত করার জিনিস নয়, অনুভব করবার জিনিস, এতে তাঁর মন কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে। আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে ৪৮৮ হিজরির শেষে বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয় ইসলামের ধর্মরাজ্যে কেবলমাত্র 'ফেকাহ' বা 'কালামে'র রাজত্ব থাকবে না। তাসাউফও (Mysticisn) তাতে আপন স্থান করে নেবে। বাগদাদ থেকে ইমাম গাজ্জালী অতঃপর সিরিয়াতে উপনীত হন। সেখানে তিনি দুই বছর কাল একাধারে সাধনা, ধ্যান ও অধ্যাপনা চালিয়ে যাওয়ার পর জেরুজালেম

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

গমন করেন। সেখান থেকে হেবরনে গিয়ে হজরত ইব্রাহিমের (যাকে মুসলিম জাতির পিতা বলা হয়) সমাধি পরিদর্শন করলেন। মক্কা ও মদিনা গমন করে হজব্রত সম্পন্ন করেন। তিনি মিসর ও আলেজান্দ্রিয়াও ভ্রমণ করেন। এইভাবে দশ বৎসর অতিক্রান্তের পর জন্মভূমি তুস নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। গাজ্জালীর এসময় উপলব্ধি হলো, সুফিদের অনুসৃত পথই একমাত্র সত্যপথ। জ্ঞান, বৃদ্ধি বা বিজ্ঞান কিছুই তাঁদের মত ও নীতির উন্নতি বা পরিবর্তন করতে পারবে না বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়।

স্বদেশে ফেরার কিছুকাল পর তিনি নিশাপুরের নিজামিয়া কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, খোরাসানের প্রধানমন্ত্রী এবং নিজাম-উল-মূল্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফখ্র-উল-মূলকের ঐকান্তিক আহবানে সাড়া দিয়ে। কিছুদিন পর আবার এ পদ পরিত্যাগ করে তুসে ফিরে আসেন এবং স্বগৃহের নিকট একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং বাকি জীবন তিনি শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন।

ইমাম-আল-গাজ্জালী সর্বশ্রেণির লোকের নিকট পরম সমাদরে গৃহীত হতেন এবং 'মুজাদ্দাদ' বা 'সংস্কারক' রূপে সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও যে তখন বিদ্যমান ছিল, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। সাহিত্য-পত্রিকার লেখক মুজফ্ফর আহমদ এতদ্বিষয়ে লিখেছেন :

> ইমাম সাহেবের ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আপনি কাহার ধর্ম্মমতের 'তকলিদ' বা অনুসরণ করেন ?" উত্তরে ইমাম সাহেব বলিলেন: "আমি যুক্তির জন্য নিজের বুদ্ধিশক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি। আর বিধানশাস্ত্রের জন্য অনুসরণ করি কোরআনের। আমি কোনো ইমাম সাহেবের অনুসরণকারী নহি।"[১]

মুসলিমরা ইমাম গাজ্জালীর ফেকাহ ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সমাদর করে থাকে। তবে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও পঠন ইউরোপের ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে 'ইহ্য়া-উল্-উলুম' অন্যতম। ফরাসি দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা হেনরি লুইস বার্গসন (১৮৫৯-১৯৪১) এই গ্রন্থ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক মুজফ্ফর আহমেদ উদ্ধৃত করেছেন:

> যদি ডেকার্টের সময় ফরাসী ভাষায় "ইহয়া-উল-উলুমের" অনুবাদ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে সকলেই বলিত যে ডেকার্ট উহা হইতে চুরি করিয়াছেন।[২]

এই মন্তব্যেই বোঝা যায়, সমকালে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইমাম-আল-গাজ্জালী কতটা প্রাগ্রসর ছিলেন। সুফিরা এই গ্রন্থটিকে কোরানের পর অন্যতম দ্বিতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দান করে রেখেছেন।[৩]

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মকাসিদ-উল-ফলাসফা, তাহাফু-উল-ফলাসফা, কিমিয়া-ই-সাআদাৎ, যওয়াহির-উল-কোরআন প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তাহাফুৎ-উল-ফলাসফা' বা 'দর্শন-ধ্বংস' নামক গ্রন্থ যেমন সাধারণের বোধগম্য করে লিখিত ঠিক তেমনি উচ্চশিক্ষিত লোকেরও উপভোগের আকরগ্রন্থ।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩ মনজুরুল হক, 'ইমাম গাজালি ও তাঁর শিক্ষাদর্শন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুন ২০২১, পৃ. ৪

প্রবন্ধে ইমাম-আল-গাজ্জালীকে নিয়ে অধ্যাপক ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ডের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখক প্রবন্ধটি শেষ করেন এভাবে :

> ইসলাম কখনো তাঁহাকে (ইমাম গাজ্জালীকে) ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু এখন ইসলামে যে নবজাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহাকে বুঝিবার সময় আসিবে, তাঁহার গ্রন্থাবলীর নবীভূত অধ্যয়নের দ্বারা নবজীবনের সূচনা হইবে।[১]

ধর্মতত্ত্বে আল গাজ্জালির অবদান সুদূরপ্রসারী। তিনি 'মুতাজিলা' দর্শন ও গ্রিক দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ইসলামের অনুসন্ধান করেন। তিনি ধর্ম ও দর্শনের মদ্যে পার্থক্য দেখান এবং ধর্মকে দর্শনের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি 'আশারিয়া' মতবাদের সংস্কার সাধন করেন এবং মুসলমানদের কোরান ও হাদিসের দিকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন এবং এসব গ্রন্থের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 'সুফিতত্ত্ব' মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শরীয়তের সাথে মারেফতের সংযোগ সাধন করেন। তাঁর প্রভাবে 'সুফিবাদ' ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারে মূল্যবান অবদান রাখে, যা সাম্যবাদী ধারার অন্যতম একটি রূপও বলা যায়।

ইতিহাসের অনেক উপাদান ভ্রমণকাহিনির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়প্রকাশিত অসংখ্য রচনার মধ্যে ভ্রমণবিষয়ক কিছু লেখা প্রকাশিত হয়, লেখাগুলিতে ইতিহাস-ঐতিহ্যের চিত্তাকর্ষক কিছু বিষয় আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো: অশ্বিনীকুমার সেন লিখিত 'ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালি', অপরটি হলো ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ'। এসব রচনায় আমরা ভ্রমণ কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের অনেক উপাদানের পরিচয় পাই।ইউরোপ যাত্রীর প্রথম বাঙালির লিখিত গ্রন্থের আবিষ্কারের পূর্বে আমরা রামমোহন রায়কে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণকারী হিসেবে জানতাম। ইতিসামউদ্দীনের 'বিলায়েতনামা' গ্রন্থটি আবিষ্কার হওয়ার পর এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে। বিষয়টি সম্পর্কে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক শুরু করেন একথাটি দিয়ে :

> শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এতদিন আমাদের এই ধারণাই ছিল কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে শিগারফ নামা-ই-বিলায়ৎ (Shigaraf Nama Vilayat) নামক যে একখানি পারশি গ্রন্থ ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে যে এর সম্মান রাজার প্রাপ্য নয় উক্ত পার্সী গ্রন্থের লেখক ইতিসামউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এ সম্মানের অধিকারী।[২]

লেখক এরপর ইতিসামউদ্দীনের বিলেত গমনের সময়, উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা দেন। ইতিসামউদ্দীনের পিতার নাম তাজউদ্দীন, যুক্তবঙ্গের নদীয়া জেলায় তাঁর জন্মস্থান। তিনি বহুদিন ধরে নবাব মীর জাফরের সেরেস্তার কাজ করে ফারসি ভাষার অধিকার লাভ করেছিলেন। এরপর মীর কাসিম

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

২ অশ্বিনীকুমার সেন, 'ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১১৩

নবাব পদ লাভ করলে তিনি সেরেস্তার কাজ ত্যাগ করে ইংরেজদের অধীনে কাজ নেন। এর পরের ঘটনা বর্ণনা দেন ইতিসামউদ্দিন (১৭৩০-১৮০০) এভাবে:

> ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেজর ইয়র্ক বীরভূমের তদানীন্তন মুসলমান নরপতি আসাদুজ্জমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, আমিও তখন তাঁহার সহিত তথায় গিয়েছিলাম। আসাদুজ্জমানের পতনের পরে ইয়র্কের সঙ্গে আমাকে পাটনায় যাইতে হয়। এখানেই দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের নিকট পরিচিত হই। পাটনা হইতে আমরা কলকাতা গিয়াছিলাম।[১]

এর কিছুদিন পর মেজর ইয়র্ক বিলেত চলে যান। যাবার সময় ইতিসামকে একখানি অনুরোধপত্র দিয়ে পাটনার মেজর এডামসের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে প্রথমে মুন্সি পরে রাজা হওয়া নবকৃষ্ণের ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি অনেকদিন কোনো কাজ সংগ্রহ করতে পারেননি। পরে অনেক কষ্টের ফলে জলেশ্বরের সেরেস্তার একটা চাকরি পেতে সক্ষম হন। এখানে দুই বৎসর চাকরি করার পর মীর কাসিম বিরোধিতাকারী সৈনিকদের সঙ্গে অন্যত্র দুই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাজমহল হয়ে মেদিনীপুরে তিনি এক বৎসর তহশীলদার এর কাজ করেন। এরপর তার মনিবস্ট্রাচি (Strachy) সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কার্নাকের অধীনে কাজ নেন। এইবারে 'চুনার' নামক স্থানে সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে এলাহাবাদে নিয়ে আসেন। ঠিক এই সময় লর্ড ক্লাইভ ইংল্যান্ড থেকে এসে বাংলার দেওয়ানি লাভ করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে একটি চিঠি ও বহু মূল্যবান উপহারসহ ক্যাপ্টেন সুইনটনকে ইংল্যান্ডে পাঠান। তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে মুন্সি হিসেবে ক্যাপ্টেনের সহকারী হয়ে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার খরচ হিসেবে রাজকোষ থেকে সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রী নবাব মনির উদ্দিন ৪০০০ টাকা ইতিসামউদ্দিনকে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে যাবার পর ইতিসামউদ্দিন ক্লাইভের ধূর্ততা কীভাবে বুঝতে পারেন তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> ইংল্যন্ডে যাইবার পথে সুইনটনের নিকট শুনিলাম, যে উপহার দ্রব্য পত্র লইয়া আমাদের যাইবার কথা তাহা আদৌ আমাদের সঙ্গে আইসে নাই, লর্ড ক্লাইব সেগুলি রাখিয়া দিয়াছেন।এই কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। যে জন্য যাইতেছি তাহাই যখন ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিল তখন আমার ইংলন্ডে যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু তখন সমুদ্রবক্ষে জাহাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হইয়াই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ইংলন্ডে চলিলাম। এখানে পৌঁছিয়া ক্লাইবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।[২]

তিনি বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রামের লস্কর ব্যতীত কোন শিক্ষিত বাঙালি ইংল্যান্ডে যাননি। রাষ্ট্রীয় সফরে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি সবার কৌতূহলের ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবার কিছুদিন পর ক্লাইভ ইংল্যান্ডে এলেও সম্রাটের পত্র বা উপহারের কথা একেবারেই গোপন করে রাখেন। ইতিসামউদ্দিন যতদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন ততদিন সুইনটন ও তাঁর বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব ইতিসামউদ্দিনের সুযোগ-সুবিধা ও যত্নআত্তির দিকে নজর রেখেছিলেন। তাঁরা তাকে ফারসি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ডে উচ্চ বেতনে থাকতে বলেছিলেন। কেউ আবার ঐ দেশের নারী বিয়ে করে স্থায়ী হতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
২ প্রাগুক্ত

এরপর তাঁর দেশে ফেরা এবং লিখিত অসমাপ্ত কথা লেখক অশ্বিনী কুমার সেন সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন :

> অবশেষে কলিকাতা কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মিঃ ম্যাজেন্ডির সাহায্যে জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলাম। ইংল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর চুপচাপ করিয়াছিলাম।পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল জন রাফটন (Colonel John Wroughten) এর সহিত পুনরায় সাতরায় যাই। এখানে মহারাষ্ট্র দিগের সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়।[১]

ইতিসামউদ্দিনের এই গ্রন্থ 'সিগারফ নামা বিলায়ৎ' (Shigaraf Nama Vilayat) বা 'বিলায়ৎনামা' হিসেবে পরিচিত।মূল ফারসি থেকে এটি অনুবাদ করে বের করেছেন গবেষক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (১৯১৮-২০১৬) ও আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪)।

সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধ 'ইবন বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ' প্রকাশিত হয়। ইবনে বতুতার (১৩০৪-১৩৭৮) সময়কালে বহু পর্যটক ছিলেন কিন্তু লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের কারণে তিনি কেবল সুবিদিত হয়েছেন। লেখক এ প্রসঙ্গে ইবনে বতুতার পূর্বে যেসব মুসলমান ভূগোল ও ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখে রেখে গেছেন তাদের মোট ২১ জনের গ্রন্থসহ নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে আল বিরুনি ও তার গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ' অন্যতম। ইবনে বতুতা ইসলামের শেষ সময়ের উন্নতির যুগের একজন ভ্রমণকারী ছিলেন। সেই হিসেবে তার ভ্রমণকাহিনির মধ্যে অনেক ঘটনা ও তথ্য উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটেছে। লেখক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> ৭২৫ সালের রজব মাসে ২২ বছর বয়সে হয্যের উদ্দেশ্যে তিনি জন্মভূমি হইতে রওয়ানা হন। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করিয়া শেষে তিনি মিসরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে হিজায বন্দরে পৌঁছিয়া মক্কা শরীফে যাইবার উদ্যোগ করেন।সেই দেশের রাজা তখন মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইবনে বতুতা সেই জন্য তথায় কোন জাহাজ না পাইয়া পুনরায় মিসরে ফিরিয়া আসেন। সেখান হইতে তিনি সীরিয়া দেশে যান।দমশকে (Damascus) হদীসের বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে দুইজন বিদুষী রমণীয়ও ছিলেন। তারপর তিনি তথা হইতে গত বৎসরের হয্যের সংকল্প পূরণের জন্য প্রথমতঃ মদীনা শরীফে উপস্থিত হন। তৎপরে মক্কা শরীফে যাইয়া হজ্ব সম্পন্ন করেন।[২]

ইবনে বতুতার জন্মভূমি মরক্কো। তিনি ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলা সফর করেন তখন তার বয়স ৪২ বছর। তাঁর পুরো নাম শেখ আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ। তার বেশ আগে তিনি ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে পৌঁছান। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে দিল্লির কাজি নিযুক্ত করেন। প্রায় আট বৎসর তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। এরপর সুলতান তাকে চীনের রাষ্ট্রদূত করে পাঠান ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে যান এবং সেখানে এক বৎসর বিচারক পদে কাজ করেন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহল অভিমুখে রওনা হন এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছান। 'মাদুরা'য় কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি বাংলা অভিমুখে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
২ 'ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

রওনা হন। তিনি প্রায় চুয়াল্লিশটি দেশ ভ্রমণ করেন। লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইবনে বতুতার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের বর্ণনা প্রদানপূর্বক বাংলায় উপনীত হওয়ার সময়ের বর্ণনা দেন এভাবে :

> সেখান হইতে (মালদ্বীপ) জাহাজে রওনা হইবার ৪৩ দিন পরে বাঙ্গাদেশের সপ্তগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নদীপথে কামরুপে গিয়া শেখ যেলাল উদ্দিন তবরিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে সোনারগাঁয় উপস্থিত হন। অনুমান হিজরী ৭৪৬ অব্দের প্রারম্ভে ইবনে বতুতা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।
>
> সোনারগাঁ হইতে একটি চীনা জাহাজে চড়িয়া ইবনে বতুতা আরাকান ও পেগুর তীর দিয়া সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে মালিক জাহির রাজা ছিলেন। সুমাত্রা হইতে মূল যাবা পৌঁছেন।মূল যাবা সম্ভবতঃ শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচিন। সেখান হইতে চীন দেশে গিয়া কিছুদিন সেখানে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় সুমাত্রায় উপস্থিত হন।[১]

লেখক ‘যাবা’ বলতে ‘জাভা’ কে বুঝিয়েছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। লেখক অতঃপর ইবনে বতুতার লিখিত ভ্রমণকাহিনির ১৩ অধ্যায়ের বঙ্গালহ (বঙ্গদেশ) অংশের ১ম পরিচ্ছেদ (বঙ্গদেশের সুলভতা), ২য় পরিচ্ছেদ (সদকাওয়ান: সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ), ৩য় পরিচ্ছেদ (কামরূ দেশ: কামরূপ), ৪র্থ পরিচ্ছেদ (সুনারকাওন: সোনারগাঁ) অংশটুকু অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক সুনিপুণভাবে তাঁর বিবরণটি তুলে ধরেছেন।

ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনির ‘বঙ্গদেশের সুলভতা’ অংশে অবিভক্ত বাংলাদেশকে বহুবিস্তৃত দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এত সস্তা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে ‘অন্ধকারময়’ এলাকা বলেছেন। খোরাসানের (ইরানের একটি প্রদেশ) লোকে একে ‘দোযখপুর নিয়ামত’ অর্থাৎ 'সম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেছেন বলে তিনি উদ্ধৃত করেন। বাংলায় যে-সব ক্রয়যোগ্য বিষয়ের ও দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তা হলো দুধওয়ালা মহিষ, গাভি, মুরগি, পায়রা, ভেড়া, গোলাপ, ঘি, চিনি, সরিষার তেল, তুলার কাপড় এমনকি সুন্দরী বাঁদি ও গোলাম। মানুষ কেনা-বেচার কথাও আমরা এভাবে জানতে পারি। পাশাপাশি ইউরোপের সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের পার্থক্যও ইবনে বতুতা তুলে ধরেন। বিভিন্ন বিক্রয় সামগ্রীর কথা বলতে গিয়ে শেষে তিনি বলেন :

> ৩০ গজ লম্বা তুলার কাপড়ের দাম ২ দীনার এবং সুন্দরী বাঁদীর দাম ১ সোনার দীনার (যাহা পশ্চিম দেশের দুই দীনারের সমান)।আমি এই মূল্যে 'আশূরহ্' নামে একটি বাঁদী কিনিয়াছিলাম। সে খুব সুন্দরী ছিল। আমার একজন সঙ্গী ‘লুলু’ নামে একটি অল্প বয়সের গোলাম ২ দীনারে খরিদ করিয়াছিল।[২]

ইতিহাস-ঐতিহ্যের চর্চায় প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিব্রাজকের লিখিত ভ্রমণকাহিনি যে অনেক হৃতঐতিহ্য ও বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান দেয়, তা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত এসব রচনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিষয় স্থান পেয়েছিল। সাহিত্য ভাবনা ও সাহিত্য বিচারে নানান মত প্রকাশ পত্রিকাটির উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ও মননশীল সাহিত্য আলোচনা পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। মতাদর্শের ভিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়েও বাঙালি মুসলমানের জীবন ও বিশ্বাসের পরিচয় পত্রিকার রচনাকর্মের ভেতর প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লেখকরা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের চিত্র সাহিত্য-পত্রিকার অনেক গল্প এবং কবিতার মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা যেমন – ছোটগল্প, রম্যগল্প, নক্‌শা, গাঁথা, কথিকা, উপকথা, রূপকথা, ছড়া, মৌলিক কবিতা, অনূদিত কবিতা, বিদেশি কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে এ-অধ্যায়ে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়, আরো অনেক সাময়িক পত্রিকা থাকতে এরকম একটি সাহিত্য-পত্রিকার আবশ্যকতা। সমাজের সবার উন্নতির সাথে মুসলিম সমাজ সমভাবে উন্নত হতে পারে, এ বাসনা সাহিত্য-পত্রিকায় পোষণ করা হয়। সাহিত্যচর্চা এমন হবে যেন সবার কথা স্থান পায়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয় – এটিই ছিল-পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য। জাতির উন্নতির জন্য সাহিত্য একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে বিধায় পত্রিকার 'নিবেদন' এ বলা হয় :

> জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক। আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি, এমন সাহিত্য যাহাকে দণ্ডযন্ত্র (Lever) রূপে অবলম্বন করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারিব।[১]

'অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অক্ষর-সেতু স্বরূপ' সাহিত্যের উপকরণের অভাব নেই, তবে সেগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ করে সবার সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম সমাজের ভালো দিকগুলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের, বিশেষত হিন্দু সমাজকে জানিয়ে তাদের মন থেকে মুসলমান সম্পর্কে 'হীন ধারণা দূর' করতে প্রয়াসী হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'। এতদ্বিষয়ে পত্রিকার প্রাথমিক বক্তব্যটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য :

> বাঙ্গালীর কত পীরের আস্তানা, কত ভগ্নস্তূপ, কত প্রাচীন বংশ প্রবাদ, কত লৌকিক কিংবদন্তী, কত প্রাচীন পুথি তাহাদের অতীত কাহিনী বলিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহার শ্রোতা কোথায় ? আমরা চাই সেই সকল কাহিনী শুনিতে ও শোনাইতে। তাই চাই 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'।[২]

নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, শ্রমজীবী-বুদ্ধিজীবী সবশ্রেণির মানুষের কথা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'। এতে নাটক, উপন্যাস, কবিতার মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক জীবনের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সৃজনশীল

---

১ 'নিবেদন', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

সাহিত্যচর্চায় বিশ্বাসী ছিল পত্রিকাটি। ভালো গ্রন্থের প্রচারে সচেষ্ট থেকে সাহিত্যের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে পত্রিকায় বলা হয় :

> প্রত্যেক সাহিত্যে যুগের প্রারম্ভে অনেক অসার গ্রন্থের প্রচার হইয়া থাকে। আমরা চাই-এই সমস্ত অসার গ্রন্থকে সমালোচনা দ্বারা দূর করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রকে পরিষ্কার করতঃ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে। তাই চাই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা।[১]

লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক প্রতিভা লুকায়িত থাকে, অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি পেলে তা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশও পায়। মুসলমান সমাজের অনেক কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক 'নীরব সাহিত্য সাধনায় নিরত' ছিল বলে জানানো হয়। সেইসব 'নীরব সাহিত্যিকের কণ্ঠস্বর' সরব করতে সচেষ্ট ছিল সাহিত্য-পত্রিকাটি। হিন্দু রচিত সাহিত্যের তুলনায় মুসলমান রচিত সাহিত্যকর্ম সমৃদ্ধ নয়, তা বলতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লেখেন :

> হিন্দুর 'রামায়ণ' আছে, মুসলমানের 'আমীর হামজা আছে'। হিন্দুর 'মহাভারত' আছে। মুসলমানের 'কাসাসোল আম্বিয়া' আছে। হিন্দুর 'মহাজন পদাবলী' আছে। হিন্দুর 'বিদ্যাসুন্দর' আছে। মুসলমানের 'পদ্মাবতী' আছে।[২]

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য বলতে পুথি সাহিত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বাঙালি মুসলমানের 'খাঁটি সাহিত্য' বলতে পুঁথি সাহিত্যকেই বিবেচনা করা হয় পত্রিকায়। দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৬৯) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র (১৮৯৬) ন্যায় কোনো মুসলিম লেখক পুথি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করবেন, এ আশা ব্যক্ত করা হয়। সাহিত্যের মাধ্যমেই কেবল মুসলমানদের বড় হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়া হয়।[৩]

অতীত গৌরবগাঁথার মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মসম্মান আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। মুসলমান লেখকের কাব্য-সঙ্গীত রচনা, দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন, সাহিত্য-পত্রিকায় এটিও বিশেষভাবে বলা হয়। সমকালীন দেশি-বিদেশি লেখকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এতদ্বিষয়ে পত্রিকায় লেখা হয় :

> রুসো, ভলটেয়ার এবং বিশ্বকোষাগারগণের রচনা দ্বারা নব্য ফরাসী জীবন গঠিত হইয়াছে। বিষমার্ক, নিট্‌শ প্রভৃতির লেখনী দ্বারা নব্য জর্ম্মাণ- জীবন অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। টলষ্টয় প্রমুখ রুসীয় লেখকগণ দ্বারা রুষের রাষ্ট্রীয় জীবন নতুন পথে চলিয়াছে। দূরের দৃষ্টান্তের কি প্রয়োজন? বঙ্কিম, মনোমোহন, ডিএল রায়, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, বিবেকানন্দ, বিপিন পাল, ব্রক্ষবান্ধব প্রভৃতি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আধুনিক বাঙালী হিন্দুর জীবনে কি নূতন আশা, নূতন প্রেরণা, নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হয় নাই ?[৪]

উপর্যুক্ত লেখক ও লেখনির আলোকে আদর্শ মুসলমান-চরিত্র আঁকতে হবে মুসলমান সম্প্রদায়কে, শুধু আত্মপ্রশংসা করবার জন্য নয়, অনুকরণ করবার জন্যও–তাই জানানো হয়। মুসলমান রচিত সাহিত্যের মধ্যে কয়টি জীবন-চরিত বা ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন ভাব ধারণ করবার মতো হৃদয় কখনো কোনো মুসলমান সাহিত্যিক বা কবির হয়নি, এ কথা একজন লেখক

---

১ প্রাগুক্ত

২ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, 'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৮

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন।[১] তবে সাহিত্য যে পর্যায়ের হোক, তা সমগ্র বাঙালি সমাজনির্ভর সাহিত্য হওয়া উচিত। এতদ্বিষয়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> মুসলমান সাহিত্যই হউক হিন্দু সাহিত্যই হউক, সেগুলি স্বত্ব এভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালি সাহিত্য হওয়া উচিত।[২]

দেশের বা জাতির উন্নতির জন্য সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের কথা সমকালীন অন্য লেখকও *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখেন। যে সমাজে সাহিত্যের কোনো কদর নেই, সেই সমাজকে বর্বর সমাজ হিসেবে তিনি অভিহিত করেন। জ্ঞানের কথা কাগজে লিখে অসংখ্য নরনারীর দৃষ্টির সামনে তুলে ধরার নাম সাহিত্য-সেবা বলে সাহিত্য-পত্রিকার লেখক মনে করেন। বহু লেখকের লেখনী-শক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে বিশ্বের সকল অনুষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে গতি প্রদান করে থাকে, জগৎ সভ্যতার নির্মাতা তাঁরাই। কোনো দেশের মানুষ যদি এই শ্রেণির লেখক বা দেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে, তবে তারা বড় হীন। মনস্বী লেখক মোহাম্মদ (ডা:) লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) এতদ্বিষয়ে পত্রিকায় লেখেন :

> লেখক, সাহিত্যিক বা পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা প্রবাহমান করে দাও। আর কিছু আবশ্যক নাই।[৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্যের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, প্রকারভেদ, বৈচিত্র্য নিয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জীবনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক, সমাজে সাহিত্যের প্রভাব, ধর্মীয় গ্রন্থে সাহিত্যের উপকরণ, সাহিত্যের মাধ্যমে বিনোদন, সাহিত্যে অনুকরণ, সাহিত্যে পুরুষ ও নারীরঅবস্থান, সম্প্রদায় পরিচয়ে সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাদিতে পত্রিকাটির সাহিত্যচিন্তার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

সাহিত্যের স্বরূপ কী, তার উদ্দেশ্যই বা কী, এসব নিয়ে বাদানুবাদ সুদীর্ঘকালের। এই বিতর্কে মোটামুটি তিনটি দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম দল আনন্দবাদী, এরা মনে করেন মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্যই সাহিত্যসৃষ্টি, তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করতে গেলে তা স্বধর্মচ্যুত হয়। এঁরা সাহিত্যকে তুলনা করেন নিছক খেলার আনন্দের সঙ্গে। বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৮) 'সাহিত্যে খেলা' রচনাটিতে এই দলের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয় দল মনে করেন ধর্ম, নীতি, জাতীয়তা ইত্যাদি মানবহিতের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। তাঁদের মতে যে সাহিত্যের কল্যাণ করবার ক্ষমতা নেই, তা সাহিত্যপদবাচ্য নয়। বাঙালি লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-১৮৯৪) এই দলের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

---

১ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমান-সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৬৭

২ প্রাগুক্ত

৩ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'সাহিত্য ও জাতির উত্থান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৫৩

তৃতীয় দলকে বলা যেতে পারে সমন্বয়পন্থী। তাঁদের মতে, সাহিত্য আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে পারে। রসসৃষ্টির গুরুত্বকে এরা খাটো করে দেখেননা, তবে তার মধ্যে কল্যাণের একটা ভূমিকা তাঁরা স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১) এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[১]

বাঙালি মুসলমানের জাগরণকালে সাহিত্যের উদ্দেশ্যগত এসব বিতর্ক তাদের মধ্যেও উঠেছিল। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*ও এ বিতর্কে অংশ নিয়েছিল। এ বিষয়ে পত্রিকার লেখকদের মতামত বিশ্লেষণ করলে পত্রিকাটিকে কখনো দ্বিতীয় দলে, আবার কখনো তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ চিন্তাধারার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির কিছুটা দ্বৈধতা লক্ষ করা যায়। এ-বিষয়ে 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের লেখক বলেন :

> যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্দ্ধন করে, যাহা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনেজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই সাহিত্য। প্রবীণের পরামর্শ, বন্ধুর আশা, সাহিত্যের ভিতর পাওয়া যায়।মানুষের কথাই তো সাহিত্য। পৃথিবীতে যাহা আছে, তাহাই সাহিত্য। তোমার জীবনটাই সাহিত্যের একটি ধারা।[২]

মানুষের চরিত্রমহিমা, জ্ঞানীর জ্ঞান, হৃদয়ের উচ্চতা নিয়ে সাহিত্যের প্রাণ গঠিত–এই অমৃতকে যে অনাবশ্যক বলে দূরে ফেলে রাখে, জীবন তার নিরর্থক বলে লেখক মনে করেন।[৩]

জাতীয় জাগরণের প্রয়াসে সাহিত্যের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। লেখকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তার লেখায় প্রকাশ করা যায় ঠিকই, তবে তা অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিক থাকে না, হয়ে ওঠে সামষ্টিক। গভীর চিন্তাপ্রসূত কোনো লিখিত বিষয় ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে জাতিতে উত্তরণে সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তখন সেটি জাতীয় চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। কারণ 'আমি একটি ছোটো খাটো জাতি, কোটি আমি নিয়েই ত বিরাট জাতি গঠিত হয়েছে'।[৪]'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যে বৈচিত্র্য' নামক প্রবন্ধেলেখা হয়:

> সাহিত্য জাতীয় জীবনের আলেখ্য। একটা জাতি যাহা ভাবে, যাহা করে, বা যাহা করিতে আশাকরে, তৎসমুদয় তাহার সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়।[৫]

সাহিত্য শুধু নির্জীব আলেখ্য নয়। 'অতীতের সকলসাধনা সকল কামনার জ্যোতির্ম্ময় শিখা' সাহিত্যের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যতের গর্ভে সংক্রামিত হয়'।[৬]

সাহিত্যের গূঢ়ার্থ কী, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তা সাহিত্যপ্রেমিকদের জানার বিশেষ দরকার হয় না। সাহিত্য যার নিত্যসাথী, বন্ধু বা পরম আত্মীয়ের মতো, তাঁর জন্য সাহিত্য স্বাভাবিক গতিতেই চলমান থাকে। সাহিত্য জাতির দুর্দশা নিরাময় করে কী না, সত্যপথে পরিচালিত করে কী না, তা ভেবে সাহিত্যে কেউ অবগাহন করে না। সাহিত্যের পুণ্যস্পর্শে নবীন চেতনা সঞ্চারিত হয় কী না, সত্যের সৈনিক হওয়া সম্ভব

---

১ হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২২৫
২ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭, পৃ. ২৮১
৩ প্রাগুক্ত
৪ জাহেদুল হোসায়ন, 'সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৫১
৫ এম. আনসারী,'সাহিত্যে বৈচিত্র্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৮, পৃ. ১৫
৬ প্রাগুক্ত

কী না–এসব ভাবনা ধারণ করে সম্ভবত কেউই সাহিত্যে মনোনিবেশ করে না। এতদ্বিষয়ে *সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখক জাহেদুল হোসায়ন তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> সংসারের ধূলি-মলিন পথে যখন আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলে যেতে চাই, তখন কে আমাকে জীবনের সন্ধান বলিয়ে দেয়? অবস্থার ঘূর্ণি বায়ু যখন আমার জীবন-তরীকে অকালে ডুবিয়ে দিতে চায়,তখন কে এসে হাল ধরে আমাকে বাঁচায়? সেআর কেউ নয়, সে যে সাহিত্য। সাহিত্য যার সাথী,সাহিত্যে যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে, তার জীবনে কোন অবসাদ নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই–সে নির্ঝর-উচ্ছ্বসিত অমৃতের স্নিগ্ধ ধারা পানে নবীন জীবন লাভ করে। সাহিত্যের অমৃতস্পর্শে রত্নাকর দস্যু মহর্ষি বাল্মিকী হন, এ যখন মনে হয়, তখন মনটা কেমন করে নেচে উঠে।[১]

তাই লেখক বলতে চান, পরের মঙ্গল হোক বা না হোক সাহিত্যচর্চা করলে নিজের মঙ্গল হয়। মানুষ যা বলে, তা নিজেই পালন করতে পারে না। কিন্তু মহামানুষের জীবনী, জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস আলোচনা করলে, পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি বাড়ে। 'সাহিত্য সুচিন্তার সমষ্টি। সাহিত্য চর্চা তাই মানুষের হৃদয়কে পবিত্র, কুসংস্কারমুক্ত, নির্মল ও উজ্জ্বল করে'।[২]

ঐতিহাসিক প্লুটার্ককে (Plutarch) (১২০খ্রি.পূ.-৪৬ খ্রি.পূ.) বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীকারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্লুটার্কের Parallel livesবা 'সমান্তরাল জীবনীমালা'কে গ্রিক-রোমান কীর্তিমানদের জীবনীর আকরগ্রন্থরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[৩] সাহিত্য প্রসঙ্গে প্লুটার্কের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সাহিত্য-পত্রিকার জনৈক লেখক বলেন :

> প্রথমে পরের জন্য কলম ধরি; কিন্তু অনতিবিলম্বে নিজের লেখা নিজের জীবন গঠনে ব্যবহার করে নিজেকে এমন ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, যে কোন খারাপ সহবাসে পড়তাম না কেন, তাতে আমার চরিত্রে আঁচর লাগত না। বই পড়েছি, লিখেছি–এতেই আমার চরিত্র পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ যদি এমনি করে সাহিত্যালোকে পবিত্র হতো, তবে সংসার যে উদার মুক্ত পবিত্র উজ্জ্বল উন্নত হতো, তা বলা বাহুল্য।[৪]

জীবন যেমন বিচিত্র, সাহিত্যও ঠিক তেমনি বিচিত্র। মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। যারা এই পরিবর্তনকে সহ্য করতে পারেন না, তারা মানবাত্মার প্রকৃত উন্নতি কীভাবে হতে পারেতা বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না। সাহিত্য-পত্রিকার একটি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮-১৯৫৯) বলেছেন :

> তিনি (বঙ্কিম) যে মত পোষণ করিতেন তাহা Support করিবার জন্যই হোক একটা চূড়ান্ত শেষ মীমাংসা তাঁহার সাহিত্যেও আমরা পাই না। ইহা অবশ্যই কেহ অস্বীকার করিবেন না যে প্রত্যেকযুগের চিন্তার একটা আঁচ আমরা সেই যুগের সাহিত্যে একটু বিশেষভাবেই অনুভব করিয়া থাকি।[৫]

---

১ জাহেদুল হোসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৩ মোবাশ্বের আলী অনূদিত, প্লুটার্ক রচিত জীবনীমালা : ১ম খণ্ড, *বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র*, ঢাকা ২০১১, পৃ. ৫
৪ জাহেদুল হোসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৫ সুধীর কুমার সেন, সাহিত্যের কথা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯, পৃ. ৩০৬-৩০৭

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প মহাকাব্য বিষয়ক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য-পত্রিকায় ৩য়বর্ষ ৩য় সংখ্যায় 'কথা সাহিত্য' নামক এরকম একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা মূলত উপন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা। দেশি-বিদেশি উপন্যাসের নিয়মিত রসাস্বাদন অনেকের যেমন আগ্রহের বিষয়, তেমনি ভালো উপন্যাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অপার তৃপ্তিলাভের আনন্দে অনেকেই ধন্য হন। স্যার ওয়াল্টার স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) ঐতিহাসিক রোমান্স, ভিক্টর হুগোর (১৮০২-১৮৮৫) উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি, তাঁর সাহিত্যপিপাসা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অন্যায় নয় বলে পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়। যে-কোনো ভাষার সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের প্রভাব অপরিসীম। লেখকের সক্ষমতা অনুযায়ী উপন্যাস ও গল্পেরমান ভালো বা মন্দ হয়ে থাকে। মানবচরিত্র সম্পর্কে যাদের গভীর জ্ঞান আছে, তাঁরাই নিপুণতার সঙ্গে উপন্যাস রচনা করতে পারেন। উপন্যাসের প্রকারভেদ নিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* লেখা হয়:

> উপন্যাসেরও শ্রেণিভেদ আছে। কোন উপন্যাস সমস্যামূলক, উহাতে সমাজ ও সংসারের জটিল বিষয়গুলি মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্যও উপন্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সামাজিক সমস্যা কোন কোন উপন্যাসে আলোচিত হয়। যে সকল পাশ্চাত্ত্য জাতি স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলোর পরিবেষ্টনে লালিত পালিত, তাহাদের রচিত উপন্যাসগুলিতে দুঃসাহসিক ঘটনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া নিছক প্রেমের গল্প উপন্যাস তো আছেই, তাহাতে কখনও বা মানবহৃদয়ের চুল-চেরা বিশ্লেষণ কখনও বা নর-নারী পরস্পরের জন্য প্রেম-বেদন বর্ণিত হইয়া থাকে।[১]

'চলমান সময় এবং সমাজশাসিত মানুষের আনন্দ বেদনা, আশ্বাস-হতাশ্বাস, প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা-ব্যর্থতার অন্তরঙ্গ রূপকথা হচ্ছে উপন্যাস। দেশ-কাল-সভ্যতার বহুবিচিত্র ভাবসত্যই উপস্থাপিত হয় উপন্যাসে'।[২] সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। গল্প বা উপন্যাস পড়তে পাঠকের তুলনামূলক আগ্রহ বেশি দেখা যায়। একটি ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করে অনেক পাঠকের চিত্ত করুণরসে বিগলিত বা হাস্যরসে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) বা বৈজ্ঞানিক এডিসনের (১৮৪৭-১৯৩১) নাম অল্পসংখ্যক লোকেরই পরিচিত, কিন্তু চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-১৮৭০) উপন্যাস ও কিপলিংয়ের (১৮৬৫-১৯৩৬) গল্পের রসে কতলোক আত্মহারা তার ইয়ত্তা নেই। তেমনি বাঙালি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) উপন্যাস ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'বহু মানুষের সুখে দুঃখে গড়া' কাহিনিগুলো অসংখ্য পাঠককে তৃপ্তি দান করেছে। গল্প বা উপন্যাস যে চিত্তাকর্ষক হয়, তার কারণ এই যে, এতে মানবের চিত্ত-বীণার রাগিনী প্রতিধ্বনিত হয়। আদিকাল থেকে যে ভালো-মন্দ প্রবৃত্তি মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে উপন্যাস বা কথাসাহিত্যে তার চিত্র প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসে আনন্দের সাথে শিক্ষাও পাওয়া যায়। অপরিচিত দেশ ও অতীত যুগের ছবি চোখের সামনে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয়:

> যেখানে জীর্ণ অস্থি ও কঙ্কাল ছিল, নিপুণ ঔপন্যাসিক তাতে রক্ত মাংসের শরীর গড়িয়া তোলেন।তখন তাহাদের মূর্তি দেখিয়া তাহারা যে অতীতযুগ ও অপরিচিত দেশের লোক তাহা মনে হয় না।[৩]

---

১ মাখন গঙ্গোপাধ্যায়, 'কথা সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭, পৃ. ১৮৩
২ গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৬৬
৩ 'কথা সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

উপন্যাস হাতের কাছে পেয়ে পাঠ করার চেয়ে ভালো উপন্যাস নির্বাচনের সক্ষমতা পাঠকের থাকতে হবে। ভালো লেখকের উত্তম উপন্যাস বাছাই করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, একটি উপন্যাস পড়ে শেষ করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়। ভালো-মন্দ বিচার না করে উপন্যাস পাঠ উচিত নয়। যে বইখানি আমরা পড়তে চাই, তার ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা প্রথমে অর্জন করতে হবে। যেসব লেখকের রুচি বিকৃত ও ভাব দুর্নীতিপূর্ণ তার উপন্যাস বিষের মতো ক্ষতিকর হতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয়:

> উহাতে আমাদের চিন্তাশক্তির বিলোপ হয়,স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না, গভীরবিষয় অনুধাবন করিবার অক্ষমতা জন্মে এবং চপলতা ও চটুলতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি হয়।[১]

উপন্যাসের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সাধারণত আমোদ পাওয়ার জন্যই তা পাঠ করি। এখন হয়তো আনন্দের অনেক মাধ্যম বিদ্যমান, কিন্তু সমকালে রুচিশীল পাঠকের বিনোদনের একটা উপকরণ হিসেবে উপন্যাস পাঠকে বিবেচনা করা হতো, তা সাহিত্য-পত্রিকায় স্পষ্ট করা হয় এভাবে:

> আমাদের মন যখন সাংসারিক কাজ কর্ম্মক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের জন্য লঘুসাহিত্যের প্রয়োজন।যাহারা উপন্যাস রচনা করিবেন, তাঁহাদেরওএ বিষয়ে দায়িত্ববোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।[২]

উপন্যাস লিখতে গেলে যে উপাদানের অভাব হয়না, তা স্পষ্ট করে পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। তবে উপাদান অনুসন্ধানের জন্য যে শিল্পদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন তার উপস্থিতি আবশ্যক। দেশের যে সব অভাব অভিযোগ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করা যায়, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যেসব সমস্যা জনসাধারণের সামনে প্রতিভাত হয়, তাকে উপজীব্য করে উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত হতে পারে। তবে সেসবের জন্য যথার্থ শিক্ষা ও সাধনা প্রয়োজন। শিক্ষা ও সামর্থ্য সীমিত হওয়ার কারণে বাঙালি জীবনের বাইরের চিত্র উপন্যাসে সেকালে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৬৮-১৯৩৭) *উড়িষ্যার চিত্র* (১৯২২) ছাড়া তৎকালীন সময়ে বাঙালির রচিত আর কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নেই, যাতে ভারতের অন্য প্রদেশের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল বলে সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-মুসলমান একে অপরের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে কতটুকু অবহিত, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় সাহিত্য-পত্রিকার একটি সংখ্যায়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় বর্ষ (কার্তিক ১৩২৭) অর্থাৎ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান রচিত সাড়া জাগানো বেশ কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) *বিষাদ সিন্ধু* (১৮৯১) ছাড়াও চৌধুরী মোহাম্মাদ আর্জুমান্দ আলীর (১৮৫০-১৯০০) *প্রেম দর্পণ*(১৮৯১); শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) *লাইলী-মজনু* (১৯০৪); ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) তারাবাঈ (১৯০৮), *রায় নন্দিনী*(১৯১৬); রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) *মতিচূর ১ম খণ্ড* (১৯০৬); মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) *রায়হান* (১৯১৯); কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) *বাঁধনহারা* (১৯২০) উপন্যাসের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

করা যায়। মুসলিম সমাজের চিত্র স্বাভাবিকভাবেই স্বধর্মের লেখকের উপন্যাসে উঠে এসেছিল। তবে মুসলিম লেখকের উপন্যাস *প্রেম দর্পণে* 'মুসলিম জীবনাগ্রহ তেমন নেই, যতোটা আছে হিন্দু সমাজের চালচিত্র'।[১] তবে কিছু ব্যতিক্রম বাদে হিন্দু লেখকের উপন্যাসে মুসলিম সমাজের চিত্র সঠিকভাবে ফুটে ওঠেনি বললেই চলে। নিরপেক্ষভাবে উভয় সমাজ সম্পর্কে জেনে তার যথাযথ রূপায়ণ উদারতার পরিচয় বহন করে। এতদ্বিষয়ে একজন অমুসলিম প্রবন্ধকার সাহিত্য-পত্রিকার পাতায় প্রশ্ন রাখেন :

> আমাদের ঘরের কোণে যে বিশাল মুসলমানসমাজ রহিয়াছে তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ রীতি ও নীতিসম্বন্ধে আমরা এত দূর অজ্ঞ যে, তাহা বলিতে লজ্জাবোধ হয়। কয়জন শক্তিশালী বাঙ্গালী লেখক তাহার চিত্র অঙ্কনে যত্নশীল হইয়াছেন?[২]

প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজ লেখক রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের (১৮৬৫-১৯৩৬) কথা সাহিত্য-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, যিনি ভারতবর্ষের ঘটনা নিয়ে ইংরেজিতে উপন্যাস লিখে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। স্বভাবতই আমাদের বাঙালি লেখকদের ঘরের খবরের পাশাপাশি প্রতিবেশী ও দূরদেশের সমাজের খবরও তুলে ধরা উচিত লেখনির মাধ্যমে, এ আশাবাদ সাহিত্য-পত্রিকায় ব্যক্ত করা হয়।

সাহিত্যের অন্যতম শাখা 'ছোটগল্প' বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*, 'গল্প সাহিত্য' ও 'ছোটগল্পের ধারা' শিরোনামে। ছোটগল্পের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তু নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে এর পার্থক্য, মানবজীবনে এর প্রভাব ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকপাত ও বিশ্লেষণ করা হয়। ইংরেজি Fiction শব্দের বাংলা হিসেবে ছোটগল্পকে 'গল্প-সাহিত্য' বলে অভিহিত করা হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*। পত্রিকায় ছোটগল্পকে 'কল্পিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত' বলে বিবেচনা করা হয়। সাহিত্যের সঙ্গে গণিতের তুলনা করে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* কাজী আকরাম হোসায়ন (১৮৯৬-১৯৬৩) লেখেন :

> সাহিত্যিক যে তুলি দিয়া আঁকেন তাহা কল্পনা, যে ফ্রেমের মধ্যে ছবিটা বসান তাহা মিথ্যা, কিন্তু ছবিটা অতি সত্য। এ বিষয়ে সাহিত্যের সঙ্গে গণিতের তুলনা দেয়া চলে। গণিতবিদ যত রেখা টানেন তাহার কোনটাই রেখা নয়, যত বিন্দু বসান তাহার কোনটাই বিন্দু নয়,অথচ তিনি যে প্রতিজ্ঞাগুলি প্রমাণ করেন তাহা অকাট্যসত্য। সাহিত্যিকও গণিতবিদ উভয়েরই ফাঁকির মধ্যেদিয়া সাচ্চার প্রতিষ্ঠা করেন, উভয়েই Symbol-এর সাহায্যে fact এ উপনীত হন।[৩]

যে-কোনো প্রকার সাহিত্যের এবং সকল সাহিত্যিকেরই সাধনার বিষয় মানবচরিত্রের বিকাশ ও উন্মেষ ঘটানো। মানব চরিত্রে যা আছে তা প্রদর্শন, এবং যা নেই তার আবাহনই সাহিত্যের লক্ষ্য হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো সাহিত্যিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে লেখেন না, তাঁদের রচনা মানবসমাজের ওপর কীরূপ কাজ করবে, তাও চিন্তা করেন না, তথাপি তাঁদের রচনা সাহিত্যের মোটামুটি উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্যের কিছু অংশ বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য:

---

১ রকিবুল হাসান, বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারা, *মীর মশাররফ হোসেন থেকে আকবর হোসেন*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১১, পৃ. ১৮-৩৪

২ মাখন গঙ্গোপাধ্যায়, 'কথা সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৩ কাজী আকরাম হোসায়ন, 'গল্প সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ১৮১

কবি যখন আপন মনে গান করেন, তখন তিনি পরোক্ষভাবে মানবচরিত্রেরই বিকাশ করেন, আমি তাঁহার প্রতি কথায় মানবহৃদয়ের গূঢ় সন্ধান পাই, তাঁহার সুখ-দুখের কাহিনীতে মানবজাতির সুখ-দুখের ইতিহাস লিখিত দেখিতে পাই। এমন কোন সাহিত্য নাই উল্লিখিত দুইটি উদ্দেশ্যেও মানবচরিত্রের প্রকাশ বা মানবচরিত্রের উন্মেষ–একটি না একটি সাধন করিতেছে।[১]

যে-কোনো বিষয় নিয়ে লেখার মধ্যে সাহিত্যগুণ থাকা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বটে। কবিতা, ছোটগল্প, চিত্রশিল্প, উপন্যাস, মহাকাব্য,ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র সব বিষয়কে বৃহত্তর অর্থে 'সাহিত্য' হিসেবে বিবেচনা করা হয়সাহিত্য-পত্রিকায়। সকল প্রকার সাহিত্যেরই একটি প্রতিপাদ্য বিষয় এবং একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের মন যেন নীচের দিকে না যায়, কুপ্রবৃত্তি এবং সঙ্কীর্ণ হৃদয় যেন তার মধ্যে না থাকে, সকল সৎ সাহিত্যেরই সেই চেষ্টা থাকে। কবি, গল্পলেখকও চিত্রকরের পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* সমালোচক লেখেন:

কবি অনেক সময় কেবল আভাস দিয়াই চলিয়া যান; গল্প লেখক তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি করেন।কবি, চিত্রকর এবং ছোটগল্পের লেখক তিনেরই কার্য্য প্রায়ই এক, কেবল বেশি কমের যা প্রভেদ। ভাল কবি, ভাল চিত্রকর এবং ভাল লেখক কেহই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কিছু শিক্ষা দেন না; তাঁহারা কেবলছবিআঁকেন, আমাদের হৃদয়ে তাহার কেমন প্রতিলিপি উঠিল তাহা দেখেন না।[২]

উপন্যাস ও মহাকাব্যের প্রকৃতি ও স্বভাব এগুলি অপেক্ষা কিছু ভিন্ন বলে সাহিত্য-পত্রিকায় দাবি করা হয়। এ-দুয়ের ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত, কথাও অনেক বেশি, কাজেই ইঙ্গিতটাও অনেক প্রকট। কারণ বেশি কথা বলতে গেলেই আর আত্মগোপন করা চলে না। মহাকবি, ঔপন্যাসিক, শিক্ষক সম্পর্কে বলতে গিয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* বলা হয়:

মহাকবি অনেক সময় গোড়াতেই নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় ঘোষণা করিয়া দেন; উপন্যাস লেখকও প্রকাশ্যে না হউকআকারে প্রকারে আসল কথাটি জানাইয়া দেন।উপন্যাস লেখক ও নীতি শিক্ষকের মধ্যে তফাৎ এই যে, একজন ইঙ্গিতে এবং আভাসে আপনার কথা প্রচার করেন, অপরজন প্রকাশ্যভাবে উপদেশ বিতরণ করেন।[৩]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা, সাহিত্যক্ষেত্রে গল্পের আবশ্যকতা কতটুকু, বিদেশি সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রাচুর্য, বাংলাদেশে গল্পের ধারা কীরূপ হওয়া উচিত–ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 'ছোটগল্পের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়সাহিত্য-পত্রিকায়। ছোটগল্পের লেখক যাদেরজন্য গল্প লেখেন, সেই পাঠককুল গল্পটি সম্পর্কে অবহিত কী না, এবং নিজে আদৌ গল্প পড়েন কী না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। শক্তিমান লেখক আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন:

যাহাদের জন্য গল্প লেখা হইতেছে বাস্তবিক তাহারা পড়িতেছেন না। এ কথাগুলি সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখিত গল্প সম্বন্ধে খাটে। অবশ্য চিত্ত বিনোদনের জন্য কলাপূর্ণ গল্পে কেবল প্রাণের খেলা প্রদর্শিত হয়। তাহা সাধারণের জন্য হয়ত সাজে না। উপরোক্ত গল্প যাঁহারা পড়েন–তাঁহারা কেবল গল্পের

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত

বাহ্য সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন।তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন একটা বিচার করিতে পারেন না। সুতরাং ইহাতে গল্প পাঠের সার্থকতা হইল কোথায়?[১]

সাহিত্য মানবের চিন্তাপ্রবাহ ও তার ফল লিপিবদ্ধ করে রাখে। মানুষের মন আছে, চিন্তাধারা আছে, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ আছে বলেই তার মাধ্যমে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য নানাবিধ চিন্তা লিপিবদ্ধ করে পরবর্তীকালের মানবজাতির চিন্তাশক্তি আরো বৃদ্ধি করেছে। কারণ মানবমন নিরন্তর প্রবহমান ও নবচিন্তাশ্রয়ী। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র লেখক প্রাচীন গল্পের ধারার বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

> সেকালে আর্য্য কবিরা নিরবচ্ছিন্ন নিরালার মধ্যে বসিয়া বসিয়া কত না সূক্ষানুসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণপূর্বক কত কি উদ্ভট গল্প রচনা করিয়াছিলেন–গ্রীকগণ নানা প্রকার Legend বা পরীর গল্প ও আরবগণ স্বপ্নপুরীর দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, কারণ তাহাদের হাতে চিন্তা করিবার সময় যথেষ্ট ছিল। আমাদের কালে তাহার বিপরীত দেখিতে পাইতেছি।[২]

সমকালে যা কিছু পরিদৃশ্যমান তা-ই নিয়ে ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নিরূপণ করা হয়, যার কারণে বিস্ময়-বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি অনেক ক্ষেত্রে আঁকা সম্ভব হয় না বলে সাহিত্য-পত্রিকায় জানানো হয়। আধুনিক যুগে মানুষের 'নানা অভাব' আবিষ্কৃত হচ্ছে, পাশাপাশি তার কাজও বেড়েছে 'অনন্ত অভাব' পূরণের জন্য। মানুষ সাধারণত দিনরাত নানা কাজে-অকাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ অন্তরের দিকে তাকাবার আর তার অবকাশ নেই। ছোটগল্পকে তাই নানা প্রকার ভাবের সমাহার বলা যেতে পারে। লেখক ছোটগল্পের সমকালীন অবস্থার দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে লেখেন:

> ছোটগল্প তাই নানা প্রকার ভাবকে সরল বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক পৃথক প্রকাশ করিতেছে–দুনিয়ার মাঝে মনের শক্তি কাহার কিভাবে খেলিতেছে, মানব সমাজ কিভাবে নড়িতেছে চলিতেছে–কখন সংযত কখনো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কিভাবে বিশ্বসৌন্দর্য্যের পুষ্টি সাধন করিতেছে, ইত্যাকার এই প্রকার খণ্ডভাবের সমষ্টি ভাষার মধ্যে আসিয়া লীন হইয়া ছোট গল্প আকারে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে অল্প কথায় সোজা ভাষায় এই ভাবের প্রকাশ সাধন করা ছোটগল্পের কাজ, যাহাতে সাধারণ মানব সমাজ সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূরকল্পে অল্প সময়ের মধ্যে মনের উপর দিয়া সত্যভাবের শীতল প্রবাহ বহাইয়া স্ব স্ব শ্রান্ত মনে শান্তি আনয়ন করিতে পারে।[৩]

বলা যায়, মানবমনে আনন্দ যোগানো ছোটগল্পের একটি প্রধান কাজ। 'দেহের ক্লান্তি নিবারণের জন্য আহার নিদ্রা, কিন্তু মনের ক্লান্তি নিবারণের জন্য সাহিত্য'।[৪] সমাজে এখনো কর্মব্যস্ত বহুলোক আছেন, যারা বাস্তবিকই ছোটগল্প পড়ে অপার আনন্দ লাভ করেন এবং সারাদিনের ক্লান্তি লাঘব করে থাকেন বলে সাহিত্য-পত্রিকায় বলা হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পরপর দুটি সংখ্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সাহিত্যকর্মের উপর শশাঙ্কমোহন সেনের (১৮৭২-১৯২৮) দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, একটি 'বঙ্গের প্রথম রোমান্টিক কাব্য' ও অপরটি 'প্রেম ও গীতি কবিতা' নামে। শিরোনামে উল্লেখ না করলেও আলোচনার

---

১ আবুল হুসেন, 'ছোটগল্পের ধারা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ২৬৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৪ প্রাগুক্ত

ভেতরে মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'কে (১৮৫৯) বঙ্গের প্রথম রোমান্টিক কাব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। এতদ্বিষয়ে প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়:

> তিলোত্তমাসম্ভব নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কাব্য। কেবল কালের হিসেবে নহে, উহা কাব্যের অন্তরাত্মা ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও বঙ্গে আদ্যসৃষ্টি। নিখুঁত সৌন্দর্য্য তত্ত্বের ঋক্-সঙ্গীতময় মহাকাব্য। সৃষ্টির আদিম যে সৌন্দর্য্যমূর্তি, যে সৌন্দর্য্য সবেমাত্র বিশ্বকর্মার হৃদয় এবং তাহার দেবী সৃষ্টিশালা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিমোহিনীর মূর্ত্তিতে বিশ্বের বিস্মিত নয়ন সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি তখনো কাহারও কন্যা অথবা বধূরূপে সম্বন্ধ লাভ করে নাই–কবি তাহারই মহিমাগীতি গান করিয়াছেন। যাহা সাহিত্য সকল আদিরসের আদিতম রস কবি তাহারই পরিস্ফুট নগ্নমূর্ত্তি এ কাব্যে ধ্যান করিয়াছেন।[১]

এই কাব্যে সুস্পষ্টভাবে 'মনুষ্যরস' বা human interest নেই, আছে কেবল সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য-উপাসনা–art for art's sake! এতে একদিকে যেমন প্রাচীন বাংলার ভাবরাজ্যে এবং ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহ আছে, তেমনি অন্য দিকে এর ভিত্তিমূল বৃহৎ ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যেই স্থির আছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' আপন মাহাত্ম্যেই বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী বঙ্গভাণ্ডারে আদি আসন লাভ করে দাঁড়িয়ে আছে[২] –একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

প্রাচ্যের কালিদাস, ভবভূতি আর পাশ্চাত্যের হোমার, মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪), কীট্সের (১৭৯৫-১৮২১) প্রভাব মধুসূদনের কবিতায় প্রবলভাবে উপস্থিত, যা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'ও লক্ষণীয়।কালিদাস ও কীটসের সৌন্দর্যতত্ত্ব A thing of beauty is a joy for ever.'-কে আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন মধুসূদন। এ-প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের উক্তি লক্ষণীয় :

> এই কাব্যে মধুসূদন ইংল্যান্ডের কীট্স এবং ভারতের কালিদাসের ন্যায় নিঁখুত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কবি। মধুসূদনের মধ্যে গ্রীক এবং ভারতীয় সৌন্দর্য্যবাদ সম্মিলিত হইয়াই অপরূপ মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।কবি কীট্স এর Endymion এর ন্যায় উহা নিখুঁত সৌন্দর্য্যমুগ্ধ এবং ভাবুকতাময়ী মহাবাণীর আত্মসিদ্ধ প্রকাশের শক্তিতেই সমৃদ্ধময় হৃদয়খানি লইয়া বঙ্গ সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিল। এখনও অসঙ্গ মাহাত্মেই দাড়াঁইয়া আছে। উহার প্রকৃত কোন উত্তরাধিকারী বঙ্গসাহিত্যে জন্মে নাই।[৩]

শশাঙ্কমোহন সেনের 'প্রেম ও গীতিকবিতা' শিরোনামের প্রবন্ধে মধুসূদনের রচনাশৈলী ও সাহিত্যাদর্শের আরেকটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। 'ব্রজাঙ্গনা'র স্বতন্ত্র কবিতাগুলির কাঠামো(Form) ও শিল্প-প্রমূর্তি (Technique) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রিক 'ওড' হইতে অভিন্ন' বলে আলোচক মত ব্যক্ত করেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রধান শক্তি নাটকীয়তা। প্রবল অহমিকতাতত্ত্ব এবং নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উল্লাসিনী রমণী বলেই ওদের 'বীরাঙ্গনা' নাম সার্থক হয়েছে। ওভিদের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩-খ্রিস্টপূর্ব ১৮) Heroic Epistlesএবং পোপের (১৬৮৮-১৭৪৪) Episitles-এর অনুকরণে মধুসূদন তাঁর কাব্যের নামকরণও প্রকাশ-প্রকরণ গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য ধারার প্রেমের আদর্শ কাব্য দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এতদ্বিষয়ে আলোচক বলেন:

---

১ শশাঙ্কমোহন সেন, 'বঙ্গের প্রথম রোমান্টিক কাব্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ. ২৬৮

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-১৭০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

> মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 'প্রেম' কবিতার আদর্শ প্রথম আমদানী করিয়াছে এবং ব্রজাঙ্গনা অন্তত 'প্রেম' কবিতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আরও বুঝিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যগন্ধ সত্ত্বেও ব্রজাঙ্গনাকাব্য অন্যদিকে ভারতীয় আদর্শের– বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা।[১]

তবে 'ব্রজাঙ্গনা' প্রধানত প্রেমাদর্শেরই কবিতা।রেঁনেসাসের পর থেকে ইউরোপীয় সাহিত্যে কবিদের ব্যক্তিত্বগন্ধী এবং আত্মসম্পর্কগন্ধী প্রেমকবিতার প্রচলন হয়েছে, দান্তে (১২৬৫-১৩২১) ও পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) এর সূত্রপাত করেছিলেন।[২] মধুসূদনের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা নবযুগের ইটালির (রেনেসাঁস) কাব্যধারা থেকে উৎসারিত। শেক্সপিয়র, মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের সনেট ইংরেজি খণ্ডকাব্য সাহিত্যের একটা প্রধান সিদ্ধি। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে সনেট আমদানি করলেন। সনেটের মধ্যে একটা চিত্তসংযম আছে, ভাবতত্ত্বে ও ধ্বনিতত্ত্বে নিপুণ অধিকারের প্রয়োজন আছে, সে কারণে সনেট রচনায় প্রতিপত্তি লাভ করা সহজ নয়। মধুসূদন কী ছিলেন, তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত ও প্রগাঢ় ছিল, তা বুঝতে হলে, চতুর্দ্দশপদী কবিতা পড়তে হবে। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় মুদ্রিত সমালোচক শশাঙ্ক মোহনের উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য:

> সাহিত্যিক মধুসূদনের বাকশক্তি এবং বাকসংযম, চিত্তশক্তি এবং চিত্তসংযম কি পরিমাণে ছিল, তিনি বিশ্বসংসারের কতদূর আপনার অধিকারে আনিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাইতে চাইলেও সনেটগুলিই অন্বেষণ করুন। একবারে আশ্চর্যান্বিত না হইয়া উপায় থাকিবে না।[৩]

তাই বলা যায়, 'মধুসূদনের গ্রাস করার শক্তি যেমন অসাধারণ, পরিপাকের এবং প্রকাশের শক্তিও তেমনই অসাধারণ'।[৪] মধুসূদন শেক্সপীয়র-মিল্টন এবং বায়রণ-ওয়ার্ডসওয়ার্থের যথার্থ উত্তরাধিকার। হোমার থেকে হুগো, বাল্মীকি থেকে কবিকঙ্কণ-ভারতচন্দ্র, কেউ-ই কবির আনন্দদৃষ্টি, প্রীতিদীপ্তি এবং মমতানুভূতি থেকে বাদ পড়েনি। লেখকের ভাষায় 'বঙ্গেদ্বিতীয় মধুর জন্ম হইবেনা এবং একালে উহার সম্ভাবনাও নাই'।[৫]

সমকালে আলোচিত ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) প্রণীত বহুল আলোচিত উপন্যাস 'শেখ আন্দু'র ওপর এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী একটি মনোজ্ঞ আলোচনা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। এটি লিখেছেন সৈয়দ এমদাদ আলী। উপন্যাসটির নাম শুরুতে ছিল 'সেখ আন্দু'; পরে বানান সংশোধন করে হয় 'শেখ আন্দু'। এটি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত এগারোটি কিস্তিতে বত্রিশটি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপা হয়েছিল শৈলবালা ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে সেটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয় 'ঘোষজায়া' নামে।[৬]

'শেখ আন্দু' (১৯১৪) উপন্যাসটি প্রধান চরিত্রের নামেই নামকরণ করা হয়েছে। আনোয়ার ওরফে আন্দুর জীবন ও দ্বন্দ্ব তুলে ধরাই ছিল লেখকের মূল লক্ষ্য। তার ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনি বর্ণনার পূর্বে লেখক

---

১ শশাঙ্কমোহন সেন, 'প্রেম ও গীতি কবিতা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৩৭
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৫
৬ শিবনারায়ন রায়, শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আন্দু', *প্রবন্ধ সংগ্রহ : ২য় খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ২০০৩, পৃ. ২৫৩

আন্দুর বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। শেখ আন্দুর পুরো নাম শেখ আনোয়ার উদ্দিন। দর্জি পিতার প্রত্যাশা ছিল–পুত্র আন্দুও এই পেশা গ্রহণ করবে। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী স্বভাবের আন্দু পিতার মৃত্যুর পর বাবার দর্জির দোকান বিক্রি করে, ধার-দেনা শোধ করে ড্রাইভারের কাজ শিখে ভাগলপুরের চৌধুরী সাহেবদের বাড়িতে গাড়ির চালক হয়।

চৌধুরী সাহেবের মেয়ে লতিকা আন্দুর রূপ ও গুণমুগ্ধ, বার বার কারণে অকারণে আন্দুর কাছে উপস্থিত হয়। বহু গুণে গুণান্বিত আন্দু যখন নিজের ঘরে সেলাইয়ের কাজ করছে সে তখন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ নিয়ে আন্দুর সামনে যায়। আন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় একটি একটি করে গোলাপের পাঁপড়ি ছিড়তে থাকে। দৃশ্যটি আঁকতে লেখিকা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। মনিবের মেয়ে হয়ে ড্রাইভার সহিসদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যদিও ঠিক নয় তবুও লতিফা যে কোনো কৌশলে আন্দুর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করত। আবেগ আকর্ষণ কীভাবে সংস্কারকে জয় করে, ধনী-দরিদ্র জাতধর্মের পার্থক্য মানে না শৈলবালার লেখায় তা ফুটে উঠেছে। এতদ্বিষয়ে সৈয়দ এমদাদ আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> লেখিকা আন্দুর ভিতর দিয়া একটি সরল, সবল, প্রেম প্রবণ, সত্য সন্ধ মুসলমান চরিত্র আঁকিয়াছেন। মুসলমান যে কামনা বা আসক্তিহীন হইয়া ও একটি হিন্দু নারীকে বা যে কোন জাতীয় নারীকে ভালবাসিতে পারে, আন্দু-চরিত্র তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। ভালবাসার অর্থ কামনার পরিপূরক নয়, আসক্তির প্রলেপ সিঞ্চন নয়। কামনা ও আসক্তি অপবিত্র, ভালবাসা পবিত্র। অতএব আন্দু চরিত্র মহান।[১]

সৈয়দ এমদাদ আলীর এ আলোচনা লেখিকা শৈলবালার দৃষ্টিগোচর হয়। জানুয়ারি ১৯৫৪ তে প্রকাশিত ‘শেখ আন্দু’র তৃতীয় সংকরণে লেখিকা তা উল্লেখ করে তাঁর নিজের মন্তব্য যোগ করেন। লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া সৈয়দ এমদাদ আলীর আলোচনার নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করেন:

> সাহিত্যের ভিতর দিয়া এক জাতির প্রতি আর এক জাতির যে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা মারাত্মক, তাহা বিঘ্ন উৎপাদক। উহা জাতি সাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া এমন বিরোধের বীজ বপন করে, যাহা সহজেবিনাশ প্রাপ্ত হয় না, বরং বাহিরের আলো বাতাস পাইয়া উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার বিশেষ অবসর পায়। সহানুভূতির প্রলেপ সিন্ধনে অতি পুরাতন ক্ষতও শুষ্ক হইতেপারে, শুষ্ক হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লেখকদেরই এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। ইহার ভিতরে বহুমঙ্গল নিহিত আছে।[২]

অতঃপর নিজের মন্তব্যটুকু সংযোজন করেন লেখক :

> নিশ্চয়ই। সৈয়দ সাহেবের সহিত সুর মিলাইয়া আমিও বলি- ‘হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন সম্ভবপর নহে’। প্রকৃত মিলন প্রাণে-মনুষ্যত্বের পটভূমিকায়। ভৌগলিক সীমারেখায় তাহা সীমাবদ্ধ নহে, সঙকুচিত বা বিঘ্ন- সঙ্কুলও হতে পারে না। অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। সুবিস্তৃত দুনিয়া আজ সুদূর- প্রসারিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। দৃষ্টিকোণের প্রসার ও পরিবর্তন আবশ্যক। মনুষ্যত্বের আবেদন আমাদের সকলের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করা উচিত। প্রেমের পথই প্রকৃত পথ।[৩]

---

১ সৈয়দ এমদাদ আলী, ‘শেখ আন্দু : সমালোচনা’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৮, পৃ. ২০২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩ ড. শিরীন আখতার সম্পাদিত, *শৈলবালা ঘোষজায়া : শেখ আন্দু*, আবিষ্কার সংস্করণ, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাটাঁবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৭

শৈলবালার আগে কোনো বাঙালি হিন্দু লেখক অথবা লেখিকা কোনো মুসলমান যুবককে নায়ক এবং হিন্দু তরুণীকে নায়িকা করে উপন্যাস লিখেছেন বলে জানা যায় না। হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলমান তরুণীর অনুরাগ নিয়ে কাহিনি রচিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমান যুবকের প্রতি হিন্দু তরুণীর অনুরাগ 'শেখ আন্দু' প্রকাশের একশ বছর পরেও হিন্দু সমাজে বা হিন্দু রচিত উপন্যাস সাহিত্যে খুব বেশি নজরে পড়ে না। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) বা আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) নিতান্তই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে শৈলবালা যে কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন, তা শুধু সে যুগে বিস্ময়কর নয়, এখনও প্রায় বৈপ্লবিক ঠেকে।[১]

'শেখ আন্দু' ছাড়াও শৈলবালা ঘোষজায়ার আরো তিনটি উপন্যাসের (জন্ম-অপরাধী, জন্ম-অভিশপ্তা, লীনার শিক্ষা) আলোচনা এবং তিনটি ছোটগল্প (আয়েসা, বিদায় গ্রহণ, লোকসানের সন্ধ্যায়) ও একটি কবিতা (মানুষ হতে চাই) প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়*।'জন্ম-অপরাধী' উপন্যাসের আলোচনায় সমালোচক উপন্যাস রচনায় শৈলবালা ঘোষজায়ার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। নারীজীবনের চিরন্তন দুঃখ বেদনার করুণ কাহিনি এই পুস্তকের পাতায় পাতায় অঙ্কিত হয়েছে। নায়িকা অপেরার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সমালোচক-সম্পাদক লেখেন :

> তথাকথিত শিক্ষিত স্বামীর হাতে পড়িয়াও 'অপেরা' সারাজীবন যে দুর্নীতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে তাহা পড়িয়া চোখের পানি সম্বরণ করা যায় না। বিনোদলালের অধঃপতনের চিত্রটি স্বাভাবিকই হইয়াছে। শিক্ষিত যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড না থাকিলে তাহাদের পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে তাহার পরিচয় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।[২]

শৈলবালার *জন্ম-অভিশপ্তা* উপন্যাসের আলোচনা (গ্রন্থ-পরিচয় শিরোনামে) *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচক 'নারী লেখিকার করুণ রসসিক্ত উপন্যাসখানি' পড়ে নারীর জীবন যে আগাগোড়া 'একটি হৃদয় বিদারক তপ্ত স্থানে গড়া' বলে মন্তব্য করেন। সংসার ও সমাজের চাপে নারীর জীবন এদেশে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে না, শুধু অশ্রু ও আর্তনাদের হাহাকারে তা ভরপুর হয়ে থাকে, এ কথা সাহিত্য-পত্রিকায় বলা হয়। পুরুষের হাতে নারী নিরন্তর যে কত নিগ্রহ সহ্য করে থাকে, তাই এই উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে। শৈলবালা নারীজীবনের করুণ ও হৃদয়বিদারক পরিণাম খুব সুস্পষ্টভাবে এঁকেছেন। এতদ্বিষয়ে পত্রিকায় নারী চরিত্র সম্পর্কে লেখা হয় :

> জগদ্ধাত্রীর চরিত্রে নারী চরিত্রের মাধুর্য্য, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা ফুটিয়াছে ভাল। উপর্য্যুপরি আঘাত সইয়া জগদ্ধাত্রীর সুপ্ত 'মনুষ্যত্ব' যেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহাও মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার স্বামীকে এক কথায় বলিতে গেলে একটি জীবন্ত Catalogue of crimes বলা হয়।[৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা) শৈলবালা ঘোষজায়ার আরেকটি উপন্যাস 'লীনার শিক্ষা'র আলোচনা (সাহিত্য-পরিচয় শিরোনামে) প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়িকা লীনা বাঙালি, কিন্তু মা ছিলেন ইটালিয়ান। পিকক নামক এক শ্বেতাঙ্গ যুবকের সাথে লীনার বিয়ে হয়, লোকটি পেশায় ছিলেন 'জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট'। সাহেবরূপী এই লোকের অর্থের প্রাচুর্য থাকলেও 'প্রভুত্ব ও

---

১ শিবনারায়ণ রায়, 'শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আন্দু', *প্রবন্ধ সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৩, পৃ.২৫৬

২ সম্পাদক, 'জন্ম অপরাধী': আলোচনা, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ.৩১৮

৩ সম্পাদক, 'জন্ম অভিশপ্তা' : গ্রন্থ পরিচয়, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ.৯২

অবিবেকতার চরম লীলাখেলা' দেখিয়ে লীনার জীবন কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন তিনি, তা-ই এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। পিকক সাহেব শিকার, মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক নানা কর্মে মেতে থাকতেন, আর হতভাগিনী লীনাকে তার খাম খেয়ালীর ফল ভোগ করতে হতো। এতৎপ্রসঙ্গে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> যাঁহারা মনে করেন যে বিলাতী মেমের পারিবারিক জীবন না জানি কত সুখ সৌভাগ্যপূর্ণ, এই উপন্যাস পড়িয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিবে। এই পুস্তকে এংলোইন্ডিয়ান সমাজের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত হইয়াছে এবং উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা সফল হইয়াছেন। 'জন্ম অভিশপ্তা', 'জন্ম অপরাধী' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখিকা বাঙ্গালী সমাজে নারী জাতিকে যে অবিচার অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহাই দেখাইয়াছেন। "লীনার শিক্ষা" উপন্যাসে তাহারই আরেকটি দিক পরিস্ফুটিত হইয়াছে–তথাকথিত সভ্য ও সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সমাজেও যে প্রাণহীন পুরুষের অভাব নাই, তাহারাও যে কায়দায় পাইলে মেয়েদের একহাত খেলিতে ছাড়েন না, লেখিকা তাহাই দেখাইয়াছেন। গল্পখোর পাঠকের নিকট উপন্যাসখানি প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।[১]

বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে আরেক চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক সফিয়া খাতুনের (জন্ম ১৮৯০) 'বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা' এবং 'বাঙালির সাহিত্যানুরাগ' দুটি প্রবন্ধ 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যার ছাপা হয়। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশকারী এই শক্তিমান লেখিকা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে সমাজে এবং রাষ্ট্রে সাহিত্যের প্রবল ভূমিকার কথা আলোকপাত করেন।[১] যে কোনো বিপ্লবে বা সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে–এরকম মন্তব্য করে একজন জার্মান সাহিত্যিকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন:

> সাহিত্যই সমস্ত জাতিকে শাসন করিতে পারে। আমাদের আচার ব্যবহার বা সংস্কারের যা পরিবর্তন হইয়াছে সবই একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া। আমাদের অন্যায় আচরণ বা কুসংস্কার আছে তাও ত্যাগ করিয়া থাকি তখন, যখন দেশের লেখকগণ গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া নানাভাবে তার সমালোচনা করিয়া থাকেন।[২]

দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটকের সমালোচনাও করেছেন সফিয়া খাতুন। নীলচাষীদের উপর ইংরেজ নীলকরদের নিপীড়নের চিত্র নাটকে প্রদর্শিত হওয়ায় যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা বলতে গিয়ে সফিয়া খাতুন বলেন:

> সাদামুখো নীলকর প্রভুদের দল যখন নিরীহ ও দরিদ্র কৃষকদিগকে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করিতেছিল, তখন দীনবন্ধু মিত্র তাহার 'নীলদর্পণ' প্রকাশ করেন। উক্ত নাটিকা রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলে পর দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। তার ফলে নীলকরদের অত্যাচার অনেকটা কমিয়া যায়।[৩]

এতদ্বিষয়ে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপন্যাসের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল, তাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা দূরীকরণে ইউরোপীয় কয়েকটি রচনার উল্লেখ করে তিনি বলেন:

---

১ সম্পাদক, 'লীনার শিক্ষা': সাহিত্য-পরিচয়, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১৫৯

২ চিত্ররেখা গুপ্ত, *বাঙালি মুসলমান লেখিকা*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০২২, পৃ. ২২০

৩ সফিয়া খাতুন বি.এ, 'বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯, পৃ. ২৭৮

'লা' মিজারেবল যদি প্রকাশিত না হইত তবে হয়ত ফ্রান্সে এত বড় বিপ্লব আসিয়া দেখা দিত না। ইউরোপের লোক যখন অসভ্য ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল তখন তাহারা কৃতদাসের উপর যে কিরূপ অত্যাচার করিত তা Uncle Tom's Cabin পড়লেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থই হতভাগ্য কৃতদাসের দুরবস্থা দূর করিয়া দিয়াছে।[১]

উল্লেখ্য যে, মার্কিন ঔপন্যাসিক হ্যারিয়েট বিচার স্টৌউ (১৮১১-১৮৯৬) খেটে খাওয়া মানুষের জীবন নিয়ে Uncle Tom's Cabin (১৮৫২)উপন্যাসটি লেখেন। এতে বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস নিরীহ টমের উপর শ্বেতাঙ্গ মালিকের অত্যাচারের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তৎকালে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। প্রথম বছর শুধু আমেরিকার উত্তরাংশের মানুষের মনে দাসপ্রথার প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়।[২]

সফিয়া খাতুন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু উপন্যাসের পাশাপাশি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁদের 'অনুদারতা'র কথা উল্লেখ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম চরিত্র চিত্রণে তাঁর 'মুসলিম বিদ্বেষ' এবং শরৎচন্দ্রের লেখায় 'ব্রাহ্ম বিদ্বেষ' প্রকাশ পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এদিক থেকে শৈলবালার লেখায় পরধর্মপ্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে বলে 'গোঁড়া হিন্দুরা' মনে করেন বলে লেখক উল্লেখ করেন। প্রবন্ধের শেষে লেখকের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

আমার মনে হয় এসব ঝগড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় সাহিত্যের ভিতর দিয়া উদার ভাব বিস্তার করা। কোন সমাজকে অনর্থক মিথ্যা গাল না দিয়া উপন্যাস লেখা যায়।[৩]

সাহিত্যের প্রতি বাঙালির অনুরাগ নিয়ে নানান প্রশ্ন সমকালে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছিল। সাহিত্যচর্চায়সমাজের বা দেশের কতটুকু মঙ্গল হবে তা ভেবে সব লেখক কলম ধরেন না। বীরবলের (প্রমথ চৌধুরীর) বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে সফিয়া খাতুন বলেন যে, লেখায় সমাজের কোনো কাজ হোক না হোক, ওটা অনেকের একটি বাতিক। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন:

সাহিত্য এখন মানুষের পাগলামী খেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার যে কোন একটা (টঃরষরঃ্) সার্থকতা আছে তা আজকালকার যুবকেরা বিশ্বাস করে না। এখানেই শেষ। এদিকে হতভাগা লেখক কি করতে বল্ল, সেটা ভাল কি মন্দ, ভাববার কোন দরকার নাই।[৪]

সাহিত্যে কোনো লেখকের পেশাগত অভিজ্ঞতার ছাপ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, তবে স্বাভাবিকভাবে আশা করাই যেতে পারে, তার অধীত বিদ্যার প্রতিফলন সাহিত্যেও ফুটে উঠবে। এতদ্বিষয়ে লেখক বলেন:

আজকাল অনেক ডাক্তার, কেমিষ্ট, ইকনমিষ্ট প্রভৃতি গল্প-লেখক দেখতে পাই। প্রথম ভাবলুম যাক্ এবার সাহিত্যের নূতনত্ব দেখতে পাবো। হয়ত গল্পগুলির ভিতর বৈজ্ঞানিক আভাস দেখতে পাবো।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত

২ সিরাজউদ্দিন সাথী, *দাস প্রথা*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১৭, পৃ. ২১২

৩ সফিয়া খাতুন, 'বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১২১-১২২

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখতে না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেন সফিয়া খাতুন। এই হতাশার মধ্যেও তিনি আশার আলো দেখতে পান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) লেখায়। এতদ্বিষয়ে তিনি বলেন:

> রামেন্দ্রসুন্দরের কৃপায় তবু সাহিত্যের ভিতর বিজ্ঞানের অরুণ-রেখা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বাংলা এত হতভাগ্য যে, বলতে গেলে একরকম অকালেই সে চলে গেল। কিন্তু তারপর আর কোনো বৈজ্ঞানিক যুবক সেই মহাপুরুষের পথ অনুসরণ করেন নাই বা তার কোন চেষ্টা করছেন না।[১]

প্রসঙ্গক্রমে সরকারের আনুকূল্য না থাকা সত্ত্বেওমধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা উল্লেখ করে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রশংসা করা হয়।

সমকালে বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যতম শক্তিশালী লেখক ছিলেন মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। তাঁর*শান্তিধারা* ও *নূরনবী* গ্রন্থ দুটির পরিচয় 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *শান্তিধারা* (১৯১৯) ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কীয় ছয়টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো হলো–'ইসলামের স্বরূপ', 'ইসলামের ধারা', 'রমযান', 'আযান', 'উপাসনা, ও 'নামাজ'। এ'সকল প্রবন্ধের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যালংকারে ঝলমল এবং অন্তরঙ্গ রহস্যের রসে উদ্বেল'।[২] প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইসলামের মর্মবাণীকে এত সুন্দর ও প্রাঞ্জল করে তাঁর পূর্বে এবং পরে কোনো মুসলমান লেখক লিখতে সমর্থ হননি। গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের এক চমৎকার নিদর্শন। এই গ্রন্থের 'ইসলামের স্বরূপ', 'রমযান', 'আযান', 'নামাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইসলামের আত্মা পুষ্পের স্বাভাবিক বিকাশের ন্যায় ফুটে উঠেছে।[৩]

এই গ্রন্থে যে এয়াকুব আলী চৌধুরীকে পাওয়া যায়, তিনি চিন্তাশীল মনীষী বটে, কিন্তু ভাবের আবেগ তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে মধুর ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে বলে সাহিত্য-পত্রিকায় মূল্যায়ন করা হয়। নিজের উপলব্ধ সত্যকে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছেন। তিনি চেয়েছেন স্বজাতি ও স্বসমাজের মঙ্গল, চেয়েছেন এই অবহেলিত, নিগৃহীত, অধঃপতিত মুসলমান জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে। আর তার জন্য এমন একটি আদর্শের অনুসরণ করতে চেয়েছেন, যে আদর্শের কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, নেই কোনো পরিবর্তন, যে আদর্শ অনুসরণ করলে জীবন প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ইসলামের মধ্যে তিনি সেই আদর্শের বাস্তব এবং জীবন্ত প্রতিফলন লক্ষ করেছেন।

সাধনার দ্বারা স্রষ্টার যে স্পর্শ তিনি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছেন, তাকেই তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে।[৪]*শান্তিধারা*র দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* মন্তব্য করা হয়:

> এই পুস্তক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই পাঠ করা উচিত। মুসলমান পাঠ করিবেন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য, হিন্দুপাঠ করিবেন উভয়ের পরিচয় ও বন্ধনকে নিবিড়তর করিবার জন্য। আমরা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা ১ম সংস্করণ, ১৩৭১, পৃ. ২২৯

৩ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩১৮

৪ মোঃ মোসলেমউদ্দীন জোয়ারদার, *এয়াকুব আলী চৌধুরী, জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৬

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই দিন আসুক যেদিন লেখকের মতই হৃদয় ও চক্ষু লইয়া আমরা ইসলামকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারিব।[১]

নূরনবী (১৯১৮) এয়াকুব আলী চৌধুরীর অসামান্য কীর্তি। এটি ছোটদের জন্য লেখা হযরত মোহাম্মদের (সা.) অনন্য জীবনীগ্রন্থ। গ্রন্থটি সাবলীল ভাষায় লেখা সমকালীন শিশু সাহিত্যের এক যুগান্তকারী রচনা। গ্রন্থটি পাঠ করে এয়াকুব আলী চৌধুরীর ভাষারীতির প্রশংসা করেরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরলেখেন:

> 'নূরনবী' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর এবং ইহার বিষয় ও রচনাপ্রণালী শিশু পাঠকদের পক্ষে মনোরম। এইরূপ সহজ বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন কাজ। আপনি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।[২]

নূরনবী যে একখানি উচ্চাঙ্গের শিশুতোষ গ্রন্থ, এ মন্তব্য তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। সমকালীন মুসলমান সমাজে শিশুদের মানসগঠনে গ্রন্থটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে *মাসিক মোহাম্মদী*তে বলা হয়:

> এই পুস্তক পাঠ করিলে একদিকে বালকগণ সৎসাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কর্তব্য পালনে অটল হইবে। অন্যদিকে ধর্মভীরু, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, নিয়মপালনকারী হইয়া গুরুজনে ভক্তিশীল হইবে এবং কালে তাহারা যথার্থ মানুষরূপে দেশের, ধর্মের, আত্মীয়-স্বজনের কাজে লাগিতে পারিবে। পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় কেবল তোতা পাখির ন্যায় স্কুলের বই মুখস্থ করিয়া সমাজে যে অকর্মণ্য উদ্দেশ্যহীন, অলস-অক্ষম দলের সৃষ্টি হইতেছে, সে পথ প্রতিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। বালকগণ ব্যতীত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।[৩]

নবীজীবনকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে উপস্থাপনের কৃতিত্ব এয়াকুব আলী চৌধুরীকে দিয়েছেন সমালোচক। এতদ্বিষয়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*য় *নূরনবী*র ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করা হয়:

> সংসারের সকল বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের অধীন হইয়া হজরত যে আদর্শ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, লেখক সেই আদর্শকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহাতে আমরাও সকল অবস্থাতে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি। বস্তুত শিশুদের চরিত্র গঠন করিবার জন্য, তাহাদের কোমল হৃদয়ে জাতীয় আদর্শের রেখাপাত করিবার জন্য 'নূরনবী' শ্রেষ্ঠ পুস্তক। আশা করি, এই জাতি গঠনের দিনে কোনো অবিভাবকই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ হজরতের জীবন-কথা সন্তানদিগের হাতে তুলিয়া দিতে ভুলিবেন না।[৪]

শিশুর মানসগঠনে মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্মগ্রন্থপাঠ যে জরুরি তা এ-আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়। তাই 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত' 'সীতা-সাবিত্রী' ইত্যাদি অসংখ্য শিশুপাঠ্য বইয়ের মতো এয়াকুব আলী চৌধুরীর *নূরনবী* গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলিম সব মহলে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল বলে জানা যায়।[৫]

---

১ সম্পাদক, 'পুস্তক পরিচয়: শান্তি ধারা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২৫৪
২ খোন্দকার সিরাজুল হক, *মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী*, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২৪
৩ আলমগীর জলিল, *শিশু সাহিত্য রচনার কয়েকজন মুসলমান লেখক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৯
৪ সম্পাদক, 'গ্রন্থ পরিচয়: নূরনবী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২৫৫
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্যচর্চার উৎস হিসেবে সৃজনশীল বইপত্র পঠন-পাঠনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭ জুলাই ১৯২০) বই বিষয়ক সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'নূতন বই' প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০)-এর প্রবন্ধ 'অন রিডিং নিউ বুকস' অবলম্বনে 'নূতন বই' প্রবন্ধটি লিখিত হওয়ার কথা প্রবন্ধ শেষে উল্লেখিত হয়েছে।

অনেক লোকেরই নতুন বই পড়ার ঝোঁক দেখা যায়, এতে আমরা সাধারণত নতুন প্রকাশিত বইয়ের কথা বুঝে থাকি। প্রত্যেক বই নতুন হিসেবেই প্রকাশিত হয়,তবে সব গ্রন্থ পড়া ও আলোচনা করার ভাবনাটি দূরে থেকে যায়। প্রবন্ধকারের শুরুর কথাগুলো অনেকটা এরকম, তারপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন:

> বঙ্কিমের নূতন উপন্যাস আর বাহির হইবে না, মাইকেলের লেখনী চিরকালের মতো থামিয়াছে, সাময়িকপত্রগুলিও নিতান্তই নীরস-এসবের কোন মূল্য আছে কি? যে সকল পুস্তক আমি পড়ি নাই, তাহা আজই ছাপা হোক বা সহস্র বছর পূর্ব্বেই বাহির হউক, আমার কাছে তাহা নূতনই বটে। যদি কেউ তর্কের খাতিরে বলেন যে, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, ইহাতে আধুনিককালের কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করা হয় নাই, ইহা প্রাচীন ভাবাপন্ন, তাহা হইলে প্রাচীন পুঁথি অধিক কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া আমার অবশ্য পাঠ্য।[১]

তবে অনেক পাঠকেরই অনেক আগে প্রকাশিত বইয়ের প্রতি আগ্রহ কম, তাই তাঁরা তা পড়তেও অনিচ্ছুক, এটা অনেকটা পোশাকের সৌন্দর্য-রুচির মতো। ফ্যাশনের যেমন নিত্যনতুন পরিবর্তন হচ্ছে, পুস্তক সম্পর্কেও ঋতুভেদে পাঠক-রুচির পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বলে পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।প্রবন্ধকার বই পড়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ দিকে প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মনে হয়, লাইব্রেরির একটি পুরাতন বই নিজে পড়ার আগে কতজন লোক পড়েছে, তার হিসাব থাকার কথা নয়। লেখক মনে করেন,পুরনো বইটি পড়ে কত পাঠক তাঁর মতো উপকৃত হয়েছেন, এটি ভেবে নিজে রোমাঞ্চিত হবারই কথা। 'এই রস-সাহিত্যের সুধাধারা পানে হয় ত বহুলোকের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত' হয়েছে, তাই এটি ভেবে তিনি আনন্দে অভিষিক্ত হতেই পারেন। পাশাপাশি কখন নতুন বই বের হবে, আমরা তা জানার জন্য উৎসুক থাকতে পারি, এটাও খুব স্বাভাবিক। এতদ্বিষয়ে প্রবন্ধকার লিখেছেন:

> ছাপাখানা হইতে টাটকা বহিখানি বাহির হইলে আমরাই উহা আগে পড়িব, দোষ গুণের বিচার করিব-সে কি আমোদ! পুস্তকের নূতন পাতাগুলি ঘাটিতে, পাতাগুলির আঘ্রাণ লইতে, ছাপার হরফগুলি আনকোরা কি না পরীক্ষা করিতে, ছাপাখানার নামটি জানিতে, এবং যে অজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা পড়িতে আমরা খুবই আনন্দ পাইয়া থাকি। আমাদের মানসরাজ্যের সম্মুখে যে এক নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার উদঘাটিত হয় তাহা বস্তুতই মনোরম। একখানি নূতন বই পড়িয়া যে আমোদ পাওয়া যায়, কোন উৎসব ভোজে তাহা হয় না।[২]

তাই লেখক একখানা নতুন গ্রন্থ হাতে পেলে তার দুই একটি অধ্যায় না পড়ে অন্য কাজে হাত দিতে পারেন না, যত জরুরি বা গুরুতর কাজ থাকুক না কেন,একথা বলেছেন। এর জন্য বন্ধু-বান্ধবদের গৃহে প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে বিলম্বে পৌঁছে তাঁকে অপ্রস্তুত হতে হয়। নতুন বই কীভাবে তাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে, তাই বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার লিখলেন:

---

১ মাখন গঙ্গোপাধ্যায়, 'নূতন বই', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ.১০৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫-১০৬

> নূতন বইগুলি যেন আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি ।আমরা বিচারকের আসনে বসিয়া উহার দোষ গুণ বিচার করি। আমার নিজের খোসখেয়াল মত উহা ভাল কি মন্দ বলিয়া বন্ধু মহলে বাহবা লই; উহার যশ বা নিন্দার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলি।যাহারা উহা পড়ে নাই তাহাদের নিকট গল্প করিয়া থাকি। পৃথিবীর আর দশজনের যে সম্বন্ধে কিছুই জানে না অথচ আমি কত জানি ইহা কি গৌরবের বিষয় নহে? যদিও আমরা কিছু লিখিতে না পারি তবু আমরা লেখককে সহায়তা করিতে পারি। আমরা সাহিত্যের স্রষ্টা না হইলেও ধাত্রী ত হইতে পারি।[১]

নতুন বই সম্বন্ধে পাঠক মাত্রেরই মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। কোনো নতুন উপন্যাস বা যে কোনো বিষয়ের পছন্দের বই বের হলে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। সাময়িকপত্র বা সাহিত্য-পত্রিকা কখন বের হবে আর কখন হাতে এসে পৌঁছাবে, এর জন্য নিয়মিতভাবে কৌতূহলী পাঠকের উদ্বিগ্ন হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। বিখ্যাত লেখকের অনেক সাহিত্যকর্ম একাধারে একাধিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার নজির বিশ্বসাহিত্যে দেখা যায়। স্যার ওয়াল্টার স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) উপন্যাস ইংল্যান্ডে ছাপা হতে না হতেই এর পাণ্ডুলিপি অনুবাদের জন্য ফরাসি, জার্মানি, ইটালিতে পাঠানো হতো, যেন ইংরেজি সংস্করণ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের পাঠক-পাঠিকারা রসাস্বাদন করতে পারেন, প্রবন্ধকার আমাদের এ তথ্য দেন। জনপ্রিয় ও বিখ্যাত লেখকদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা খুব স্বাভাবিক। কারণ রুচিশীল ও আধুনিক পাঠক সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে চান। আবার সব বই বা লেখক সম্পর্কে পাঠকের তাৎক্ষণিক আগ্রহ তৈরি হয় না। প্রবন্ধকার এ-প্রসঙ্গে বলেন:

> সমসাময়িক সাহিত্যের সহিত আমাদের নাড়ির যোগ আছেঃ- উহা যে কেবল নতুনত্বের মোহ তাহা নহে যে লেখক জীবিত আছেন, সমসাময়িক সমাজের উপর তাহার দাবী অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা পরবাসী হইয়াছেন বা ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের উপর বর্ত্তমান লেখকের কোন দাবি-দাওয়া নাই। আমরা সকল প্রকার নূতন বই পড়িবার জন্য আগ্রহান্বিত হই না,- যে সব পুস্তকের কোন বিশেষত্ব না থাকে তাহা আমাদের কৌতূহল আকৃষ্ট করে না। যাহারা নিতান্ত নিষ্কর্মা তাহারাই নির্বিচারে বাজে বই পড়িয়া সময় কাটায় । সকল নূতন পুস্তক পড়া যেমন অসম্ভব, সকল পুরাতন পুঁথি পড়াও তেমনই অসাধ্য।[২]

এইজন্য বই পড়ার ক্ষেত্রে পুরাতন হোক আর নতুন হোক বই নির্বাচন করার সক্ষমতা পাঠকের থাকা চাই। বই প্রাথমিকভাবে যাচাই না করে ঢালাওভাবে বই পড়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি সব বিষয়ের উপর লিখিত বই পড়ার আগ্রহ সবার থাকার কথা নয়। প্রবন্ধকার বলেছেন, কোন প্রয়াত লেখকের অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হঠাৎ আবিষ্কার হলে তা পড়ার জন্য লোকের আগ্রহ পরিলক্ষিত হবে কীনা সেটি একটি চিন্তার বিষয়। সকলের আগ্রহ তেমন না থাকলেও কেউ কেউ অবশ্যই তা খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে লেখক মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলসহ অনেক লেখকের অপ্রকাশিত রচনা তাঁদের মৃত্যুর পর ছাপা হতে দেখা গেছে। আমরা দেখেছি,জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর বহু বছর পর ডা.ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩-২০১৫) কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির ভেতর জীবনানন্দের একুশটি উপন্যাস, শতাধিক ছোটগল্পসহ অন্যান্য রচনা রয়েছে, যেটি সাম্প্রতিককালে উজ্জ্বল-উদ্ধারের একটি বড় উদাহরণ। তাই প্রাচীন হোক আর সাম্প্রতিক হোক আমরা যতই তার অনুসন্ধান করবো, ততই আমাদের মনোজগতে ভাব-রাজ্যের নতুন

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

রূপ উদ্ভাসিত হবে। কোনো জিনিসকে সীমাবদ্ধভাবে কল্পনা করা আমাদের অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। পুরাতনের ঐশ্বর্য সম্পর্কে লেখক বলেন:

> আমরা কালিদাসের কবিতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, তাঁহার নায়িকার মুখে প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হই যে, সেই অতীত যুগের মানুষের মনের ভাব কেমনে এত উচ্চ ও উদার ভাবে ফুটিয়া উঠিত। এই সার সত্যটুকু ভুলিয়া যাই যে মানুষের মন সকল যুগেই সমান। প্রাচীন যুগেও এমন শিল্পী জন্মিয়াছেন যাঁহার ভাবৈশ্বর্য্যের তুলনায় আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ভাবসম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ বিবেচিত হইবে। কিন্তু আমরা সেই পুরাতন এর আদর জানি না, তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হই, তাহার কারণ আমাদের গুনগ্রাহিতার অভাব নহে,- নূতনত্বের মোহ। যেমন আমাদের দৃষ্টিপথে দেয়ালের আড়াল থাকিলে সুদূরের উচ্চতম শৈলশৃঙ্গও নয়নগোচর হয় না। প্রাচীন লেখকের রচনায় যে ভাবের ঐশ্বর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে সেইটা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা যদিও আমাদের চেয়ে অধিক পণ্ডিত ছিলেন না, তথাপি জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁহাদের স্পৃহা কম ছিল না। তাঁহারাও অনাদিকালের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যের তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেন।[১]

তাই একালের লোকে ধারণাই করতে পারে না, আধুনিক সভ্যতার সুবিধা ও সম্পদে বঞ্চিত হয়েও প্রাচীনেরা কী করে জীবনধারণ করতেন। এক দেশের লোক এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অপর দেশের লোককে নিজের চেয়ে হীন মনে করেন। কিন্তু এই ধারণার যে কোনো হেতু নেই,তা ভুলে গেলে চলবে না বলে লেখক মনে করেন। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে অসামান্য প্রতিভাশালী ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যশিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আধুনিককালেও সৃজনশীল ও মননশীল শিল্পীর নিয়মিত আবির্ভাব ঘটে। তাই প্রাচীন ও আধুনিক সব সময়ের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হয়। পুরাতন ও নতুন সৃষ্টিকর্মের বিবর্তিত রূপের ধারা বেয়ে আরো নতুনতর সৃষ্টি সাধিত হয়। তাছাড়া সমস্ত কিছুর রূপ ই তো পরিবর্তনশীল। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে বলেন:

> আমাদের সাহিত্যের সুর বদলাইয়াছে, রচনার কোমলত্ব ও মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছে, যাহার সহিত তুলনা করিলে প্রাচীন যুগের সাহিত্য নীরস ও নিস্তেজ মনে হইতে পারে। এক যুগের লোকের নিকট যাহা বিশুদ্ধ অন্য যুগের লোকের নিকট তাহাই বিকৃত বোধ হইতে পারে। প্রাচীনেরা যাহা শ্লীল ও সঙ্গত মনে করিতেন আমরা তাহা অশ্লীল ও অসঙ্গত মনে করিয়া থাকি। মোটের উপর সাহিত্যের ধারা চিরকালই যে এক পথে চলিবে ইহা আশা করা যায় না। সাহিত্য যখন সম্প্রদায়বিশেষের সেব্য না হইয়া সাধারণের উপভোগ্য হয় তখন উহার উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভবপর হয় না। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কবিতা নব্যতন্ত্রীদের কাছে তেমন আদর পায় না। কারণ তাহাতে আধুনিক গীতি-কবিতার লালিত্য ও মনহারিত্ব নাই।[২]

সাহিত্য-পত্রিকার লেখক ১৯২০ সালে যখন একথা বলেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন। আমাদের এই কথাটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, ইতোমধ্যে মহাকাব্যের ধারা শেষ হয়েছে আর গীতিকবিতার ধারা বেগবান হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য পড়ার লোকের সংখ্যা কমে এসেছে। ধর্মগ্রন্থ ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা না লাগার বিষয়, এমনকি সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লিখিত কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্রূপাত্মক রচনাও এখন অনেক লোকের নিকট রুচিকর বিবেচিত হয় না। প্রবন্ধকার লেখকরুচির মধ্যে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

সাম্প্রদায়িক মনস্কতা, ব্যক্তিগত আদর্শপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রেমের কথা স্পষ্টভাবে উদ্ভাবন করে অতঃপর বলেছেন:

> আধুনিক লেখকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব খুব বেশি। প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নিজেদের আদর্শ লেখকের তারিফ করিতে ব্যস্ত। সাহিত্যিকগণও আপনাদের দলের খোশামুদীতে তুষ্ট। সকলেই নিজের দলের প্রশংসাগানে মুখর। খুব অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকই বেশি দিন জনপ্রিয় থাকেন।[১]

যদিও জনপ্রিয়তা দিয়ে সাহিত্যের মান সবসময় নির্ধারণ করা যায় না। অনেকে মনে করেন, প্রতিভার প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি প্রদর্শন এক প্রকার মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক। প্রবন্ধকার তার সঙ্গে মোটেও একমত নন। তিনি গুণী,জ্ঞানী ও শিক্ষিতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে অকুণ্ঠচিত্তে প্রস্তুত। এতদ্বিষয়ে তিনি বলেন:

> যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহাদিগকে যদি আমরা মান্য না করি, যাঁহারা প্রভাবশালী তাঁহাদিগকে যদি পূজা না করি, তবে আমরা জগতের সমক্ষে আমাদের মনুষ্যত্বহীনতারই পরিচয় দিব। আমি যাঁহারা গুণবান তাঁহারা প্রাচীনই হউক বা নবীনই হউক, আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। হয় ত আমাদের এই ভক্তি অনুরাগ বলিয়া মনে হইবে, তথাপি নিরর্থক অশ্রদ্ধার চেয়ে এই সশ্রদ্ধ বিনয় অনেক সার্থক। যদি জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মার উদারতা ও মনের প্রসারতা না বাড়িল, তবে সে জ্ঞানের মূল্য কি? আমরা যদি শিক্ষার অভিমান করি অথচ শিক্ষার প্রতি সম্মান না দেখাই তবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি?[২]

লেখক এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উদাহরণ তুলে ধরেন। ইংল্যান্ডের জোসেফ এডিসন (১৬৭২-১৭১৯) এবং জুনিয়াস, আয়ারল্যান্ডের জোনাথান সুইফট (১৬৬৭-১৭৪৫) প্রমুখ লেখক সমকালে স্বদেশে নগণ্য বলে বিবেচিত হতেন। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৯) পর ইংলিশ-আইরিশ সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাধিত হয় এবং উপযুক্ত সাহিত্যিকরা মর্যাদা পেতে শুরু করেন বলে উল্লেখ করেছেন প্রবন্ধকার।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মানুষের স্বভাবের প্রতিফলন ঘটে থাকে। মতামত প্রকাশের অধিকারের নামে কিছু বিষয় প্রশংসাযোগ্য হওয়ার স্থলে অনেকের নিকট রুচিহীন নিন্দার কারণ হয়ে থাকে। দুঃখের বিষয়, অনেক মানুষের আকর্ষণ যেন নেতিবাচক দিকেই বেশি। এ-প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার লিখেছেন:

> মানুষের স্বভাব এই যে, কাহারও ভাল দিক না দেখিয়া মন্দ দিকের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়ে। লোকের নিন্দা করিয়া বাহাদূরী লইতে অনেকেই মজবুত। কাহারও অঙ্গে মালিশ লেপন করা খুবই সহজ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিবার একমাত্র উপায় যে সাহিত্যিক সাধনা, সেই সাহিত্যিকগণ লোকের যে পরিমাণ নিন্দাভাজন হইয়া থাকে অন্য কোন ব্যবসায়ী সেইরূপ হয় না।[৩]

দেখা যায়, যে সাহিত্যিক জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য রত্নসম্ভার দান করে যশের ভাগী হয়েছেন, তাঁর নিন্দার ঝড়ও চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এটা অবশ্যই মানুষের ঈর্ষা-দ্বেষের পরিচায়ক, বলেছেন প্রবন্ধকার। বর্তমান আধুনিক সাহিত্যের ধরন আর জনপ্রিয় পুস্তকের পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার লেখেন:

> আধুনিক সাহিত্যের মজ্জাগত ভাব কি? সাহিত্যিকের নিন্দা ও সাম্প্রদায়িকতা। কোন্ পুস্তক সবচেয়ে বেশি লোকপ্রিয় হয় ? যে পুস্তক আমাদিগকে জানায় যে, প্রতিভার বরপুত্র যাঁহারা তাঁহারা আমাদেরই মতো রক্তমাংসের জীব, আমরা সমাজে আছি, তাঁহাদের স্থান সমাজের বাহিরে হওয়া উচিত। কাজেই আধুনিক সাহিত্যিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী না হইয়া রাজসরকার কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের গুণানুকীর্ত্তনে রত

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১

হয়।সাহিত্য এখন ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর জ্ঞানের মহত্ত্ব নাই, সে এখন অর্থের দাস হ ইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে। যাঁহারা এখন দশের মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, তাঁহারাই সুলেখক বলিয়া পরিচিত। ইহা সাহিত্যের শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে না।[১]

তবে সব সাহিত্যিক এই দশের মন জুগিয়ে চলতে চান না, আর অনেকে চলতে পারেনও না। অজনপ্রিয় ও কম প্রচারিত সাহিত্যিক অনেক পরে ব্যাপক জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত হয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। অনেক লেখক-সাহিত্যিক তাঁর পরবর্তী জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি, এটাই ট্রাজেডি। জীবনানন্দ দাশ তার বড় প্রমাণ।

প্রবন্ধকার নতুন বই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন, আধুনিক, সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, সাহিত্যিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সাহিত্যরস পিপাসুদের নানান ধরন, শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক, দেশ-বিদেশের সাহিত্যের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ, সর্বোপরি নতুন-পুরাতন বইয়ের সুবিধা-অসুবিধা-গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রবন্ধটি ব্যাপকবিস্তারী বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*কে কেন্দ্র করে যেসব শিল্পী-সাহিত্যিকের স্মরণীয় উদ্বোধন ঘটে তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৬) নজরুলের 'মুক্তি' নামক কবিতাটি মুদ্রিত হয়, নামের পাশে পরিচয় লেখা ছিল হাবিলদার বঙ্গবাহিনী, করাচি।এটিই নজরুলের প্রকাশিত প্রথম কবিতা। কবিতাটির কবিপ্রদত্ত নাম ছিল 'ক্ষমা'।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৬) নজরুলের 'হেনা' গল্পটি মুদ্রিত হয়। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে নজরুলের রচনা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ'আকাঙ্ক্ষা'র পাশাপাশি নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পটি মুদ্রিত হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৭) নজরুলের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়, 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ও 'মানিনী বধূর প্রতি'। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা থেকে গৃহীত 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন বিজ্ঞান'–এই তিনটি অনূদিত প্রবন্ধও নজরুলের নামে প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যা থেকে নজরুলের নামের পাশে বিশেষ কোনো পরিচয় বা পদবি উল্লেখিত ছিল না। বোঝা যায়, এ পর্যায়ে কবি হিসেবে তিনি অনেকটা পরিচিত ও খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন।পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭) একাধারে নজরুলের কবিতা, গান ও 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটি প্রকাশিত হয়।'আজ নতুন করে পড়ল মনে' গানটি "গান" শিরোনামে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এটি 'স্মরণে' নামে *পূবের হাওয়া* কাব্যগ্রন্থে পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। এক সংখ্যা বিরতিতে নজরুলের গল্প 'সাঁঝের তারা'প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭)। চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় নজরুলের কোনো রচনা প্রকাশ না পেলেও দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৮) তাঁর 'বিজয়-গান' ও 'মা' কবিতা মুদ্রিত হয়। চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৮) নজরুলের 'মরণ বরণ' ও 'খোকার বুদ্ধি' কবিতা দুটি বের হয়।চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৮) নজরুলের চারটি কবিতা 'বন্দী-বন্দনা','নিশীথ-প্রীতম', 'খোকার গল্প বলা','চিঠি'প্রকাশিত হয়। নজরুল এই পত্রিকায় একাধারে বড়দের ও ছোটদের জন্য লিখে গেছেন। পত্রিকার শিশু-কিশোরদের বিভাগ 'ছেলেদের পৃষ্ঠা'য় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৯)

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্যগ্রন্থের উপর আলোচনা বের হয় 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে। এখানে আলোচক লেখেন:

> বিদ্রোহী বীর কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলাদেশে সুপরিচিত। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, *'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'*তেই কাজী সাহেবের 'হাতে খড়ি' হইয়াছিল। আমরা কাজী সাহেবের অগ্নিবীণা পাইয়া তাই আজ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যেসব অনুপম উপমা তিনি সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়।[১]

পরবর্তী সংখ্যায় নজরুলের *ব্যথার দান* গল্পগ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায় 'দোদুল-দুল' কবিতাটিও মুদ্রিত হয়। কবিতাটি ইতঃপূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* প্রকাশের ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৩০) নজরুলের *দীওয়ান-ই-হাফিজ*-এর গজল 'যদিও কান্তা সিরাজ সজনী'প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০) 'জাত জালিয়াত' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটি অতঃপর *বিজলী* ও *উপাসনা* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতাটি 'জাতের বজ্জাতি' নামে *বিষের বাঁশি* কাব্যগ্রন্থে পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে সংকলিত হয়। লক্ষ্য করা যায়,*'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'*য় প্রথম থেকে শেষ অবধি নজরুলের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। *সাহিত্য-পত্রিকা*র ধারাবাহিকতায় 'সওগাত', 'প্রবাসী', 'নূর', 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গনূর', 'অঙ্কুর', 'বকুল', 'সাধনা', 'ধূমকেতু', 'বঙ্গবাণী', 'নারায়ণ', 'কল্লোল', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'উপাসনা', 'বিজলী', 'সহচর', 'অলকা', 'আত্মশক্তি', 'বসুমতি', 'প্রবর্তক' এরকম একুশটি পত্রিকায় একাদিক্রমে নজরুলের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় যে অভিনবত্ব, তা নিঃসন্দেহে নির্মাণ করে দিয়েছিল *'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'*। নজরুল নিজেও তা স্বীকার করেছিলেন। প্রায় দুই দশক পরে ১৯৪১ সালের ৫ এপ্রিল *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে নজরুল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

> সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম তা আমি জানিনা। এই ভালোবাসার বন্ধনে আমি প্রথম নীড় বেঁধে ছিলাম। এই আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হতো কিনা জানা নেই।[২]

পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে তিনি হয়ে যান বাকহীন। ফলে রুদ্ধ হয়ে যায় তাঁর সাহিত্যচর্চা। সুস্থ ও সচল থাকা পর্যন্ত সমিতি ও পত্রিকার প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতা অক্ষুণ্ন ছিল।

নজরুল ছাড়াও *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পাতায় অনেক নবীন মুসলমান লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যাঁরা পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছেন আরো খ্যাতিমান। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, শেখ ফজলল করিম, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী ইমদাদুল হক, ডাক্তার মোঃ লুৎফর রহমান, শেখ হবিবর রহমান, সৈয়দ এমদাদ আলী, মুজফ্ফর আহমদ, কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, একরাম উদ্দিন, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ফররোখ আহমেদ,আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, ফজলুর রহিম চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী আকরম হোসেন, মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন

---

১ অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ)-নজরুল ইসলাম : আলোচনা, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২৫৩

২ উদ্ধৃত, অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩০

আহমদ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সারা তয়ফুর, আবুল হুসেন, আবদুল কাদির, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ বাঙালি মুসলমান এই পত্রিকায় লিখেছেন এবং সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রগতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় পুরুষদের পাশাপাশি নারী লেখকদের রচনাও গুরুত্বের সঙ্গে মুদ্রিত হতো। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) পাশাপাশি নতুন নতুন নারী লেখকের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকা। নারীদের জন্য সাহিত্য-সমিতি ও সাহিত্য-পত্রিকার অবদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন নারী গবেষক বলেন :

> সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায়, শুধু মুসলমান মেয়ে কেন পুরুষদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি, এ সময় মুসলমান সম্পাদিত কয়েকটি প্রগতিশীল পত্রিকা এবং বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি (১৯১১) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রাগ্রসর চিন্তার বীজ বপন করে।[১]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনে 'মহিলা শাখা' নামে পৃথক একটি শাখার অস্তিত্ব ছিল। এটির নেতৃত্বে ছিলেন একজন নারী লেখক। ষষ্ঠ ও সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে নারীদের সভানেত্রী হন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯১৪)। তাঁর প্রদত্ত অভিভাষণ এবং এর প্রতিক্রিয়া সমকালীন *মোহাম্মদী* পত্রিকাসহ একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *সাহিত্য-সমিতি* আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি বাংলার নারী জাগরণের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে মনে করা যেতে পারে। যে-সব নারীর লেখনীতে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* উজ্জ্বল হয়ে আছে তাদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ফাতেমা খানম (জন্ম-১৮৯৪), বিবি সারা তয়ফুর (জন্ম ১৮৯৩), খুকুমনি দেবী, সাজেদা খাতুন, বিরজাসুন্দরী দেবী, সরসীবালা বসু, সফিয়া খাতুন, শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪), মিসেস এম রহমান ওরফে মাসুদা খাতুন (১৮৮৫-১৯২৬) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মিসেস এম রহমান (১৮৮৫-১৯২৮) ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে নারীবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর 'স্বাবলম্বিনী' নামে দুই পর্বের ছোটগল্প *সাহিত্য-পত্রিকার* ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়। *শেখ আন্দু* (১৯১৪) উপন্যাসের লেখক শৈলবালা ঘোষজায়ার অনেকগুলো মর্মস্পর্শী গল্প, ছন্দময় কবিতা ও গান *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত কবিতাগুলির নাম হলো 'মানুষ হতে চাই', 'বাঁচাও বাঁচাও' এবং ছোটগল্প 'লোকসানের সন্ধ্যায়', 'আয়েশা', 'বিদায় গ্রহণ'। সাজেদা খাতুন নামের আরেক লেখকের চারটি কবিতা প্রকাশিত হয় *সাহিত্য পত্রিকায়*। এছাড়া পত্রিকাটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র সম্মিলিত (গ্রুপ) ছবি ছেপে নতুন যুগের সূচনা করে। মহিলাদের ছবি মুদ্রণের বিষয়টি পরবর্তীকালের *সওগাত* পত্রিকাতেও দেখা যায়।

সাহিত্য-পত্রিকায় 'কোরক' নামক বিশেষ পাতায় নতুন লেখকদের রচনা প্রকাশিত হতো। সেখানে সম্পাদকের বরাতে বলা হয়েছিল: "বঙ্গ সাহিত্য চর্চ্চার নতুন নবীন লেখকদের উৎসাহ বন্ধন কেবল তাদেরই রচনা সংশোধনপূর্বক 'কোরকে' প্রকাশ করা হয়।"[২]প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই 'কোরক'-এ সাতজন নতুন লেখকের সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) কবিতা 'মহাসংকল্প' ছিল। তৃতীয় সংখ্যায় শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) ও আবদুল

---

১ লায়লা জামান সংকলিত ও সম্পাদিত, *দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০
২ কোরক, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃ. ২৪১

কাদিরের (১৯০৬-১৯৮৪) কবিতা মুদ্রিত হয়। এঁরাই তখন সম্পাদকের ভাষায়, 'নূতন ব্রতী নবীন লেখক'[১] হিসেবে সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পান। পরবর্তীকালে তাঁরা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ১৫ জন নবীন লেখকের ১৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় স্থানীয় সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের পরিচয় আলোচিত হয়। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'যুগসন্ধির কবি মালেকুজ্জমান' এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম, সাতকানিয়া অঞ্চলের অখ্যাত এই কবি *নজমুদ্দিনের জীবন-চরিত* নামে বৃহৎ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবনী মূলক গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু তার বাইরে এরূপ গ্রন্থ বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আর নেই বলে লেখক দাবি করেন। এজন্য গ্রন্থখানিকে একটু নতুনত্ব আছে বলে কবি আলাওলের (১৬০৭-১৬৮০) গ্রন্থাবলি কবি মালেকুজ্জমান নিবিড়ভাবে পাঠ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ সর্বশেষ সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'চট্টগ্রামে বঙ্গ-সাহিত্য' শীর্ষক এগার পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। এটি লেখকের লিখিত সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধের শেষাংশ, যেটির প্রথম অংশের পর্বগুলি *সওগাত* এ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় সূচনা বক্তব্যে জানান :

> আমি অধুনা বিলুপ্ত 'সওগাত' পত্রে 'ইসলামাবাদ' নামক একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলাম। সেই প্রবন্ধে চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাস প্রদান করিতে গিয়া চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণের সাহিত্য সেবার পরিচয় প্রদান করিয়াছি। হিন্দু কবিগণের বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তাঁহাদের কথা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। তাই এই প্রবন্ধে হিন্দুগণের সাহিত্য-চর্চ্চার কথাই বলিব বাসনা করিয়াছি।[২]

সওগাত ও *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* সূচনাবর্ষ একই হলেও *সওগাত*-এর প্রকাশনা এই পর্যায়ে কয়েক বছর বন্ধ ছিল। লেখক *সওগাতে* চট্টগ্রামের মুসলমান কবিদের পরিচয় দিলেও সাহিত্য-পত্রিকায় বিশজন হিন্দু কবির সাহিত্য সাধনার পরিচয় প্রদান করেন, যা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধকার চট্টগ্রামের বৈষ্ণব পদাবলি লেখকগণ ও শ্যামা সঙ্গীত বা সাধন সঙ্গীত ইত্যাদি রচয়িতাগণের নাম উল্লেখ করেছেন, এভাবে তিনি এই রচনায় মোট ৯৬ জন হিন্দু কবির নাম উল্লেখ করেছেন। এসব লেখকের মধ্যে যে ২০জন হিন্দু কবির নাম তাঁদের সাহিত্যকৃতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ প্রদান করেন, তারা হলেন, শঙ্কর দাস, মুক্তারাম সেন, ভক্তরাম দাস, ব্রজলাল সেন, ফকির চাঁদ, দ্বিজ রতিদের, বলরাম দেব, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন, নীলকমল দাস, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শঙ্কর ভট্ট, সদানন্দ ভট্ট, রামতনু আচার্য্য, ভৈরবচন্দ্র আউচ, রামলোচন দাস, কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার, দূর্গাচরণ পাঠক ও গোবিন্দ দাস। লেখক তাঁর আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে পাঁচটি পদাবলি প্রকাশ করেন, যার মধ্যে একটি পদাবলি সাহিত্য-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :

---

১ প্রাগুক্ত

২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'চট্টগ্রামে বঙ্গ-সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ১১১

পরাণে সে জানে।
মরম দুঃখ পরাণে সে জানে।
কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কুলে।
ধরে ধেরজ নাহি মানে।
অধর রঙ্গিমা ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটি বান্ধ্যাছে ঠানে।
নিষেধ ন মানে বিষম সন্ধানে
হান্যাছে গোবিন্দের বাণে
জাগিতে ঘুমিতে আন না লএ চিতে
কালিয়ার বাঁশীর সানে
চিত্ত ধরা ন দিয়া রাখিতে ন পারি হিয়া
অনুসূতে বান্ধি টানে।।
বাঁশী বাজাএ নিতি কালার পিরীতি
বুঝিতে বুঝন ধান্ধা
কহে শিবচরণ দাসে প্রেম ভকতি পাশ
মুই কেনে না গেনু বান্ধা।।[১]

হিন্দু ও মুসলমান কবিরা যুগপৎভাবে এরকম সার্থক বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন বলে লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জানিয়েছেন। তবে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী, সাহিত্য-সেবায় তাঁদের অনেকের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ করা যায়, লেখক আক্ষেপ করে একথা বলেন। বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদনের সঙ্গে আর কোনো কবিতার তুলনা হতে পারে না বলে লেখক এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> বৈষ্ণব কবিতাগুলির সরল সৌন্দর্য্য ও তরল মাধুর্য্যে প্রেমিক হৃদয়ের পরতে পরতে যেমন অমৃত ধারা ঢালিয়া দেয় তাহাদের সুধা নিষ্যন্দী সুরে হৃদয়-বীণার তারগুলি যেমন বাজিয়া উঠে, বঙ্গ-সাহিত্যের আর কোন কবিতাই তেমন করিতে পারে না।[২]

লেখকের বক্তব্য এই যে, 'প্রাচীনকালে এদেশে খুবই সাহিত্যচর্চ্চা' হয়েছিল। এদেশ বলতে লেখক চট্টগ্রামকে বুঝিয়েছেন। চট্টগ্রামের কবি হিসেবে যাঁদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি, এই তালিকায় ধৃত হিন্দু কবিগণ সম্বন্ধেও তেমন বলা আবশ্যক, ইহারা যে সকলে চট্টগ্রামের কবি, হলফ করিয়া বলা বড় শক্ত। তন্মধ্যে দুই চারিজনের বিদেশীয় কবি হওয়াও অসম্ভব নহে।[৩]

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

চট্টগ্রাম বা তার বাইরের অঞ্চলেরই হোক, প্রাচীন কবিদের কাব্যচর্চার একটা অধ্যায়ের পরিচয় আমরা সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে অবহিত হই।

কবি কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) *মহাশ্মশান*কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। *মহাশ্মশান* প্রকাশ মাত্রই সাধারণ কাব্যপাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। কবির জীবদ্দশায় এই বইটিরও চারটি সংস্করণ হয়েছিলো এবং কিছু কিছু পরিশোধন-সংস্কারও করেছিলেন, আর প্রতিবারেই যুক্ত হয়েছিলো কবির স্বনামে অনামে রচিত নতুন-নতুন ভূমিকা। প্রথম প্রকাশের পর-পরই বইটিকে কেন্দ্র করে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত এটিই সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৮৫৬), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) প্রমুখ তদানীন্তন লেখকগোষ্ঠী *মহাশ্মশান* কাব্যগ্রন্থের পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যান।[১]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় যে বহুল আলোচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে সৈয়দ এমদাদ আলী রচিত '*মহাশ্মশান* কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব'। শিরোনামেই সুস্পষ্ট যে, গ্রন্থের পূর্ণ-সমালোচনা সমালোচকের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য *মহাশ্মশান* কাব্যের অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাবকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। সমালোচনার প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য যথার্থ সমালোচনা প্রয়োজন। তারপর তিনি এই অভিযোগ আনেন যে, 'জন্ম মুহূর্তেই আমাদের সাহিত্য অসৎ ও অনৈসলামিক পথ' ধরেছে, তার নিদর্শন কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্য। *মহাশ্মশান* কাব্যের কোনো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যেরই উল্লেখ তিনি করেননি। সমালোচক প্রধানত এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রধান দোষের কথা বলেছেন।

মহাশ্মশানে অনৈসলমিকতার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে তিনি কাব্যের এক নায়িকার মুখে প্রদত্ত 'গঙ্গাস্তোত্রে'র কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 'গঙ্গাস্তোত্র'টি তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'মুসলমানের কাব্যে গঙ্গাস্তোত্র-কি দুর্দৈব'। কাব্যে অশ্লীলতার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে তিনি কাব্যের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত্ত করেছিলেন :

উঠাইয়া ভুজদ্বয়, বাঁকিয়া পশ্চাতে
অনঙ্গের ধনুপ্রায়। দুটি পুষ্পকলি
শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ ধনুকে
দুটি সুবর্ণের শর নয়ন-রঞ্জন।[২]

এতদ্বিষয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বক্তব্যটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য :

> কাব্যে ইসলামিকতা বা অনৈসলামিকতা বলে কোনো কথা নাই। কাব্য সার্বজনীন। কাজেই সৈয়দ সাহেবের অনৈসলামিকতার অপবাদ সত্যকার কাব্য বিচারের ধোপে টিকে না। তাছাড়া কাব্যের একজন হিন্দু নায়িকার মুখেই গঙ্গাস্তোত্র দেওয়া হয়েছে সেখানে আল্লাস্তোত্র দেওয়া অস্বাভাবিক হতো। আর

---

১ আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *কায়কোবাদ রচনাবলি ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.[একুশ]
২ সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীলভাব', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ.১

> কায়কোবাদ সাহেব যে গঙ্গাস্তোত্রটি ঠিক হিন্দুর মতো করেই সুন্দরভাবে লিখতে পেরেছেন, এটা কবি হিসেবে তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। এজন্য তাঁকে নিন্দা করা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও।[১]

সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী এব্রাহিম ও জোহরার যে প্রাক-বৈবাহিক প্রেম দেখানো হয়েছে তাকে 'অস্বাভাবিক ও অশোভন' বলেছেন। উদাহরণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন :

লজ্জায় বালিকা
মুখখানি নত করে রহিলা নীরবে
বালক তখনি ছুটে চুম্বিলা সাদরে
বালিকার মুখখানি, কহিলা হাসিয়া,
'আমি হব রাজা আর তুমি হবে রাণী।[২]

সমালোচক প্রশ্ন রাখেন – 'বিবাহের পূর্বে যুবক যুবতীর এইরূপ অবাধ মিলন এবং চুম্বন ব্যাপার অনৈসলামিক নহে কি?' সমালোচক আরো কটাক্ষ করেন যে, 'কবি চুম্বনের নেশায় এতই মশগুল' যে, 'তিনি একবারের চুম্বন ব্যাপারে তৃপ্ত' না হয়ে তার পুনরাবৃত্তিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সমালোচক আরো বলেন 'এই মুসলমান কবির সহানুভূতি মুসলমানের দিকে নয়, মহারাষ্ট্রের দিকে'। তিনি জোহরা চরিত্রকে পুরুষভাবাপন্ন Amazonজাতীয় চরিত্রের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন তা 'অস্বাভাবিক ও অশোভন'। রমণীদেহের বর্ণনায় 'অনৈসলামিক ভাব' লক্ষ করে সমালোচক মন্তব্য করেন – 'তিনি যেন শ্লীলতার ধার ধারেন না, যাহা অবগুণ্ঠিত রাখা দরকার তিনি তাহাই মুক্ত করিয়া দিতে ভালবাসেন।' সমালোচক প্রসঙ্গক্রমে কবির কাব্য থেকে রমণীদেহের, বিশেষ করে স্তন ও নিতম্বের বর্ণনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর এ সমালোচনার ভাষা অসংগত, অশালীন এবং আক্রমণাত্মক। এতদ্বিষয়ে কয়েকটি উক্তি তুলে ধরা যায় :

ক. কায়কোবাদ 'হিন্দু ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'।

খ. 'কবি সম্ভবতঃ দুষ্টরসের ভাণ্ড'।

গ. 'কুচের প্রতি বড় মমতা'।

ঘ. 'নিতম্বকে নানাভাবে সর্বসাধারণের গোচরীভূত না করিলে কবির নিদ্রার ব্যাঘাত হইত।'

ঙ. 'কবিকে চাঁদা করিয়া একটা মেডেল-টেডেল যা হোক একটা কিছু দেওয়া উচিত।'[৩]

সমালোচক কাব্যের দোষ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময়ই উদ্ধৃতি ও বক্তব্যের মধ্যে যৌক্তিকতা রক্ষা করতে পারেননি। যেমন, *মহাশ্মশান* কাব্যে দিল্লির বর্ণনায় কবি লিখেছেন :

যেই স্থানে রমজানের মধুর সাহান্থে
জুমা মসজিদের পার্শ্বে, চাঁদনী চত্তকে
সুরম্য বিপনিগুলি সজ্জিত
বিবিধ সুখাদ্য খাদ্যে ....

---

১ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'অতীত দিনের স্মৃতি', *উদ্ধৃত*, *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলি ২য় খণ্ড*, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৩২

২ *'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীলভাব'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

এই বর্ণনার উল্লেখ করে সমালোচক মন্তব্য করেন :

> কি বিপদ। কেবল রমজানের রোজার প্রতি নয়,
> মুসলমান জাতির পেটুকতার প্রতিও কি অমোঘ
> বজ্র-নিক্ষেপ।[১]

সমালোচক *মহাশ্মশান* কাব্যে 'মোসলেম স্ত্রী চরিত্র' নামে আরেকটি প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমালোচনা শেষ করেন।

সৈয়দ এমদাদ আলী 'মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র' শীর্ষক পরবর্তী প্রবন্ধ লেখেন সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়। তাঁর পূর্ববর্তী 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীলভাব' লেখা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার জবাব তিনি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেন। পূর্ব প্রবন্ধে তাঁর মতামতের বিরোধিতাকারীদের এমদাদ আলী 'স্তাবকদল' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি সাহিত্য-পত্রিকায় বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় বলেন :

> নিরপেক্ষ সমালোচনার আঘাত যাঁহারা সইতে পারেন না, তাঁহারা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক নহেন। আবার আমাদের প্রবীণ লেখকদের (নবীন-প্রবীণ বিরোধ) মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে চিঠি লিখিয়া এইরূপ নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য উৎসাহিতও করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিনয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।[২]

মহাশ্মশান কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১৯০৪ খ্রি.) প্রধান স্ত্রী চরিত্র জোহরা ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে কায়কোবাদ এই চরিত্র সৃষ্টি করেন বলে এমদাদ আলী সাহিত্য-পত্রিকায় জানান। কী কারণে এবং কার অনুরোধে কায়কোবাদ জোহরা চরিত্র সংযোজিত করেছেন তা বলতে গিয়ে লেখক বলেন :

> মুসলমান সমাজ আদর্শ স্ত্রী চরিত্র সৃষ্টির জন্য কবিকে অনুরোধ করায় তিনি এই নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বিগতজীবন 'নবনূর' পত্রিকায় ডাক্তার ফজলুর রহমান সাহেব প্রথম সংস্করণের 'মহাশ্মশানে'র সমালোচনাকালে কৌমুদী বাঈর ন্যায় একটি মোসলেম নারী চরিত্র দ্বারা কাব্যের শোভা বর্দ্ধিত হইলে মুসলমান সমাজ বিশেষ তুষ্ট হইতে পারিতেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে কবি এই নূতন চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন কলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা এই সুবৃহৎ কাব্য পড়িয়া ঘটনার সূত্র ধারণপূর্ব্বক দুই চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বলিবেন, কৌমুদী বাঈর নিকট জোহরা দাঁড়াইতেও অক্ষম, কারণ কৌমুদী বাঈর চিত্র অনেকটা স্বাভাবিক, কিন্তু জোহরার চিত্র অস্বাভাবিক।[৩]

এই অস্বাভাবিকতার কারণ কী, সেই প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী জোহরার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যটি যে কবি কায়কোবাদ অন্য লেখকের রচনা থেকে অনুকরণ করেছেন, তা বলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬) ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র (১৮৬১-১৯৬০) *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৮) নাটক থেকে

---

১ গোলাম মোস্তফা, 'আনোয়ারা : আলোচনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৫৮
২ সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ১২৫
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

কায়কোবাদ জোহরা চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন, এরকম অভিযোগ করেছেন। লেখক এমদাদ আলী এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> জোহরা কখনও নারী বেশে কখনও পুরুষ বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে তাহার সেই জিঘাংসায় উন্মত্তা মুর্ত্তি দেখিয়া কেনা শিহরিয়া উঠিত ? আমাদের কবি সাহেব সেই জোহরাকেই একরূপ অপরিবর্ত্তিতভাবে তাঁহার এই কাব্যে স্থান দিয়া আমাদিগকে ধন্য ও বাধিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন।[১]

জোহরা যখন তাঁর হবু স্বামী এব্রাহিম কার্দির সাথে প্রেমালাপে মত্ত, তখনও তীরধনুক হাতে জোহরার উপস্থিতি দেখা যায়। এমদাদ আলী যেন 'যুবতীর তীর-ধনুক হাতে কাননে কাননে বেড়ানো' সঙ্গত কী-না তা পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কবি কায়কোবাদ যাত্রার নায়িকার মতো জোহরা চরিত্রকে একেঁছেন বলে এমদাদ আলী মনে করেন। জোহরা তার হবু স্বামীকে যা বলে, এতৎপ্রসঙ্গে কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন লেখক সৈয়দ এমদাদ আলী :

"এব্রাহিম পারিবেনা তুমি মোর সাথে।"
"কেন পারিবনা আমি ?" কহিলা বালক ...
রমণী হইয়া তুমি পরাজিবে রণে
পুরুষে ! এ কথা তুমি বলিলে কেমনে
জোহরা ?"[২]

জোহরা এব্রাহিম কার্দির বাগদত্তা হলেও সে তার তোয়াক্কা করে না বলে স্পষ্ট হয় তার পরবর্তী কথোপকথনে, তবে এরকম সাহসী নারীর পরিচয় সাহিত্যে বা ইতিহাসে কম নেই, এমনও বলেন। তবে শারীরিক শক্তিমত্তায় একই আখ্যানে পুরুষ ও নারীর সমানে সমান অবস্থান খুব একটা দেখা যায় না বলে ধরা যায়। রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদার* উদাহরণ দিয়ে এমদাদ আলী নারী চিত্রাঙ্গদা যে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, সাহিত্য-পত্রিকায় তার বর্ণনা দেন এভাবে :

> এইরূপ পুরুষভাবাপন্ন নারী চরিত্র বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে একা কায়কোবাদ সাহেব আঁকেন নাই। আরও কেহ আঁকিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা তাহার প্রমাণ। চিত্রাঙ্গদা মনিপুর রাজদুহিতা, সে তাহার পিতার একমাত্র সন্তান। তাই পিতা তাহাকে পুত্রের মত করিয়াই শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষভাবে শিক্ষিত হইলেও নারীর নারীত্ব কেমন করিয়া সহজ সরলভাবে আপনা আপনি বিকশিত হইয়া উঠে, কবি নিপুণ তুলিকায় চিত্রাঙ্গদাতে তাহাই দেখাইয়াছেন। পুরুষের শিক্ষায় ও দীক্ষায় যে নারীকে কখনও পুরুষ করিয়া রাখা যায় না, তাহাকে যে নারী হইতেই হয়। চিত্রাঙ্গদার জীবনের ইতিহাস তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন।[৩]

তাই দেখা যায়, পুরুষ পার্থকে দেখে নারী চিত্রাঙ্গদার 'পুরুষের খোলস' খসে পড়ে তার নারীত্ব জেগে উঠেছিল, পূর্ণ নারীত্বের মহিমায় যখন তার সুপ্ত আত্মা জেগে উঠে যা বলেছিল, তা ভাববার বিষয় বলে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

লেখক এমদাদ আলী মনে করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'র কিছু কথা লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন :

আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তব পরিচয়।[১]

মহাশ্মশান কাব্যের কৌমুদী বাঈর সমান্তরাল চরিত্র হিসেবে জোহরাকে অঙ্কন করায় কাব্যের কলেবর শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সমালোচক এমদাদ আলী মনে করেন। আসলে কায়কোবাদের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু নারী চরিত্রের পাশাপাশি মুসলিম নারী চরিত্রের আগমন ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক সমতার দিকে দৃষ্টিপাত করা। তবে কাব্যের এক স্থানে কবি জোহরার মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন, তা একটি উৎকৃষ্ট ভাব এবং জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির সহায়ক বলে লেখক মনে করেন। লেখক এতদ্বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু জোহরার জবানিতে *মহাশ্মশান* থেকে উদ্ধৃত করেন :

পবিত্র মানব জন্ম শুধু কি জগতে
পার্থিব সুখের জন্য ? পুরুষের জন্ম
শুধু কি জগতে পাপ করিতে বর্দ্ধন
ইন্দ্রিয় সেবার জন্য জন্ম কি নারীর
ধরাতলে ? ...

মোসলেম রমণী
নহে ভীরু, নহে তারা কুসুম কোমলা
শুকাইবে সূর্য্য করে, ঝরিবে পবনে।
পুণ্যময়ী দেবী তারা, স্বধর্ম্মের তরে
সতত প্রস্তুত প্রাণ করিতে প্রদান।[২]

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

২ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

জোহরা যে তাঁর স্বামীকে খুব ভালোবাসতো, কবি শেষের দিকে তার প্রমাণ দিয়ে জোহরাকে রক্ষা করেছেন বলে এমদাদ আলী জানান। পরিশেষে লেখক-সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী *মহাশ্মশানের* শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলির (জোহরা ও কৌমুদী) বিচারভার পাঠকসমাজের উপর অর্পণ করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী?' নামে ৮ পৃষ্ঠার একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি মূলত : দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের কিছু কথা নিয়ে লেখকের ভিন্নমত প্রদান ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ বিষয়ক। প্রবন্ধকার সৈয়দ এমদাদ আলী বাংলা সাহিত্য মুসলিম রচিত সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে অশ্লীলতার প্রবেশ ঘটেছিল বলে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যকে আবেগ, যুক্তি ও তথ্য-উপাত্তের সাথে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দুই খণ্ড গ্রন্থের নবম অধ্যায় অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায় 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ' অধ্যায়ে দীনেশচন্দ্র সেন যে আলোচনা করেছেন, তার ভিতর প্রবন্ধকার সৈয়দ এমদাদ আলী নির্দিষ্ট কিছু অংশ চিহ্নিত করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকরা বিশ্বের খ্যাতিমান মুসলমান সাহিত্যিকদের যথার্থ উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন :

> হাফেজ, সাদী, যামী, নেজামী, ফেরদৌসী, উরফি, মাওলানা রুমী, ওমর খাইয়াম, সালমান সাওকি, আমীর খসরু প্রভৃতি অমর কবিগণ কোন জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ? ইহাদের কাব্য ও কবিতা কি অশ্লীলতার জন্য বিখ্যাত, না ভাবের গভীরতায় হৃদয়ের পবিত্রতায় এবং শালীনতায় ইহাঁরা জগতের সাহিত্য-কুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিলরূপে সম্মানিত হইতেছেন ? ইহাঁরা মুসলমান ছিলেন এবং এই মুসলমান কবিদের কাব্যসুধা পান করিয়া কত লোক তৃপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সঞ্চিতসুর সাগর হইতে অঞ্জলি ভরিয়া অমৃত গ্রহণ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং বিশ্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁরা কোন বিশেষ দেশ, কাল বা জাতির কবি নহেন, ইহারা জগতের কবি।[১]

আধুনিক কালের অনেক বিখ্যাত কবির শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে অনুসন্ধান করলে এই কবিদের প্রভাব লক্ষ করা যায় বলে প্রবন্ধকার সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন। বিশ্বসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবকেরা সাহিত্যকে জাতি-ধর্মের গণ্ডী থেকে মুক্ত দেখতে চান, যাঁরা সাহিত্যকে অনুদারতা থেকে মুক্ত রাখতে চান, তাঁরাই এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে লেখক মনে করেন। লেখক অতঃপর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হওয়ার পেছনে মুসলমানদের অবদান ও সীমাবদ্ধতা এবং প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> মুসলমানদের অনুগ্রহে ও পরিচর্যায় একদিন বঙ্গ-সাহিত্য বিকশিত হওয়ার অবসর পাইলেও তখনকার মুসলমানগণ বঙ্গ-ভাষার সেবায় আত্মসমর্পণ করেন নাই। কারণ, তখন মুসলমানের রাজ্য ছিল এবং আরবী পার্সীরই সমাদর ছিল। তবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কোমল কান্ত পদাবলী যে অনেকের মনোহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহারই ফলে আলাওল ও দৌলতকাজী প্রভৃতির উদ্ভব। ইহাঁরা সেই সময়ে কেবল যে বঙ্গদেশের মান রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাঁরা মুসলমানদেরও মুখ রাখিয়াছিলেন। কারণ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে ইহাঁরাই বঙ্গ-সাহিত্যে

১ সৈয়দ এমদাদ আলী, 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী ?', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩১৮

বিশ্বসাহিত্যের পথে কতক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুর দেশে হিন্দুর ভাষায় মুসলমানের এই সহায়তা উপেক্ষার বিষয় নহে, ইহা প্রণিধান করার উপযুক্ত।[১]

দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮) ও আলাওলের (১৬০৭-১৬৮০) পরে মধ্যযুগের শেষ ও শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের(১৭১২-১৭৬০) কাব্যে অশ্লীলতার জন্য তাঁর পূরবর্তী কবিদের সমালোচনার ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতকে এমদাদ আলী মানতে নারাজ, কোনো সম্প্রদায় বিশেষকে দোয়ারোপ করা আরও অবান্তর বলেও তিনি মনে করেন। সাহিত্য সবসময় তার যুগের চাহিদাকে ধারণ করে থাকে। এতদ্বিষয়ে সৈয়দ এমদাদ আলী সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগেরই চিহ্ন বুকে ধারণ করিয়া আছে ? তখনকার বঙ্গ-সাহিত্যে যারা আছে তাহাতে সেই যুগেরই লক্ষণ বিদ্যমান। সে সাহিত্য হিন্দুরাই সাহিত্য ছিল, তখনও তাহা হিন্দু মুসলমান উভয়ের সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয় নাই। কারণ মুসলমান জনসাধারণ তখন বাঙ্গালা-সাহিত্যকে নিজের সাহিত্য বোধে পরিচর্য্যা করিত না, যাহা কিছু করিত, তাহা যেন শখ করিয়াই করিত। তবে তখন যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ যেন তাহা সফল হইতে চলিয়াছে-আজ বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষার পদে বরণ করিয়া লইয়াছেন।[২]

বাংলা ভাষা আজ সব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির মাতৃভাষা। এখন 'বঙ্গভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী বা নববধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের জিনিষ নহে' আর 'বাঙ্গালা কবিতা' এখন আর 'কৃষকের গান' নহে বলে দীনেশচন্দ্র সেনও মনে করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নবম অধ্যায়ে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ'-এর 'সাহিত্যে নূতন আদর্শ' অংশে লেখক এ কথা বলেছেন।[৩] সৈয়দ এমদাদ আলী এই অধ্যায়ের একটি অংশ উদ্ধৃত করে সাহিত্য-পত্রিকায় লিখেছেন :

> বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিদু-ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুটনী ও কামিনীকুমারের সোনামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্ব্বলাদাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্র লোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী। মুসলমানী কেতাবে কুটনীদাসী অনেক স্থলে দৃষ্টি হয়।[৪]

'মুসলমানী কেতাবের কুটনীদাসী অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়' বাক্যটি লেখক দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পরবর্তী সংস্করণে বর্জন করেন। ওখানে তিনি যে কথাগুলি সংযোজন করেন, তা এই :

> কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় এইরূপ নারী-চরিত্র কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বটতলার নানা বিদেশী ভাবাপন্ন কেতাবে কুটনী দাসী অনেক স্থলে দৃষ্টি হয়।[৫]

এছাড়া দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে আরো কয়েকটি স্থানে 'মুসলমানী' শব্দ ব্যবহার করে পরবর্তী সংস্করণে সেস্থানে 'বিদেশী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত আপত্তির কারণে এটি পরিবর্তিত হয়েছিল কী না, তা আমাদের জানা নেই। তবে একই অধ্যায়ের আরো একটি স্থানে তিনি 'মুসলমানী' শব্দটি রেখেছেন, হয়তো তিনি সেটি রাখা সঠিক মনে

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯
৩ দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৫৬৫
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
৫ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭

করেছেন বলে পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করেননি। আমরা সৈয়দ এমদাদ আলীর সাহিত্য-পত্রিকায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এর দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রকাশকাল ১৯০১) থেকে উদ্বৃত্ত অংশ তুলে ধরছি:

> বিদ্যাসাগরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্‌নী সংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ-এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক।[১]

লেখক দীনেশচন্দ্র সেন 'মুসলমানী' শব্দের স্থলে 'বিদেশী' শব্দ পরবর্তী সংস্করণে (৫ম সংস্করণ, ১৯২৬) ব্যবহার করেলেও বইয়ের ফুটনোটে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

> এই দূতীগণের সাহায্যে বশীকরণের চেষ্টা প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও কিছু কিছু বিবৃতি আছে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর সাহিত্যিক রুচি নির্ম্মল হয়। বৌদ্ধধর্মের অনেকেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহিত্যে সেই প্রাচীন জিনিসের পুনরায় আমদানীর জন্য তাঁহারাই দায়ী।[২]

তাই সমালোচক প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে যে কুটনীপ্রথার প্রচলন দেখা যায়, তা কি বিদেশ থেকে এসেছিল, না এদেশের উর্বরা মাটিতেই গজিয়ে উঠেছিল। এই কুটনী প্রথা মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এ দেশে প্রচলিত ছিল। এটি যে এ দেশেরই জিনিস, তার প্রামাণিক সূত্র হিসেবে সৈয়দ এমদাদ আলী *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যের (১২৮৫-১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) 'বৌদ্ধ ধর্ম ও স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসধর্মের পরিণাম' প্রবন্ধ থেকে প্রযোজ্য অংশটুকু *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* উদ্ধৃত করেন :

> ভিক্ষুণীর সৃষ্টিতে তাঁহার সমীহিত ফললাভে বহুবিধ উৎপন্ন হইয়াছিল। কালের ধর্ম্মে বা মানুষের স্বভাবে স্খলন হইয়াই থাকে। কিন্তু ভিক্ষুণীদের সৃষ্টিতে ঐ স্খলনটা যে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব সেই জন্যই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলেই তাঁহার সদ্ধর্ম্ম সহস্র বৎসর থাকিত, কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করার আর পাঁচশত বছরের বেশী থাকিবে না।
>
> ভিক্ষুণীদের উল্লিখিত দুর্নীতি কালক্রমে ধীরে ধীরে কিরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা পরবর্তী সংস্কৃত-সাহিত্যেও জানা যায়, নায়ক নায়িকার অবৈধ ও লজ্জাবহ সংযোগের জন্য দূতীর প্রয়োজন হয়, দূতীই কৌশলে তাদৃশ সংযোগ ঘটাইয়া দিয়া থাকে। কামন্দকী এবং তাহার 'অন্তে বাসিনী' অবলোকিতা ও 'প্রিয় সখী' বুদ্ধ রক্ষিতা, ইহারা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া চৌর্য্য বিবাহ সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৩]

তাই বলা যায় কুটনী প্রথা বিদেশ থেকে আমদানি নয়, এটি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুস্থানেই প্রচলিত ছিল। আবার কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যে যে অশ্লীলতাভাবের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেজন্য সংস্কৃত সাহিত্যই দায়ী। আরবি, ফারসির প্রভাব তখন বাংলা সাহিত্যে উপর পড়া শুরু করেনি। কবি আলাওল ও ভারতচন্দ্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের ভাষা ও রচনার পারিপাট্য থেকে তা বিশেষভাবেই বোঝা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেই বরং অনেক অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়, তা কালিদাসের কাব্য থেকে কয়েকটি শ্লোক সাহিত্য-পত্রিকায় অর্থসহ উদ্ধৃত করে দেখান সৈয়দ এমদাদ আলী :

---

১ 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

৩ সৌগত উদ্ধৃত, 'জরৎ প্রাবাজিকা', *মালতী-মাধব: ১ম খণ্ড*, 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী ?', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে আছে :-

বিলাসিনীবিভ্রমন্তপত্র মাপালুরং কেতকবর্হমন্যঃ

প্রিয়ানিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈবিপাটায়ামাস যুবানখগৈঃ

অভিনব যৌবন সম্পন্ন কোন নরপতি বিলাসিনীগণের নিতম্বদেশ বিনীত করণে সুপটু নসাগ্র দ্বারা প্রেয়সী-বিভ্রম দন্ত্রপত্র নামক বিলাসভূষণস্বরূপ ইষ্যৎপাণ্ডবর্ণ কেতকীদল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

উক্ত মহাকাব্যের উনবিংশ স্বর্গে আছে-

কুপ্ত পুষাশয়নান্ লতাগৃহান এত্য দূতীকৃতমার্গদর্শন

অস্বভৃৎ পরিজনাঙ্গস্বতং "সোহবরোধবযপেথূত্তরম"

তিনি পথপ্রদর্শিনী দূতীর সঙ্গে কুসুমশয্যাশোভিত লতাগৃহে আসিয়া প্রণয়িণীগণের ভয়ে কম্পমান কলেবরে দাসীগণের রতি উপভোগ করিতেন।[১]

কালিদাসের *কুমারসম্ভব*, *মেঘদূত*, *শৃঙ্গারিতিলক* ও *ঋতুসংহার* এবং জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* অশ্লীলতা পরিপূর্ণ। তাই বলে আমরা কালিদাস বা জয়দেবকে অশ্লীলতার কবি বলে অপবাদ দিতে পারি না। এতৎপ্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী কবিদের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> আমরা তাঁহাদের কাব্যসুধাপানে পরিতৃপ্ত, এই কথাই আমরা স্মরণ রাখি। আমরা সবই ভুলিয়া যাই। এই কবিদের রচনা যখন দেশবাসীর প্রথম মনোরঞ্জন করিয়াছিল, তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রতি সামজস্য রাখিয়াই কবি প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখনকার সমাজে নিশ্চয়ই ইহা দূষনীয় বিবেচনা হইত না। আজ যদি কেহ এইরূপ কবিতা রচনা করেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সহস্রধিক্কার লাভ অনিবার্য্য। ভাব ও ভাষা ক্রমে মার্জিত হইয়াই উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কালিদাসের শকুন্তলা তাহার নিদর্শন।
>
> অতএব এই আলোচনার ফলে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গভাষায় অশ্লীলতার আবির্ভাব, তদানীন্তন কবিদের অত্যধিক সংস্কৃত চর্চ্চারই ফল। উহা মুসলমানদের দ্বারা বিদেশের আমদানী বা বিজাতীয় ভাবের প্রচারের ফল নহে।[২]

তাই বলা যেতে পারে, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে যে অশ্লীলতার ছাপ পড়েছে তা এবং কুটনী-প্রথা উভয়ই এই দেশের জিনিস, এই দেশের আলো, বাতাস ও সহানুভূতি পেয়েই তা মুসলমানদের ভারত আগমনের বহুপূর্বে বিরাজমান ছিল বলে সমালোচক মনে করেন।

কুটনী প্রথা বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে এদশে স্থান পেয়েছিল, এটি মুসলমানের আমদানি নয়। আর এখন যাকে অশ্লীল বলা হয়, তা বরং সেই সময় সাহিত্যরসপিপাসুদের নিকট স্বাভাবিক বিষয়ই ছিল। সৈয়দ এমদাদ আলী প্রবন্ধ শেষে লেখেন :

> আমরা আশা করি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ভবিষ্যৎ সংস্করণে দীনেশবাবু মুসলমানদের প্রতি অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিয়া যে অবিচার করিয়াছেন তাহার প্রতিবিধান করিবেন-কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের সাহিত্যের আলোচনাটি তিনি নূতন করিয়া লিখিয়া মুসলমান জাতিকে মিথ্যা দোষারোপ হইতে মুক্ত করিবেন।[৩]

---

১ রঘুবংশ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, উদ্ধৃত, 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী?', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের সাহিত্য-পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলীর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' পরবর্তী সংস্করণে (১৯২৬) উপর্যুক্ত বিষয়সহ অনেক স্থানে সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

বরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব' শীর্ষক সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৯) প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবন্ধটি যখন সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় ও বেঁচে ছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার নানামুখী বিশ্লেষণ ও সমালোচনা তখন মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্র হিসেবে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশ একটি ইতিবাচক ঘটনা। অখণ্ড বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাত্মতা প্রকাশ তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটির প্রথমেই প্রবন্ধকার বরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে মূল বিশেষত্বটী সহজেই চোখের সামনে ধরা দেয় তা হচ্ছে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাত্ম বোধ। জীবনের অখণ্ড বৈচিত্র্যের, অগণিত রূপভঙ্গীর মাঝখান দিয়ে কবি বিশ্ব মানবের মূল স্বরূপটী যে তুলি, রঙ আর রেখা দিয়ে তাঁর প্রতি কবিতার নানা ছন্দে নানারূপে ব্যক্ত করছেন-আমরা বিশ্ব আত্মার একটা অখণ্ড গোটা প্রকাশই তার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই।[১]

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স থেকেই বিশ্বজগতের মধ্যে কল্পনা ও সত্যের ছায়া দেখতে পেয়ে তার আলোকমালা ও সৌন্দর্যের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণ করেন। কবির হৃদয় ও জীবনে এর প্রতিফলন যেন মানবজীবনেরই একটি বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। লেখক বরুণ কুমার সাহিত্য-পত্রিকায় এতৎপ্রসঙ্গে লেখেন :

> মানব জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের, অসংখ্য ভঙ্গীর একটী বিচিত্র খেলা। বিচিত্র ভঙ্গী আমরা এইখান থেকেই কবির জীবনে একটানা গতিতে প্রবাহিত দেখতে পাই। ধীরে ধীরে এই সৌন্দর্য্য অনুভূতি দেহে প্রাণে মনে ছাপ পেয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে-ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির রেশ তাঁর হৃদয়ে সেতারার ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে-কী চঞ্চল বিচিত্রগামী তার গতি।[২]

বিশ্ব সৌন্দর্যের এই চরম অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যে অনন্ত রূপে অনন্ত ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই কবির 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' আমরা তাঁর যে বাণী দেখতে পাই, তা সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন প্রন্ধকার :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে, এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।[৩]

অনন্ত সৌন্দর্যের বার্তাবাহক হিসেবে ইউরোপে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের (১৭৭০-১৮৫০) মাধ্যমে রোমান্টিক যুগ এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তেমনই সার্থক রোমান্টিক কবি হিসেবে বাংলা কবিতায় আবির্ভূত

১ বরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব,*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯, পৃ. ৩২০

২ প্রাগুক্ত

৩ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

হয়েছেন। প্রবন্ধকার এতৎপ্রসঙ্গে ইউরোপে রোমান্টিক যুগের আরেক কবি রুশ ভাবুক ভাসিলি জুকবসকির (Jukvoshy) কবিতা উদ্ধৃত করেছেন :

> Everywhere we hear the familiar voice Everywhere we see the unforgotten face; O, the sweetness of the secred thought That there, tan off in the distant dale, The angel queen of beauty, Alone with her grief. Mouras and weeps her lover Even thither does the soul bear.The love and enage of the dear one of there, friends, death can never rob us For there is life and love bey and the grave.[১]

প্রবন্ধকার তাই বলেছেন, আমরা একই তত্ত্ব নব নবরূপে নতুন ভঙ্গিতে বিচিত্র ভাষায় অভিব্যক্ত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সৌন্দর্যই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। কবির কৈশোর জীবনের কল্পনা রঙিন কাব্যগুলি সেই জীবন ইতিহাসের প্রথম ভূমিকা স্বরূপ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় হওয়ার সঙ্গে তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে মূলগত রসবোধের কোনো অনৈক্য দেখা যায় না। প্রকৃতি, মানুষ ও বিশ্বের সঙ্গে কবির জীবনের একটা মিলনসূত্র গ্রথিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিতা সেইদিক থেকে সার্থক। তবে কবি প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয়ও দিতে চাননি। তাহলে কবির ধর্ম কী, এতৎবিষয়ে প্রবন্ধকার সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> কবির ধর্ম্ম তাই মানুষের ধর্ম্ম আবার দেবতার ধর্ম্মও; -যেখানে মানুষে আর দেবতার সত্যের দিক হতে মিলন হয়েছে, মানুষ যেখানে নিছক দেবতা হয়ে যায় নি, আবার দেবতাও যেখানে নিছক মানুষ হয়ে ওঠেনি। কবির শ্রেষ্ঠ শিল্পী সর্ব্বদাই এই সত্য মেনে চলেছে।...রবীন্দ্রনাথের ক্যাসাহিত্যে এই বিশেষত্বটুকু আমরা দেখতে পাই যে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন রূপকের পশ্চাতে তত্ত্বের অনুসন্ধান করে রূপকেই আবদ্ধ থেকে গেছেন-রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রতিভা কিন্তু সেই রকম কোনও বেড়াজালে ঠেস্ খেয়ে যায় নি।[২]

কবি এভাবে তাঁর প্রাণের স্বর ছাড়িয়ে স্রষ্টার মনোরম রূপের একটা সন্ধান ধীরে ধীরে পেয়েছেন। তাকেই তিনি 'জীবন দেবতা' হিসেবে বুঝিয়েছেন। 'জীবন দেবতা' কোনো একক সত্তা নয়, অনেক বৈশিষ্ট্যের সমাহার বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। লেখক এতদ্বিষয়ে রবীন্দ্র কবিতার উদ্ধৃতিসহ সাহিত্য-পত্রিকায় লিখেছেন :

> যে স্বভাব কর্ম্মে উদ্দীপ্ত, জ্ঞানের অভিব্যক্ত প্রেমে অনির্ব্বচনীয়; এই কর্ম্ম, প্রেম, প্রেমের ত্রিধা বিকাশ স্বরূপ যে জীবন, জীবন দেবতা হচ্ছেন সেই রসাধার, যাঁর মধ্য থেকে এ সকলের বিকাশ হবে, প্রকাশ হবে। ... 'নৈবেদ্যে' তাই লিখছেন-
>
> তোমার মন্দির-মাঝে
> রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে ইন্দ্রিয়ের দ্বার আমার।
> যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝ-খানে।
> মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।[৩]

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
৩ প্রাগুক্ত

জীবন দেবতার এই চরম রসটির সন্ধান কবি পেয়েছেন। জীবনের প্রতিদিনকার তুচ্ছ খুটিনাটি ঘটনার সঙ্গে জীবন দেবতা সংশ্লিষ্ট ও সংবদ্ধ, কবি এই চরম তত্ত্বটি পেয়েছেন এবং এ তত্ত্বের পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাই ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালাতীত যে শিল্প, তার অনুসন্ধান করেছেন। কবি যেন সীমার বন্ধন পেরিয়ে উঠেছেন, একটা অসীম অনন্তের উদ্দেশ্যে তিনি যেন পাড়ি দিতে চেয়েছেন।

কবির কাব্য পিপাসা অনন্ত, তার শেষ নেই-ছেদ নেই, অতীন্দ্রিয়ের অনন্তের একটা নিবিড় স্পর্শের মধ্যেই তিনি জগতকে দেখতে দেখতে চলেছেন, আধুনিককালে যাকে Mystic নামে অভিহিত করা হয়। কবির অন্তর্চক্ষুর নিবিড় অনুভূতিবোধ আমরা *গীতাঞ্জলির* পৃষ্ঠায় নানা আকারে দেখতে পাই।

জীবন দেবতা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন, তিনিও এক মুগ্ধ আবেশ রঞ্জিত নয়নে তাঁর রূপ ও কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। প্রাবন্ধিক সবশেষে *গীতাঞ্জলির* উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করেন :

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র একবাণী
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর কাব্য নিয়ে এরকম জীবনধর্মী একটি প্রবন্ধ রচনা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সুধীর কুমার সেনের 'পল্লীসমাজের খানিকটা' শীর্ষক সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *পল্লীসমাজ* (১৯১৬) উপন্যাসের কয়েকটি দিকের উপর সমালোচক আলোচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীণ সমাজের মানুষের জীবনধারণের পটভূমি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উচ্চশ্রেণির সমাজপতিদের আধিপত্য, নিম্নশ্রেণির মানুষের দরিদ্রতা, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, বিবাদ, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয় উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। উপন্যাসটি প্রথম *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমেশের বাবা তারিণী ঘোষালের শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র ঘিরেই উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র রমেশকে এ উপন্যাসের নায়ক এবং রমাকে নায়িকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র বেণী মাধব আর বেণী মাধবের মা বিশ্বেশ্বরী। তবে বিশ্বেশ্বরী প্রতিদ্বন্দ্বী সবার ভিতর সমঝোতা বা সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সকলেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঈর্ষাপরায়ণ জমিদার এবং কুয়াপুর নামক গ্রামের অধিবাসী। তবে গ্রামের সাধারণ লোকজন ও গ্রামোন্নয়ন নিয়ে অবস্থাপন্ন ও ক্ষমতাশালীদের বিভিন্ন সময়ে নানামুখী অবস্থান ও পক্ষবদল লক্ষ করা যায়। লেখক সমালোচক সুধীর কুমার সেন উপন্যাসটি সম্পর্কে সাহিত্য–পত্রিকায় বলেন :

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

এইরূপ উপন্যাসগুলিকে problem novels ই সাধারণত বলে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে এই জিনিসটা ভাল ফুটিয়াছে। তাই তাঁহার 'পল্লীসমাজের খানিকটা' অংশ লইয়াই অল্প আলোচনা করিব। ... কি করিয়া আস্তে আস্তে অতি ধীর পদক্ষেপ সমাজসংস্কার সাধন করিতে হইবে ইহা দেখানোই হইতেছে শরৎবাবুর এই উপন্যাস লিখা। রবি বাবুর*গোরা*র ভিত্তিস্থল আর পল্লীসমাজের ভিত্তিস্থল একই বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাস উপলক্ষ্য করিয়া শরৎবাবু বিশ্বেশ্বরীর যে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে।[১]

বিশ্বেশ্বরীকে মায়ের মতোই রমা ভক্তি করে, বিশ্বেশ্বরীর পুত্র বেণী ঘোষাল স্বার্থপরতা ও হীনতার প্রতীক হয়ে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল যুবক রমেশের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের ফলে বেণীর মাথায় আঘাতজনিত কারণে রমেশকে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে যেতে হয়, যদিও এখানে রমেশের কোনো ইন্ধন ছিল না। রমেশের সঙ্গে রমার সুসম্পর্ক থাকলেও ঘটনা পরম্পরায় রমার অবস্থান হয়ে যায় বেণীর পক্ষে আর রমেশের বিপক্ষে। তবে বেণীর মা হয়েও বিশ্বেশ্বরী রমার অবস্থানকে মেনে নিতে পারেননি। আবার রমেশ জেলে যাবার পর রমার মনোকষ্ট প্রবল হয়, এভাবে রমার দ্বিমুখী টানাপোড়েন উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে সহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

তাই রমেশ যখন জেলে চলিয়া গেল রমা শয্যা লইল। জীবনের ভিতরকার দৈন্য বাহিরের নানা জমকালো জিনিষে কিছুকাল ঢাকিয়া রাখা যায় বটে কিন্তু তাহা চিরদিনের জন্য নয়, দুদিন পরেই অন্তরের আসল স্বরূপ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে।[২]

রমেশের প্রতি তার অন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে রমার অসুস্থতা প্রাপ্য ছিল বলে রমা নিজেই পরে মেনে নিয়েছে। রমার এই পরিবর্তনটা যিনি লক্ষ করেছিলেন, তিনি বিশ্বেশ্বরী। রমা তাঁকে জেঠাইমা বলে জানলেও আপন মায়ের থেকে কোনো অংশে কম নয় বলে উভয়ে বিশ্বাস করে। বিশ্বেশ্বরীর মধ্যে ন্যায়নীতির বিচারে একাধারে কোমলতা ও কঠোরতার সন্নিবেশ ঘটেছিল। এতদ্বিষয়ে রমাকে বলা বিশ্বেশ্বরীর কথামালা লেখক সুধীর কুমার সেন সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

শরৎবাবু বিশ্বেশ্বরীকে শুধু কোমলতা ও স্নেহ দিয়া 'মা' করিয়াই গড়েন নাই, তাঁহাকে কর্ত্তব্যোচিত কঠোরও করিয়াছেন। বেণী যখন মাথায় ঘা লইয়া হাসপাতালে এবং রমা যখন তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিল, তখন বিশ্বেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন- 'দুঃখ করো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে' প্রত্যুত্তরে রমার মুখে আবার বিস্ময়ের একটা আভাস পাইয়া তিনি কহিলেন–'ভাব্‌চ মা হয়ে সন্তানের এতবড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি ? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশী পেয়েচি কি আনন্দ বেশী পেয়েচি তা বলতে পারি নে। .. কয়লাকে ধুলে তার রংবদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পুড়তে হয়।[৩]

বিশ্বেশ্বরীর যৌক্তিক ও পরিস্থিতিজনিত কথায় রমার দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। এরপরে রমার মনস্তত্ত্ব বোঝাতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসে যেটি লেখেন, তা সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছেন সমালোচক সুধীর কুমার সেন :

---

১ সুধীর কুমার সেন, 'পল্লীসমাজের খানিকটা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৭২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

> থার্ড ক্লাশের গাড়ির দরজা খোলা পাইলে যেমন একটির পর একটি করিয়া সকল যাত্রীই ঐ গাড়িতে ঢুকিতে চায়-তেমনিই রমার মনে ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়া বিগত দিনের চিন্তারাশি ক্রমাগত জড় হইতে লাগিল।[১]

শরৎচন্দ্র রমার ভিতর দিয়ে এক নারীর আত্মসমর্পণের কাহিনি বিবৃত করেছেন বলে লেখক জানান। অপর নারী বিশ্বেশ্বরীর মাধ্যমে মাতৃরূপ, সমাজ, সংস্কার-মানস, ন্যায়পরায়ণতা দেখানোর চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্র, এটাই লেখকের অভিমত। শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে রমার উদ্দেশে যা বলেছেন, সমালোচক সুধীর কুমার সেন তা উদ্ধৃত করেছেন সাহিত্য-পত্রিকায় :

> কি জানিস মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা। তাকে জোর করে নেবালেও সে আশেপাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।[২]

সমালোচক সুধীর কুমার সেন এ রচনায় রমা ও বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রের কিছু প্রবণতার বিশেষ দিক নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন। বিপ্লবী ও নারী সাহসী হয়েও শেষ পর্যন্ত পুরুষেতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ রমা চরিত্রের চূড়ান্ত পরিণতি বলে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৫) বিখ্যাত উপন্যাস *আনোয়ারা* (১৯১৪) নিয়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)র একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। *আনোয়ারা* উপন্যাসকে সমালোচক 'একখানি স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি উপন্যাসের মূল আলোচনার পূর্বে সাহিত্য, উপন্যাস রচনায় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান লেখকদের রচনাশৈলির পার্থক্য, অনুকরণ, প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রায় তিন পৃষ্ঠা আলোচনা করেন। এতদ্বিষয়ে সমালোচক লেখেন :

> আমরা এতদিন বঙ্কিম প্রমুখ মোস্‌লেম বিদ্বেষী সাহিত্যিকগণকে গালাগালিই দিয়া আসিতেছি, একদিনও দু'টো ভাল কথা শুনাই নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, আমাদের এই যে সাহিত্যিক জাগরণ ইহার মূলে বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র ইত্যাদি উদার হৃদয় (?) ব্যক্তিবর্গের 'যবন," নেড়ে রূপী তীব্র আহ্বানগুলিই বিরাজমান রহিয়াছে। অভাবের উত্তেজনা বা বেদনার সৃষ্টি না হইলে কোন কার্য্যেই আমাদের প্রবৃত্তি আসে না। সুতরাং এই বেদনা যাহারা দান করেন, প্রকারান্তরে তাঁহারা নেহাইত ভাল মানুষ- তাঁহারা আমাদের হিতৈষী বন্ধু।[৩]

বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের অগ্রযাত্রায় হিন্দু সাহিত্যিকদের ভূমিকাকে লেখক-সমালোচক এভাবে স্মরণ করেন। উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক আমাদের সমাজে 'রুচি-বিরোধ' ঘটেছে বলে মনে করেন। একদল এর ঘোর বিরোধী, অপরদল এর ঘোর পক্ষপাতী। উপন্যাসকে সৎসাহিত্য হিসেবে মানতেও অনেকে নারাজ। তবে উপন্যাসের গুরুত্বকে খাঁটো করে দেখার অবকাশ নেই। এতদ্বিষয়ে সাহিত্যের বিভাগ ও পার্থক্য নিয়ে লেখক-সমালোচক গোলাম মোস্তফা লেখেন :

> সাহিত্যের দুইটা বিভাগ আছে: ১ম, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, ২য় সাধারণ সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি পরিমার্জ্জিত বিষয়গুলিরই একচেটিয়া অধিকার। আর গল্প উপন্যাস ইত্যাদি

---

১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮-৭৯

৩ গোলাম মোস্তফা, 'আনোয়ারাঃ আলোচনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৫৮-৫৯

> যাহা কিছু সরস ও সাধারণের বোধগম্য, তাহাই লইয়া সাধারণ সাহিত্য গঠিত। এই দু'য়ের সংমিশ্রণেই সাহিত্যের পূর্ণতা।[১]

বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের যে কয়েকটি গ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেছে, এগুলোর মধ্যে *আনোয়ারা* (১৯১৪) অন্যতম। এক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৮৫-৯১) এর পরেই *আনোয়ারার* স্থান। প্রসঙ্গত কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> সম্প্রতি (বাংলা ১৩৫৬ সালে) এ বই- এর এয়োবিংশতি সংস্করণ কলিকাতার ৩০নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থ ওসমানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।---- জানা গেছে, এ-যাবত 'আনোয়ারা'র প্রায় দেড় লক্ষ কপি নিঃশেষিত হয়েছে। বোধ হয় একমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া আর কোনো বাংলা বই- এর এত কাট্‌তি হয়নি।[২]

আনোয়ারা অমর কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আনোয়ারা উপন্যাসের জনপ্রিয়তার মূল কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পূর্ব বাংলাদেশের পল্লিসমাজের, বিশেষভাবে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজের জীবনচিত্রের বিশ্বস্ত রূপায়ণ। পল্লির মুসলমান সমাজের সঙ্গে প্রবন্ধকারের পরিচয় ছিল সুগভীর ও দীর্ঘকালের। স্বভাবতই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পচেতনা যুক্ত হয়ে *আনোয়ারা* উপন্যাস জীবন্তরূপ লাভ করেছে। এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে যেমন পল্লিজীবনের স্নিগ্ধ শান্তশ্রী, তেমনি ধরা পড়েছে সমাজের মসিলিপ্ত ক্রুররূপ। ফলত উদঘাটিত হয়েছে সমাজজীবনের অখণ্ড চিত্র। বহুবিবাহ প্রথা ও কুলগর্বের অন্তঃসারশূন্যতা কীভাবে একটি সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তারও জীবন্তরূপ ধরা পড়েছে এ উপন্যাসে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) ও মশাররফের পথই অনুসরণ করেছেন। তাই নজিবর রহমানের ভাষা অলংকারবহুল হলেও লালিত্যহীন নয়। পাঠকের হৃদয় জয় করার ক্ষেত্রে লেখকের প্রাঞ্জল ভাষা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। আনোয়ারার চরিত্র মুসলমানী কায়দায় সুন্দররূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটিই লক্ষ করার বিষয়। আনোয়ারার পাশাপাশি নূরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, গোলাপজান চরিত্র নিয়ে সমালোচক সাহিত্য-পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। আলোচনা শেষে লেখক-সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> আনোয়ারা লেখকের রচনা-পদ্ধতি খুব সুন্দর। ভাষার উপর তাহার বেশ অধিপত্য আছে। বর্ণনা কৌশলও সুন্দর এবং সরল। লেখক অনেকস্থলে হাস্যরসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা ততদূর সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, আমার মনে হয়, বাজারে আমাদের যে কয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আনোয়ারা একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়া আনোয়ারা লিখিয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে বলিয়াই বিশ্বাস। ইহাদ্বারা নববধূদের চরিত্র গঠিত ও সংশোধিত হইবে বলিয়া বিলক্ষণ আশা করা যায়। এই শ্রেণীর উপন্যাস দ্বারা আমাদের সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে না, বরং উপকারই হইবে।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২ কাজী মোতাহার হোসেন, 'মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা : বাংলা সাহিত্য সম্পদ', পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৬, পৃ. ৩৩-৩৪

৩ গোলাম মোস্তফা, 'আনোয়ারা : আলোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

উপন্যাসের মাধ্যমে ইতঃপূর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজের পল্লি জীবনের পারিবারিক চিত্র কোনো লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই পথিকৃৎ। প্রসঙ্গত কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) *নদীবক্ষে*(১৯১৯), মুহম্মদ কোরবান আলীর *মনোয়ারা* (১৯২৩), আবুল ফাত্তাহ কোরেশীর *সালেহা*(১৯২৬), কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ* (১৯৩২), মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) *জোহরা* (১৯৩৫) প্রভৃতি উপন্যাসের কথা মনে আসবে। কিন্তু এগুলো *আনোয়ারার* পরবর্তীকালের রচনা এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে কোনো উপন্যাসই *আনোয়ারার* সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'মীর-পরিবার' (১৯১৮) এর 'দোষ গুণ আলোচনা' '*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*'র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'মীর পরিবার' কাজী আবদুল ওদুদের ছাত্রজীবনের রচনা। এতে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে : 'মীর পরিবার', 'আশরাফ হোসেন', 'করিম পাগলা', 'হামিদ' ও 'আবদুর রহিম'। গল্পগুলোর নাম দেখেই বোঝা যায় বাঙালি মুসলমান সমাজই প্রধানত এর উপজীব্য। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রতিটি গল্পের আলোচনা পৃথকভাবে করেন সমালোচক। ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা '*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*'র একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মীর পরিবার' বিলাসপুরের মীর সাহেবের জীবনকাহিনি। দুটি অংশে বিভক্ত এই গল্পের 'সেকাল' অংশ মীর ভাইদ্বয়ের জীবনকথা এবং 'একাল' অংশ তাদের পুত্র-কন্যাদ্বয়ের প্রণয়কাহিনি। 'সেকাল' অংশের থেকে 'একাল' অংশ সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। প্রথমাংশ অসহিষ্ণু পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে।[১] গল্পের উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র রওশন আরা এখানে আদর্শ মহীয়সী নারী রূপে আবির্ভূত, অনেকটা বেগম রোকেয়ার আদলে গড়া। রওশন আরার প্রেরণায় ও কৃতিত্বে মীর পরিবার যেমন উদ্ভাসিত সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি এলাকার আপামর জনগোষ্ঠীও জ্ঞানের প্রভায় আলোকিত হয়েছে।[২]এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকার বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য:

> 'একাল' বা দ্বিতীয়ার্ধে রওশন আরার মৃত্যুতেই যেন গল্পের আরম্ভ। এখান হতেই যেন অনেকটা মনকে টেনে নিয়ে যায়। রওশন আরার সহসা মৃত্যুর মস্ত বড় আঘাত ও লেখক বেশ ধীর শান্তভাবে রয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের এ সংযম উপভোগ্য।[৩]

দ্বিতীয় গল্প 'আশরাফ হোসেন'। আলিগড়ের নব্য শিক্ষিত যুবক আশরাফ হোসেনের প্রণয়-বিবাহ, দাম্পত্য সুখ দুঃখ ও স্ত্রী বিয়োগ নিয়ে রচিত হয়েছে। গল্পটি বাঙালি মুসলমানের সমাজ বিবর্তনের একটি ধারাকে স্পর্শ করে একটি শাশ্বত ব্যক্তি-জীবনকে প্রকাশ করে। তৃতীয় গল্প 'করিম পাগলা' দুঃখী দিনমজুরের কাহিনি। পাগল বলে কথিত দিনমজুর করিমের হাসি কান্নার আলেখ্য এর বিষয়বস্তু। সহায় সম্বল ও পরিজনহীন করিম সংসারের অতীব শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও নিজে মহাসুখে দিন কাটাত। এই সুখের উৎস ছিল তার কণ্ঠের মধুর গান। এটি একটি 'সুন্দর গল্প। আর্টে, কৃতিত্বে-স্বাভাবিকতায় অপূর্ব।'[৪]

---

১ খেয়াম, 'মীর পরিবার', দোষ-গুণ আলোচনা, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ.৭৫

২ সম্পাদকের কথা, *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলি: ৩য় খণ্ড*, নুরুল আমিন সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. [তিন]

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

লেখকের অন্যতম 'হামিদ' গল্পটি হতাশা আর ব্যথাদীর্ণ এক তরুণের কাহিনি। অসুস্থতা ও অবহেলায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারা এক ব্যথাতুর যুবকের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে এ গল্পে। তার অনিচ্ছাজনিত অক্ষমতাকে ক্ষমা না করে তার পিতা বরং তার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। নিরীহ হামিদ ব্যথার ভার বইতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে গিয়ে নিষ্কৃতি খোঁজে। হামিদের পিতা আরো তাচ্ছিল্যভরে তাঁর উদ্দেশে বলেন, 'যায় যাবে ও থেকেও যা, না থেকেও তাই।' সাহিত্য-পত্রিকার সমালোচক গল্পটির শৈল্পিক দিক নিয়ে লেখেন :

> এ সব গল্প যেন জাপানী শিল্পীর আঁকা এক একটি ছোট্ট ছবির মত। কোন বাড়াবাড়ি নাই। তুলির পাৎলা সহজ ছোপ দিয়ে মানব মনের ভিতরকার শাশ্বত রঙ্গীন একটু ভাবকে চোখের সামনে নষ্ট করে ধরিয়ে দেয়া-বাস্। এই ছোট্টর সার্থকতায় শিল্পীর নির্বাচনী পরীক্ষা হয়ে যায়।[১]

'মীর পরিবার' গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'আবদুর রহিম' সামন্তবাদী পরিবেশে গড়া। বাঙালি মুসলমান জমিদার শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিতের বৃহদায়তন মূল্যবোধের মিশ্রণে এই গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি। এটিই মীর পরিবারের শ্রেষ্ঠ গল্প। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকার মূল্যায়নটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য:

> ভাষার ঝংকারে, শিল্পাচাতুর্য্যে, শিল্পসৌন্দর্য্যের শুভ্র পবিত্রতার সারা গল্পটি বিশেষ সমৃদ্ধ। বইয়ের একেবারে শেষে থেকে গল্পটি যেন শেফালিমালার শেষে ডাগর একটি শ্বেত বসোরা গোলাপের মতো গাঁথা রয়েছে মনে হয়। কোন গল্পই এর মতো মধুর উপভোগ্য হয়নি। আর এত জমজমাটও লাগেনি।[২]

মীর পরিবার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিশির কুমার দাশ (১৯৩৬-২০০৩) তাঁর *বাংলা ছোটগল্প* গ্রন্থে বলেন :

> বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন লেখকেরা মুসলমান জীবন ও সমাজ নিয়ে লেখার প্রচেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কোন সার্থক সৃষ্টি তখনও হয়নি। কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর পরিবার' (১৯১৮) গ্রন্থটি সেই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব চরিত্র বাস্তব-জীবনানুগই শুধু নয়, মুসলমান চরিত্রগুলো বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত স্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়নি।[৩]

নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) প্রবন্ধগ্রন্থ *মতিচুরের* উপর 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দুটি সংখ্যায় আলোচনা বের হয়। *মতিচুর* প্রথম খণ্ডের উপর আলোচনা করেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রাবন্ধিক আবুল হুসেন (এ. হোসেন নামে)। লেখিকা অবরুদ্ধা অবলা নারীদের দুরবস্থা দেখে তাদেরকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করবার জন্য এই বইটি লেখেন। পুরুষের স্বার্থপরতা, শাসননীতি ও কঠোর পশুশক্তির বলে নারীকে যে কীরূপ জঘন্য জীবন বহন করতে হচ্ছে, আর তাতে যে সমাজ ও দেশের কত অকল্যাণ ও অমঙ্গল ঘটছে, তাই অতি সংযত ভাষা ও কোমল শ্রদ্ধার সাথে লেখিকা দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন। লেখিকা 'সুগৃহিণী, 'গৃহ', 'অর্ধাঙ্গী', 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে নারীর সুজ্ঞান কীরূপে জন্মাতে পারে, তা দেখাতে গিয়ে চমৎকার সফলতা লাভ করেছেন। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বোরকা' ও 'নিরীহ বাঙ্গালী' পড়তে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে পুরুষ বিষয়ে লেখিকার মনোভঙ্গি প্রসঙ্গে আলোচক যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

৩ উদ্ধৃত, *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮

পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছুই বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয় পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কশাঘাত করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখিকার মাহাত্ম ঐ স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে বেশী, তিনি ভগিনীগণের ত্রুটিই বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন; পুরুষকে কেবল অঙ্গুলি দিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন মাত্র।[১]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র আরেকটি সংখ্যায় *মতিচুর* দ্বিতীয় খণ্ডের' সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের বিষয়গুলোর হচ্ছে : 'নূর ইসলাম', 'সৌরজগৎ', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'ডেলিসিয়া হত্যা', 'জ্ঞানবল', 'নারীসৃষ্টি', 'নার্স নেলী', 'শিশু পালন', 'মুক্তিফল' এবং 'সৃষ্টিতত্ত্ব'। সমকালীন *সহচর* পত্রিকায়ও 'প্রত্যেক সাহিত্যরসিক সুধীকে বইখানি একবার পড়ে দেখতে[২] অনুরোধ করা হয়। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকার সমালোচকের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

লেখিকা, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। ভাব ও ভাষায় তাহার লেখা সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। নারী জাতির দুঃখ দৈন্য ব্যথিত হইয়া লেখিকা যে সরস মধুর ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। 'মুক্তিফল' রূপকথাটি Political Carricature হিসেবে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।[৩]

উল্লেখ্য রোকেয়ার রূপকথাকর্মী নামে 'মুক্তিফল' 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত হয়। মূল 'মুক্তিফল' গল্পটি নিয়েও যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় ফজলুর রহীম চৌধুরীর দশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'সাব্আ-মোয়াল্লাকার কবিগণ' নামে আরবের প্রাচীন কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়। 'মোয়াল্লাক' শব্দটি 'ইল্ক' থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। 'ইল্ক' অর্থ কোনো মূল্যবান জিনিস, লোকে সাধারণত যার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে।

'সাবআ মোয়াল্লাকা' অর্থ 'দোদুল্যমান কবিতা সপ্তক', শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বোধ হয় কবিতাগুলিকে উক্ত নাম দেয়া হয়েছিল বলে লেখক বলেন। 'মুয়াল্লাকাত' এর সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত কবির নাম ইমরুল কায়েস (৫০১-৫৪৪ খ্রি.)। তিনি তৎকালীন ইয়েমেনের রাজার আত্মীয় ছিলেন। যিনি সর্বজনস্বীকৃত সেরা কবি ছিলেন প্রাক-ইসলামি যুগের। মোহাম্মদ (সা.) তাঁকে 'নরকাগ্নির নেতা' বলে অভিহিত করেছেন। খলিফা উমর ও আলি তাঁর মৌলিকত্বের প্রশংসা করেছেন।[৪] জানা যায়, তিনি কনস্টান্টিপোলনের তদানীন্তন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের (শাসনকাল ৫২৭ খ্রি.) কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কবিতায় এর প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে, তা উদ্ধৃত করেছেন সাহিত্য-পত্রিকার লেখক ফজলুর রহীম চৌধুরী :

যখন পাশে সুবর্ণময় গোলকগুলি
জ্বলিতেছিল, আমি শিবিরে প্রবেশ করিলাম,

---

১ এ হোসেন, 'মতিচূর': ১ম খণ্ড, পুস্তক পরিচয়, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৮, পৃ. ২৩৮

২ সৈয়দ নওশের আলী,'মতিচূর (২য় খণ্ড) গ্রন্থ আলোচনা', *সহচর*, বৈশাখ ১৩২৯, উদ্ধৃত, *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি*, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬২৪

৩ সম্পাদক: 'মতিচূর (২য় খণ্ড) গ্রন্থ পরিচয়', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৯২

৪ আর. এ নিকলসন, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, জয়ন্ত সিংহ, মুহাঃ আবদুল কাইউম অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৬

আমার প্রেয়সী মশারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল;
নৈশ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া
সে নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল
আমাকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল,
"এরূপ নির্বুদ্ধিতার মূল্য কি, তাহা জান ?
দেখিতেছি তোমার পুরাতন পাগলামী
এখনো তোমাকে ত্যাগ করে নাই।"
আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চলিলাম।
তাহার আচল মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতেছিল,
এবং পায়ের ছাপ তাহাতে মুছিয়া যাইতেছিল;
এইরূপে আমরা পাহাড় ও পাথরে পরিপূর্ণ
উপত্যকার প্রান্তে উপস্থিত হইলাম,
তৎপর উভয় হস্ত দ্বারা আমি
তাহার মস্তক আলিঙ্গন করিলাম
পদযুগল বিনত হইয়া আসিল।
কি সুঠাম অবয়ব। কি মনোহর দৃশ্য
আরসী প্রতিফলিত আলোর ন্যায়
কি দীপ্তিমান বক্ষ।[১]

লেখক এরপর পর্যায়ক্রমে যে কবি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা হলেন তারাফা বিন-আল-আবদ (মৃত্যু-৫৬৪), আমর-বিন-কুলসুম (৫২৬-৫৮৪ খ্রি.), হারেস-বিন-হিল্লিজা (মৃত্যু-৫৬০ খ্রি.), আনতারা-বিন-শাজ্জাদ (৫২৫-৬০৮ খ্রি.), জুহায়ের-বিন-আবিসুলমা (৫২০-৬০৯ খ্রি.), লাবিদ-বিন-রাবিয়া।

তারাফা ছিলেন আরবি ব্যঙ্গ রচয়িতা কবিদের মধ্যে অন্যতম। বন্ধু ও শত্রুর সঙ্গে তিনি অক্রোশ চালিয়ে যেতে পারতেন ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। তিনি তাঁর ভাইয়ের পশু-তত্ত্বাবধান করে জীবন নির্বাহ করতেন। এ সময় তাঁর লেখা কিছু 'মুয়াল্লাকা' উচ্চ প্রশংসিত হয়। তিনি হীরার উদ্দেশে রওনা হলে সেখানকার শাসক আমর বিন হিন্দ ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তীকালে অন্য এক কবি মুতালাম্মিনের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তারাফাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয়। শ্লেষপূর্ণ কবিতা লেখার চিরাচরিত অভ্যাস শাসকের উপর প্রয়োগ করায় তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। শাসক আমরকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন এভাবে :

হায়রে যদি আমরের পরিবর্তে
শিবিরের চারিদেকে দুগ্ধবতী এবং
হাম্বারবকারী একটি গাভী পাইতাম।[২]

১ ফজলুর রহীম চৌধুরী, "সাবআ-মোয়াল্লাকার কবিগণ", *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ২১-২২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

একদিন আমর তাঁর ভগ্নীসহ খেতে বসেছেন। তারাফাও অন্য পাশে বসেছেন। রাজার বোনের সৌন্দর্য দেখে হঠাৎ তিনি স্বভাব কবিতার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন :

ঐ যে আমার মনোরম হরিণী
আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে
তাহার কর্ণদূল চকমক করিতেছে।
যদি রাজা এখানে উপস্থিত না থাকিতেন,
তবে তাহার অধরে আমার অধর
সংলগ্ন করিতাম।[১]

আমর এভাবে বারবার বিরক্ত হয়ে তাঁকে এবং তাঁর পিতৃ-সহোদর অথচ তারাফার ঘনিষ্ঠজন মুতালাম্মিসকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দিলেন। দুজনের হাতেই মুখবন্ধ খামে একটি করে চিঠি দিলেন বাহরাইনের রাজ্যপালকে দেয়ার জন্য। পথিমধ্যে মুতালাম্মিসের সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁর খাম খুলে ফেললেন এবং দেখলেন পত্রবাহককে জীবন্ত করর দিতে বলা হয়েছে। এরপর মুতালাম্মিস তাঁর চিঠিটি ছিড়ে পানিতে ফেলে দিয়ে তারাফাকেও তাই করতে বললেন। তারাফা চিঠিটি খুলতে সম্মত হলেন না, একাই বাহরাইনে গিয়ে তিনি তা শাসনকর্তার হাতে প্রদান করেন। ফলস্বরূপ তাকে আমরের পত্রানুযায়ী জীবন্ত কবর দেয়া হয়। সাবআ মোয়াল্লাকার কবিদের মধ্যে কেউই এত অল্প বয়সে তাঁর (তারাফা) মতো খ্যাতিলাভ করেননি। মাত্র বিশ বছরে বয়সে তাঁর জীবনের সমাপ্তি হয় এভাবে।

আমাদের এ পর্বের আলোচ্য কবি আমর বিন কুলসুম। বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে প্রতিভা আর প্রতিষ্ঠার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি মাত্র পনের বছর বয়সে নিজ গোত্রের (তাগ্‌লিব) গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। কবি, বাগ্মী ও দুঃসাহসী যোদ্ধা হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হীরার রাজা আমর-বিন-হিন্দ তাঁর বীরত্বের ও কবিত্বের কথা শ্রবণ করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে লোক পাঠালেন এবং তাঁর মাতা লায়লাকেও আনতে অনুরোধ করেন। আমর বিন কুলসুম তাঁর মা (লায়লা) সহ হীরার রাজার দরবারে উপস্থিত হলেন এবং যথারীতি রাজমাতা তথা আমর বিন হিন্দের মা'র অন্দরমহলে প্রেরিত হলেন। তখন আমর বিন কুলসুম রাজার কক্ষে অবস্থান করছিলেন। দুই মহিলা একত্র হওয়ার পর দাস-দাসীরা এদিক-সেদিক দূরে সরে গেলো, রাজমাতা ও রাজার পূর্ব নির্দেশনানুযায়ী। তখনই রাজার মা লায়লাকে একটি পাত্র এগিয়ে দিতে বললেন। এতে সাড়া না দেয়ার কারণে তিনি দ্বিতীয়বার বললেন। রাজমাতার এরকম ব্যবহারে অপমানে লায়লা আর্তনাদ করে উঠলেন। দরবারে বসে আমর বিন কুলসুম শুনলেন সেই চিৎকার। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো তাঁবুর খুঁটিতে ঝুলন্ত একটি তরবারির দিকে, তা নিয়ে আমর বিন কুলসুম তৎক্ষণাৎ সোজা ঢুকিয়ে দিলেন রাজার বুকে।[২] সাহিত্য-পত্রিকায় অবশ্য আমর বিন কুলসুম কর্তৃক রাজার শিরশ্ছেদের কথা বলা হয়েছে।[৩] এই ঘটনাটি ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল।

এ দুঃসাহসিকতার পর কবি নিজ গোত্রের লোকদের সংগঠিত করেন। এই ঘটনায় কবির সম্ভ্রমবোধ আরো তীব্র হয়। পরবর্তীকালে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর মুয়াল্লকাটি রচনা করেন। তাতে তিনি নিজ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২ আ. ত. ম মুছলেহউদ্দিন, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৬০
৩ সাবআ মোয়াল্লাকার কবিগণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

আত্মগৌরবের কথা তুলে ধরেন। রাজার সঙ্গে তাঁর এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মুয়াল্লাকায়। আমরা সাহিত্য-পত্রিকা থেকে কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

আমরা গৌরবের উত্তরাধিকারী
আল্‌মাআজগণ (অর্থাৎ আরবগণ) তাহা জানে;
আমাদের বর্শা সেই গৌরব রক্ষা করে;
যখন যুদ্ধ সময়ে শিবিরের থামগুলি
কাঁপিয়া উঠে, তখনো আমরা আমাদের
বন্ধুগণকে রক্ষা করিব, ইহা স্মরণ রাখিও।[১]

আমর বিন-কুলসুম এভাবে তাঁর কবিত্ব ও সাহসিকতার প্রকাশ দেখান। আরেক কবি হারেস-বিন-হিল্লিজা নিজ 'তাগলীব' জাতির প্রশংসা-গানের পাশাপাশি কবিতায় কিছু ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উত্তর আরবে ও পারস্যের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল, তার কিছু আভাস এতে আছে। কবিতায় তিনি 'বাকর' ও 'তাগলীব'দেরকে অনর্থক মারামারি-হানাহানি থেকে বিরত হতে বলেছেন। লেখক ফজলুর রহীম চৌধুরী হারেসের কবিতা সাহিত্য-পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

নির্ব্বুদ্ধিতা এবং ভুল ত্যাগ কর
তোমরা অন্ধের ন্যায় আচরণ করিতেছ,
এবং ঐখানেই তোমাদের দুঃখ নিহিত রহিয়াছে।
জুলমা আজের শপথ স্মরণ কর,
যখন উভয় দল হইতে প্রতিভূ-স্বরূপ
লোক প্রদত্ত হইয়াছিল, তখন যেন ক্ষমতা ও চতুরতা
পুনঃ উহা ভঙ্গ করিতে না পারে।
ধূর্ত্ততা কি সন্ধিপত্র একেবারেই ভঙ্গ করিয়া দিবে ?[২]

এভাবেই কবি হারেস তাঁর কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পরবর্তী কবি আনতারা-বিন-শাদ্দাদ আব্‌স বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী 'তায়ী'দের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় তিনি নিহত হন। এজন্য আরবগণ তাঁকে বীরত্বের অবতার মনে করতো। তাঁর মোয়াল্লাকা কেবল বীরত্বপূর্ণ কাহিনিতে পরিপূর্ণ। লেখক ফজলুর রহমান চৌধুরী সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন :

হে মালিক দুহিতা, তুমি জান
যুদ্ধের সময় আমি কি রূপে
সম্মুখে ধাবমান হই।
যুদ্ধ-বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির অংশগ্রহণ সময়ে
কেবল আমি পশ্চাতে আসি।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

আমি কখনো গদী ত্যাগ করি না,
আমার বেগবান অশ্ব দ্রুত সম্মুখে
অগ্রসর হইতেছে,
যদিও অরিগণ তাহাকে আহত করিয়াছে।[১]

আন্তারা-বিন-শাদ্দাদের সমসাময়িক আরেক কবি জুহায়ের-বিন-আবিসুলমার কবিতায় এক ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ মেলে, যা বিলীন হয় শান্তির বার্তায়। জুহায়ের শৈশবেই পারিবারিক সাহচর্যে কাব্য প্রতিভার অধিকারী হন। তাঁর দুবোন সলমা ও খনসা এবং তাঁর দুছেলে কা'ব ও বুজয়রও ছিলেন কবি। বংশ পরম্পরায় নারীপুরুষ সকলেই তাঁরা কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বংশব্যাপী কবিত্বের এমন অনায়াস প্রকাশ আর কোথাও দেখা যায় না।[২]

হজরত উমর তাকে কবিদের কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। শোনা যায়, তিনি মোহাম্মদের (সা.) সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।[৩] তাঁর কবিতা জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে ভরপুর হয়ে আছে। লেখক ফজলুর রহীম চৌধুরী সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন :

তোমরা যে পাপ ঈশ্বরের নিকট প্রকাশ করিতে
সাহস করিতেছ না, তাহা কি গোপন রাখিবে ?
যে বিষয়ই তোমরা তাঁহার নিকট হইতে
গোপন করিতে চাহ, তাহা তিনি জানেন,
হয়ত উহা 'হিসাবের খাতায়' লিখিত হইয়াছে
এবং কেয়ামতের দিবস তোমাকে প্রদর্শন
করিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে।
অথবা না জানি কোন্ অজানিত সময়ে
সহসা তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে।[৪]

জোহায়েরের কবিতার এমন মৌলিকত্ব ও ধর্মভাব আরব লেখকদের কারো ভিতর আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর পুত্র কা'ব বিখ্যাত 'বানত সুআদ' রচনা করে অমর হয়ে গেছেন।

সাবআ-মোয়াল্লাকার কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক কবি হিসেবে লাবীদ-বিন্-রাবিয়াকে অভিহিত করা হয়। তিনি "বনু আমর" বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলিফা মুয়াবিয়ার রাজত্বকালের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। বেদুইন জীবনের নিখুঁত চিত্র লাবীদের মতো আর কেউই রচনা করতে পারেননি। লেখক ফজলুর রহীম চৌধুরী সাহিত্য-পত্রিকায় লাবীদ-বিন-রাবিয়ার মোয়াল্লাকা থেকে একাংশ উদ্ধৃত করেছেন :

মিনার অধিবাসীগণ একদিন যেখানে অবস্থান করিত,
তাহা এখন পরিত্যক্ত রহিয়েছে,
'রিজাম ও গাওল' বিজন ভূমিতে পরিণত হইয়াছে,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২ আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬
৩ আর এ নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৪ সাবআ মোয়াল্লাকার কবিগণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

রায়আস উপত্যকার শিবিরগুলির চিহ্ন এখনো
চামড়ার উপরে বহুদিনের পুরাতন লেখার ন্যায় বিরাজমান
এই স্থান বিজন হওয়ার পর পর্ব্ব ও পবিত্র দিবস পরিপূর্ণ
কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে
কত বসন্তে তারকারাজির অজানিত শক্তির বশীভূত হইয়া
এখানে বৃষ্টি হইয়াছে এবঙ বজ্র পরিপূর্ণ মেঘমালা
বারিধারা বর্ষণ করিয়াছ।[১]

কোথাও কবি লাবিদ নির্জন ভীতিপ্রদ উপত্যাকার বর্ণনা করেছেন। তিনি উটের পিঠে সেই বিজন ভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, কোথাও হরিণ বা উটপাখি তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি তার মোয়াল্লাকায় নীলগাইয়ের সুন্দর বর্ণনা দান করেছেন, কোথাও তিনি বেদুইন-জীবনের ফূর্তি ও আমোদ-প্রমোদের চিত্র ফুঁটিয়ে তুলেছেন। সবশেষে কবি আত্মীয়স্বজনের মনোরম প্রশংসা গান করে তাঁর মোয়াল্লাকাত শেষ করেছেন। একথা সত্য, পুরোপুরি অবিকৃত অবস্থায় কোনো 'মোয়াল্লাকা' বাংলা বা ভিন্ন ভাষায় পাঠকরা পড়ার স্বাদ পায়নি। বরং পাঠকরা যা পেয়েছে তাকে বলা ভালো, প্রকৃত অর্থে বীরগাঁথা। এইসব কবিতায় এমন অনেক কিছুই থাকত, যার পুরো ভাষ্য পেলে বিষয়টি বোধগম্য হতো। মোয়াল্লাকার অনেক কিছুই ছিল কবিতার আঙ্গিকের পক্ষে বেমানান। তৎকালীন প্রাক-ইসলামি আরবভূমি এবং সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে সুগভীর ধারণা না থাকলে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা বোঝা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়; দুরূহ হয়ে পড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধান এবং কবিতার ভাব প্রকাশের সৌন্দর্য। বরং কৃত্রিম রূপরেখা, বিষয়ের সংকীর্ণ পরিধি তৎক্ষণাৎ আমাদের নাড়া দেয়। বেদুইন জীবন ও আচার আচরণের চিত্র প্রায়শই সাবআ মোয়াল্লাকার কবিদের ভেতরেই ফুটে উঠেছে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭) মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বা'নত সুআদ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বানত সু'আদ আরবি সাহিত্যের একটি বিখ্যাত একক কবিতা, এর রচয়িতার নাম কা'ব বিন জুহয়র। তিনি হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর সময়ে আরবের একজন কবি ছিলেন। কা'বের পিতা জুহয়র আরবির বিখ্যাত সাতজন কবির অন্যতম কবি ছিলেন। পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার থেকে কবিত্বশক্তি অর্জন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কা'ব প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, শুধু তাই নয়, প্রথম থেকে তাঁর কবিতার মধ্যে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। তাঁর কবিতার প্রভাব সম্পর্কে সাহিত্য-পত্রিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লেখেন :

> কিন্তু তাঁহার শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর রণভেরীর ন্যায় কার্য্য করিত। পৌত্তলিক আরব যদি কোন পার্থিব শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিত, তবে তাহা এই কবিত্বশক্তি। কা'ব ইসলামের শত্রুগণকেওজস্বিনী কবিতা দ্বারা ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য সকল সময়ে উত্তেজিত করিতেন।[২]

হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর সময়ে ইসলামের প্রসারকালে কা'ব ও তাঁর ভাই বুয়য়র ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি এড়ানোর জন্য ইরাকে পলায়ন করেন। কিছুদিন পর বুয়য়র মদিনায় এসে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে হজরত আবু বকরের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পৌত্তলিক কা'ব এ সংবাদ

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বানত-সু'আদ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ১১৭

পেয়ে ভাই বুযয়য়ের উপর রেগে গেলেন এবং কবিতায়ও তাঁর অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটালেন। এর জবাবে বুযয়র হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর গুণাবলি এবং ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কা'বকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানান। কা'বের উপর মোহাম্মদের ভক্তগণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন বলে জানানো হয় তাঁকে। ফলে কা'ব সিদ্ধান্ত নেন, তিনি হজরত মোহাম্মদের (সা.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নিজ পরিচয় গোপন করে, তিনি হজরত আলীর মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কবি কাবের নবি-সাক্ষাতের শেষে নিজ পরিচয় প্রকাশ পূর্বক দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হয় সে প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> তুমি কি সেই কা'ব, যে আমাকে মামুর (পিশাচসিদ্ধ) বলিয়াছ। ... কোন নির্ব্বোধ 'মামুন' স্থানে 'মামুর' লিখিয়া থাকিবে।" কা'বের উত্তরে হজরত সন্তুষ্ট হইলেন।[১]

তারপর কা'ব মোহাম্মদের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষাবচন পাঠ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সেখানেই তিনি স্বরচিত 'বা'নত সুআদ' কবিতাটি পাঠ করেন। মোহাম্মদ ও তাঁর ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে কা'বের সুললিত কবিতা শুনতে থাকেন। হজরত কবিতা শুনে মুগ্ধ হন এবং নিজের গায়ের চাদর উপহার দেন। কা'ব অতঃপর মোহাম্মদের (সা.) হতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

'বা'নত সুআদ' নামক কবিতাটি ৫৯ টি অংশে বা শ্লোকে বিভক্ত করে লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির প্রথম ও বায়ান্নতম শ্লোকের সাহিত্য-পত্রিকা থেকে অনুবাদ উদ্ধৃত করছি :

> ১। সু'আদ দূরে চলিয়া গিয়াছেন। তাই আজ আমার হৃদয় পীড়িত। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে আমার হৃদয় তাঁহার ক্রীতদাস হইয়াছে। তাহা এমন বন্দী হইয়াছে যে তাহার মুক্তিমূল্য নাই।
>
> ২। নিশ্চয় আল্লার রসুল এমন এক জ্যোতিঃ যাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তিনি আল্লার তরবারিসমূহ মধ্যে এক কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারী সদৃশ।[২]

তাঁর কবিতায় তৎকালীন জাহিলী যুগের ভাবধারার প্রাচুর্য ছিল। অপ্রচলিত শব্দ, জটিল বাক্য বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর উপস্থিতিতে কাব্যসুলভ রীতির অভাব না থাকলে তিনি প্রথম শ্রেণির কবিদের মর্যাদা লাভে সমর্থ হতেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর খ্যাতি সমসাময়িক কবিদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। কা'ব ২৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

ইসলাম ও মোহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই আরবি সাহিত্যে কাব্যের প্রচলন ছিল। তাঁর (মোহাম্মদ (সা.) সমকালে এ যাত্রা অব্যাহত ছিল, তা কা'বের 'বানত সুআদে'র মাধ্যমে এ কথা প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে 'সাবআ মোয়াল্লাকা'র কবিদের কাব্যচর্চার পরিধির সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হই সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে। আরবি সাহিত্যের পূর্বাপর সমৃদ্ধির বিষয়ে লেখক মুজফ্ফর আহমদ পত্রিকার একটি রচনায় জানিয়েছেন :

> সাহিত্যের হিসাবে মোহাম্মদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও আরবী সাহিত্যের যথেষ্ট মূল্য ছিল। কিন্তু ইহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও ইহা ছিল ঠিক সূর্য্যোদয়ের ভূমিকায় পূর্ব্বাকাশে শুকতারার আগমনের ন্যায়। যেইমাত্র

১ বা'নত সু'আদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮ ও ১২১
৩ আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

কোরআন আপনার আগমণ ঘোষণা করিল, অমনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান সমস্তই এক সঙ্গে আরবীর জয় জয়াকার দিয়া উঠিল। মৃত ও মরনোম্মুখ প্রাচ্যবাসীর পক্ষে ইহা ছিল নব জাগরণ।[১]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৬) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.) পনের পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'ওমর খাইয়াম' প্রকাশিত হয়। পারস্য কবি 'ওমর খৈয়াম' নামে পরিচিত এই কবির পুরো নাম গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতাহ্ ওমর বিন ইব্রাহিম আল্ খইয়াম ওরফে খইয়ামী নামে উল্লেখ করেছেন লেখক। লেখক প্রবন্ধের প্রথম চার পৃষ্ঠায় ভূমিকা, পরবর্তী পাঁচ পৃষ্ঠায় ওমরের জীবন এবং শেষ ছয় পৃষ্ঠায় ওমরের রুবাইয়াৎ ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তাঁর সাহিত্য ও দর্শনের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। অত্যন্ত মধুর ও সুললিত ভাষায় লেখক বরকতুল্লাহ প্রবন্ধের সূচনা করেন। ওমর-মানসে প্রবেশ করার পূর্বে লেখক ভূমিকার ভিতরে লিখেছেন :

> সৃষ্টির অনন্ত তরঙ্গ উদ্দাম প্রবাহে দুটিয়া চলিয়াছে, সে প্রবাহে অযুত কোটী বুদ্ধুদ নিমিষে ফুটিয়া আমার নিমেষে মিলাইয়া যাইতেছে। মানুষ সেই অদ্ভুত কোটীর মধ্যে একটি। নির্ম্মম নিয়তির বিধানে কোথা হইতে আসিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছি। কোথায় ছিলাম কেহ জানি না। কোথায় যাইতেছি তাও বলিতে পারি না। এটা আলো না স্বপন কে বলিবে ? কত জ্বালা কত দাহ বুকে বহিয়া, আশার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িতেছি। এ নিয়তিচক্রের উপর ত আমার কোনও অধিকার নাই। আমি যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র।[২]

লেখক এরপর এখানে শেক্সপীয়রের 'Divinity' তথা দৈবশক্তির কথা বলেছেন। আবার জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের (১৭৮৮-১৮৬০ খ্রি.) প্রসঙ্গও এনেছেন, যিনি বলেছেন, Divine বলে কিছু নেই, এটি অচেতন প্রেরণামাত্র (Unconsecous will), এটি এক অন্ধশক্তি, যা এক সুদূর লক্ষ্যের পানে অনন্ত মহাযাত্রায় ছুটে চলেছে। সে কিছু বোঝে না, কিছু তার কানে প্রবেশ করে না। এ পৃথিবীর আকুল ক্রন্দন, ব্যথিতের মর্মবেদনা, উৎপীড়িতের সহস্র মিনতি, কিছু তার হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহলে জীবনের লক্ষ্য ও পরিণাম কী ওমরের প্রসঙ্গ এনে লেখক এর দ্বার উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন :

> মৃত্যুই জীবের অপরিহার্য্য পরিণাম। বৃথা সে শক্তির নিকট কাতর প্রার্থনা-বৃথা তার নিকট সুখের আকুল কামনা। বৃথা পুণ্যের পুরস্কার ও অত্যাচারের প্রতিকার ভিক্ষা। ওমর খাইয়াম বলিতেছেন যে, সে আমি অজ্ঞান নয়, অচেতন নয়, সে সজাগ শক্তি, সে স্বেচ্ছাচারী বিরাট অভিনেতা। যে আপনার মনে আপনি ভাবে, আনন্দ করে, লীলা করে, ভাঙ্গে গড়ে, আপনার মন লইয়া আপনি মত্ত থাকে।[৩]

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসাধারণ পণ্ডিত ওমরের একে অচেতন অন্ধ শক্তির লীলাভিনয় বলে মনে করার কারণ নেই। নদীর সুধামাখা কলনাদ, পাখীর গীতি, শ্যামল সৈকতের অপূর্ব শোভা ওমরের প্রাণে আনন্দ দেয়। ওমরের বিশ্বাস কী এবং তিনি কী বলেন, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বরকতুল্লাহ জানান :

> তবে ওমর কি বলেন ? তিনি বলেন, সৃষ্টির যে এই সৌন্দর্য্য সমাবেশ। পৃথিবীর যে এই লীলাবৈচিত্র্য ইহা সেই স্রষ্টার নিজের সুখের জন্য। তোমার আমার জন্য নহে। তুমি আমি তাঁর সৃষ্টির উপকরণ মাত্র, তাঁর সুখাস্বাদনের উপাদান মাত্র।[৪]

---

১ মুজফ্ফর আহমদ, 'আরবী ভাষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৪২
২ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, 'ওমর খাইয়াম' *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ২৯০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

মানুষের সুখে-দুঃখে স্রষ্টা যে অনেক বেশি নির্মোহ, তা-ই লেখকের এই প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি।

লেখক এ প্রসঙ্গে কুম্ভকারের মাটির পাত্র তৈরির কথা বলেছেন, যে প্রতিদিন তৈরি করছে, তার কোনোটি ভাঙছে, ফেটে যাচ্ছে বা কোনোটি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নির্মাতা এটি নিয়ে মোটেও ব্যস্ত নয়। মানুষও সেই বিশ্বশিল্পীর প্রস্তুত মৃৎপাত্রের মতো। তাই কারো সুখদুঃখে নির্মাতার তেমন কিছু আসে না বলে ধরা যায়। তাহলে দুঃখের প্রতিকার কীভাবে হবে, সেটি এক বিরাট প্রশ্ন। তাই সৃষ্টিকুলের কারো দুঃখ-শোকের তরঙ্গে আর আনন্দ বিলাসের কোলাহলে স্রষ্টার কিছু আসে যায় না। দুঃখের কশাঘাতে যে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে, অপর কোটি কোটি জীব এ সৃষ্টিকে মুখরিত করে রাখবে। তাই ওমর-মানসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ওমর দর্শন তাঁর সাহিত্যর মধ্যে কীভাবে ফুটে উঠেছে, ওমরের শেষের দিকের কবিতা 'কুজানামা' থেকে উদ্ধৃতি সহকারে লেখক বরকতুল্লাহ বলেন :

> তুমি আমি কে যে এই পৃথিবীর বাহিরে, মরণের পরপারে আমাদের জন্য বিধাতা এক বিরাট স্বর্গপুরী গড়িয়া রাখিবেন। গৃহী হাঁড়ি লইয়া কার্য্য করে হঠাৎ যখন কোন আঘাতে সেটী ভাঙ্গিয়া যায়, সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন করিয়া কাজে লাগায়। কে কবে সে ভগ্ন খেলার জন্য সুবর্ণ মন্দির গড়িয়াছে ? এই কথাটি কবি তাঁহার 'কুজানামা'য় অতি স্পষ্টভাবে গাহিয়াছেন। মরণের পরে যে মানুষ আবার বাঁচিয়া উঠে, কবি একথা বিশ্বাস করিতে পারেন না।[১]

অতএব পরকালের ভরসায় জীবনকে সুখ হতে বঞ্চিত না করার কথা বলার পাশাপাশি মুহূর্তের ভিতর দিয়ে জীবন ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে মুহূর্ত পিছনে পড়লো, তা আর ফিরে আসবে না। এর জন্য অনুশোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। ওমরের সাহিত্যকর্মের মূল বিষয় রুবাইয়াতের অংশ 'কুজনামা'য় এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েচে। ফরাসি দার্শনিক অধ্যাপক পেরি পিয়ের গাঁসদি শেক্সপীয়র ও ওমরের তুলনা করে বলেছেন, এক হিসেবে ওমরের স্থান শেক্সপীয়রের (১৫৯২-১৬৫৫ খ্রি.) উপরে। উভয়ে জীবন সমস্যা পাঠ করেছেন। কিন্তু মানবের সুখ-দুঃখের ভিতর শেক্সপীয়র যতদূর প্রবেশ করেছিলেন, ওমর তার চেয়েও বেশি নিমগ্ন হয়েছিলেন বলে বরকতুল্লাহ মনে করেন।

পারস্য কবিদের একটা বৈশিষ্ট্যই ছিল অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির কামনার পরিবর্তে নির্জন সাধনায় দিন কাটাতে তাঁরা ভালোবাসেন। ওমরও তার ব্যতিক্রম নন। জন্মস্থান নিশাপুরেই বিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মোয়াফিকের পদমূলে বসে কিশোর ওমর অধ্যয়ন করতেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নির্জনে বসে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনা করতেন, ইউরোপীয়রা তাঁকে (Astronomer Poet) বলে আখ্যা দিয়েছেন। রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (১৮০৯-১৮৮৩) তাঁকে কবিতা না লিখলে তিনি গণিত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলে অমরত্ব লাভ করতে পারতেন বলে মনে করেন। কিন্তু কবি হিসেবে ওমর অত্যাধিক খ্যাতি লাভ করেন। মহাকবি টমাস গ্রের (১৭১৬-১৭৭১ খ্রি.) সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের ধরন সম্পর্কে বলতে লেখক বরকতুল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> উভয়েই 'এক কবিতার কবি'। গ্রে দারিদ্রের পরিণাম দেখিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছেন, ওমর বিশ্ব মানুষের পরিণাম ভাবিয়া নৈরাশ্যের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন।[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

সমকালীন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিক-কবিদের প্রভাব যেমন ওমরের ওপর পড়েছিল, তেমনি তারাও ওমর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিশাপুরের দুজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ লেখক নিজাম-উল-মূলক (১০১৮-১০৯২), যিনি 'সিয়াসৎ নামা' লিখেছিলেন ও হাসান সাব্বা (১০৫০-১১২৪), যাকে ওমরের দ্বিতীয় বন্ধু বলে লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তিনজনই ইমাম মোয়াফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কথিত ছিল, যাঁরা ইমাম মোয়াফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন, তাঁরা জগতে বিশেষ সৌভাগ্যশালী হতেন। ওমরের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ ইমাম গাজ্জালিও (১০৫৮-১১১১) ওমরের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন। স্কটিশ কবি এনড্রু লং (১৮৪৪-১৯১২) ওমরের সাহসের যে প্রশংসা করেছেন, লেখক বরকতুল্লাহ তা ব্যক্ত করেছেন সাহিত্য-পত্রিকায় এভাবে :

> সেই আঁধার যুগে, সেই পুঞ্জীভূত অজ্ঞতার বুকের উপর দাড়াইয়া নির্ভীক ওমর যাহা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে তাহার অসাধারণ হৃদয় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাহারও মুখ চাহেন নাই; যাহা বুঝিয়াছেন, ভ্রান্ত হউক, শুদ্ধ হউক সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাই উচ্ছসিত কবিতায় এন্ড্রু লং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছেন।[১]

ওমরের অমর সৃষ্টি 'রুবাইয়াতে' তার উচ্ছ্বাসের অনন্য প্রতিফলন ঘটেছে। তবে সমকালে ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াৎ ইউরোপে যেমন সমাদর লাভ করেছিল, এমন কোনো গ্রন্থ আর করেনি। ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এক সময় ওমরের গ্রন্থপাঠের জন্য ইউরোপে একটা মাদকতা এসেছিল। এর কারণ কী এবং বিশেষত 'রুবাইয়াতে'র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ লেখেন :

> প্রথমতঃ ইহার ছন্দের লালিত্য ও শব্দ বিন্যাসের মাধুয্য এতই যে সঙ্গীতের ন্যায় সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়টী সকলেরই একান্ত প্রাণের জিনিস, আবার তেমনি প্রাণভরা ভাষায় উহা গ্রথিত। ইহাতে 'ইউসুফ জোলায়খা'র প্রেমালাপ নাই- 'লায়লী মজনুর' প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন নাই- প্রাচ্য দেশীয় চিরন্তন বাঁধা গদ্যে ইশ্বরের আরতিও ইহাতে নাই। ইহাতে আছে সেই তথ্য-যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের চিন্তাকে বিব্রত, হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে সেই তত্ত্ব যাহা পৃথিবীর জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ মীমাংসা করিতে পারে নাই, শত দর্শন শত বিজ্ঞান যাহার গভীরতার ভিতর আপনাকে হারাইয়া বসিয়াছে। মানুষের পরিণাম-স্বর্গ-নরক-সৃষ্টির উদ্দেশ্য-ন্যায়ের পুরষ্কার, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত- এই সকল জটিল সমস্যা সকলেরই জীবনে একবার না একবার উদয় হইয়া মনকে আলোড়িত করে-যতই জীবনের আলো অবসানের পানে অগ্রসর হয়, ততই এই সকল প্রশ্ন ভীষণ হইতে ভীষণতর গুরুত্ব লইয়া মানুষের চিত্তকে নিপীড়িত করে। মানুষ এর একটা সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়। রুবাইয়াতের ভিতর এই সকল প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে-একজন মুক্তপ্রাণ সাধকের মরমের মর্ম্মস্থল হইতে।[২]

লেখক এস্থলে রুবাইয়াতের অনেক অনুবাদের মধ্যে ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা ওমর জগতে অমর হয়ে আছেন বলে উল্লেখ করেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

ওমরের রুবাইয়াতে একটা দারুণ অভিমানের সুর সাড়া দিয়ে ওঠে। কবি মনে করেন, অতীতকে স্বরণ করে কোনো ফল লাভ হবে না। পূর্ব কৃতকর্মের অনুশোচনায় বর্তমানের সময় ক্ষেপণ করাও ঠিক নয়। ওমর তাই যা বলেছেন, যা বরকতুল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন সাহিত্য-পত্রিকায় :

বিধি বিধানের শীতপরিধান ফাগুন আগুনে দহন কর।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ি চলে যায়, হে সাকী পেয়ালা অধরে ধর
উপর ঝলকে হেসে উঠে কত, অযুত কুসুম বিবশ কায়,
তারি আশে পাশে মৌনব্যথা লয়ে, লক্ষ প্রসূন ঝরিয়া যায়।[১]

কবি মনে করেন, প্রকৃতির হাসিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে নেই। প্রকৃতি একহাতে সুষমা ছড়াচ্ছে, অপর হাতে ধ্বংসের মহা অস্ত্র নিক্ষেপ করছে। প্রকৃতির এক চক্ষুতে হাসি, অন্য চোখে অশনি। তাই ওমর যেন প্রকৃতির নির্মম বিধানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সাকী, সুরা ও সঙ্গীতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। ওমর যা বলেছেন আর সাহিত্য-পত্রিকার লেখক যা বিশ্লেষণ করেছেন তা এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায় :

হেথায় গায়ক সনে, এই স্নিগ্ধগ্লানিহীন তটে
আমি চাই সাকী আর একমাত্র লোহিত মদিবা
স্বরগ যদ্যপি থাকে বিশ্বমাঝে এই হবে তাহা
মুর্খ সে যে নরকের আশঙ্কায়, ত্যাজে এ অমরা।

রুবাইয়াৎ নামের অর্থ চার লাইনের কবিতা। ওমর খাইয়ামের রুবাই (১৮৫৯) থেকে সেরা ১৯৭ টি রুবাই মূল ফরাসি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ ১৯৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় ওমরের জনপ্রিয়তার মূলে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অপরিসীম। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর এ লেখা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশকালে (১৯২০ খ্রি.) নজরুলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর সঙ্গে তুলনা করে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> রচনাভঙ্গীতে (Style) ওমরের তুলনা বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ। সোজা কথায় একটি মাত্র শব্দে একটি মাত্র ইঙ্গিতে পাঠকের মর্ম্মের ভিতর হইতে লুকায়িত তারটিকে বাজাইয়া তোলাও বোধ হয় অন্য কেহ এমন পারেন নাই।[২]

মোহম্মদ রবকতুল্লাহর এ আলোচনার আগে ওমর ও তাঁর ‘রুবাই’ বাঙালি সমাজে খুব বেশি পরিচিত ছিল না। নজরুলসহ আরো অনেক বাংলা অনুবাদকের গুণে ওমর পরবর্তীকে বাংলা সাহিত্যের ‘অনুবাদে বিশ্বসাহিত্যে’র শাখায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আহুত ছাত্র-সম্মিলনীতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর ছাত্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এ সম্মিলনে বাংলার

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

আকাশে শুকতারা ফোটার মতো ছাত্রদের তুলনা করেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আমাদের জাতীয় জীবন সুপ্রভাতের অনাগত আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র ছাত্রদের ভূমিকার কারণে, লেখক এ কথা বিশেষভাবে বলেন। ছাত্রদের চোখে প্রতিভার আলো আর কষ্টসহিষ্ণু শরীরে সাধনার চিহ্ন দেখতে পান লেখক। তাই কেবল পশুবল বা অর্থবলে নয়, মস্তিষ্কের বলে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে আর মনের বলে চরিত্রে ও ব্যবহারে ছাত্রদের বলশালী হওয়ার আহবান জানান লেখক।

সাহিত্যিক বা ভালো লেখক হতে গেলে অনুশীলন প্রয়োজন, বলেছেন লেখক। ছাত্রজীবন থেকে এর চর্চা শুরু করলে সেটা হওয়া সম্ভব বলে লেখক মনে করেন। আর সবকিছুর পিছনে সাধনা ও পরিশ্রম থাকা দরকার, এতৎপ্রসঙ্গে লেখক প্রশ্ন রেখে বলেন :

> কেবল গলার স্বর থাকিলেই কি কেহ সুগায়ক হইতে পারে ? না, একটা যন্ত্র হাতের কাছে থাকিলেই সে সুবাদক হইতে পারে ? যেমন সুগায়ক, সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি সুলেখক হইতে গেলে এই ছাত্র জীবন হইতেই রীতিমত রচনা অভ্যাস করিতে হইবে।[১]

তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'The New Oxford Dictionary'র ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালি দ্বারা অভিধান তৈরির পরামর্শ দেন। উক্ত অভিধানের জন্য 'বহুসহস্র স্বেচ্ছা-শব্দ-সংগ্রাহক' নিযুক্ত হয়েছিল, আমাদের জন্য তিনি 'একশত স্বেচ্ছা-সাহিত্য-সেবক' পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ছাত্রদের মধ্য থেকে।

সাহিত্য-পত্রিকায় কাজী আবদুল ওদুদ, ইবরাহীম খাঁ, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আবুল হুসেন, কাজী ইমদাদুল হক, ডা. লুৎফর রহমান, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শৈলবালা ঘোষজায়া, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, একরামুদ্দীন, রেয়াজ উদ্দীন আহমেদ, জীবন্দ্রে কুমার দত্ত, মণীন্দ্র কুমার দত্ত, গোপেন্দ্রনাথ সরকার, নিশিকান্ত সেন, মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিসেস এম. রহমানসহ অনেক গল্পকারের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।আমরা এখন পর্যায়ক্রমে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের (হাবিলদার বঙ্গ বাহিনী, করাচি পরিচয়ে) চারটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৬, অক্টোবর ১৯১৯) এগার পৃষ্ঠার 'হেনা' গল্পটি মুদ্রিত হয়। 'হেনা' গল্পে যুদ্ধ-প্রেমের সঙ্গে নারী-প্রেমের অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। ফ্রান্স থেকে আফগানিস্তান-বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ভার্দুনের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র, সিঁন নদী, প্যারিসের পাশের ঘন বন, হিন্ডেনবার্গ লাইন, বেলুচিস্তানের কোয়েটা, কাবুলের ডাক্কা ক্যাম্প ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ করে গল্পের কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। প্রবল কাব্যময় ভাষায় সমৃদ্ধ লেখায় ভাস্বর নজরুলের হেনা' গল্পটি। গল্পে দুটি মাত্র চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নাম-চরিত্র হেনা আর গল্পের কথক সোহরাব। গল্পে আমরা দেখি, নায়ক সোহরাব প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছে। সোহরাবের বর্ণনায় একের পর এক দৃশ্যময় হয়ে ওঠে যুদ্ধের ময়দান, সহযোদ্ধার লাশ, ভারত উপমহাদেশের বাইরের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি এবং সৈনিক-প্রেমিকের মনোজাগতিক সংবেদনশীলতা।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

গল্পটির কাহিনির ধারাবাহিকতায় এ-প্রতীতি জন্মে যে, নজরুল যেন সোহরাবের মাধ্যমে নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। ফ্রান্সের ভার্দুন থেকে শুরু করে কাবুলের ডাক্কা ক্যাম্প পর্যন্ত সোহরাব যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়। তার সঙ্গে ছায়ার মত ধেয়ে চলে আফগান মেয়ে হেনা। সোহরাব নিজে আফগান হয়েও সে পরদেশীর মতো জীবন যাপন করে বেড়াচ্ছিল। তাই নায়িকা হেনা তাকে ভালবেসেও তার কাছে এতকাল ধরা দেয়নি। সোহরাব যখন পরবর্তীকালে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধে গেল, তখনই হেনা তাকে লুকায়িত ভালবাসার প্রকাশ্য পরিচয় দিল। আফগানিস্তানের পেশোয়ারে যখন সোহরাব হেনাকে দেখেছে, তখন তার মনের অভিব্যক্তি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

> পেয়েছি, পেয়েছি! আজ তার দেখা পেয়েছি! হেনা! হেনা!! তোমাকে আজ দেখেছি এইখানে, এই পেশোয়ারে! তুমি এখনো কুমারী আছ। তবে কেন মিথ্যা দিয়ে এতবড় একটা সত্যকে এখনও ঢেকে রেখেছ ? সে আমায় লুকিয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে ! কিচ্ছু বলেনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে![১]

এই গল্পে যুদ্ধের পটভূমিতে সোহরাবের অন্তরের অনুভূতিগুলো অনুরণিত হয়েছে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। তাই দেখা যায়, ফ্রান্সের সি'ন নদীর ধারের তাঁবুতে বসে সে কাব্যিক ভাষায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিশাপ প্রকাশ করছে :

> আগুন, তুমি ঝর-ঝম্ ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ তুমি নেমে এসো ওই নদীর বুকে জমাট বরফের মত হয়ে- ঝুপ ঝুপ ঝুপ! ইস্রাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজ সড়কে নিসাড় করে দিয়ে-ওম্ ওম্ ওম্ ! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্য দিয়ে ফাট ঠিক মানুষের মগজের উপরে-দ্রুম দ্রুম দ্রুম !! আর সমস্ত দুনিয়াটা সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙ্গে পড় তাদের মাথায়, যারা ভালোবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে![২]

এক হাতে অস্ত্র আরেক হাতে ফুল, এই যেন 'হেনা' গল্পের মূলমন্ত্র বলে আমাদের কাছে মনে হয়। খ্যাতিমান সম্পাদক ও লেখক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের 'হেনা' গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে মন্তব্য করেন :

> হেনা গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। লেখক প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক। তাঁহার প্রতিভায় অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যাকাশের দিগমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।[৩]

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৬, জানুয়ারি ১৯২০) নজরুলের চৌদ্দ পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। মানবমনের অকৃত্রিম আবেগ আর স্বচ্ছ অনুভূতির প্রাঞ্জল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় 'ব্যথার দান' গল্পে। তারা এই গল্পের নূরুন্নবী, বেদৌরা ও সয়ফুল-মুলক, এই চরিত্র তিনটি জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছে সরলরৈখিক মাত্রায়। তথ্যসর্বস্বতায় কিংবা তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যে নয় বরং জীবন পরিবেশের সহজ অভিজ্ঞতার সরল প্রকাশ ঘটেছে এদের উচ্চারণে।

---

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'হেনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ১৯৪

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৩ 'সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩২৬, উদ্ধৃত : আজহার উদ্দিন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৯

গল্পে আমরা দেখি, মাতৃরূপী মাতৃভূমির টানে নূরুন্নবী যুদ্ধে যোগ দেয়। সেদিন আমাদের দেশে রুশ বিপ্লব (১৯১৭), মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) সম্পর্কে বইপড়া আলোচনা, আমদানি নিষিদ্ধ ছিল । ব্রিটিশ আমলে রাশিয়ার পক্ষে যায় এমন কথা অপরাধ বলে গণ্য হতো। নজরুল তখন সৈনিক হওয়ায় বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। প্রেমের মূল্য ও মর্যাদা 'ব্যথার দান' গল্পে নজরুল গভীর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা বেদৌরা মুহূর্তের ভুলে দেহের পবিত্রতা নষ্ট করে, এই 'অপরাধ' নূরুন্নবীর অন্তর থেকে মেনে নেয়া কষ্টকর ছিল। তবে বেদৌরা বলেছে, তাকে নূরুন্নবী একেবারে হৃদয় হতে প্রাণখুলে ক্ষমা করেছে। বেদৌরাই জানিয়েছে, সে তাকে বলেছে :

> বেদৌরা ! কামনা আর প্রেম এ দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটি প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য।[১]

একদিকে বেদৌরার প্রতি কঠিন ভালোবাসা, অপরদিকে যুদ্ধে গিয়ে নূরুন্নবীর অন্ধ ও বধির হয়ে যাওয়ার মত ট্রাজিক চিত্র সাহিত্য-পত্রিকায় তুলে ধরেছেন গল্পকার। সহযোদ্ধা সয়ফুল মুলক তাই স্রষ্টার উদ্দেশে বলেছে :

> এ কি করলে খোদা! এ কি করলে? এত আঘাতের পরেও হতভাগা নুরুন্নবীকে অন্ধ ও বধির করে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ তৃষ্ণার ফল যে এই রকমই একটা কিছু হবে তা আমি অনেক আগে হতেই ভয় করছিলুম! আচ্ছা করুণাময়! তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারি না বটে, কিন্তু এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কাণ দুটো বধির করে দিলে, এবং আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি বলব যে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা লুকানো রয়েছে ?[২]

এই 'ব্যথার দান' গল্পটি বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় ছাপাতে সম্পাদককে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল। নজরুলের লেখা মূল গল্পের 'লালফৌজ' শব্দটি থাকলেও 'রুশগন্ধী' বিবেচনায় মুজফ্‌ফর আহমদ তা কেটে 'মুক্তিসেবক সৈন্য' কথাটি লেখেন। তারপরও পরোক্ষভাবে 'দেশাত্মবোধ' জাগ্রত করার কথা আছে 'অভিযোগে' প্রেস আপত্তি করেছিল, তবে সেটি ধোপে টেকেনি। গল্পটি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'নুরুন্নবী' চরিত্রটির নাম পরিবর্তন করে 'দারা' করা হয়।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) প্রকাশিত 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটিতে অঙ্কিত হয়েছে এমনই এক করুণ চিত্র। উত্তম পুরুষের বর্ণিত নিখাদ-নিটোল প্রেমের কাহিনি জমাটবাঁধা রূপ 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটিতে দেখতে পাই। নামকরণেই গল্পের মূল সুরকে ধরিয়ে দেয়। মোতি নামের একটি মেয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু গল্পে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, দুঃখ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। দুঃখবোধের পরাকাষ্ঠা যেটুকু, সেটুকু গল্প-কথকের।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭, জানুয়ারি ১৯২১) প্রকাশিত 'সাঁঝের তারা' গল্পটিতে প্রেমে ব্যর্থ, আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত ও সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ক্ষতবিক্ষত নজরুল চেতনা অনেকখানি রোমান্টিকতা- অনুগামী। গল্পটিতে নজরুলের রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

প্রকৃতির সঙ্গে আত্মচেতনা সংশ্লেষ ঘটিয়ে। এই গল্পের কথক তাই কথা বলে প্রকৃতির সঙ্গে, 'সাঁঝের তারার' সঙ্গে :

> আমি ঘুমের-দেশের বাদশাজাদির পেশোয়াজ-প্রান্ত দু-হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে' বললাম, "না না, এখনও আমার ওঠবার সময় হয়নি।... কে তুমি ভাই? তোমার সব কিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে উঠছে কেন?" তার গলায় আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে সে বলল, "আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ড নিবিড় করে পেয়েছিলাম।... এখন আমি যাই, তুমি ওঠ! আই স ই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে ![১]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'পার্সীয়ান মুনশীর দফতর' শিরোনামে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* দুটি সংখ্যায় 'আমোদজনক ও শিক্ষাপ্রদ' ছয়টি ক্ষুদ্র গল্প ছাঁপা হয়। ইংরেজ লেখক ও 'ক্যালকাটা গেজেট' (১৭৮৪ খ্রি.) পত্রিকা সম্পাদক ফ্রান্সিস গ্লাডুইনের লিখিত ১৭৯৯ সালে কলকাতার মিরর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রথমে মূল ফারসি ভাষা ও পরে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রদত্ত হয়েছে বলে লেখক জানান।

একটি গল্পের পরিচয় দেয়া যেতে পারে, যেখানে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে কী ব্যবধান হয়ে থাকে তা বোঝা যায়। একদা সেকান্দার বাদশাহ তাঁর সভাসদগণকে লক্ষ করে বললেন, 'আমি কখনও কোনো লোককে নিরাশ করিনি-যখনই কেউ আমার নিকট প্রার্থনা করেছে তখনই আমি তাকে তা দিয়েছি।' একজন লোক পরক্ষণেই বাদশাহ'র নিকট প্রার্থনা করল, 'জাহাঁপনা আমি একটি দেরেম চাই। দয়া করিয়া আমাকে একটি দেরেম দিন।' এতে বাদশাহ সামর্থ্যবানের নিকট সামান্য জিনিস চাইলে তাঁদের অপমান করা হয় বলে জানান। একথা শুনে লোকটি বললো যে, বাদশাহের একটি মুদ্রা দিতে লজ্জাবোধ হলে তাকে যেন একটি রাজ্য দান করা হয়। তদুত্তরে বাদশাহ বললেন যে, প্রথম সে এমন জিনিস চেয়েছিল, যা দান করলে বাদশা'হ সম্মানের লাঘব হতে পারে, তারপর তার দ্বিতীয় প্রার্থনা বাদশাহ'র নিজের সামাজিক অবস্থার জন্য উপযোগী নয়, ফলে ব্যক্তিটির উভয় প্রার্থনাই অসঙ্গত হয়েছে বলে জানান। লোকটি লজ্জায় আর কোনো উত্তর করল না। অতি ক্ষুদ্র থেকে সুযোগ বুঝে এক লাফে অতি বড় কিছু পাওয়ার মতো বিবেচনাবোধ অনেকের মধ্যে থাকে না, তা-ই এই গল্পে বোঝানো হয়েছে। বাকি পাঁচটি গল্পেও এরকম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।[২]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সৈয়দ মোকাররম আলীর ছোটগল্প প্রতীক্ষা প্রকাশিত হয়। গল্পটি 'একটি ফরাসি গল্পের ছায়া অবলম্বনে' বলে উল্লেখিত ছিল। আট পৃষ্ঠার এই ছোটগল্পে ইরানি বালিকা নূরী ও তার স্বামী এবং নূরীর ছোট ভাইয়ের কথামালা ও দিনযাপনের মধ্যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। স্বামীর জন্য অপেক্ষারত স্ত্রীর অপেক্ষার চিত্র দিয়েই গল্পটি শুরু হয়েছে। তার একমাত্র সঙ্গী ভাইটি তাকে আশার বাণী শুনিয়েছে, যেকোনো সময় তেহরান থেকে ফল বিক্রি করে তার ভগ্নিপতি ফিরে আসবেন।

এ পর্বে তেহরানে যাওয়ার পর নূরীর বণিক স্বামীর এক মাসের অধিক সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। এরইমধ্যে তাদের গাছের পাকা আঙ্গুর ঝরে পড়ছিল আর কাঁচা আঙ্গুর পেকে উঠছিল।দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে

---

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'সাঁঝের তারা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭ পৃ. ২৭৪
২ *পার্সীয়ান মুন্সীর দফতর*, প্রাগুক্ত, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৩১

গেল, কিন্তু নূরীর স্বামী তখনও ফিরে এলো না। হতাশা আর বেদনায় তার বুক ফেটে যেতে চায়, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে কতবার মরতে চেয়েছে কিন্তু আবার সে আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পায়।

ছোটগল্পের এ পর্যায়ে এসে আমরা নূরীর স্বামী নিখোঁজ বণিকের সন্ধান পাই। গল্পকার এ পর্যায়ে যে ঘটনাটি বিবৃত করেন তাতে দেখা যায়, তিনি নাদির শাহের কারাগারে আটক আছেন। পরবর্তীকালে বণিক যুবক নাদিরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন এবং নিজ গৃহদ্বারে পৌঁছে আকুল কণ্ঠে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন:

> নূরী! একবার, দুইবার, তিনবার ডাকিল, কোন সাড়া নাই ।ব্যাগ্রকণ্ঠের ব্যর্থ আহ্বান বাতাসে মিশিয়া দূরে আরো দূরে গিয়া বিলীন হইল।[১]

বণিকের ডাকে তার স্ত্রীর সাড়া দেওয়ার আর কোনো ছিল কারণ তখন আর ছিল না। কারণ নূরী ততদিনে অনন্তলোকে যাত্রা করেছিল। গল্পকারের পরবর্তী বর্ণনায় আমরা তাই দেখে গল্পের সমাপ্তি পর্বে প্রবেশ করি।গল্পকার লিখেছেন :

> অদূরে নার্গিস-কুঞ্জে অমর ভাস্কর ফরহাদের অধস্তন ত্রয়োদশ শিষ্য গালেব একটি সদ্যোত্থিত সমাধিস্তূপের উপর শুভ্র মর্ম্মরখোদিত কুসুম স্তবক রচনা করিতেছিল। বণিক দুইহাতে বুক চাপিয়া শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল 'এ কার সমাধি, ভাস্কর?' অশ্রুজড়িত কণ্ঠে গালেব উত্তর করিল, 'বুর্জাই পল্লীর এক বিরহকাতরা তন্বীর সমাধি।' সজোরে ভাস্করের হাত চাপিয়া বণিক জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে?" অঙ্গুলি সঙ্কেতে ভাস্কর দেখাইয়া দিল, "ঐ যে ছিন্নবসন কঙ্কালসার কিশোর কবরের পাশে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে, ওরই বোন ওই কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।[২]

তখন বণিক যুবক নূরীর ভাই সিপারকে চিনতে পেরে ব্যাকুল হয়ে ডাক দিল।সিপার বণিকের নিকট জানতে চাইল, সেখানে তিনি কীভাবে এলেন। বণিক জানালেন, মৃত্যুকে জয় করে তিনি ফিরে এসেছেন। সিপার বলল, তার বোন নূরী বণিকের প্রতীক্ষায় থেকে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এই কবরে চিরদিনের জন্য শায়িত আছে। বণিক নিজ বুকে করাঘাত করে বলল, 'কি বললে সিপার! সে আমার প্রতীক্ষা ছিল? এইতো আমি এসেছি, তবে কেন সে চলে গেল?' বোনের শোকে কাতর সিপারের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না।

গল্পকার এক বৃদ্ধ সুফির আবির্ভাব ও তার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পের ইতি টেনেছেন। সুফি হেসে বণিককে বলেছিলেন, 'তবে ফিরে যাও, তার প্রতীক্ষা করোগে, যে প্রতীক্ষাকারীর দ্বারে আপনি আসিয়া দেখা দেয়'।[৩]গল্পের শেষে সুফিতত্ত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে গল্পটি সুখপাঠ্য ও অসাধারণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৫, অক্টোবর ১৯১৮) গোলাম কাসেমের দশ পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'সুন্দরী' প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে তের-চৌদ্দ বছর বয়সী একটি মেয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যে মোটেও সুশ্রী ছিল না। দেখতে অসুন্দর একটি মেয়ের নাম সুন্দরী রেখে তার জীবনের নানা রকম অবজ্ঞা, বিড়ম্বনা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চিত্র ছোটগল্পকার সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

নিজ পরিবার এবং পরিবারের বাইরে সুন্দরীকে নিয়ে সবাই যে অস্বাভাবিক এবং কুৎসিত আচরণ করতো, সেটি তার নিজ জবানিতে গল্পমধ্যে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের সমাজে এরকম মেয়েদের চিত্র আমরা দেখি, যারা যতটা না সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য, তার চেয়ে বেশি নিজ পরিবারে অপাংক্তেয়। সুন্দরী নামক মেয়েটির ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পকারের বর্ণনার ভিতর দিয়ে তা-ই ফুটে উঠতে দেখি।ছোটগল্পকার গোলাম কাসেম তীর্যক ও রসালো ভঙ্গিতে সুন্দরী নামক মেয়েটিকেএভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> আমি সুন্দরী। আমি দেখিতে সুন্দরী নহি, আমার নাম সুন্দরী। দেখিতে সুন্দরী? হা জগদীশ! আমার সৌন্দর্য্যের একটা ছবি তবে আমি তোমাদের উপহার দিতেছি; কিন্তু তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে স্মেলিংসেন্টের ও ওডিকোলনেরর শিশিটা হাতের কাছে রাখিও। তবে শুন-
>
> আমার বর্ণ মলিন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বললেই তো আর কুৎসিত হয় না। কৃষ্ণবর্ণের সহিত যদি উজ্জ্বলতা থাকে তবে সে কৃষ্ণবর্ণ ও নয়নরঞ্জক হয়। তাহার প্রমাণ,-কাল চুল, কাল চোখ, জুতার কাল বার্নিশ,কাল কালী, কাল মখমল আর কত বলিব? কাজেই শুধু কৃষ্ণ বলিলে চলিবে কেন? মলিন কৃষ্ণ।মলিন কৃষ্ণ কথাটা হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। সৌন্দর্য্যের রাজা তোমরা, সৌন্দর্য্যের রাণী তোমরা তাহা কিরূপে বুঝিবে, বল দেখি ?[১]

অসুন্দরের কারণে মেয়েটির যতটা না কষ্ট ছিল, তার চেয়ে বেশি কষ্ট ছিল পরিবারের কেউ তাকে ভালোবাসতো তো নয়ই, রীতিমতো ঘৃণার চোখে দেখত। সুন্দরীকে তার বাবাও ভালোবাসতো না, মা দুঃখ করে বলতো, তার মত কুৎসিত বালিকা কেমন করে তার মেয়ে হলো, মা সামান্য বা বিনা ত্রুটিতে তাকে যেমন তিরস্কার করত তেমনি গায়েও হাত তুলত। তার বড় ভাই যাকে সে দাদা বলে ডাকত, সে তার ধারেকাছেও ঘেঁষত না, সারাদিনের মধ্যে দু'একটি কথা বললেও সেটাকে তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

দোষগুণ এর বিচার করার ক্ষমতা নিয়ে সুন্দরী ভাবতো না, তার হাসি এলে সে হাসত, কান্না এলে আপনমনে কাঁদত। তবে কারও মুখের উপর সে একটি কথাও বলতো না। বিশেষ কারণে কথা বলার দরকার হলে খুব নীচু স্বরে অমায়িকভাবে সুন্দরী কথা বলতো, যাতে কেউ তার কথায় একটুও ব্যথিত না হয়। এভাবে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিদ্রুপ, ভ্রুকুটির মধ্য দিয়ে তার বয়স হলো চৌদ্দ। গল্পটির এ পর্যায়ে আমরা দেখি, সুন্দরীকে বাড়ি থেকে বিয়ের মাধ্যমে তাড়ানোর আয়োজন। ছোটগল্পের এ পর্যায়ের একটি বড় অংশ জুড়ে সুন্দরীর বিয়ে হওয়া, তার দাম্পত্য জীবন এবং অপরাপর ঘটনাবল চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যৌতুকের বিনিময়ে সুদর্শন ছেলেটি সুন্দরীকে বিয়ের আগে নিজেও জানতো না, সে কেমন দেখতে। সুন্দরীও বুঝতে পারেনি,তার স্বামী এত সুশ্রী হবে। সুন্দরীর ভয় একারণেই বেড়ে গিয়েছিল :

> স্বামী সুন্দর এইজন্যই আমার দুঃখ। আমি মরমে মরিয়া যাইতেছিলাম । হায়! হায়! তিনি আমায় লইয়া কিরূপে থাকিবেন? তাহার আশা উচ্চ, রুচি মার্জ্জিত, প্রণয় গভীর, তিনি আমায় লইয়া কী করিবেন? কেমন করিয়া থাকিবেন? আমার নিজের কোনই দুঃখ নাই। আমি জগতে কোনকালে যে কিছুর আশা করি নাই। তবে আমার কষ্ট কি? কিন্তু পরের ব্যথা দেখিলে যে আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিনা। তিনি যে সুখী হইতে পারিবেন না, ইহাই তো আমার দুঃখ।[২]

---

১ গোলাম কাসেম, 'সুন্দরী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃ. ২১৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

সুন্দরীর স্বামী প্রথম প্রথম তাকে কিছুই বলতো না। টাকার বিনিময়ে সুন্দরীর বাবা এই ছেলের কাছে তাকে সঁপে দিয়েছেন, এখন তার স্বামীটি পরিতাপ করছেন বলে সুন্দরী জানায়।

সুন্দরী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দাসীর মতো সংসারে থেকে সমস্ত সেবা-শুশ্রুষা ও যত্নের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার স্বামীকে। তবে অসুন্দর স্ত্রীর সঙ্গে বসবাসের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের ভিতর সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। একদিন সুন্দরী তার স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করার জন্য বলে, যে হবে 'অপরূপ সুন্দরী', স্বামীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সব যে পূরণ করতে পারে। ছোটগল্পকারের বর্ণনায় সুন্দরীর মনের কথাটি সাহিত্য-পত্রিকায় ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

> স্বামীকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম না। আমার পোড়ামুখ দেখিলে গভীর প্রণয়ীরও প্রণয় কোথায় উড়িয়া যায়। কাজেই আমার স্বামী বাহিরে কোথাও কাহাকে তাঁহার প্রণয় ঢালিয়া দিলেন। তিনি সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম। তাঁহাকে বিরক্ত করা হইবে ভাবিয়া আমিও সে কথার উল্লেখ করিতাম না।[১]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেটুকু যত্ন বা সহানুভূতি সেটুকুও ক্রমশ কমতে থাকল। সামান্য যেটুকু ভালোবাসা সুন্দরীর প্রতি তার স্বামীর ছিল, সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হলো। তিনি সুন্দরীর আর কোনো খবর নিতেন না, সুন্দরীও তার ঘরে স্বামীর উপস্থিতিতে নীরবে পাথরের মত চুপ করে থাকত। মাঝে গল্পমধ্যে স্বামীর মাতলামির দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনও আরম্ভ করে। এর কিছুদিন পরেই তিনি সুন্দরীকে মাসখানেকের জন্য বাপের বাড়ি যাবার কথা বললেন। নিরিবিলি থেকে তিনি তার মনটি ঠিক করতে চান।

দুমাস অতিবাহিত হওয়ার পরে স্বামীর কোন সংবাদ সুন্দরী আর পায়না। অবশেষে সুন্দরীর পিতা সুন্দরীকে নেয়ার জন্য তার স্বামীর কাছে তারবার্তা করলেন। সুন্দরী এর আগে তার স্বামীকে সাতটি চিঠি লিখেছিল কিন্তু স্বামী তাকে একটি চিঠিরউত্তর দেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কারণ ততদিনে তিনি মোহিনী নামের এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন। স্বামীগ্রহে এসে মোহিনীকে সতীন নয়, বোন হিসেবেই সুন্দরী গ্রহণ করেছিল।

হঠাৎ একদিন সুন্দরী পাশের ঘরে ভয়ানক চিৎকার শুনতে পেল। দৌড়ে গিয়ে সে দেখল, মোহিনী ও তার স্বামী খুব ঝগড়া করছে। মোহিনী একটি ক্যাটালগ হাতে নিয়ে স্বামীকে সেটি কিনে দেবার জন্য বায়না করছিল। গল্পটির এ পর্যায়ে মোহিনীর 'বিসূচিকা রোগে' আক্রান্ত হওয়া এবং সুন্দরী কর্তৃক সেবা-শুশ্রূষা করে চতুর্থ দিন মৃত্যুবরণ করা আকস্মিক বলেই মনে হয়। এরপর স্বামীরও একই রোগে অসুস্থ হওয়া এবং তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে স্বামীর মন পাওয়ায় পাঠকের মনের অস্বস্তিভাব দূর হয়ে যায়। গল্পে সুন্দরীর সুন্দর মনের জয় ঘোষিত হয়েছে। অনেক ঘাত প্রতিঘাত ও ঘটনা পরম্পরা অতিক্রম করে শৈশব থেকে সংসার জীবন পর্যন্ত সুন্দরী যে সংগ্রাম করেছে এবং মনেপ্রাণে দগ্ধ হয়েছে, পাশাপাশি চরম ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে স্বামীর কাঙ্ক্ষিত হৃদয়টি যে অর্জন করতে পেরেছে, এখানেই গল্পটি সার্থক বলে আমরা মনে করি।

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫ সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর (১৮৭৫-১৯৫৬) 'স্মৃতি-চিহ্ন' নামক দশ পৃষ্ঠার একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের মূল চরিত্র কথক নিজে, তার মা, স্ত্রী জোবেদা এবং শ্বশুর আবুল মনসুরের জবানিতে মূল কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা পর্ব শেষ করার পর কথকের বিয়ের আয়োজন তার মায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল।পাত্রী দেখার আগেই পাত্রীর বাবা হবু শ্বশুরের সঙ্গে তার পরিচয় ও ভালোলাগার কথা বলেছেন কথক। মনসুর সাহেব ছিলেন কলিকাতার এক কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, তাঁর নম্র স্বভাব ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। স্ত্রী জোবেদার মৃত্যুর আগে ও পরে তার শ্বশুরের মহত্ব ও ঔদার্য্যের প্রশংসা করেছেন কথক। এতৎপ্রসঙ্গে কথকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়পর্বের অনুভূতিটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আমি তাহাকে চিনিতাম না। পৌঢ় পুরুষ তাহার দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ নিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া আমার মাথা আপনি নত হইয়া আসিল। আমার মনে হইল, আমি যেন কোন ফেরেশতার নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার দেবত্বের কাছে আপনাকে নত করিয়া দিয়াছি।[১]

এরকম ব্যক্তির একমাত্র কন্যা জোবেদাকে তাঁর বিবেচনায় উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আবার পাত্রীক নির্বাচন করার শক্তি দেখে অবাক হয়ে পাত্র তার নিজ মায়েরও প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক মনসুর সাহেব তার কন্যাকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ধনীর ঘরে বিয়ে হলে সে যেন নিজেকে যথাযথভাবে মানিয়ে নিতে পারে আবার দরিদ্রের ঘরে গেলেও যেন কোনোরূপ কুণ্ঠা অনুভব না করে। তিনি নিজে জোবেদাকে এরকম শিক্ষাই দিয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মেয়েকে তিনি শিক্ষিত করেননি বটে, কিন্তু সাহিত্য পাঠ, ধর্ম শিক্ষা এবং সাংসারিক জ্ঞানের খুঁটিনাটি জোবেদা বিয়ের আগেই রপ্ত করেছিল। জোবেদার লেখাপড়া সম্পর্কে ছোটগল্প থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

> সে 'কোরআন শরিফ' পড়িয়া বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন লেখক ছিল না, যাহার বহি সে পড়ে নাই! উর্দ্দুতে 'মসদ্দসে হালী' তাহার প্রিয় কাব্য ছিল। আর ইংরেজী সাহিত্যে টেনিসনের কাব্য ও কবিতা পড়িয়া সে বুঝিতে পারিত। স্কুল-কলেজের ত্রিসীমানায় তাহাকে যাইতে হয় নাই, কিন্তু তবু সে এমন শিক্ষা পাইয়াছিল, যে শিক্ষা স্কুল-কলেজে পাওয়া যায় না।[২]

তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম পরিবারের নারী বা গৃহবধূর শিক্ষাঙ্গনে না গিয়ে বাড়িতে পঠন-পাঠনের এরকম চিত্রই তুলে ধরেছেন গল্পকার। ছোটগল্পে বিয়ের পরবর্তী কাহিনিতে আমরা দেখি, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর পারস্পরিক সহানুভূতিমুলক সু-সম্পর্ক ,একে অপরের প্রতি সহযোগিতা, সংসারের খুঁটিনাটি কাজ একসাথে মিলে করা, এভাবেই আনন্দমুখর অবস্থায় তাদের দিন অতিবাহিত হতো।

কথক বঙ্গদেশের একটা কলেজে ২০০ টাকা বেতনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা তাকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলেন, শিক্ষকতাকেই তিনি আজীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে তারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।তার কর্মস্থল গ্রামের বাড়ি থেকে দশ ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। মা গ্রামে থাকলেও মাঝে মাঝে ছেলের বাসায় এসে থাকতেন। তার শহরের বাসায় স্ত্রী ছাড়াও ছোট ভাই, ছোট বোন ও এক কাজের মেয়ে থাকতো। প্রতি মাসের বেতনের

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
২ প্রাগুক্ত

থেকে তিনি ১০০ টাকা মায়ের কাছে পাঠাতেন। এরই মধ্যে তার ছোট বোনটির মহকুমার কোর্টের উকিলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া কাজটিও তিনি সম্পন্ন করেন। মায়ের চেষ্টায় হাতে কিছু টাকা জমা হওয়ার পর শহরে কিছু জমি কেনার সৌভাগ্য তার হয়।

গল্পটির সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই, কথকের গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।তাদের এই গ্রামটি 'সুস্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত' হলেও সেই গ্রামেই কলেরায় প্রতিদিন ছয়-সাতজন করে মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। চিকিৎসার অভাবে অনেকেই মারা যেতে লাগলো,ফলে গ্রামের ভিতরে একটা ভীতির সঞ্চার তৈরি হলো।এই অবস্থায় সকলকে নিয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন নৌপথের চিন্তা করলেও নৌকায় পারাপারের জন্য কোনো মাঝি রাজি হলো না। ফলে বাধ্য হয়ে নিজ গ্রামেই থাকতে হলো। শেষ পর্যন্ত কলেরা তার পরিবারেও আঘাত হানলো।

যতদূর সম্ভব সর্তকতা নিলেও একদিন জোবেদার মুখের দিকে তাকিয়ে তার স্বামী শিঁউরে উঠলো, তার মনে হলো কলেরা নামক কালব্যাধি রাতেই তার স্ত্রীকে আক্রমণ করেছে। উৎকণ্ঠিতভাবে তাকে প্রশ্ন করে জানা গেল, তার তিন-চারবার 'দাস্ত' হয়েছে, একবার বমি হয়েছে। জোবেদার পিপাসাও খুব বেশি, শরীর খুব জ্বালাচ্ছে। তারপর স্বামীর বুঝতে আর বাকি রইলো না যে,তার স্ত্রীকেও কলেরা আক্রান্ত করেছে। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু চিকিৎসার পঞ্চম দিনে জোবেদার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল। ডাক্তারদের কপাল কুঞ্চন দেখে জোবেদার স্বামী বুঝতে পারলেন, তার অবস্থা বেশি ভালো নয়। প্রকৃতির পরিবর্তনের চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে জোবেদার বিদায়বেলার চিত্র এ ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন গল্পকার :

> শরতের সায়াহ্ন।পীতাভ রৌদ্র ঘরের জানালা দিয়া জোবেদার বিছানার নিকট মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে এবং একটু একটু করিয়া ঘরের দিক হইতে বাহিরের দিকে সরিয়া যাইতেছে, যেন তাহার বিদায়ের দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না! এই সায়াহ্নের রৌদ্রের মত জোবেদার জীবনও যেন ক্রমশঃ এই সসীমের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অসীমের রাজ্যে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।[১]

জোবেদার প্রয়াণপর্ব দিয়েই এই কাহিনির শেষ হতে পারত, কিন্তু গল্পের শেষ অংশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজসেবার যে মহান ব্রত কথক তার পেশা গ্রহণের সময় নিয়েছিলো, মা, শ্বশুর ও সদ্যপ্রয়াত স্ত্রীর ইচ্ছায় তা বাস্তবায়নের পথে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রিয়জন হারিয়ে তার স্মৃতিকে ধারণ করে মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই, আমরা গল্পের ভিতর থেকে এই শিক্ষাটুকু পাই।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ও দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'রবীন্দ্র প্রতিভা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ-লেখক একরামুদ্দীনের (১৮৭২-১৯৪০) সংগৃহীত 'মেঘের কোলে সৌদামিনী' নামে দুই পর্বের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের শিরোনামে 'চাঁদ মিঞার খাতা' কথাটি লেখা ছিল। সংকলক গল্পের ফুটনোটে চাঁদ মিঞাকে তাঁর বাল্যবন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদ মিঞা এক বছর আগে মেসোপটেমিয়া (ইরাক) যুদ্ধে যাওয়ার আগে লেখকের কাছে একটি খাতা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে এখন তা পাঠ না করার কথা বলেছিলেন। এখানে চাঁদ মিঞার বক্তব্য ও সংকলক একরামুদ্দীনের নিকট রক্ষিত গল্পটি প্রকাশের প্রসঙ্গ-কথা সাহিত্য-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

---

১ প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৮

যদি কখনো শুনিতে পাও যে মহা সমরে চাঁদ মিঞার পতন হইয়াছে, তখন ইহা পড়িও। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে যশ কামনা করি না। আমিও তদ্রুপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং আমার খাতাখানি পড়িবার বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু তিন মাস পূর্বেও আমার অপর একজন সৈনিক বন্ধুর চিঠিতে চাঁদ মিঞার নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়া এবং নিরুদ্দেশ ও মৃত্যুতে যে প্রভেদ আছে তাহা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার খাতাখানি পড়িয়া ফেলিলাম। কয়েকদিন পরে আমি চাঁদ মিঞার চিঠিতে জানিলাম যে তিনি মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট হয়েন নাই,স্বপক্ষীয় একদল সৈন্যকে বিপক্ষ সৈন্য মনে করিয়া তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত বৃক্ষশাখায় দুইদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন মাত্র। আশা করি তিনি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার খাতা হইতে ইহা *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।[১]

এবার আমরা মূল গল্পের আলোচনায় আসি। গল্পের মূল চরিত্রের নামও চাঁদ। সে'ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ'বলে সকলে তাকে কালামিয়া বলে ডাকে,তা পরে জানিয়েছেন। তাকে বরং চাঁদের সাথে তুলনা করে 'কালাচাঁদ' নামে ডাকলে বেশি খুশি হতেন বলে আফসোসের সঙ্গে বলেছেন। যারা তাকে 'কালামিঞা' বলেন, তাদের 'অলঙ্কার বোধ' নেই বলেই তিনি মনে করেন। তবে মেরি নামে খ্রিস্টান এক প্রতিবেশীর মেয়ের অলংকার জ্ঞান আছে বলে তিনি বলেছেন, মেরি তাঁকে কালাচাঁদ বলেই ডাকেন এবং ডেকে একটু হাসেন। চাঁদ মিয়া মেরিকে 'একটু' ভালোবাসেন এবং তাঁকে বিয়ের ইচ্ছেও পোষণ করেন। কারণ মেরিকে বিয়ে করলে 'কিছু ভূসম্পত্তি'র অধিকারী চাঁদ মিঞা হতে পারবেন। এরপর চাঁদ মিঞার জবানিতে পরবর্তী অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

আমি সাহিত্য চর্চ্চা করিতে চাই-কিন্তু গৃহে অন্নের সংস্থান না থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমি যখন কবিতা লিখিতে লিখিতে মিল করিবার জন্য একাগ্রমনে বসিয়া ভাবি, তখন মা আসিয়া ঘরে চাউল নাই সংবাদ দেওয়া মাত্র আমার কণ্ঠে আবির্ভূতা শিষ্টা সরস্বতী সহসা অন্তর্দ্ধান করেন এবং পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। মেরিকে বিবাহ করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সেবা করিতে পারিব। অনেকে বলেন উদর পূর্ণ থাকিলে সাহিত্য চর্চ্চা হয় না,-সুনিদ্রা হয়, কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করিনা।[২]

পরিশেষে চাঁদ মিঞা বুঝেছেন, তিনি পিতৃপুরুষের নাম ডুবিয়ে গির্জায় গিয়ে মেরিকে বিয়ে করতে পারবেন না। মুসলিম মতে বিয়েতে যদি আপত্তি থাকে, তবে কারো ধর্মমতে বিয়ের দরকার নেই। 'বৈষ্ণবের মত কণ্ঠী বদল' হোক, তবুও মেরি যেন তাঁকে বিয়ে করেন, চাঁদ মিয়া তাতেই ধন্য হবেন। বিয়ের পর যদি মনে না ধরে, তাহলে মেরি চাঁদ মিঞাকে ডিভোর্স দিক, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। এখানেই গল্পটির শেষ হয়েছে, অনেকটা তীর্যক ও রসালো ভঙ্গিতে নানান প্রশ্নের ইঙ্গিত দিয়ে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় জিতেন্দ্রকুমার দত্তের ছোটগল্প 'কুড়ান চিঠি' প্রকাশিত হয়। পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটি চিঠি এবং চিঠিটিকে কেন্দ্র করে গল্পকারের কিছু কথা এবং চিঠিতে লিখিত কথামালাই গল্পটির মূল বিষয়বস্তু। চিঠিটি লিখেছেন একজন মহিলা, সমাজের নীচুস্তরে যার অবস্থান। ঘটনাচক্রে এক পুরুষকে ভালোবাসার ফল হিসেবে এই চিঠি লেখা। তিনি তার কথিত প্রেমিককে কী লিখেছেন, সেটির মাধ্যমে পুরো গল্পটির কাহিনি-বিস্তার ঘটেছে।

---

১ একরামুদ্দীন, 'চাঁদ মিঞার খাতা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃ. ২০৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

গল্পটিতে লেখক প্রথমে বলেছেন, আকাশের দিকে চেয়ে পথচলা তাঁর অভ্যাস। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হন। প্রতিবারই সৌভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পেয়েছেন গুরুতর অনেক আঘাত থেকে, কিন্তু তাঁর স্বভাবে তাতে পরিবর্তন হয়নি। তবে হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিমেষের জন্য নিম্নাভিমুখী' হওয়ার ফলে এক মহিলার হাতে লেখা একখানি ছিন্নপ্রায় ধূলিধূসরিত চিঠি তার পায়ের কাছে আবিষ্কৃত হলো। কৌতূহলবশত তিনি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিলেন, তারপর নিজে যা করলেন, তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> একটু নিরিবিলি জায়গা পাইয়া দুষ্টা সরস্বতী আমার ঘাড়ে চাপিলেন- পরের চিঠি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের চিঠি পড়া অন্যায় জানিয়াও সেই চিঠিখানি ধূলা ঝাড়িয়া কোনরূপে পড়িলাম। স্থানে স্থানে হাতের লেখা অস্পষ্ট হইয়া গেলেও পুরাতন পুঁথির কীট আমি,উহা পড়িতে আমার বিশেষ অসুবিধাহইল না। কিন্তু পত্রখানি পড়িয়া আমার মনে কি ভাব হইল, তাহা আর এখানে লিখিব না। আমি শুধু আমার কুড়ান চিঠিখানা নিয়া যথাযথ সঙ্কলন করিয়া দিয়া বিদায় লইতেছি, আমাদের সমাজেরনীতিবাগীশ ধুরন্ধরেরা ইহার নিরপেক্ষ বিচার করিবেন।[১]

গল্পকার 'সমাজের নীতিবাগীশ ধুরন্ধর' বলতে যাদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তাদেরই একজনকে নিয়ে মহিলাটির এই পত্রখানি লিখিত হয়েছে। চিঠিটিতে সমাজের একটি ভিন্ন অধ্যায়ের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়।

মহিলা চিঠিটি শুরু করেছেন 'প্রিয়তম' সম্বোধন দিয়ে মহিলাটির সঙ্গে পুরুষটির পরিচয়ের প্রেক্ষাপট তিনি শুরুতেই বিবৃত করেছেন এভাবে :

> মনে পড়ে এমনই একদিনে আষাঢ়ে সন্ধ্যাবেলা, সারাদিন অজস্র বর্ষণের পর যখন সবেমাত্র বারিধারা নামিয়াছে, তখন তুমি বিজন-পথ বহিয়া বুঝি শুধু ক্ষণিকের সুখের আশায় আমার কাছে আসিয়াছিলে। অচেনা অজানা পথিক তুমি! তথাপি তোমার পানে চাহিয়া আমার মনে হইয়াছিল, চির পরিচিত বাঞ্ছিত নিধি আমার। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমি শুধু তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছি।[২]

মহিলা বলেছে, তার রূপের অনলে কতদিন কত উদ্ভ্রান্ত যুবক পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে আর পুড়ে মরেছে। তিনি তাদেরকে জ্বালিয়ে পৈশাচিক তৃপ্তিও লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে এই পুরুষ টিকে দেখার করে পরে মহিলাটি নিজেই এখন মরমে জ্বলছেন। আগে কখনো নিজে আর এমন করে জ্বলেননি কিন্তু এই পুরুষটিকে দেখে তার এমন হলো কেনো, তা নিজেও তিনি জানেন না।

মহিলাটি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, শুধু উদ্দাম গতিতে বয়ে যাওয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই পুরুষটিকে পেয়ে এই 'চিরন্তন সত্যের সন্ধান' পেয়েছেন। মহিলাটি তার কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে একজন 'নগণ্যা বারাঙ্গনা'র স্পর্ধা দেখে বিস্ময়ে বা ক্ষোভে রোষে শিউরে না উঠে একে 'স্পর্ধা' হিসেবে না দেখার কথা বলেছেন। নারী-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি লাভের স্রষ্টা নির্ধারিত সরল সহজ সুপথ থেকে শুধু মুহূর্তের ভুলে তিনি পদস্খলিতা হয়েছিলেন। আজ আবার সেই ভুলকে পেছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্যই তিনি পুরুষটির 'প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের সাহায্যপ্রার্থিনী' হয়েছেন মাত্র। নিজেকে 'কুলটা' হিসেবে স্বীকার

---

১ জিতেন্দ্র কুমার দত্ত, 'কুড়ান চিঠি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ১৬
২ প্রাগুক্ত

করেও কারা তাঁর কুলকে হরণ করেছেন সে প্রশ্ন প্রিয়তমের কাছে রেখেছেন। গল্পকার সাহিত্য-পত্রিকায় লিখেছেন :

> আমি জীবন-উষায় আমার অপরিচিত জীবন দেবতাকে হারাইয়া বৃদ্ধা জননীর স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় বেশ আনন্দে ও সুখেই তো ছিলাম। তারপর একদিন হঠাৎ কখন রূপ- রস-গন্ধ স্পর্শের বিচিত্র প্লাবনে আমার নিজেরই অজ্ঞাতে আমার কায়মনো প্রাণ ঘেরিয়া তীব্র অভাববোধ জাগাইয়া তুলিল, তখন তোমাদেরই পুরুষ জাতির একজন মদির- মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমাকে সেই অপার্থিব স্নেহের স্বর্গহইতে বিচ্যুত করিয়া এ ঘৃণিত নরকের পথে লইয়া আসিল। অথচ যে নরাকৃতি পশুর জন্য আমার এ অধঃপতন, তোমাদের একদেশদর্শী সমাজ তাহার কোনো বিচার করিল না; সে যেমনি ছিল, তেমনি সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া নানাছলে আমাকে আরও অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিল।আর হতভাগিনী আমি, আমার ক্ষণিকের ভ্রান্তির জন্য তোমাদের বিরাট সমাজের এক প্রান্তে এক বিন্দু স্থান পাইলাম না।[১]

এভাবেই সমাজচ্যূত হয়ে যে অন্ধকার জীবনের পথ তিনি বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তার কাছে মনে হয়েছে, সমস্ত সমাজ শুধু পুরুষের জন্য, নারী যেন সমাজের কেউ নয়। সমাজের চোখে নারীদের সহস্র অশ্রুপাত ও বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, তা গল্পমধ্যে পত্রভাষ্যে ফুটে উঠেছে ।

পত্রগল্পের এ পর্যায়ে মহিলাটি অপবিত্র শরীরের সংস্পর্শে পবিত্র মন যদি অপবিত্র হয়, তাহলে গভীরতর চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। প্রাচীন মনীষীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিম্নোক্ত কথা বলেন রমণীটি :

> আমাদের প্রাচীন মহর্ষিরা বলিয়াছেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা সর্বদা সর্বপ্রকারে অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন । আশা করি, তুমি অস্বীকার করিবে না, তোমার মতে যদি আমার শরীর ও মন উভয়ই অপবিত্র এবং গ্রহণের অযোগ্য হয়, তথাপি আমার ভিতরে সেই ভূমা মহান আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ,যাঁহাকে কোন দিন কোন মলিনতা স্পর্শ বা কলঙ্কিত করিতে পারে নাই।[২]

তাই রমণীটি তাঁর সুনির্মল আত্মার সঙ্গে প্রিয়তমেরর সুন্দর আত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা করেছে এবং একান্ত ব্যাকুল প্রাণে প্রিয়তম পুরুষটির পদপ্রান্তে এসে দাঁড়াবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বলেছেন।গল্পকার গল্পটির শেষে মহিলাটির বলা শেষ বাক্য, নাম, তারিখ উল্লেখ করেছেন :

> আমার আর সহ্য হয় না। !!ইতি। তোমারই দাসী রানী সন ১৩২৩, ২০ শে আষাঢ়।[৩]

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় সাত পৃষ্টার একটি ছোটগল্প ‘প্রতিদান’ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দুই বাল্যবন্ধু : মাহমুদ ও আজিজের ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবনের সম্পর্ক এবং পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। ছাত্র হিসেবে দুই বন্ধুর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর ঘটনা পরম্পরায় তাদের সম্পর্কের যে উত্থান-পতন হয়েছে, তার চমৎকার চিত্র গল্পমধ্যে গল্পকার পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন।

গল্পেমাহমুদ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনায় শীর্ষস্থানে ছিল। বিদ্যালয়ের সাহিত্য- সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে সে পুরস্কৃত হতো। তার প্রাপ্ত পুরস্কারে তাদের বাড়ির আলমারি বোঝাই হয়ে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

গিয়েছিল বলে সে জানিয়েছে। মাঝে মাঝে সে মাসিক পত্রিকায় দুই-একটি প্রবন্ধ ,গল্প, উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশ করে। তবে সে দেখতে সুন্দর ছিল না বলে তার বন্ধুদের অনেকেই সামনে বা আড়ালে চেহারা ভালো হলে 'সোনায় সোহাগা' হতো বলে আফসোস করতো।

এরমধ্যে আজিজের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। ছেলেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। কিছুদিন পর আজিজের সদাহাস্যময় সুন্দর মুখখানাতে বিষাদের ছায়া এবং আতঙ্কের মেঘ দেখা দিতে শুরু করলো। বিষয়টি মাহমুদের হৃদয়ে সংক্রমিত হয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাকে চিন্তিত করে তুলতো। আজিজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেও প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়নি। একদিন আজিজ মাহমুদকে বলেছিল, সে তো ভালো ছাত্র, আজিজের মতো বন্ধুকে বেশিদিন মনে রাখতে পারবে না। লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে সে ভালো চাকরি করে বড়লোক হবে, আর আজিজের অবস্থা হবে তার বিপরীত। এর প্রত্যুত্তরে কথক আবার আজিজকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলেছিল, গল্পকার তা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

> আনন্দে কি বিষাদে বলিতে পারিব না, তদুত্তরে আমি রবিবাবুর 'বিসর্জ্জন' দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' ইত্যাদি প্রায় পাঁচ সাত খানা পুস্তক কতিপয় ছড়া আউড়াইয়া তাকে বিশেষ রকম বুঝাইয়া দিলাম যে, আমাদের এই ভালোবাসা অটুট। আমাদের পরলোকগমনের পরেও ইহার কিছুমাত্র হ্রাস হইতে পারে না। নাটকের ভাষায় সুদক্ষ অভিনেতার মত গলা কাঁপাইয়া তাহাকে একথাও শুনাইয়া দিলাম যে যদি ভাগ্যচক্রে তাহাকে আমি বিচারপতির আসনেও সে আসামীর কাঠগড়ায় স্থাপিত হয়, তথাপিও সর্ব্বসমক্ষে বুকে তুলিয়া লইয়া জগতে একটা দামন পিথিয়সের অভিনয় করিয়া ফেলিব।[১]

গল্পের একপর্যায়ে আমরা দেখি আজিজ তিনবার প্রবেশিকা অকৃতকার্য হয়েছিল, তখন বন্ধু গল্প কথক মাহমুদ বি.এ পড়ছিল। আজিজ প্রথমবার প্রবেশিকা ফেল করার পর বন্ধু তাকে খানিকটা তিরস্কার করেছিল। মাহমুদ নিজেই স্বীকার করেছে, এটাকে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দেয়ার মত কাজ করেছিল। এ পর্যায়ে আজিজের সাথে মাহমুদের এক প্রকার কোনো সম্পর্কই টিকে রইল না। একই শহরে থাকলেও মাসে কদাচিৎ দুই-একবার তাদের সাথে দেখা হয়েছে। মাহমুদ আজিজকে বন্ধুটি অবজ্ঞার চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে এড়িয়ে চলত। আজিজ দূর থেকে তাকিয়ে তার বন্ধুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও তখন বন্ধুটি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি।

অনেক পরে মাহমুদের ভিতরে ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল, আজিজের সাথে দেখা করার জন্য। আজিজ যে হোস্টেলে থাকত সেখানে গিয়ে সে জানতে পারল, সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তখন ইচ্ছা হলো, তার বাড়িতে গিয়ে খারাপ ব্যবহারের জন্য আজিজের হাত পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। এটা শুধু কথকের চিন্তার দোলাচলবৃত্তির মধ্যে থাকলেও একপর্যায়ে সে আজিজকে তার মন থেকে মুছে ফেলেছিল, গল্পের পরবর্তী বর্ণনায় আমরা তাই দেখি।

মাহমুদের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশের পর আবারো আজিজের কথা তার মনে পড়েছিল। পরবর্তীকালে সে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, আজিজ গ্রামের বাড়িতে থাকে এবং সংসার দেখাশোনা করে। তারপর একদিন তাকে দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতায় আজিজের জন্য পছন্দমত কিছু জিনিস কিনে তাদের গ্রামে উপস্থিত হল। গ্রামবাসীরা এরকম বড় কর্মকর্তাকে দেখে যথেষ্ট অভ্যর্থনা জানালো, কিন্তু জানা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

গেল, আজিজ কিছুদিন পূর্বে তার বৃদ্ধা মা ,পতিব্রতা স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ের' মৃত্যু হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে গ্রামবাসীর কেউ তা জানে না। শুনেমাহমুদের মনটা খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আজিজের জন্য আনা জিনিসপত্র গ্রামবাসীদের কারো কারো মধ্যে প্রদান করে সে ফিরে আসে। আজিজের সঙ্গে ভবিষ্যতে আর সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ অনিশ্চিত বলে তার কাছে মনে হলো। আবারও সময়ের ব্যবধানে তার ধীরে ধীরে আজিজকে ভুলে যাওয়ার পালা শুরু হলো।

গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি, আলীপুর মহকুমার জব্বলপুর গ্রামের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঘটনায় উভয়পক্ষের চার-পাঁচ জন হতাহত হয়েছিল এবং এই মামলায় উভয় পক্ষের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক অভিযুক্ত হিসেবে ধরা পড়েছিল। যেদিন মুসলমান আসামিদের জবানবন্দি চলছিল, সেদিন আদালত প্রাঙ্গণে ছিল প্রচণ্ড ভিড়। একে একে অনেক আসামির জবানবন্দি শেষে এক আসামির দিকে ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। সেই আসামি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের তাকে দেখে চেনা মনে হচ্ছিল। তারপরে বর্ণনা গল্পে এসেছে এভাবে :

> বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অকস্মাৎ সব কথা স্মরণ করিয়া ফেলিলাম। আমারমাথা ভন ভন এবং কাণেও শোঁ শোঁ করিতে লাগিল। আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া "আজিজ, ভাই আজিজ আমার" বলিয়া চিৎকার করিয়া আসামির গলা জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, আজিজ স্থির প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। সে সবল হস্ত আমাকে ফেলিয়া দিয়া বলিল "আপনি সরুন, আমি খুনী আসামী।" আমি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "যেই তুমি হও আজিজ, আমায় মাফ কর! আমি অনুতাপে পুড়িয়া গিয়াছি"।[১]

গল্পের এখানে বন্ধুত্বের কারণে খুনি আসামির নিকট ম্যাজিস্ট্রেটের মাফ চাওয়ার পাশাপাশি আসামিকে আদালত প্রাঙ্গণে আলিঙ্গন করতে যাওয়ার বর্ণনায় বন্ধুত্বের আবেগের চরমতম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয় – তা যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেনো।

শেষ পর্যন্ত কর্তব্যবোধের তাগিদে ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু বিচারে মনোনিবেশ করে আসামিদের উপযুক্ত সাজা প্রদান করে। বিচারকার্য কতটুকু সঠিক হয়েছিল, সে প্রশ্ন রেখেও বলা যায়, সকল আসামির অল্পবিস্তর দণ্ড হয়েছিল। আজিজের দুই বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। এ রায় দেওয়ার সময় বিচারক বন্ধুটির শরীর শিউরে উঠে। শরীর ভালো নেই বলে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করার প্রাক্কালে আজিজ কী করেছিল, তা বন্ধু বিচারকের কথার মাধ্যমে বর্ণনা গল্পে এভাবে এসেছে :

> আজিজ তাহার শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় দ্বারা আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ভাই আমায় মাফ করো আমি তোমার প্রাণে আঘাত দিয়াছি, কিন্তু আমার জন্য তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে এ আমি চোখ চাহিয়া দেখিতে পারিতাম না।[২]

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুখে বিচারের পর এরকম কথা সত্যিই বিস্ময়কর। বিচারক আবারও আজিজকে সজোরে বুকে চেপে ধরে তার কাছে পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমার কথা বলাতে আজিজ যে কথাটি তার বন্ধুকে বলে, এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২ প্রাগুক্ত

ক্ষমা? ক্ষমার কোন কথাই যে এখানে উঠিতে পারে না, মাহমুদ! তুমি বাহিরে যাই দেখাও না কোনদিন যে আমায় ঘৃণা করিতে পারিবেনা এ দম্ভ আমার চিরকাল ছিল, তাই পৃথিবীর সমস্ত বন্ধনচ্যুত হইয়া আমি বাঁচিয়া আছি। ন্যায়ের পথে, কর্ত্তব্যের সম্মুখে সমস্ত কামনার বলি দিয়া যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার অবসর খোদা আজ তোমায় দিয়াছেন, তুচ্ছ কারণে বিচলিত হইয়া তাহার মহান আদর্শকে খাট করিও না মাহমুদ। বলিতে বলিতে আজিজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।[১]

আজিজের কথার পর মাহমুদের সমস্ত হৃদয়ে কী এক বিস্ময়কর অনুভূতি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তা বলার অসাধ্য। মাহমুদ আজিজের মধ্যে যেটুকু শূন্যতার অনুসন্ধান পেয়েছিল, সেই শূন্যতাকে বন্ধুত্বের নির্মল আবেগে গল্পে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৬ জুলাই ১৯১৯) ১৪ পৃষ্ঠার 'কালু ডাকাত' নামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। এ গল্পে বর্ণিত গ্রামটির নাম হরিদ্রা, আর এই গ্রামের যিনি জমিদার, তাঁর নাম কৃষ্ণধন বাবু। পরোপকারী ও প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে তাঁর পরিচয় আমরা গল্পের সূচনাতেই পাই। এই জমিদার বাড়ি থেকে কোন গরিব- দুঃখীকে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়নি, যারা খেতে পায় না তাদেরকেও তিনি না খাইয়ে ছাড়েন না।গল্পেজমিদার গৃহিণীর অপছন্দ সত্ত্বেও কৃষ্ণধন বাবু কালু ও তার মাকে তাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন আশ্রয় দেন। ইতোমধ্যে জমিদারকন্যা সুষমার বিয়ের তারিখ নির্ধারণ হয়ে যায় এবং এই বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিমন্ত্রিত হয়। মুসলমানদের নিমন্ত্রণের ভার কালুর উপর অর্পিত হয়।

কৃষ্ণধন বাবুর সহযোগিতায় কালুর দিনগুলি ভালোই কাটছিল। তবে জমিদার পত্নীর কারণে তাদের প্রায়ই সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো। বাড়ির কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে বা কোনো জিনিস চুরি হলে জমিদার-পত্নী তাদের সন্দেহ করে গালিগালাজ করতেন। তবে গৃহিণীর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখে কৃষ্ণধন বাবু তাদের জন্য পৃথক ঘর তৈরি করে দিলেন এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থা হলো। নতুন স্থানে এসে তারা নানা প্রকার শাক- সবজির চাষ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্তাংশ বিক্রি করে কিছু টাকা-পয়সা হাতে জমা হতে থাকে। এভাবে তারা অভাব মোচন করে সচ্ছল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি জমিদার বাড়িতে কালুর চাহিদাও বেড়ে যায়। এতৎপ্রসঙ্গে গল্পে বলা হয় :

মধ্যে মধ্যে একাজ ওকাজে জমিদারবাবুর বাটীতে কালুর ডাক পড়িত। এই কাজগুলি সে বেশ দক্ষতার সহিতই করিত। অবশেষে সে বাবুর হৃদয় জয় করিয়া লইল। কৃষ্ণধন বাবু তাহার বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া এগার টাকা বেতনে তাহাকে নিজের মণ্ডলের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ হইলেই তিনি কালুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তাই সুষমার বিবাহে মুসলমান প্রজাদিগকে খাওয়ানোর ভার তাহার উপর পড়িয়াছিল। আজ কয়েকদিন হইল,কালুর বিশ্রাম নাই। সমস্ত দিন জমিদার বাড়িতে থাকে, সেখানেই তার খাওয়া-দাওয়া চলে। প্রত্যহ রাত্রিতে বাড়িতে আসিত এবং প্রাতঃকালে আবার চলিয়া যাইত। অবশেষে বিবাহের ঘটা যখন একেবারে কমিয়া আসিল, তখন কালু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।[২]

একবার কৃষ্ণধন বাবুর ইচ্ছা ছিল হাওড়ার মধ্যে কোনো স্থানে নৌকা নোঙ্গর করে রাত্রি যাপন করবেন, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না হওয়ায় এবং হঠাৎ দ্রুতবেগে বাতাস বইতে শুরু করায় তিনি রাত্রি যাপন করার

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

সিদ্ধান্ত পরিহার করলেন। মাঝিদেরকে পাল তুলে দিতে আদেশ প্রদান করলেন, যাতে এক ঘণ্টার মধ্যে মহকুমা সদর সেরগঞ্জ পৌঁছাতে পারেন। সেই পালতোলা নৌকা দ্রুতবেগে চলতে লাগলো আর বড় বড় ঢেউ দুধারে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড বেগে ঝড় আসাতে নৌকা উল্টে ফেলার উপক্রম হলো, মাঝিরা পাল নামিয়ে নেওয়ার সময় পেল না, হঠাৎ বজরা খানিও ঝড়ের বেগে উল্টে গেল।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তারা ডাকাতির শিকার হয়। ডাকাতদলের সকলের হাতেই একটি করে লম্বা লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র ছিল। এরপর তাদের পুরো শরীর তল্লাশি করে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন এই দস্যুরা বড়ই নিরাশ হলো।দস্যুদের পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন, ওদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী জগৎপুর গ্রামে। এ গ্রামটি অনেকটা দ্বীপের মতো, চারিদিকে আর কোন গ্রাম নেই।রাত্রিতে নৌকা লুট করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে, বংশানুক্রমে এদের এই বৃত্তি। মাঝে মাঝে হাওড়ের নিকটবর্তী স্থানে এরা ডাকাতিও করে। লোকজন সমবেত হলেই নৌকায় চড়ে চম্পট দেয়। এভাবে একরাত অতিক্রম করে কালু ও জমিদারকে তিনজন লোক সেরগঞ্জ থেকে এক মাইল দূরবর্তী কোনো এক স্থানে পৌঁছে দিয়ে এলো।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে গল্পকার আমাদের জানান, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির অগ্রদূত বাগ্মী, প্রজাহিতৌষী, পরোপকারী কৃষ্ণধন বাবু কলেরায় প্রয়াণের পর তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র বিমলবাবু যখন ওকালতি ছেড়ে জমিদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন কালুর মতো লোকদের আর গুরুত্ব তো থাকলোই না। বিমলবাবু ভিন্ন ধর্মের লোকদের বিশেষ করে মুসলমানদের একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। বাবা কৃষ্ণধন বাবু যে খাজনা মওকুফ করেছিলেন, তিনি সেই খাজনা আদায় করার জন্য নতুন আদেশ জারি করেন। প্রজাদের অবস্থাও খারাপ হয়ে উঠেছিল, খাজনা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তাদের ছিল না। তারপর গল্পে আমরা দেখি, কালু অবশেষে জমিদার বাড়ির যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হারাতে থাকে। কিশোর জীবনের সূচনায় যে অবস্থা হয়েছিল, অনেকটা সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মত অবস্থা হয় তাদের, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে তার পিছু হটার কোনো উপায় ছিল না। কৃষ্ণধন বাবু যে বছর মারা যান সে বছর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিসূচিকা অর্থাৎ কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

দুর্ভিক্ষে বিমলবাবু কালুকে কর্মচ্যুত করেন। কালুর হাতে যে অল্প অর্থ ছিল, তা দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ফলে কালু তার মাকে নিয়ে মস্ত বিপদে পড়লো। এই পরিস্থিতিতে কালুও দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। দস্যুদলে যাবার পরে কালুর দিনগুলি বেশ সচ্ছলতার সঙ্গে কাটতে লাগল। বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই ডাকাত মহলে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। যখন বাড়ি থেকে রাত্রিতে ঘনঘন কালু অনুপস্থিত হতে লাগল, তখন তার মা একদিন কারণ জানতে চাইলে সে বলল, সে নীলশ্রী গ্রামের এক ধনী লোকের বাড়িতে চাকরি পেয়েছে। সেখানে রাত জেগে পাহারা দিতে হয়, আজকাল ডাকাতির খুব বেশি ভয় হওয়ার কারণে। কালুর মা সরলমনে কালুর কথা বিশ্বাস করলো।

কৃষ্ণধন বাবুর কন্যা সুষমার বিয়ে হয়েছিল আরেক জমিদার হরেন্দ্র বাবুর সাথে। তাদের বাড়ির ভিতরে কালু তার দশ-বারোজন সঙ্গীসহ ডাকাতির জন্য যখন প্রবেশ করে, তখনো তার জানা ছিলনা, কোন বাড়িতে সে এসেছে। কালুর সঙ্গীরা দরজার বাইরে অবস্থান করছিল আর কালু ভিতরে প্রবেশ করার পর কী হলো, সেই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার :

> হরেন্দ্র বাবু ও তাহার স্ত্রী পর্য্যঙ্কের উপর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দস্যু হরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাইল। অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অবশেষে কি জানি

> কি ভাবিয়া শিহরিত উঠিল। তাহার আর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল না। এক কোণে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে অন্যান্য দস্যুরা তাহার বিলম্বে অধৈর্য হইয়া পড়িল।[১]

দস্যুদের দরজার বাইরে ধাক্কাধাক্কিতে হরেন্দ্র বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে তৎক্ষণাৎ নিজের বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে লাগলেন, গুলির আওয়াজ শুনে দরজার বাইরে থাকা অন্যান্য ডাকাতরা পালিয়ে গেল। ডাকাতরা পালিয়ে গিয়েছে দেখে হরেন্দ্র বাবু যেই দরজা খুলেছেন, ভিতরের ডাকাতটি সুযোগ বুঝে ঘর থেকে দৌড়ে বের হলো। তখন হরেন্দ্র বাবু 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার করাতে তা শুনে চার পাঁচজন লোক ডাকাতটিকে ধরে ফেলল। ধরা পড়ার পর দেখা গেল, ধৃত লোকটি কালু। রাত্রে তাকে ওই বাড়িতে আটকে রেখে পরের দিন পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

কালু নিজে ধরা পড়ল, নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়েও অকৃতজ্ঞ হয়ে অন্য সদস্যদের নাম সে প্রকাশ করল না। অবশেষে গল্পে আমরা দেখি নিজ স্বামীগৃহে সুষমা শৈশবের কালুকে নতুনভাবে যেন আবিষ্কার করল।কালুকে চিনতে পেরে সুষমা কি ভেবেছিল সে কথা বলতে গিয়ে গল্পকার লেখেন :

> সুষমা যখন শুনিল তাহারই কালু তাহার বাল্যের সাথী কালু তাহাদের গৃহে ডাকাতিতে ধরা পড়িয়াছে, তখন সে সমস্ত মুসলমান জাতটাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সুষমা এতদিনে বুঝিতে পারিল, তাহার জননী মুসলমানকে কেন এত ঘৃণা করিতেন। তাহার পিতা যে ঐ জাতটাকে অনর্থক প্রশ্রয় দিয়া মহা ভুল করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে জগৎ জানিল, সুষমা জানিল, কালু নিমকহারাম! হায় কালু! অদৃষ্ট-[২]

গল্পের সবচেয়ে উত্তেজনাকর পর্ব হচ্ছে, ডাকাতি করতে গিয়ে কালুর বিবেকের তাড়নায় ধরা পড়া এবং পুলিশের জেরা ও পাশবিক নির্যাতনের পর তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা।গল্পের মধ্যে তৎকালীন জমিদার ও নিম্নবিত্ত পরিবারের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। গল্পকার সত্যিই গল্প বর্ণনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৮ এপ্রিল ১৯২১) মনীন্দ্র কুমার দত্তের তিন পৃষ্ঠার গল্প ‘ব্যথিত’ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে মেঘনা নদীর উপর দিয়ে চলমান নৌকার মাঝি ও তার যাত্রীর জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।দিগন্তবিস্তৃত মেঘনায় নৌকার এক যাত্রী ছাদের উপর নিস্তব্ধ ভাবে বসে ছিল। এমন সময় পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে মাঝি গেয়ে উঠলো ভাটিয়ালি সুরে এই গানটি :

“মনের আগুন জলে গো দিগুণ।
কেমনে নিভিব
আশার পাশে ধাই গো রবে
আর কতকাল রব।-[৩]

এই গান শুনে যাত্রীর উদাস মন ব্যাকুল হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই নৌকার মাঝির হৃদয় কোন দারুণ ক্ষতে পীড়িত। তিনি কাছে গিয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন তার দুঃখের কথা। তখন যাত্রীকে মাঝি বলল, তার এক বৃদ্ধা মা ছিল, সে তাকে কাজ করতে দিত না। শেষ বয়সে তালের পাতার

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

খোঁচায় তার মায়ের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। মায়ের এই দুঃসময়ে ছেলেকে ছেড়ে মা এক মুহূর্ত দূরে থাকতে পারত না, সেও তার মাকে ছেড়ে কীভাবে যেতে পারে ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আরেক জায়গায় গিয়ে জুটেছে, ছোট ছেলেটিও চলে গিয়েছে মায়ের সঙ্গে।

লোকটিকে আরো জানায়, তার মা মৃত্যুর পূর্বে তরমুজ খেতে চেয়েছিল। তখন বর্ষাকাল, তরমুজ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, আর মাকে ছেড়ে কোথায় খুঁজতে যাবে তাও সে ভেবে পাচ্ছিল না। তবুও মার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সে নৌকা নিয়ে গেল তরমুজ আনবার আশায়। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বিকালবেলা ক্লান্ত শরীরে ছোট্ট একটা তরমুজ হাতে নিয়ে সে বাড়িতে ফিরল। কিন্তু ঘরে ঢুকে সে দেখল, তার মার অবস্থা খুবই খারাপ। তরমুজ আর খাওয়ানো হলো না তার মাকে। মার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে না পারার সে সারাক্ষণ বয়ে বেড়ায় এবং তার ভিতর একটি পাপবোধ কাজ করে। গল্পকার অতঃপর যাত্রীর জবানিতে বলেছেন :

> এই জোৎস্না, এই নদী, গভীর রাত্রি দেশের পর দেশ, জানার পর অজানা এরাও কি একে সান্ত্বনা দিতে পারল না?
>
> সান্ত্বনা কি সহানুভূতি থেকে পাওয়া যায় না?
>
> এত দরদী প্রকৃতি রয়েছে তবু কেন শান্তি পাচ্ছেনা এর মন?
>
> এর পাপ? আমি কি উত্তর দিব? কেবল আমার সহানুভূতি ভরা আকুল হৃদয়খানি দিয়ে তার পাশে সব দরদী প্রকৃতির মতো চুপ করে বসে রইলাম।[১]

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ ১৯১৮ সাল থেকে গল্প লেখা শুরু করেন, আগে কবিতা লিখতেন।[২]*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) তিনটি গল্প 'জোহরা', 'ভিখারী' ও 'ডাকাত' যথাক্রমে চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটি গল্প রুশ ঔপন্যাসিক-গল্পকার ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩)এর অনুকরণে প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখিত ি

আমরা 'জোহরা' গল্পে দেখতে পাই, কথক যেকোনো একটি রিক্সায় উঠে রিক্সাওয়ালার সাথে ভাব জমিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ান আর তাদের জীবনের গল্প শোনেন। এরকম একজন 'আদম গাড়ি' চালক কুড়ি-একুশ বছর বয়সী দোহারা গোছের সুন্দর চেহারার সুদৃষ্টির এক যুবকের সঙ্গে কথকের পরিচয় ও খাতির হয়। তাকে দেখে তার মনে হয়, কী যেন একটা বেদনার চাপে সে বড় ম্লান। তার সাথে কথা বলতে সে জানালো, আট মাস হলো তার স্ত্রী মারা গেছে। স্ত্রীকে সে খুবই ভালোবাসত, তাই :

> এখনও ভুলতে পারছিনা তাকে। নিজের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াই আর ভাবি সেই একই কথা! আচ্ছা, বলতে পার বাবু, কেন মরে গেল সে? বয়স ছিল তার খুবই কাঁচা, আর ভারা যোয়ান! এখনও পর্যন্ত, যদি কোনদিন সোহাগ করে ঝুমঝুমি চুলের গোছাটা তার এলোচুলের ফাঁসে ফাঁসে জড়িয়ে দিতুম-লজ্জায় তার গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠতো; লোকের কাছে আমার পানে মুখ তুলে চাইতেও পারত না। তবু সে চলে গেল-কলেরা তাকে আমার পাষাণ বুক দেখে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো বাবু।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬
২ বুদ্ধদেব দাশ সম্পাদিত, *শ্রেষ্ঠ গল্প: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২, পৃ. [এক]
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

চালক জানায়,স্ত্রী মারা যাবার সময় সে দার্জিলিঙে ছিল। সে ফেরার আগেই কবর দিয়ে দেওয়ার কষ্ট তার কাছে বর্ণনাতীত হয়েছিল। সে এসে দুঃখে-কষ্টে স্ত্রী জোহরার কবরের মাটির উপর হাত চাপড়েছিল আর বলেছিল, নিষ্ঠুর দুনিয়ার কী এত ক্ষুধা পেয়েছিল যে, তার স্ত্রী জোহরাকে গিলে খেলো। গন্তব্যে আসার পর রিক্সাযাত্রী লোকটি নামবার সময় তাকে কিছু টাকা বেশি দিলেন। লোকটি মাথার টুপি খুলে তাকে সালাম করে আবার গাড়িখানি টানতে টানতে এগিয়ে গেল। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, চারিদিক কুয়াশায় ঘিরে ফেলেছে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়িখানি দেখতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ জলভরা চোখে তিনিও সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। এভাবেই গল্পকার গল্পটির শেষ করেছেন।

'তুর্গনিভের পদাঙ্ক অনুসরণে' কথাটি শৈলজানন্দ মজুমদারের দ্বিতীয় গল্প 'ভিখারী'র নামের নীচে মুদ্রিত ছিল। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৪২৮) এটি ছাপা হয়। রাস্তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় এক ব্যক্তির একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সাহায্যের আশায় কান্নার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তী কথোপকথন ও মনের ভাবনা এই গল্পের মূল বিষয়। ভিক্ষুককে কী অবস্থায় ব্যক্তিটি দেখেছিল এবং কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল সাহিত্য-পত্রিকায় তার বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার :

> রক্ত রাঙ্গা চোখ দুটি জলে ভরা,- মিনতি কাতর দৃষ্টিটুকু নিষ্প্রভ, পরণের শতচ্ছিন্ন কাপড়খানা হাজার জায়গায় গিঁট্ দেওয়া, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, ... আর, হা ভগবান ! গরীব বলে কি এমনি করে মারতে হয় ! কিছু পাবার আশায় সে তার মলিন, কম্পিত হাতখানি ধীরে ধীরে আমার সুমুখে বাড়িয়ে ধরলে।[১]

কিন্তু কথক ব্যক্তি তখন সাহায্যের আশায় নিজ পকেটে হাত দিয়ে দেখেন মানিব্যাগ, টাকা-পয়সা এমনকি রুমাল পর্যন্ত কিছুই তিনি সঙ্গে নিয়ে বের হননি। তখনও বৃদ্ধ ভিখারি তার সামনে হাত পেতে আছে। দেওয়ার মতো কিছুই না পাওয়ায় তার কাছে খারাপ লাগছিল। তবে কিছু দিতে না পারলেও লোকটি ভিক্ষুকের হাত ধরে বিনীতভাবে অপারগতা প্রকাশ করায় গল্পে মার্জিত ও শালীন ব্যবহারের জয় ঘোষিত হয়েছে। ক্ষুদ্র এ গল্পটির সার্থকতা এখানেই।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৯, এপ্রিল ১৯২২) শৈলজানন্দ মজুমদারের ছোটগল্প 'ডাকাত' প্রকাশিত হয়। গল্পটির চরিত্রগুলির নাম হিমাংশু ও তার স্ত্রী শতদল এবং জব্বার ও তার স্ত্রী রহিমা। হিমাংশু-শতদল দম্পতির একটি শিশু কন্যা ছিল, তাকে খুকি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

হিমাংশুর চাকরির সুবিধার্থে স্ত্রী শতদল শিশুকন্যাসহ সপরিবারে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করত। বাড়িটি পুরনো ও স্যাতসেতে হওয়ায় শতদল তাকে প্রায় প্রতিদিনই বলছিল, বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে নতুন বাড়ি দেখবার জন্য। একদিন অনেক অনুসন্ধানের পর মুসলমান পল্লির ভিতর দোতলা বাড়ি ঠিক করে পরদিনই তারা সেখানেউঠে গেল।

গল্পে এর পরে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে জব্বার নামে এক মুসলমান গুণ্ডার প্রসঙ্গ এসেছিল। হিমাংশু স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করে বলছিল, জব্বারের বাড়ি এ পাড়াতেই। স্ত্রী শতদল কথাটা শুনে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেও মনের কথাটা গোপন করে হাসতে হাসতে হিমাংশুকে জানায়,আর যাই হোক এ বাড়ি ছেড়ে সে

---

১ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'ভিখারী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ. ২৭৩

কোথাও যেতে রাজি নয়। শতদলের মনের ভিতর জব্বার নামক ব্যক্তিটির ভীতি ঠিকই লুকিয়ে ছিল এবং এই ভীতি তাকে স্বপ্নেও আক্রমণ করতো।

এরপরে গল্পে আমরা দেখি মার্চেন্ট অফিসের কেরানি হিসেবে হিমাংশু ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন থেকে গেল। এমনকি কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের বছরেও শেষ সময়ে লোকজন সপরিবারে শহর ত্যাগ করতে থাকলেও হিমাংশু সেরকম কোনো চিন্তা করলো না। এ পর্যায়ে গল্পে আমরা দেখি, হিমাংশু গলার বাঁদিকের ব্যথায় ভুগছে আবার শতদল পায়ের গ্রন্থির যন্ত্রণায় অস্থিরতায় ভোগার চিত্র। তাদের শিশুকন্যাটি তাদের এই অসুস্থতার বিষয়টি দেখছে, সে মাঝে মাঝে তার বাবাকে ওষুধ খাইয়ে দেয় মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী।

এমন সময় দরজাটা ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, শতদল একটা অপরিচিত মুখ ঘরের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎই যুবকটি দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলো। বলিষ্ঠ যুবকটির 'খালি গা, পরনে একখান কাপড়, মাথায় পাগড়ীর মতো কি জড়ানো'। তার নাম জব্বার বলাতে শতদলের সর্বাঙ্গ কেঁপে শিঁউরে উঠলো। খুকিকে বুকে টেনে নিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চুপিচুপি বললো 'ডাকাত'। জব্বার আশ্বস্ত করে তাকে বলে, 'ভয় কোরো না আমি শুধু ডাকাতি করি না'। খুকি অনেকক্ষণ থেকে জব্বারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল,তারপর তাকে এমনিভাবে কথা বলতে দেখে সে তার বাবার দিকে যায়। গল্পের এখানে নাটকীয় ট্রাজিক পর্বের সূচনা হয়। এরপরে গল্পে আমরা দেখি:

> হিমাংশু যে তখন সব যন্ত্রনার হাত থেকে এড়িয়ে মস্ত ঘুম ঘুমিয়ে গেছে,-তার শীতল শুষ্ক শরীরে হাত পড়বামাত্র জব্বার তা বেশ বুঝতে পারলে। খুকির মুখের পানে তাকিয়ে তার বড় কষ্ট হলো; বল্লে, উনি ঘুমুচ্ছেন, উঠিও না আর।
>
> সাদা চাদরটা মৃতের মুখের কাছে ঢাকা দিতে জব্বার খুকিকে বল্লে তোমার মায়ের অসুখ, না?[১]

জব্বার আসার আগে অসুস্থ হিমাংশু যে মারা গেছে, এটি শতদল ও খুকি বুঝতে পারেনি। এরপর জব্বার ডাক্তার আনার কথা বলে বাইরে এল। কিন্তু বাইরে আসতে না আসতেই অনেকগুলি লোক একসঙ্গে 'ডাকাত' জব্বারকে ধরে হাতে লোহার শক্ত বেড়ি পরিয়ে দিলো। এরপর থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে সারারাত হাজতে আটকে রাখা হলো। হাজতের ভেতরে প্রহরী রাতে পাহারার মধ্যে ঘুমানোর সময়ে জব্বার ভাবছিল, কী করা যায়। হিমাংশুর মৃত্যু, শতদলের অসুস্থতা, খুকির ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে সে যেটা করলো তা গল্পকারের বর্ণনায় :

> ধীরে ধীরে পিছনের জানলাটার কাছে উঠে গিয়ে, দু হাতে দুটো গরাদে ধরে দু-তিনবার সজোরে টান মারতেই তার বজ্রমুষ্ঠি চাপ তারা আর সহ্য করতে পারলে না-আস্তে আস্তে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল। কোন রকমে সেই সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে জব্বার তার চওড়া বুকখানা গলিয়ে বাইরে এসে পড়ল[২]

হিমাংশুর মৃত্যু হতে না হতে শতদলের মৃত্যু এবং আবারও জব্বারের আকষ্কিক উপস্থিতি গল্পের একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়। বাবা-মা হীন খুকিকে নিয়ে জব্বার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। হিমাংশু ও শতদলের চিরবিদায়, এরপর ঘুমন্ত খুকিকে নিয়ে জব্বারের নিজ বাড়িতে নিয়ে আসায় গল্পটি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসায় জব্বারের স্ত্রী রহিমা মোটেই অবাক হলো না বরং আনন্দে তার মাতৃহৃদয় নেচে উঠলো। তার স্ত্রী মেয়েটিকে পেয়ে খুশি হলেও জব্বারকে চুরি-ডাকাতি

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২ প্রাগুক্ত

ছেড়ে দিতে বলে। জব্বার জানায়, সে এমন ছোটলোক নয় যে চুরি ডাকাতি করবে। খুকির দিকে চেয়ে তাও না হয় সে ছেড়ে দেবে বলে। তারপর কী হবে, এরপরের জব্বারের জবানিতে গল্পকারের বর্ণনা :

> কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জব্বার বলে উঠল-না, ছাড়তে পারবো না বোধ হয় রহিমা!
>
> অন্তত গরীবগুলোকে খাওয়াবার জন্য তা আমাকে করতেই হবে। তোমাকে তো কতদিন বলেছি রহিমা, ওসব আমার সহ্য হবে না। ওই যে কতগুলো জানোয়ার গরীবের বুকে পা দিয়ে শহরের উপরে হাওয়া গাড়ি ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে, অনর্থক টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, -অথচ অন্ধ আতুর দশদিন দরজায় মাথা খুঁড়লেও..[১]

কথাটি শেষ করবার আগেই ঘরের দরজায় পুলিশের লোক এসে জব্বারকে ডাকতে শুরু করে। জব্বার অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখে, ধরা দেবে বলে। খুকিকে মায়ের মত স্নেহ দিয়ে লালন পালন কথা করার কথা বলে সে স্ত্রী রহিমাকে। দরকার হলে মেয়েটিকে নিয়ে রহিমার বাবার বাড়িতে যাওয়া অথবা রহিমার ভাইকে এ বাড়িতে আসার কথা বলে। রহিমা জব্বারের কাছে জানতে চায়, সে পুলিশের হাতে ধরা দেবে কিনা, জব্বার হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। এরপর গল্পের শেষ অংশটি রচিত হয় এই সংলাপ গুলি দিয়ে:

> রহিমার চোখ দিয়ে দুঝলক অশ্রু উথলে উঠল, স্বামীর গলা জড়িয়ে বল্লে-আর আমি? জব্বার সাদরে তার গণ্ডদেশে বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে হাত ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে উপর দিকে দেখিয়ে বল্লে-খোদা দুনিয়ার মালিক, খোদা আছে, রহিমা ভয় কি? বাইরে সত্যসত্যই একদল পুলিশের লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। জব্বার তার চওড়া বুকটা একটু ফুলিয়ে হাসতে হাসতে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে-ধরো।[২]

ডাকাত রূপের মধ্যে মানবতাবাদী রূপটি গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন গল্পকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কাহিনি বর্ণনায়ও গল্পটি সত্যি সার্থক হয়েছে।

হিন্দু নারী হয়েও মুসলিম-অমুসলিম জীবনচিত্রের সম্যক রূপায়ণে সমকোলে যে লেখিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য সর্বাধিক আলোচিত হয়েছিলেন, তিনি শৈলবালা ঘোষজায়া। সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গানের পাশাপাশি তিনটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, গল্পগুলি হলো : লোকগানের সন্ধ্যায়, আয়েশা ও বিদায় গ্রহণ। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৮, জুলাই ১৯২১) শৈলবালা ঘোষজায়ার (১৮৯৪-১৯৭৪) দশ পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'লোকসানের সন্ধ্যায়' প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূল চরিত্র একজন তরুণ চিকিৎসক, তার ছোট বোন 'খুদু' এবং এক গানের ওস্তাদকে নিয়ে গল্পটির কাহিনি গড়ে উঠেছে।

গল্পে কথক ডাক্তারের নিজ মানিব্যাগ থেকে ৪৬৪ টাকা আর কারখানার টাকা থেকে ২৫৫ টাকা হারিয়ে যাওয়ায় তিনি খুব অবাক হয়ে পড়েন। অবাক ব্যাপার হলো, গল্পে এ ব্যাপারে চিকিৎসক তার নিজ বাবাকে সন্দেহ করলেন। তার কারণ গল্পে বলা হয়েছে এভাবে :

> ভাবিতে লাগিলাম, দোষ কার? ভাবিতে ভাবিতে সকলের আগে যে দোষীর নামটি পয়লা নম্বরেই আমার মনে পড়িল তিনি আমার পিতৃদেব! সত্যই তো! দোষ আর কাকে দিব? মেডিকেল লাইনের পথ ধরিয়া, না হয় বছর কয়েকের জন্য বিলাতটাই ঘুরিয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া কি এমন লায়েক হইয়া পড়িয়াছি যে, টাকা আগলানো ব্যাপারটায় পর্যন্ত বাবা আমায় এতটা বিশ্বাস করেন? ছেলেবেলা হইতে তিনি বরাবর

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

দেখিতেছেন জিনিষ, পত্র, টাকা, কড়ি হারাইতে আমার চেয়ে নিপুণ-দক্ষতা কারুর নাই-তবুও তিনি যদি আমার যোগ্যতার উপর শ্রদ্ধা না হারান,তবে সেটা তাঁর বিবেচনার দোষ নয় কি?[1]

পিতাকে নিয়ে এই ভাবনার একটা যুক্তি তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটা তার একরকম খেয়াল মাত্র। এরকম ভাবনার মধ্যে গল্পে কথকের ছোটবোনের আবির্ভাব আমরা লক্ষ করি। তাঁর এ বোনটি গান বাজনা করায় অভ্যস্ত। সময়ের অভাবে তিনি নিজে এই 'সুকুমার কলাবিদ্যার' কোনোকিছুই চর্চা করতেপারেননি বলে জানান। তবে গান-বাজনার উপর তার মধুর আকর্ষণ আর তাঁর বিবেচনায় এমন 'পবিত্র-সুন্দর জিনিস' আর নেই। এখানে তাঁর এক পরিচিত গানের ওস্তাদের প্রসঙ্গ চলে আসে। 'চিরকুমার ওস্তাদ' নিউমোনিয়া আক্রান্ত দুর্বল ফুসফুস নিয়ে বাঁশির চর্চা করতে গিয়ে 'রক্ত-ওঠা' রোগে আক্রান্ত হন, তখন কথক তার চিকিৎসার ভার নেন। ওস্তাদ তার ক্লারিওনেট আছড়ে ভেঙ্গে তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, রক্তখেকো যন্ত্র এই দুশমনটা, এটার চর্চা কখনো করোনা।

ওস্তাদের শরীরের অবস্থা দেখে তিনি তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেন। তাঁর বক্তব্য, ক্লারিওনেট শুধু ওস্তাদকে ধ্বংসের কবলে ফেলেছে, কিন্তু বিয়ে করলে তার বংশ শুদ্ধ লোককে অভিশপ্ত করে ছাড়তো। বিয়ে সম্পর্কে কথকের উপলব্ধি গল্পে এভাবে এসেছে :

এ দেশের শতকরা ছিয়াত্তরটা অযোগ্য-বিবাহের সুযোগ্য-পরিণাম অহরহ চোখের উপর ঘটিতে দেখিতেছি! শতকরা চুয়াল্লিশটা দূষিত রক্তের শরীর, আর শতকরা বত্রিশটা কম-জোরী-বুক, একি বিবাহের যোগ্য? আরে বাপু বিবাহ-কর্ম্ম ছাড়া সংসারে মানুষের করিবার কাজ কি আর কিছু নাই? এ দেশ আজ, কাজের মানুষের কাঙাল-যাও না বাবু সেই পথে; তাহলে দেশটার- পৃথিবীটার অনেক উপকারই তোমাদের দ্বারা হইবে। সে পথে চলিতে যার আলস্য-চর্চ্চার ব্যাঘাত ভয়ে কুণ্ঠিত-তাদের জন্য বাণপ্রস্থের পথ খোলা আছে। কিন্তু বিবাহ করা কেন? ওটা যে শুধু আত্মহত্যা আর পরহত্যা মাত্র!

এই অযোগ্য বিবাহ, বাল্য মাতৃত্ব এবং বহু-বহু সন্তান সৃষ্টি-এই জঘন্য অনাচারটার ফল দেখিয়া দেখিয়া চোখ যত ক্ষরিতেছে আমার দিলও তত চটিতেছ! ভাবিতে ভাবিতে এক একসময় আমার তাক লাগিয়া যায়, বাস্তবিক এই মানুষগুলোর রুচি কি অদ্ভুত![2]

একশত বছর আগে লিখিত (১৯২১) গল্পে বিয়ে সম্পর্কে লেখিকার এই বক্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে বর্তমানের সাথে অনেক মিলে যায়। তিনি চিন্তাভাবনায় কত আধুনিক ছিলেন, তা উপর্যুক্ত কথার ভিতর দিয়ে লক্ষ করা যায়।ডাক্তারি ব্যবসায় এবং রোগীর সত্যিকারের চিকিৎসা নিয়েও কিছু কথা গল্পে উল্লেখিত হয়েছে। ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে তাই এই চিকিৎসকের মনোভাবের প্রকাশ গল্পে এভাবে ব্যক্ত হতে দেখি :

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে সুরু দিলাম, মনটা অশান্তিতে খিচ্ খিচ্ করিয়া উঠিল, আরও কিছু কারণ খুঁজিবার নাই কি? এইখানেই নিশ্চিন্ত হওয়া কি, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কর্তব্য ?[3]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৮ জানুয়ারি ১৯২২) সংখ্যায় শৈলবালার 'আয়েসা' নামক চৌদ্দ পৃষ্ঠার ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি মূলত আয়েসা নামক নিম্নবিত্ত এক নারীর জীবনকাহিনি। দশ বছর বয়সে আয়েসার পিতার মৃত্যু হয়। পরের বছর আয়েসারবিয়ে হয়ে

---

১ শৈলবালা ঘোষজায়া, 'লোকসানের সন্ধ্যায়', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৮, পৃ. ১৩০
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

গিয়েছিল, কিন্তুতার সংসার করা হয়ে ওঠেনি। কৃষক পরিবারের স্ত্রী হিসেবে আয়েসাকে চাষীদের ভাত, মুড়ি ইত্যাদি যোগাতে হতো। কিছু কারণ দেখিয়ে তার স্বামী আর 'একটি পূর্ণ বয়স্কা নারীকে নিকা' করে ঘরে আনে। এটা আয়েসা ও তার মায়ের পক্ষে দুঃখজনক হলেও সাধারণ লোকজনের চোখে নিতান্তই একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল বলে গল্পে উল্লেখিত হয়েছে।

বিয়ের পর আয়েসার স্বামী খোদাবক্সের কৃষিকাজে উদাসীনতা দেখা দেয় এবং তার নেশার আসক্তি প্রতিদিন উগ্র হয়ে উঠে। যে জমিজমার ভরসায় আয়েসার মা তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন, সে জমিজমা 'শ্রীমান বাবাজীবনের' নেশায় দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর সে গৃহপালিত কয়েকটি গরুর দুধ বেচে, গরুর গাড়ি বহন করে এবং ভিন্ন গ্রামের কোন একটা 'লক্ষীছাড়া ঝুমুর নাচের দলে বেহালা' বাজিয়ে নাচ-গানে ভরপুর হয়ে 'এক রকম সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন যাপন' শুরু করে। পাশাপাশি খোদাবক্স এর দুই পত্নীর উপস্থিতিতে সংসারে একটি অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। এদিকে সন্তানসম্ভবা আয়েসা কিছুদিন পর এক দুর্বল পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু সন্তানটি পরের দিনই মারা যায়। অতঃপর আয়েসার মা ও চাচা এসে মৃত নবজাতকের সৎকার করে অসুস্থ আয়েসাকে পালকি করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। এখবর ঝুমুর দলের মধ্যে পড়ে থাকা খোদাবক্সের কানে খবরটা পৌঁছালে সে এটিকে 'অসহ্য মর্ম্মপীড়াদায়ক অপমানের সংবাদ' মনে করে রাগে জ্বলে ওঠে।

এরপর খোদা বক্সের জীবন আর আয়েসার জীবন ভিন্ন ও সমান্তরালভাবে চলতে আলাদা অবস্থানে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শের খোদাবক্স আয়েসা ও তার পরিবারকে শায়েস্তা করার চিন্তাভাবনা এবং প্রয়োজনে আইন আদালতের আশ্রয় নেওয়া চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। এ-সব সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই খোদাবক্স আরেকটি কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। পাশের গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু জেলে পরিবারের চোখে ধুলা দিয়ে তাদের অনেকগুলি টাকা এবং একটি মেয়েকে নিয়ে সে সহসা একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। খোদাবক্সের সঙ্গী-সাথীরা এতে ভয় ও হতাশায় মুষড়ে পড়ল। এদিকে আয়েশার মা বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে অনেক কষ্টে ধারদেনা করে মেয়েকে বাঁচিয়ে তুললেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর মায়ের করা ঋণ পরিশোধের ভাবনায় আয়েসা কাজের সন্ধান করতে থাকে। অবশেষে খোঁজ খবর নিয়ে পাশের গ্রামের শেখেদের বাড়িতে 'পাখা টানার কাজ খালি আছে' জেনে এরকম কাজের সন্ধান পেয়ে সেখানে প্রথম চাকরিতে ঢুকল।

আয়েসা যে ডাকবাংলায় পাখনার কাজ নিয়েছিল সেখানে একদিন ঘটনাক্রমে বন্দুকধারী একজন 'চিড়িয়া শিকারী' সাহেবের আগমন ঘটে। শিকারি সাহেবের চেহারার ভিতরে বয়স্কতার ছাপ দেখে আয়েসা অনেকটা অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালো, সে বোঝে তার স্বামী খোদাবক্সের আগমন ঘটেছে ডাকবাংলোয়। ডাকবাংলার সরদার খানসামা বুড়ো চাচা আয়েসাকে সামান্য দেরিতে আসার জন্য ধমক দিলেন। আয়েসা কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের বেঞ্চে বসে পাখা টানতে টানতে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে অনেক কথা ভাবতে লাগলো।

গল্পের এ পর্যায়ে আমরা দেখি, তার মনের ভিতর অতীত ভাবনার অনেক স্মৃতি মনে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। খোদাবক্স আয়েসাকে লক্ষ্য করেনি বা তাকে চিনতে পারেনি, তবে আয়েসা তাকে দেখে বয়সের ছাপ পড়া সত্ত্বেও ঠিকই চিনতে পেরেছে। আয়েসার একবার মনে হয়েছে নিজের পরিচয়টা তুলে ধরতে, কিন্তু খোদাবক্সের পুরনো অভ্যাসের কথা মনে করে সে আবার পিছিয়ে যায়। গল্পের বর্ণনায় :

> এখন, ইহার উপর যদি আয়েসা নিজের সম্পর্কের দাবীটা লইয়া লোকটার সামনে দাঁড়ায়,- তাহা হইলে? আয়েসা বিষাদভরে হাসিল!- নতুন সংসারের দিকে খুব একটা বিশ্রী গোলমেলে কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে,

> সন্দেহ নাই,- ঐ অব্যবস্থ-চিত্ত মানুষটাকে চিনিতে তো আর বাকী নাই! ঐ মানুষটির পুরাতন অভ্যাস সবই ঠিকই আছে, সুতরাং ...।[১]

এর ভিতর শিকারি সাহেব তার দলবল নিয়ে শিকার-কাজ সেরে কখন চলে যায়, আয়েশা তা জানতেও পারে না। সে ডাকবাংলোর চাচার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, শিকারি সাহেবের খবর। জঙ্গল থেকে তাদের ফেরার খবর জানতে চাইলে চাচা জবাব দিলেন, বারোটার পর স্টেশনে গিয়ে চারটার দিকে চলে গেছেন। আয়েসা জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাচাকে সালাম দিয়ে প্রস্থান করলো। শেষ পর্যন্ত খোদাবক্সের সাথে আয়েশার আর সাক্ষাৎ হয় না। গল্পটি এখানেই শেষ হয়।

কাহিনি বর্ণনায় গল্পকার আয়েশা নামক নারীর সংগ্রামমুখর জীবনের বর্ণনা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। নানা টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে একজন নারীর যে জীবনচিত্র তিনি এঁকেছেন, তা সত্যিই লেখকের অভিজ্ঞতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে। সমাজের নিম্নবিত্ত এক মহিলার জীবন সংগ্রামের কাহিনি আয়েসা নামক নারীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৯ অক্টোবর ১৯২২) শৈলবালার এগার পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'বিদায় গ্রহণ' প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে একজন কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষকের (খান সাহেব নামে পরিচিত) চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পের কাহিনি শুরু হয়েছে উক্ত শিক্ষকের বাসায় অনুপম নামে একজন ছাত্রের আগমন এবং তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। স্কুলের খেলাধুলা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি এবং সেটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষককে অভিযুক্ত করা এবং তার প্রেক্ষিতে শিক্ষকের অবস্থানের বিশ্লেষণ, এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা' শীর্ষক চার পৃষ্ঠার একটি রম্যগল্প প্রকাশিত হয়। তিনজন মহিলা ও লেখিকা স্বয়ং উপস্থিত থেকে 'প্লানচেট' বিষয়ক কাহিনি নিয়ে গল্পটি লিখিত হয়েছে। গল্পের কাহিনি শুরু হয়েছে চার মহিলা একত্রে অধিক রাত পর্যন্ত গল্প করা নিয়ে, তাঁদের গল্পের আলোচ্য বিষয় ছিল জিন, পরি, ভূত। এই গল্পে লেখিকা তিন মহিলার নাম দিয়েছেন, মিসেস এ, মিসেস বী, ও মিস ডী।

তাঁদের এই আলোচনা শেষে কিছুক্ষণ পর ঘরের ভিতর হঠাৎ করে ভয়ানক শব্দ হলো। মিস ডী কিসের শব্দ হলো,ভয় পেয়ে জানতে চাইলেন। 'বলতে পারি না' জানিয়ে কথক-লেখিকা আর যা বললেন :

> কিছুদিন হলো আমি 'ষ্টেটসম্যানে' ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙ্গে কোন বাড়ির ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর ভাঙ্গা ছাদ গলিয়ে সে এরোপ্লেনের আরোহী একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু-খাওয়া ভাঙ্গা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন টেন এসে পড়ে নি ত ? জানালা খুলে একটু দেখুন না?[২]

বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তার উপর ভূতের গল্প বলাতে জানালা খোলা নিয়ে তাদের ভিতরে ভয়ভীতি কাজ করছিল। মিস ডী ভীতু হলেও মিসেস এ সাহসের সঙ্গে জানালা খুলে ফেললেন। জানালা খোলার সাথে সাথে এক ঝটকা বাতাস ও বৃষ্টি এসে তাঁদের সবাইকে ভিজিয়ে দিলো। তার সঙ্গে মস্ত একটা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

২ মিসেস আর এস হোসেন, 'পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ১২২

উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করল। তা দেখে সবার চোখ স্থির হয়ে গেল। অন্য কক্ষে অবস্থান করা মিসেস বী দৌড়ে এলেন। তাঁরা সকলে চিৎকার করে বাড়ির সকলকে জাগিয়ে তুলবেন, নাকি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করবেন, কিছুই স্থির করতে না পেরে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ে থাকলেন। এটি ক্রমে এক 'জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যমূর্ত্তিতে পরিণত' হলো। তাঁকে দেখে লেখিকার কোথায় যেন দেখেছেন, এরকম মনে হল। কিন্তু ঠিক চিনতে পারলেন না। তবে আগন্তুককে দেখে তাঁরা খুব ভীত হলেও লোকটি অভয় দিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা নেই। তারপর তাদের ভিতর যে সংলাপ বিনিময় হয়, তাই গল্পে পরে বিবৃত হয়েছে।

মিসেস এ, মিসেস বি এবং 'জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি' র মধ্যে কিছু কথোপকথনের পর তিনি তাঁর পরিচয় দেন 'বিশ্ব স্রষ্টা ত্বষ্টি' হিসেবে। ত্বষ্টি নাম শুনে মিসেস বী তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। লেখিকার তখন মনে হলো, কলকাতায় 'নারী সৃষ্টি' লেখার সময় তিনি এই জ্যোতির্ময় আত্মার দর্শন লাভ করেছিলেন। তারপর সবাই মিলে ত্বষ্টিদেবকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। মিস ডী বিনয়ের সঙ্গে তাকে অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে 'পদধূলি' না বলে 'পদকর্দ্দম' বলতে হয়, বলেছেন লেখিকা) দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি লেখিকার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। লেখিকা সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে তাঁকে 'মহাত্মা' বলে তার কারণ জানতে চাইলেন। এরপর ত্বষ্টি দৃঢ়স্বরে যা বললেন :

> তুমি আমার নারী সৃজনের ইতিহাস বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা তোমারই বা দোষ দিব কি, সম্পূর্ণ দোষ 'সওগাত' কার্য্যালয়ের।[১]

তিনি আরো বলেন, নরলোকের শান্তিনাশকারী যুবকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য 'টিকটিকি, গিরগিটি, সিআইডি' ইত্যাদি আছে, কিন্তু সুরলোকে তাদের জব্দ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই এতরাতে উক্ত বাবুদের বাসা থেকে ফিরে যাবার সময় তাঁদের ছাদের কলসে ত্বষ্টিদেবের বাষ্পরথ আটকে পড়ে। তিনি তাই সশব্দে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিভেজা সহ্য হয় না,তাই যখনই মিসেস এ জানালা খুলেছেন, অমনি গৃহে প্রবেশ করেছেন বলে জানান।

মিস ডী এরপর কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে তা জানতে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ত্বষ্টিদেব তাঁদেরকে ঘুমাতে যাবার কথা বলে চলে যেতে উদ্যত হন।

শেষবেলায় মহাত্মা ত্বষ্টি গুরুত্বের সঙ্গে আরও কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, যে পত্রিকার জন্য এই রচনাটি দেয়া হবে তার এডিটর কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিতে হবে, যেন তিনি কোন রকম এডিটিং ছাড়াই সমস্ত রচনাটি প্রকাশ করেন,আবার 'পণ্ডিত কম্পোজিটরগণ একটা কমা কিম্বা সেমিকোলন পর্যন্ত বাদ না দেয়'। ত্বষ্টি এসব বলে বিদায় নেওয়ার পর মহিলারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে শয্যায় ঢলে পড়লেন। এরপর লেখিকার নিজ কথা দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে :

> বেচারী মিসেস বী-র পরিশ্রমের কিন্তু 'ইতি' এই পর্যন্তই নহে। তাঁহাকে ঐ শর্টহ্যান্ডের লেখা আবার সহজ ভাষায় লিখিত হইবে। অদনস্তর তাহা বঙ্গভাষায় রচনা করিতে হইবে। মিসেস বী আপন কাজ করিতে থাকুন। আমি এখন আসি।[২]

এই গল্পটি রোকেয়ার 'মতিচুরঃ দ্বিতীয় খণ্ডে' (প্রকাশকাল ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ) 'সৃষ্টিতত্ত্ব' নামে পরিবর্তিত আকারে সংকলিত হয়েছে। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত মূল গল্পের মিসেস এ,মিসেস বী, মিস

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
২ প্রাগুক্ত

ডী-র নাম পরিবর্তিত ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ গল্পে নেই। এখানে তার বদলে ননীবালা দত্ত, জাহেদা বেগম, শিরীন বেগম, বীণাপাণি ঘোষ, আফসার দুলহিন ইত্যাদি নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তাদের সংখ্যাও বেশি। দেখা যায়, লেখিকা গ্রন্থভুক্ত করার আগে মূল কাহিনিটি ঠিক রেখে শুধু নাম পরিবর্তন ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, গল্পটির ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছিলেন। তবে তাতে গল্পটির রম্য-ব্যঙ্গ-রস আস্বাদনে ব্যত্যয় ঘটেনি।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৮, জুলাই ১৯২১) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রূপকথাধর্মী আঠারো পৃষ্ঠার ছোটগল্প “মুক্তিফল” প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে তিনি নানান রকম রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, ভাইয়েরা বোনদের পাশে নিয়ে কাজ না করলে সে কাজে আশানুরূপ সফলতা পাওয়া যায়না। রূপকথার শুরুতে আমরা দেখি, এককালের ভোলাপুরের রানী একসময় কাঙ্গালিনীতে পরিণত হয়েছিলেন। রাজরানী থেকে কাঙ্গালিনীতে পরিণত হওয়ার আগে তিনি পুত্রদের অধিক আদর-যত্ন-স্নেহ করতেন, কন্যাদের তেমনটি করতেন না।

এক সন্ন্যাসী এ বিষয়টি লক্ষ্য করে একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এটি অন্যায়, পরিণামে রানী তার অতি আদরের পুত্রদের দ্বারা কষ্ট পাবেন। কালক্রমে সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করে,রানী কাঙ্গালিনীতে পরিণত হয়ে কঠিন অসুখে পড়েন। তার কয়েকজন ছেলে তাঁর সুস্থতার জন্য চেষ্টা করছিল, তখন তিনি “মুক্তি ফল” এর ব্যাপারে তাদেরকে বলেন। কাঙ্গালিনী যে এলাকা থেকে মুক্তি ফল আনার কথা বলেছিলেন সেই কৈলাস পর্বত এখন মায়াপুর রাজার রাজ্যভুক্ত, একথা তার পুত্র দর্পানন্দ জানায়। তবে সেটি আনার লক্ষ্যে ছেলেদের নানারকম অদ্ভুত প্রচেষ্টার চিত্র রূপকথায় ফুটে উঠেছে। কনিষ্ঠ পুত্র নবীন তার মাকে বলে, সে কোনোভাবেই তাঁকে মরতে দেবে না। এ কথার উত্তরে কাঙ্গালিনী বলেন :

> ওরে হতভাগা ছেলে। তোরই জন্য মরতে পারি না। যে দিন সিংহাসনচ্যুত হইলাম, যে দিন রাজরানীর পদ হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম সেই দিন মরিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তোরা অসহায় শিশু ছিলি বলিয়া মরি নাই। তোমাদের এই অবস্থায় ফেলিয়া মরিতেও কষ্ট হয়। নচেৎ মরণে ভয় করি না,- এমন ঘৃণিত জীবন বহন করা অপেক্ষা শতবার মৃত্যু শ্রেয়ঃ।[১]

রূপকথার বিভিন্ন স্থানে কাঙ্গালিনীর পুত্র ধীমান, নিন্দুক, লায়েক, দর্পানন্দ, প্রবীণ, নবীন আর দুই মেয়ে, শ্রীমতী ও সুমতি ইত্যাদি নাম দেখা যায়। মেয়েদের প্রতি অনাদর অবহেলা করার জন্য মা কাঙ্গালিনী শাপগ্রস্ত হয়েছেন, মেয়ে শ্রীমতী তা জেনেও মায়ের সুস্থতার জন্য ভাইদের সঙ্গে রাজার দ্বারে ভিক্ষা করতে যেতেও প্রস্তুত বলে জানান।

এদিকে কৈলাস পর্বতে গিয়ে মুক্তিফল না পাবার ব্যর্থতায় প্রবীণ,নিন্দুক হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তারপরও তারা বোনদের কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। মায়েকে ‘মুক্তিফল’ এনে দেয়ার আশ্বাস প্রদানকারী নবীন, ভাই ধীমান, তাদের বোন শ্রীমতী ও সুমতিসহ আবার কৈলাস পর্বতে যাত্রা শুরু করে। রূপকথাধর্মী এই গল্পের শেষে শ্রীমতী ও কাঙ্গালিনীর এই কথাগুলির মাধ্যমে শেষ হয় :

> শ্রীমতী। আমি এই চুল খুলিলাম,-আমরা সকলে জননীকে মুক্তিফল আনিয়া দিতে না পারা পর্যন্ত আমি আর চুল বাঁধিব না! হে প্রভু পরমেশ্বর! সহায় হও!

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

কাঙ্গালিনী। এ কি দেখি আমার কোমলাঙ্গী পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থে,- সাংসারিক ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্য্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবতঃ আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী প্রভাত হইবে!-এতদিনে হয়তো আমার সন্তান-সন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে।-আশা মায়াবিনি।[১]

এই রূপকথার মাধ্যমে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পুত্র-কন্যার প্রতি মা-বাবার সমদৃষ্টি দেওয়ার গুরুত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭, জানুয়ারি ১৯২১) কাজী ইমদাদুল হকের পাঁচ পৃষ্ঠার মজার ছোটগল্প 'অদ্ভুত চা-খোর' প্রকাশিত হয়। অবিভক্ত বঙ্গের শিয়ালদা স্টেশন থেকে খুলনাগামী ট্রেনের এক যাত্রীর চা পান করা নিয়ে গল্পটি লিখিত হয়েছে।জরুরি কাজে লেখকের খুলনা যাবার দরকার হলো। স্টেশনে এসে দেখেন প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অবস্থান করা বগির দরজায় কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একটা লোক ব্যাগ হাতে করে উঠতে যাচ্ছে আর পুলিশ তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। তারপরও সে ট্রেনে উঠে পড়ে। লোকটি কথককে জানায়

তাড়াতাড়ি আসার কারণে শিয়ালদা স্টেশন থেকে সে চা খেয়ে আসতে পারেনি। এদিকের কোনো স্টেশনে চাওয়া পাওয়া যাবে কিনা, তাই সে লেখকের কাছে জানতে চাই। শোবার জায়গাটা বেদখল হয়ে গেল দেখে লেখক লোকটার উপর চটেছিলেন। বিরক্তির সঙ্গে 'কি জানি মশাই, আমি জানিনা', তাই বললেন। লোকটি তখন নিজেই চায়ের খবর জিজ্ঞাসা করে নেবেন, তাই বললেন। কিন্তু লোকটি স্থির হয়ে বসতে পারে না। কেবল উসখুস করতে থাকলেন। আর চা খেতে না পেরে তার ভিতর অস্থিরতা শুরু হলো। তিনি বিকালবেলা এক কাপ চা খেয়েছিলেন আর খেতে পারেন নি। এরপর পরবর্তী গোরাবাজার স্টেশনে চা ওয়ালাকে ডেকেও তিনি চা পেলেন না, তখন পাগলের মত বলেন, 'আমার কি হবে মশাই'। ট্রেন আবারও ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি বসতে পারছিলেন না, কেবল ছটফট করছিলেন আর আবোল-তাবোল বলছিলেন। এরপর দুতিনটা স্টেশন পার হওয়ার পরে ট্রেন বনগাঁ স্টেশনে এল। এই স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুম থাকায় এখানে চা পাওয়ার আশায় তিনি নেমে গেলেন।ট্রেনের যাত্রীদের সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। রিফ্রেশমেন্ট রুমের কাছে গিয়ে বাটলারকে এক পেয়ালা চা দিতে পারেন কিনা জানতে চাইলেন। গরম পানি নেই বলে এখন চা হবে না, এই কথাটি সে 'হুজুরকে' জানিয়ে দেয়। লোকটা একেবারে হতাশ হয়ে "কি গেরো, কি গেরো, একটু চা পাওয়া গেল না! কি হবে, কোথায় পাই একটু চা! উঃ একটু চা!" এই বলতে লাগলেন।

এবার লোকটি নিজে পানি সংগ্রহ করে চা বানানোর চিন্তা করলেন। ট্রেন থেকে এর জন্য একটি 'ঘটি' সংগ্রহ করলেন বটে, কিন্তু তাতে পানি ছিল না। স্টেশনে একটা লোক বালতিতে করে পানি নিয়ে যাচ্ছিল,তার ডাক শুনে সে দৌড়ে এলো, তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে দরজা বন্ধ করে লোকটা স্বস্তির সঙ্গে বলল,যাক একটু জল পাওয়া গেছে। এখন এটিকে একটু গরম করার কথা বললেন। এবার কি দিয়ে গরম করবেন তাই ভাবতে ভাবতে কিছু টুকরো কাগজ সংগ্রহ করলেন। এবার

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

কাগজে আগুন ধরানোর জন্য দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার করতে গিয়ে ট্রেনের এক যাত্রীর প্রতিবাদের মুখে যেভাবে পড়লেন, তা এই :

> সামনের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এখন গাড়ির ভিতর আগুন ধরিয়ে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিন আর কি! কাগজ ফাগজ জ্বালা হবে না মশাই- এ কি খেলা পেয়েছেন? এখনই এলার্ম সিগন্যাল ধ'রে টান দেবো কিন্তু.......
>
> আপনার চা এর জন্য কি আমরা প্রাণ দেবো ।[১]

লোকটি জল, কাগজ, দেয়াশলাই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও চা বানাতে পারলেন না, এই আফসোস করছিলেন। এরপর তিনি যে কাণ্ডটি করলেন,তাই দিয়ে গল্পের শেষ হয়েছে :

> তখন লোকটা একটুখানি বসে কি ভাবলে। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাগটা খুলে এক মুটো চা বার করে মুখে ফেলে দিল, আর ঘটিটে তুলে ঢক ঢক করে মুখে জল ঢেলে কাঁচা চা গুলো গিলে ফেল্লে। তারপর আরো খানিকটে জল খেয়ে, খুব একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "আহ!প্রাণটা ত বাঁচান চাই মশাই!"[২]

লোকটির এরকম চা-পাতি খাওয়ার কাণ্ড দেখে লেখকসহ যাত্রীরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন। ভ্রমণপথের যাত্রীরা যে বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তারই একটি খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার। তাঁর এই 'অদ্ভুত চা-খোর' গল্পের ভিতরে রেলের পরিবেশ ও কথোপকথনের বর্ণনায় তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে গল্পটি সত্যিই মনোহর এবং আকর্ষণীয় হয়েছে।

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭, অক্টোবর ১৯২০) মোহম্মদ হোসেনের লিখিত আট পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'ভ্রান্তি' প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রথমে আমরা দেখি, অসময়ে অকালে ফাতেমা স্বামীর সোহাগ, পাড়া-প্রতিবেশীর সাদর সম্ভাষণ ও ভালোবাসা এবং সমস্ত ছোট বড় বাঁধন ছিন্ন করে পরপারে চলে যায়। তার স্বামী তার ছয় বছরের কন্যা রওসনারার দিকে চেয়ে নতুন করে স্বস্তি ফিরে পেতে চান। সন্তান প্রেমে তিনি তার কন্যাকে চিরাচরিত ডাক'মা' বলে সম্বোধন করে চুমু দিয়ে বুকে আগলে ধরেন।

এই চিত্রের পাশে আরেকটি চিত্র ছিল সৈয়দ আলীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর কষ্টে জীবন যাপন করা। মৃত্যুর সময় সৈয়দ আলী এমন কিছু রেখে যেতে পারেননি, যা দিয়ে বিধবার সংসার সচ্ছল ভাবে চলে যেতে পারে। তার নয় বছর বয়সী কন্যার নাম ছিল আমিনা। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমিনার মা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে লেখক আমাদের সামনে সমাজের খানিকটা চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে নিম্নবিত্ত সমাজের কন্যাদায়গ্রস্থ বিধবা নারীরা কেমন অবস্থার মধ্যে পতিত হন। গল্পে বিধবা নারীর মনের কথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> বিধবার অর্থ নাই, তাই তাঁর চিন্তারও বিরাম নাই, চোখে ঘুম নাই, মনে শান্তি নাই, দেহে বল নাই। তার চিন্তা কেবল,কেমন করে তাঁর স্নেহের কন্যা আমিনাকে সৎপাত্রে অর্পণ করবেন। তাঁর আপন বলতে কেউ নাই, দিন দুনিয়ার সবই আঁধার।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৫, এপ্রিল ১৯১৮) তালেব উদ্দীন আহমদ, বি এ-এর ১৯ পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'যক্ষের ধন' প্রকাশিত হয়। গল্পটিকে কাসেম নামের এক ব্যক্তির কৃপণতার চিত্র গল্পকারের সূনিপুণ হাতে তুলে ধরা হয়েছে। জিনিসপত্র ব্যবহারেও যার সুক্ষ্ণ হিসাবের চিত্র গল্পটির একটা প্রধান উপজীব্য। অর্থ জানিয়ে রাখা তার চরম ও পরম নেশা, তা এই গল্পমধ্যে আমরা দেখতে পাই। সংসারে তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিলনা, দুই মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বড় মেয়ের নাম মতিজান হওয়ার কারণেতার স্ত্রীকে গ্রামের লোকেরা 'মতির মা' বলে ডাকত। স্ত্রীর অলংকার, পিতলের মতো দামি জিনিসপত্র বিক্রি করে কাসেম টাকা নিজের কাছে গচ্ছিত রাখত। টাকায় দুই আনা হিসেবে সুদে খাটাত তার অর্থ। এ বিষয় গল্পকার সুদ গ্রহণের ব্যাপারে কাসেমের অদ্ভুত যুক্তি তুলে ধরেছেন :

> যে দিন সে শুনিয়াছে মৌলভী সাহেবেরা সুদখোরের বাড়ীতে আহার করেন না, সেইদিন হইতে সে আরও দুই পয়সা বাড়াইয়া দশ পয়সা হিসাবে সুদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ পরান্নভোজী মৌলভীর দলকে শিক্ষা দেওয়া সে একটা অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিত। কত কষ্টে সে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সেই অর্থে এই সকল অকর্মণ্ড লোককে প্রতিপালন করা সে একটা মস্ত অধর্ম বলিয়া মনে করিত।[১]

পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত হুক্কা, মাদুর, ছাতা ইত্যাদি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার ও তা সংরক্ষণে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। ছাতা বিনষ্ট হলে তার ছেড়া কাপড়ের টুকরো কাঁথায় ব্যবহারের জন্য সে স্ত্রীকে রীতিমত আদেশ করত। এগুলিকে সযত্নে রাখা লক্ষীতূল্য মনে করত কাসেম আর ফেলে দেয়াকে সে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে মনে করত।

এদিকে কাসেমের বাড়িতে নিত্য আসা যাওয়ার সুবাদে প্রতিবেশী কালার মা খবর দেয়, কাসেম বিয়ে করতে যাচ্ছে পাশের গ্রামের জহুর পরামানিকের মেয়ে সেতিকে। সেতিকে দস্যি মেয়ে বলে অভিহিতি করলো কালার মা। তার মুখে সব সময় কথার খই ফোটে। ঝগড়ার চোটে ভূত পালায়, স্বামীর কান ধরে তুলবে নাক ধরে বসাবে। তাই প্রথম স্ত্রীকেও কঠোর হওয়ার কথা বলে কালার মা। এই 'শুভ সংবাদে' কাসেমের স্ত্রীও রান্না বান্নাও আর করলো না। কাসেমের বুঝতে বাকি রইলো না, কালার মা'র সুবাদে তার স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ের কথা জেনে গিয়েছে। কালার মার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> কালার মা ও অঞ্চলের দৈনিক সংবাদপত্রের স্বরূপ। প্রত্যহ নূতন নূতন সংবাদ লইয়া কালার মা বাহির হইয়া পড়ে এবং সেগুলি যথাযথ স্থানে প্রদান করিয়া সন্ধ্যার সময় পুরস্কার স্বরূপ একদিনের আহারের সংস্থান করিয়া সে বাড়ী আসে। সুতরাং কাসেম বুঝিল যে তাহার স্ত্রী সমস্তই শুনিয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে থালা বাসন কিছু না থাকায় সে স্ত্রীর রোগের পরিমাণ ঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারিল না। তবে ভোরে উঠিয়া সে স্ত্রীকে যেরূপ জোরে জোরে সম্মার্জ্জনী চালনা করিতে দেখিল। তাহাতে সে মনে করিয়া লইল যে নিশ্চয় আজা তাহার শরীরে কোনও দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে।[২]

শেষ পর্যন্ত পুত্র কামনায় সেতির সঙ্গে কাসেমের বিয়ে হয়ে গেল। কালুর মার মুখে সতীনের কলহপটুতার সংবাদ পেয়ে মতির মা সেদিন থেকে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবেই দুই সতীনের লড়াই শুরু হলো মতির মা ও সেতির মধ্যে। নতুন বউ নানা যুক্তিতে পান-সুপারির ব্যবস্থার নামে কাসেমের টাকা আত্মসাৎ করতে থাকলো, আবার মতির মা ধান টাউলের বস্তা থেকে নিজ উপার্জনের

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

চেষ্টায় রত হলো। মতির মা প্রায়ই বলত, "যার দৌলতে দালান কোটা, তারি পিঠে আজ খ্যাংরা ঝাঁটা।" দুই স্ত্রীর এরকম সমরাঙ্গনে যুদ্ধাবস্থায় কাসেমের নীরব হয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ দুজনের কাউকে কিছু বললেই কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। যে আশায় সে বিয়ে করেছিল, তা তো হলোই না আর সম্ভাবনাও ছিল না।

গল্পে এরপর কাসেম যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী তার সম্পত্তি পাবার জন্য নানা অপচেষ্টা করে। কাসেম মনে করে টাকা বুকে করে সে মরবে, তবু তাদের নামে সে কোনো মতেই সম্পত্তি লিখে দেবে না। এরকম অবস্থায় একদিন ভোরে কাসেম তার অসুস্থ শরীর নিয়ে পার্শবর্তী জমিদার বাড়িতে উপস্থিত হলো। ভূসম্পত্তি যা ছিল সব বিক্রি করে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিয়ে সন্ধ্যার সময় প্রচুর টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। যার নিকট যা পাওনা ছিল, তা সে পূর্বেই আদায় করে নিয়েছিল। এরপর অবিশ্বাস্যভাবে যা করলো, তা গল্পকারের বর্ণনায় :

> রাত্রিতে যখন সকলে গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট তখন কাসেম শয্যা ত্যাগ করিয়া একখানি কোদালি ও একটি পুটলী হস্তে বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। একটি বৃক্ষের নিম্নে খুঁড়িয়া কি যেন একটা বাহির করিয়া লইল। তারপর বাড়ীর সন্নিকটে যেখানে তাহার পিতার কবর ছিল। সেইখানে আসিয়া কবর হইতে একটু দূরে একটি গভীর গর্ত্ত খনন করিল এবংতাহাতে কি যেন রাখিয়া আবার বেশ করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া গৃহে ফিরিল। আজ তাহার প্রাণে অনেক শান্তি।[১]

এর পরের দিন হতেই কাসেমের শারীরিক অবস্থা অধিকতর খারাপ হতে লাগল। প্রত্যেকদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল এবং চারদিন আগে সে তার নাতিটিকে ডেকে মৃদু স্বরে বলে যায় যে, তাকে যেন তার পিতার নিকট সমাহিত করা হয়।তবে তার অর্জিত অর্থ সে কোথায় রেখে গেল তার সন্ধান কেউ পেল না। এই নিয়ে গ্রামবাসীর ভিতর রীতিমত তোলপাড় চলছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পর কাসেমের নাতিটিও যক্ষারোগে মারা গেল। তখন পাড়ার সকলের ভিতর ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হলো, এক ব্যক্তি আগে বলেছিল, কাসেমের রোগটা যক্ষা রোগ। যক্ষের দৃষ্টি না হলে ঐ রোগ হয় না। এই ব্যক্তি কাসেমের নাতনি মরে যাবার পর বললো, দেখলে তো ও টাকা যে নেবে তারই ঐ রকম ব্যারাম হবে। বখিলের ধন যক্ষের হেকমতে যায়। গল্পকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চমৎকার ও কৌতুহল উদ্দীপক বর্ণনার মাধ্যমে গল্পটি পরিবেশন করেছেন। গল্পের শেষ পর্যন্ত যে নাটকীয়তা ছিল, তা খুবই বিরল ঘটনা।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কাজী আবদুল ওদুদের 'ভুল' নামক একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দাদি ও নাতির আদর, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসার চিরাচরিত একটি মনোজ্ঞ চিত্র ফুটে উঠেছে। দশ বছরের শিশু নাতির আবদার ও মান-অভিমানের আলেখ্য চিত্রণে গল্পকার সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৬ অক্টোবর ১৯১৯) কাজী আবদুল ওদুদের এগারো পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'মা' প্রকাশিত হয়।

'মা' গল্পের গল্পটির কথক চরিত্রটিকে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। গল্পে এক বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধা মহিলাটি কথক ছেলেটিকে তার নিজের সন্তানের

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩২-৩৩

মত মনে করে। বৃদ্ধার অকালপ্রয়াত পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের শূন্যতা ও হাহাকারকে ধারন করে আরেক মায়ের সন্তানকে পুত্রসম ভালোবাসার মধ্যে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।আবার সেই সন্তানতুল্য ছেলের মাতৃভক্তির স্বরূপও গল্পটিতে ফুটে উঠেছে।

গল্পের শেষাংশে আমরা দেখি, কথক Convocation এর আগের দিন থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ছুটাছুটি করে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল। তাই বিকেল বেলায় বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তাকে দেখে আসতে পারেনি। অতঃপর Gown, Hood পরে লাট সাহেবের হাতের দেয়া ডিগ্রির সনদ নিয়ে নানান রকম ফটোসেশন করে কথক বাসায় ফিরে আসে। রামবাবুর বাসা থেকে খেয়ে আসা বৃদ্ধা কথকের বাসার লোকের অনুরোধে ভালো ঠান্ডা জায়গায় বসে ছিল। কথক আসার পর যেন নতুন এক ছেলেকে বৃদ্ধা দেখল। অন্যান্য দিন যেমন তার কাঁপানো হাতখানি দিয়ে তার শরীরে বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ জানায়, সেদিন কথকের এত জমকালো পোশাকের উপর সেভাবে আশীর্বাদ বুলিয়ে দিতে বৃদ্ধার কেমন যেন সংকোচ হচ্ছিল। বৃদ্ধার থেকে নেয়া আশীর্বাদ ও কথকের প্রাপ্ত ডিগ্রির তুলনা দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে এভাবে :

> আমি তার ঈষৎ উদ্যত আশীর্বাদের হস্ত আজকে আমার দেহের উপর বুলিয়ে নেবার জন্য নিজের শরীরটাকে আরো নত করে তার কাছে নিয়ে নিলাম ।
>
> তার কৃশ কম্পিত মলিন হাতের স্পর্শে আর লাটসাহেবের হাতের ডিগ্রির সনদে যে কত তফাৎ তা আমিই আজ প্রাণভরে উপলব্ধি করলাম।[১]

মাতৃস্নেহের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় সম্মানের অনেক কিছুই যে তুচ্ছ মনে হয়, গল্পের এখানে সেটি ফুটে উঠেছে।মা' গল্পটি সত্যিই কাজী আবদুল ওদুদের একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি মাত্র ছোটগল্প 'লক্ষীছাড়া' প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার এই গল্পটির লেখক খাজা, যেটি ইবরাহীম খাঁর ছদ্মনাম। গল্পটিতে আশরাফ নামে এক সাহসী যুবকের ঘটনাবহুল কাহিনি এক হিন্দু সহপাঠীর কথনে বর্ণিত হয়েছে। নোয়াখালীর নিভৃত পল্লি থেকে কথকের বাবার চাকরির সুবাদে হুগলিতে এসে সে যে মহাবিপদে পড়েছিল, তার বিস্তারিত ঘটনা বলেছেন। তার বাবা মুন্সেফ হলেও ছেলে খেলার সাথীদের বা বয়োবৃদ্ধদের আদরসে পায়নি এবং কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে জানতেও চায়নি। আরেকটি সমস্যা, শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাকে বিপত্তিতে পড়তে হতো। গল্পকার এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> প্রথম দিন দেখিলাম-যেই একটি কথা বলি, অমনি সকলি আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে দই একটা দুষ্ট ছেলে মুচকি হাসিয়া নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলে "বাঙ্গাল"। দ্বিতীয় দিনে আমার কথা লইয়া প্রকাশ্যভাবে ভেৎচান আরম্ভ হইল।[২]

ক্লাসে ক্যাপ্টেন বা সর্দার বলতে যা বোঝায়, আশরাফ ছিল তাই। শিক্ষক না থাকলে শ্রেণিকক্ষে আশরাফের কথাই একপ্রকার আইন। ক্লাসের ঘন্টা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন কথক 'বাঙ্গাল' ছেলেটির নিকট এসে যথারীতি ভ্যাংচানো শুরু করেলো, আর দুএকজন আশরাফের নিকট এসে বললো, আশরাফ ভাই, ও একবারে 'বুনো বাঙ্গাল' একটা কথাও ঠিক করে বলতে পারে না, এসব নিয়ে খুব মজা হবে। আশরাফ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

২ ইবরাহীম খাঁ, 'লক্ষীছাড়া', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১০৬

এসে ছেলেটির কাছে তার বাড়ি কোথায় এবং অন্যান্য কিছু কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কোনো উত্তর না দিয়ে 'হু' জবাব দিলো।

এরপর আস্তে আস্তে নবীন নামক কথকের ভাষার পরিবর্তন এবং তার জীবনে আশরাফের প্রভাব ও বন্ধুত্ব গল্পকার খাজা তাঁর সুনিপুণ লিখনশৈলীতে চিত্রিত করেছেন। কথক 'বাঙ্গাল' ভাষা ছেড়ে ওদের "ঘাটচোরের দেশের ভাষা" আয়ত্ত করে ফেলল। ছাত্রদের সঙ্গেও মিশতেও আর বেশি সময় লাগল না। পড়াশোনায়ও তার বেশ নাম হলো। আশরাফ শুধু শ্রেণির নয়, সমস্ত স্কুলের যেন সর্দার ছিল। ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও নবীনের পরিবারের সঙ্গে আশরাফের ঘনিষ্টতা জন্মেছিল, তা সাহিত্য-পত্রিকায় গল্পকারের বর্ণনায় :

> মা আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার বিষয় জানিতেন। তিনি আশরাফেকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং মাঝে মাঝে খাওয়াইতেন। আমরা হিন্দু বলিয়া আশরাফ কখনও আমাদের আদর উপেক্ষা করে নাই। টাউনের সকলে তাহাকে চিনিত, বয়োবৃদ্ধরা কেহ আদর করিয়া কেহ বা তিরষ্কার করিয়া তাহাকে কখনও কখনও লক্ষীছাড়া বলিয়াডাকিত, অনেক কাজ সে এমন করিয়া ফেলিত যে সকলে তাহাকে পাগল না বলিয়া পারিত না।[১]

স্কুল কর্তৃপক্ষের নানা অন্যায় আচরণ ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় আশরাফকে তারা নানা উপায়ে নিগৃহীত করতে শুরু করে। একপর্যায়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায্য সিদ্ধান্তে মার খেয়ে সে স্কুল ও হুগলি ত্যাগ করে চলে যায় এবং পরিশেষে অসহায় মানুষের সেবা-শুশ্রূষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে।প্রকৃতপক্ষে একটি দুরন্ত প্রকৃতির চরিত্র কীভাবে আবাল্য ন্যায় ও সাহসের ধ্বজা তুলে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে গেছে এবং আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মানবধর্মে জীবনোৎসর্গ করেছে তা এ-গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৬, এপ্রিল ১৯১৯) ইবরাহীম খাঁ লিখিত ছোটগল্প 'নূতন বাড়ী' প্রকাশিত হয়। মূল চরিত্র আবদুল্লা, তার স্ত্রী রহিমা ও সাত বছরের মেয়ে হালিমাকে নিয়ে গল্পটির কাহিনি গড়ে উঠেছে। এছাড়া বৃদ্ধ কাদের শেখ, এরফান মোল্লা, আবদুল্লার মহাজন কানাই সরকার, মহুরি হরিনাথ, হিরালাল সিং, গোলাদার কালাচাঁদ, মেঘা মণ্ডল, খেতু মাঝি, আবদুল্লার মামাতো ভাই ও প্রতিবেশী গফুর ইত্যাদি চরিত্র গল্পটির মধ্যে ছোট-বড় বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে অবস্থান করেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র আবদুল্লাহর সহজ-সরল জীবনযাপন, জন্মভিটের প্রতি আকর্ষণ এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে সুখের আস্বাদন, অবশেষে ইহলীলা সংবরণ প্রভৃতি গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৮) ইবরাহীম খাঁ লিখিত ছয় পৃষ্ঠার ছোটগল্প 'গোলাবজাদী' প্রকাশিত হয়। এটি একটি 'তুর্কী উপকথা'অবলম্বনে রচিত।প্রকৃতপক্ষে সমকালীন মানুষদের নৈতিক শিক্ষাদানই এ-গল্পের প্রতিপাদ্য।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৬, জানুয়ারি ১৯২০) আবুল হুসেনের লিখিত ছোটগল্প 'রূদ্ধব্যথা' প্রকাশিত হয়। এই ছোটগল্পে বাঙালি মুসলমান সমাজের মেয়েদের শিক্ষা, বিবাহ, সংসার, সন্তান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৎকালীন গ্রাম ও শহরের মুসলিম মানসের আভ্যন্তরচালচিত্রাঙ্কনে গল্পটি সমৃদ্ধ।মুসলমানদের দৃষ্টিকটু ধর্মপ্রীতি, নীতিহীন আচরণ, নারীর প্রতি বৈষম্য, বহুবিবাহপ্রথা প্রভৃতি গল্পটিতে প্রদর্শিত হয়েছে। তখনো যে মুসলিম সমাজ

---

১ প্রাগুক্ত

চিন্তা-চেতনায় সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেনি, গোঁড়ামিই যে তাদের চলার পথের সম্বল, তা গল্পকার অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন এ-গল্পে।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৯৩-১৯৭৪) ছোটগল্প 'ব্যর্থ' প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে উত্তম পুরুষের জবানিতে তার দুই স্ত্রীর সঙ্গে জীবনযাপন, দাম্পত্যজীবনের টানাপড়েন, প্রভৃতি শিল্পরূপ পেয়েছে। সেকালে হিন্দু সমাজে বিবাহরীতি, একাধিক বিবাহ এবং এতৎসংক্রান্ত সমাজদৃষ্টি প্রভৃতি গল্পকার চমৎকারভাবে গল্পটিতে পরিবেশন করেছেন। শান্তি ও চারুকে কেন্দ্র করে গল্পকথকের যে দ্বন্দ্বময় জীবনযাত্রা তা তার উচ্চারিত ভাষ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ-গল্পে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> আমার অন্তরে দেবাসুরসমরের সূচনা হল। আমার মনের ভিতর ত্যাগের দেবতা ছিলেন, আবার ভোগের দানবও ছিল। ত্যাগী যিনি তার একান্ত মনের এই ছিল কামনা-শান্তির জীবন সুখ শান্তিময় হোক। আর যে ভোগী, সে শান্তিকেই কামনা করছিল। শান্তির কল্যাণ কামনা আর তাকে পাবার বাসনা-আমার এ দুটি লক্ষ্যই হয় ত আমি একই শরে করে ভেদ করতে পারতুম, যদি চারু সে ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হয়ে না থাকত।[১]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৫,জুলাই১৯১৯) দেওয়ান শামসউদ্দীন আহমদের ছোটগল্প 'জুতা ও আমি' নামে একটিরম্যগল্প প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি ও জুতার কাল্পনিক কথোপকথনেরমধ্য দিয়ে মানুষের কর্তব্য এবং স্রষ্টার প্রতি আত্মনিবেদনের কথাই বিজ্ঞাপিত হয়েছে। দিয়ে গল্পটি

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭) রেয়াজউদ্দীন আহমদের ক্ষুদ্র ঘটনা নির্ভর একটি সামাজিক নকশা প্রকাশিত হয়। এর নাম ছিল 'চিত্র-বিচিত্র'। নয়টি কাহিনির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই নকশাধর্মী রচনাটি একান্তই শিক্ষাপ্রদ। লেখক অত্যন্ত রসসমৃদ্ধ করে এই কাহিনিগুলোর মাধ্যমে সমাজে বিরাজিত নানা বৈষম্যের চিত্র প্রকটিত করে পাঠকদের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন গড়ে তোলার প্রতি অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। সার্বিক বিচারে এটি একটি শিক্ষাপ্রদ রচনা।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) 'ক্ষুদে পিপড়ের আত্ম কাহিনী' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। আবি আবদুল্লা রচিত এই রচনায় পিপড়ার জীবনকাহিনি তার জবানিতে অত্যন্ত রঙ্গরসাত্মক করে বর্ণনা করেছেন গল্পকার। গল্পটি মনোময়, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদায়ক। পাঠককে নিছক আনন্দদানই ছিল গল্পকারের উদ্দেশ্য।

১৩২৬ সালে লুৎফর রহমানের 'পথহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'পথহারা' সম্বন্ধে মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন ১৩২৬ ভাদ্রের 'সওগাতে', মুজফ্‌ফর আহমদ 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে ১৩২৮ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়, বিজয়কেতন সেনগুপ্ত ১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারতে' এবং শাহাদাৎ হোসেন ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'সাধনা'য় বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন।[২] *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র একই সংখ্যায় 'পলায়ন' নামে চারপৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ছোটগল্পও প্রকাশিত হয়।

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
২ আবদুল কাদির সম্পাদিত, *লুৎফর রহমান রচনাবলি ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. [সাত]

‘পথহারা’ উপন্যাসে কয়েকটি প্লট একত্রে মিশ্রিত হয়েছে। এর প্রধান চরিত্র আবদার রহমান ও সরযুর জীবনকাহিনির পাশাপাশি এবাদ-মিস ফিনি-এরশাদ-কুলসুম চরিত্র নিয়ে আরেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাহিনী রচিত হয়েছে। বাংলাভাষায় প্রথম শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে এর স্থান হতে পারে – একথা সাহিত্য-পত্রিকার একজন সমালোচকের মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়। সমালোচকের মন্তব্য লক্ষণীয় :

> এই লেখকের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার হৃদয় যেমন উদার সৎসাহসও তেমন খুব বেশী – এত বেশী যে শরৎ বাবুর সহিত তুলনা করা চলে। অত্যাচার পীড়িত নারীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অপরিসীম। ‘পথহারা’র পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাঁহার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও সৎ সাহস উছলিয়া পড়িয়াছে এবং উহার সর্ব্বত্রই একটা বিশ্বজনীন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১]

তবে উপন্যাসে স্ববিরোধিতাও কম নেই। ব্রাহ্মদিগকে ‘অবাধে মুসলমান বলা যাইতে পারে’ এবং ‘বাঙ্গালী হিন্দু খাঁটি মুসলমান’-এ সকল উক্তিতে লুৎফর রহমানের মনের ঔদার্য যেমন উদ্ভাসিত তেমনি ‘মুসলমানরা জাপানীদের হাতে খায় না, তাতে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়, অতএব ক্ষমা করবেন’ এসব উক্তিতে লেখকের স্ববিরোধিতার দিকটি ফুটে ওঠে। জাপানের বাঙালি ছাত্র এবাদকে জাপ-কুমারী ফিনি যখন খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন তখন এবাদের মুখনিঃসৃত এই উক্তি মর্মপীড়া দেয় পাঠককে। এতৎপ্রসঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় :

> অন্য কোন সৎকীর্ণ মতের মুসলমান এমন কথা লিখিলে আমার কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু আমি আমি ভাবিয়া পাইনা যে লুৎফর রহমান সাহেবের ন্যায় লোক কি করিয়া এমন কথা লিখিলেন, বিশেষতঃ তাহার গ্রন্থোক্ত মি. এবাদও যখন ইতোপূর্বে কোনো গোড়ামীর পরিচয় দেন নাই। ইসলাম হইতেছে বিশ্বজনীন ধর্ম, সুতরাং জাপানীর (বৌদ্ধের?) ছোয়া লাগিলে উহা নষ্ট হইবে কেন? জাপানীরা তো বিশ্বের বাহিরে নয়।[২]

অবশ্য লেখকের এরকম অবস্থান অন্য কোনো লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর একাধিক রচনায় আত্মোন্নয়ন, চিত্তশুদ্ধির কথা অত্যন্ত জীবনধর্মী করে বয়ান করেছেন।[৩]

সাহিত্য পত্রিকায় ‘কথিকা’ লিখেছিলেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। ব্যঙ্গাত্মক গল্প, ও নাট্যগুণান্বিত এই কথিকাগুলোতে বংশ গৌরবের বৃথা আস্ফালন, পাপ-পুণ্য ও ধর্ম সম্পর্কে গতানুগতিকতা বর্জিত নিজস্ব ভাবনাগুলোকে ছোট্ট পরিসরে (এক আধ পৃষ্ঠায়) উপস্থাপন করেছেন লেখক, যা সাহিত্যরসে সমুজ্জ্বল। তিনি ‘উড়োপাখী’ ছদ্মনামে ‘বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা’য় ‘মেঘলা আকাশ’ শীর্ষক পাঁচটি কথিকা লিখেছিলেন। পরে স্বনামে প্রথম বর্ষের ‘সওগাতে’ ১৩২৫-২৬ এ আবারও তিন-চারটি কথিকা লেখেন। ‘সওগাতে’র ২য় ও ৩য় বর্ষের সংখ্যাগুলোকে আরো ৩৪টি, ১৩২৯ আশ্বিনের ‘সহচরে’ ৯টি এবং ১৩৩২ সনের ভাদ্রের ‘সাম্যবাদী’তে ২টি সহ মোট ৮৪টি কথিকা লেখেন। এতদ্বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের একটি ছোট্ট কথিকা উল্লেখযোগ্য :

---

১ দ্বৈপায়ন, ‘পথহারা: সমালোচনা’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৭৬

২ ‘পথহারা : সমালোচনা’, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

৩ লুৎফর রহমানের আত্মোন্নয়নমূলক প্রবন্ধ সংকলন ‘উচ্চ জীবন’ ১৩২৯-২৯ সালে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাতে চারটি প্রবন্ধ ছিল। তন্মধ্যে ‘নারীপুরুষ’ ১৩২৮ শ্রাবণে, ‘শহর ও পল্লী জীবন’ ১৩২৮ কার্তিকে, ‘জীবনের ব্যবহার’ ১৩২৮ মাঘে ও ‘পিতৃ-মাতৃ ভক্তি’ ১৩২৯ বৈশাখে পত্রস্থ হয়।

> এক বৃদ্ধার ঘর হইতে চোরে তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রভাতে সে আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছিল। একজন প্রতিবেশী আসিয়া থানায় সংবাদ দিতে বলিল। বৃদ্ধা বলিল 'চোরের হাতে ধন সম্পত্তি দিয়াছি, দারোগার হাতে প্রাণ দিতে চাহি না।'[১]

'পলায়ন', 'রানী হেলেনের গল্প', 'অহিংসা', 'রাজপথ', 'অমাবস্যা,' 'রোমান্টিক বিয়ে' 'ফিরে যাও ফিরে যাও' শীর্ষক ৭টি ছোটগল্পও তিনি লিখেছিলেন। যেগুলো 'সাধনা' 'জয়তী,' 'মোহাম্মদী' ও '*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*'য় প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটি গল্প যথাক্রমে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র চতুর্থ বর্ষ প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌সহ আবদুল কাদির, শাহাদাৎ হোসেন, ডা. লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর), শেখ ফজলল করিম, গোলাম মোস্তফা, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলবালা ঘোষজায়া, বন্দে আলী মিয়া, কাদের নওয়াজ, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, একলিমুর রেজা, চণ্ডীচরণ মিত্র, কেশবলাল বসু, চণ্ডীদাস গুপ্ত, কাজী হবিবর রহমান, ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা, বিমলেন্দ্র মিত্র, শেখ হবিবর রহমান, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ মল্লিক, গোপেন্দ্রনাথ সরকার, সাজেদা খাতুন, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক, এ লোহানী, সরসীবালা বসু সহ আরো অনেক কবির কবিতা প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ১৩২৬, জুলাই ১৯১৯) কাজী নজরুল ইসলামের ১০৭ চরণবিশিষ্ট কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি ১৯৩৯ সালে কবির 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী, করাচি – এই পরিচয়ে কবিতাটি সাহিত্য-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। রানীগঞ্জের (শিয়ারসোল) একটি ঘটনা অবলম্বনে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বলে কবি জানান। কথিত এক ফকির বা দরবেশের কাহিনি নিয়ে কবিতাটিতে অলৌকিক আখ্যান বিধৃত হয়েছে। রানীগঞ্জের অর্জুনপট্টির তিন দিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে 'ত্রিবেণীর ত্রিধারার' মতো এক হয়ে মিশেছে যেখানে, সেই স্থানের ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

তেপথার সেই 'দেখাশুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হোত বেথা;
বাবাজিদের 'ধূনি' দেওয়ার তাপে
না সে তপের প্রতাপে-
গাছে মোটেই ছিল না ক পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা[২]

কবিতাটি প্রথমে 'ক্ষমা' নামে তিনি প্রেরণ করেন সাহিত্য-পত্রিকায়। কিন্তু শিরোনাম বদলে কবিতাটির নাম রাখা হয় 'মুক্তি', যা পত্রিকার ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত-লেখকদের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠায়

---

১ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'মেঘলা আকাশ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৭১
২ কাজী নজরুল ইসলাম, 'মুক্তি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ১৫৫

আত্মপ্রকাশ করে। কবিতাটি নতুন লেখকদের জন্য নির্ধাইরত'কোরক' শীর্ষক পৃষ্ঠায় না ছাপানোয় নজরুল খুশি হন। তিনি পত্রিকার সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দেন। মুদ্রিত কবিতার পাদটীকায় মন্তব্য ছিল, 'ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিত-রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত বাঁধা ফকিরের মাজার শরীফ' বলিয়া কথিত হয়। কবিতাটিতে শৈল্পিক দুর্বলতা যাই থাকুক, প্রথম প্রকাশিত বলে এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এ কবিতায় নজরুলের গল্প-রস সৃষ্টির কুশলতার ইঙ্গিতও লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় নজরুলের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়, 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ও 'মানিনী বধূর প্রতি'। প্রথম কবিতাটি ফারসি কবি হাফিজের "জুলফে আ-শফতা ও খুয়ে কর্দা ও খান্দানে লবে মস্ত" শীর্ষক গজলের ভাবাবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে কবিতার পাদটীকায় উল্লেখিত আছে। এখানে কবি নজরুল ইসলাম নিজের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করেছেন 'নজর'। কবিতার প্রথম চার লাইন ছিল:

কোঁকড়া অলক মুর্চ্ছে ছিল ঘাম-ভেজা লাল গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল সে,যায় যেন যায় ঝাউ এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তা'র আকুল-অধর পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে
শরাব্-ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নাম্‌লে সে।[১]

প্রিয়া গভীর রাতে রাতে কম্পিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে, শুরুতে কবিতায় আমরা তাই দেখি। তারপর যখন সে বেদনার প্রেম সংগীত গাইল তখন তাঁর চোখ দুটি অশ্রুজলে সিক্ত হচ্ছিল, আর বুকের বসন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শঙ্কাকুল মনে প্রিয়া কানের কাছে মুখ নিয়ে কবিকে 'শ্রান্ত আশেক' তথা 'ক্লান্ত প্রেমিক' সম্বোধন করে সে ঘুমিয়েছে কিনা জানতে চায়। তারপর কবি বলেন:

ঘুমিয়ে সে যে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে
নিঝুম ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে-বাক্ মিলে!
কম্পিত বাম্ হাতটি ঘুরে স্পন্দিত মোর বুকটিতে
শরাব নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক এক নিতে।[২]

কবি এই শরাবকে 'বেহেশতী না আঙ্গুর গলা রস' ছিল তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগই পাননি।কারণ,তার কাছে শুধু পান করার জন্য মিনতি আসছিল। প্রিয়া মুক্তকেশে নিশুতি রাতে শরাব নিয়ে ধীরে ধীরে কবির বুকে হাত রাখল। তারপর কবির অনুভূতি কেমন হলো তা নিম্নোক্ত কবিতাংশে লক্ষণীয়:

প্রেমের এমন বেদিল কাফের কে আছে গো
শরাব-সোরাই এক নিমেষে পান করে না নি:শেষে ?
ওগো কাজী, খামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে ?
ভাঙতে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া, লাখো তৌবাকে ![৩]

---

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৩ প্রাগুক্ত

কবির মনে হয়েছে,পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কেউ আছে কিনা সন্দেহ, যে প্রিয়ার দেওয়া শরাব এক নিমিষে পান করে না।

নজরুলের আরেকটি কবিতা 'মানিনী বধূর প্রতি' সাহিত্য-পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটিও একটি মনোময় রোমান্টিক কবিতা।

উপর্যুক্ত তিনটি কবিতা ছাড়াও *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* নজরুলের আরো বারোটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় গান (হিন্দুস্থানি-কাজরী), চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বিজয়-গান' (কবিতা), 'মা' (কিশোর কবিতা),তৃতীয় সংখ্যায় 'খোকার বুদ্ধি' (কিশোর-কবিতা), 'মরণ-বরণ' (কবিতা), চতুর্থ সংখ্যায় 'বন্দী-বন্দনা' (কবিতা), 'নিশীথ- প্রীতম' (কবিতা), 'খোকার গপপ বলা' (কিশোর কবিতা), 'চিঠি' (কিশোর কবিতা), 'তোদের কবি দা' নামে) প্রকাশিত হয়। পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় 'দোদুল-দুল' কবিতা,ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'দিওয়ান-ই-হাফিজ'-এর একাংশ এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 'জাত-জালিয়াৎ' কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পরপরই ছাপা হয় বিমলেন্দু মিত্রের কবিতা 'বিন্দু ও সিন্ধু'। বিশাল সিন্ধুকে ক্ষুদ্র বিন্দুর অবহেলা এবং অবশেষে উভয়ের মিলনই প্রদর্শিত হয়েছে এ-কবিতায়। কবিতাটির প্রথম চার লাইন হলো এই:

বিন্দু বলে ও হে সিন্ধু! তুমি মোর জ্ঞাতি
সিন্ধু বলে ওরে মূর্খ! তুই ক্ষুদ্র অতি।
বিন্দু বলে ক্ষুদ্র আমি, নাহি তাতে ক্ষতি,
ক্ষুদ্রই মহৎ হয় পাইলে সংহতি।[১]

অবশেষে বিন্দু ও সিন্ধুর কথোপকথন, কবির ভাষায় নিম্নরূপ:

আমি তুচ্ছ অতিকায় ক্ষুদ্র বারিবিন্দু,
একই হইলে পারি রচিবারে সিন্ধু।
সিন্ধু বলে,তব বাক্যে ঘুচিয়াছে ভ্রম,
হৃদে ধরি এস ভাই! করি আলিঙ্গন।
এত শুনি বারি বিন্দু পতিত হইল
বিশাল বারিধিবক্ষে আশ্রয় লভিল।[২]

যে সিন্ধু, বিন্দুকে তাচ্ছিল্য করছিল, সেই সিন্ধুই বিন্দুর অকাট্য যুক্তিকে বাস্তবতার নিরিখে সমর্থন করলো। সিন্ধুর মধ্যেই যে বিন্দুর অবস্থান, এটা উভয়ের সমর্থন ও স্বীকৃতিতে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো, এটাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন।

একই সংখ্যার 'কোরক' পাতায় তিনজন নতুন কবির তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আফাজউদ্দীন আহমেদের 'পাপিয়া', এ হাদীর 'ব্যাপ্তী', মোহাম্মদ আবুল হাশেমের 'বিপুল বিজয়' ।কেশবলাল বসুর 'আলী বখশ'এবং একলিমুর রেজা'র 'স্বরূপ'নামক কবিতাও মুদ্রিত হয় এই সংখ্যায়। 'স্বরূপ'কবিতাটি একটি বাস্তব

---

১ বিমলেন্দু মিত্র, 'বিন্দু ও সিন্ধু', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ১৫৮
২ প্রাগুক্ত

ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই কবির পুরো নাম দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (১৮৮৯- ১৯৬৪), তিনি সম্পর্কে হাসন রাজার (১৮৫৪-১৯২২) পুত্র ছিলেন। সাহিত্য-পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশকালে সালে হাসন রাজাও জীবিত ছিলেন (১৯১৯)। কবিতায় কবি স্রষ্টার অস্তিত্ব, লীলা ও মায়ার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার মধ্যে তাঁর স্বরূপকে খুঁজে ফিরেছেন। চমৎকার ইঙ্গিতধর্মী ব্যঞ্জনায় সুফিদর্শনের আলোকপাত ঘটেছে এই কবিতায়।

সাহিত্য-পত্রিকার একই সংখ্যায় জীবেন্দ্রকুমার দত্তের (১৮৮৩-১৯২১) ১৪ চরণের কবিতা 'প্রাণের গান'প্রকাশিত হয়। কবিতার প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি ছিল এরকম:

মহাকাশ সিন্ধু তটে আমার প্রাণের গান
উপল খণ্ডের যেন ছড়ায়ে যেতেছি আজ;
তেমনি সে সঙ্গী হারা, তেমতি সে হতমান
জগৎ চাহেনি তারে, সাধেনি সে কোন কাজ![১]

কবির মতে, জীবন থেকে মরণ অবধি জীবনের যে যাত্রা তা যেন ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মতো। এ উপলখণ্ড কোন সে জন আবার কুড়িয়ে নেবে, কবি তা জানেন না। তাই বলেছেন:

জানি না – জানি না কভু আমি কারো হৃদি-মন
মোর এ উপলপাশে যাবে কি বা হারাইয়া[২]

সাহিত্য-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় জীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'অশুভ-মঙ্গল' নামে ১৬ চরণের আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে কবি বলেছেন, যারা তাকে ঘৃণা করে বা দুঃখ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদরেই তিনি তাঁর অন্তরের নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনে নেয়ার আশা করেন। কবি বলেন :

যদি কেহ আমায় করে ঘৃণা
যদি কেহ নাই বা ভালবাসে
তারে নাথ, আরও বেশী করে
সদা আমি জড়াই হৃদি পাশে।...
যদি কেহ আমায় দেয় দুখ,
আশা-সাধ সকলি দলে পায়,
তারে প্রভু, আপন বেশী জানি
শুভ তার সকল মন চায়।[৩]

অশুভের জন্য শুভ কামনার কথা কবি কবিতাটিতে এভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতার পর কবির আর কোনো কবিতা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায় না। কবির মৃত্যুর (১২ মার্চ ১৯২১ খ্রি.) অনেক পরে (জানুয়ারি ১৯২২ খ্রি.) সাহিত্য-পত্রিকায়

---

১ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, 'প্রাণের গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
২ প্রাগুক্ত
৩ জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, 'অশুভ-মঙ্গল', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮, পৃ. ২৪৫

‘অশুভ-মঙ্গল’ কবিতাটি ছাপা হয়। ধরে নেয়া যায়, এটিই কবির শেষ কবিতা। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের প্রয়াণ সংবাদ সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। সাহিত্য-পত্রিকায় লেখা হয় :

> বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুকবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তিনি ‘অঞ্জলি’, ‘তপোবল’, ‘ধ্যানলোক’ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অনেক বাঙ্গালা সাময়িকপত্রেই তিনি কবিতা লিখতেন। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকারও তিনি অন্যতম লেখক ছিলেন। কবির জীবন সন্ধ্যা যে ঘনাইয়া আসিয়াছে বোধ হয় তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমরা পরলোগত কবির আত্মার কল্যাণ কামনা করি।[১]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ‘কোরক’ পাতায় মোহাম্মদ হোসায়ন নামে একজন নবীন কবির দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। একটি বিশ পঙ্‌ক্তির কবিতা ‘শরতে উষা’, আরেকটি ৩৬ চরণের কবিতা ‘নদী পারে’। প্রথমটি প্রেমের কবিতা, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি ও নিসর্গপ্রেমের কবিতা।

‘বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা’রতৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় গোলাম মোস্তফার একটি এবং ওয়ারিশউদ্দিনের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ওয়ারিশউদ্দিনের কবিতাটি পত্রিকাটির প্রথম দিকে ছাপা হয়। তাঁর ১৬ চরণের কবিতাটির নাম ছিল ‘যাচঞা’। কবিতাটির প্রথম স্তবকে ভ্রমণপিয়াসী কবির ভ্রমণের অভ্যাসের কথা বলেছেন এভাবে:

কহিতে প্রাণের ভাষা
মিটাতে মনের আশা
আজিও জীবন শেষে
ভ্রমিতেছি দেশে দেশে।[২]

অজানাকে জানার বাসনা থেকে কবির মন ভ্রমণের জন্য ছুটে চলে। মনের ইচ্ছে শুধু নতুনের পানে যাওয়া, এতে কিছু জানা বা বোঝা গেল কিনা তা নিয়ে তার চিন্তার বালাই নেই। যে দেশে বা যে স্থানে তিনি যাননি, সেখানে যাওয়ার বাসনাতে তার মন গুমরে মরে। তিনি এসব উল্লেখ করে এই কবিতার শেষে বলেছেন:

আজি এ দিনের শেষে
নিয়ে যাও তব দেশে![৩]

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘কোরক’ পাতায় প্রকাশিত আফাজউদ্দীন আহমেদের ‘পাপিয়া’ কবিতাটি একটি স্মৃতি ভারাতুর প্রেমের কবিতা। পাখির মধুর তান কবিমনকে এক স্মৃতিময় অতীতে নিয়ে যায়, কত কথাই না তানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে – কবিতার মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। শোক, বিচ্ছেদ, প্রেম, করুণা সবকিছুই পাখির সুরে ধ্বনিত হতে পারে, পুরো পৃথিবীটাই যেন পাখির তানে চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাখির সুরে মানবমনে কী অবস্থা হয় তা বলতে গিয়ে কবি বলেন:

পরানের গুপ্ত ব্যথা সবে উঠে ভাসিয়া
নিরাশার হাহুতাশ

---

১ সমিতি সংবাদ, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ.৯৬
২ ওয়ারিশউদ্দিন, ‘যাচঞা’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭, এপ্রিল ১৯২০ পৃ.৩৫
৩ ‘যাচঞা’, প্রাগুক্ত

বিচ্ছেদের তপ্তশ্বাস,
কোমল হৃদয়,পাখি ফেলে যেন ঢাকিয়া
জানিনা কাহার স্বর,
কি জানি কি মোহকর;
তোর এই ডাকে পাখি রহিয়াছে মিশিয়া[১]

পাখির এই মধুমাখা স্বরে কবির হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে, তার প্রাণ যেন উড়ে যেতে চায়। তাই কবি বলেছেন:

আপনা অস্তিত্ব পাখী! গিয়াছি রে ভুলিয়া
তোর এই ললিত তানে,
সুপ্ত প্রকৃতির প্রাণে,
কি এক প্রেমের গাঁথা উঠে যেন ধ্বনিয়া
জাগিয়া সে মধুস্বরে
প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে
আকুল মরমে পানে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া[২]

তাইতো পাখির গানে পৃথিবী যেন 'পাগল পারা' হয়ে যায়, আর পাখিও তার সুর ছড়িয়ে দূর আকাশে মিলিয়ে যায়। কবির মনের ব্যথা ব্যক্ত করে পাখি কোথায় মিলিয়ে গেল, কবি তা জানেন না। তাই তো শেষে কবি বলেছেন :

'কতদিন উড়ি' তথা যাবি তুই পাপিয়া,
জানি না বসতি তার
কোন অনন্তের পার
তবু রইলাম পাখী! আশা পথ চাহিয়া[৩]

পরবর্তী কবিতা নবীন কবি এ.হাদী লিখিত ৮৪ চরণের দীর্ঘ 'ব্যাপ্তী' কবিতায় ছোট ছোট পঙ্‌ক্তিতে রাতের আঁধারে চাঁদের মহিমার পাশাপাশি আকাশ, বিজলি, বর্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে ।

‘বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা’র তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭ অক্টোবর ১৯২০) আবদুল মজিদের লিখিত চুয়াল্লিশ চরণের কবিতা প্রকাশিত হয়। এটি একটি প্রেমের কবিতা। একই বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭, অক্টোবর ১৯২০) গোপেন্দ্রনাথ সরকারের ‘সার্থক’ নামক ৩৮ চরণের কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে কবির ঈশ্বরপ্রেমের রূপ সংগীতের মূর্ছনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭, অক্টোবর ১৯২০) ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ইনসাফ’ নামক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৫২ চরণের কবিতাটি দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (রাজত্বকাল ১২৬৬-১২৮৬ খ্রি.) কর্তৃক একটি আলোচিত বিচার অবলম্বনে লিখিত, যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

১ আফাজউদ্দীন আহমদ, ‘পাপিয়া’, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ.,১৭১
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে কাব্যবিচারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কবিতা-অনুবাদ-ব্যঙ্গ কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতি সাহিত্য আঙ্গিকে তাঁর বিচরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) সহ তাঁর অন্তত এগারোটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'রএই লেখক মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁকে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) স্মরণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'সত্যেন্দ্র স্মরণে'(১৬ চরণ) এবং গোলাম মোস্তফার 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি' (৪২ চরণ) কবিতা প্রকাশিত হয় সাহিত্য-পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কবিতার প্রথম দুচরণ ছিল এরকম :

ফুরিয়ে গেল 'ফুলের ফসল' 'কুহু-কেকা'র সরস গান
ভর আসরে নিঝুম হল 'বেণু-বীণা'র মধুর তান।[১]

গোলাম মোস্তফা লিখিত দীর্ঘ কবিতার দুটি চরণ ছিল নিম্নরূপ :

ওরে সত্যের প্রাণ, সত্যের গান, মৃত্যুর নয় বশ
কভু সত্যের, ক্ষয় সম্ভব নয়, অব্যয় তার যশ।[২]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা এই দুটি কবিতার মাধ্যমে এভাবে ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭ অক্টোবর ১৯২০) হরিপ্রসাদ মল্লিকের বাষট্টি চরণের কবিতা 'মিলন সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। এটি মূলত ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনায় নিবেদিত দেশপ্রেমমূলক কবিতা।নবীন-প্রবীণের সম্মিলিত প্রেমানন্দ-সংগীতের মাধ্যমে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের ফলে এ দেশ আবার সোনার দেশ হয়ে উঠবে, এ আশাবাদের কথাই বলেছেন কবি।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মোট ১০টি কবিতা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম দিকে ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় সম্পাদক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের 'আবাহন' নামক কবিতাটি মুদ্রিত হয়। কবিতাটির পাদটীকায় লেখা ছিল – 'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত'। কবিতাটি ছিল মোট ৩৬ চরণের। কবিতাটির প্রথম ও শেষ চার চরণ ছিল একই :

ঝঙ্কৃত করি নিখিল বিশ্ব
এসেছে অভয়-বাণী
"করিও না ভয় হবে হবে জয়
বাঁধহ হৃদয়খানি।"[৩]

কবিতার ২৫তম চরণ থেকে ৩২তম চরণে কবি বলেছেন :

যত্ন করিয়া এ শুভ লগ্নে
ভক্ত তোমরা আজ

---

১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'সত্যেন্দ্র স্মরণে', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৭২
২ গোলাম মোস্তফা, 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ১৭২
৩ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, 'আহবান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৩

বঙ্গ ভাষার অঙ্গ ভরিয়া

পুরাও নূতন সাজ।

দীপ্ত রাগেতে উঠুক হাসিয়া

মোদের কুটীরখানি

নবীণ চেতনা নবীণ প্রেরনা

চিত্তে সবার আনি।"[১]

সবাইকে বাংলাভাষাকে হৃদয়ে ধারণ করে তারুণ্যের জায়গানে মুখরিত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন কবি।

একই সংখ্যার প্রায় শেষের দিকে 'কোরক' পাতায় প্রকাশিত সাতজন নতুন কবির একজন মোহাম্মদ ইয়াসিন এর 'আহবান' নামক ৩২ চরণবিশিষ্ট কবিতার প্রকাশিত হয়। সেখানে এই তরুণ কবি ৫ম থেকে ৮ম চরণে বলেছেন :

এই বেলা নাও, পাল তুলে দাও

বিশ্বদেবকে স্মরি

ভয় কিরে ভাই থাকতে এমন

সুদক্ষ কাণ্ডারী।[২]

তিনি এই কবিতায় কাউকে চুপ করে না থেকে কর্মক্ষেত্রের আহবানে জীবন-তরী ভাসিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারুণ্যের উদ্ভাসিত হয়ে সামনে এগোলে নতুন আলোর রেখা দেখা যাবে বলে কবি বিশ্বাস করেন। তিনি আরো লিখেছেন :

দূরে যাবে সকল বিপদ

আসবে শুভ দিন;

জয় রাগিনীর সুরে মোদের

বাজবে প্রাণের বীণ।[৩]

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার যাত্রারম্ভে কবিতা দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (ডাক্তার) কবিতা 'মহাসঙ্কল্প' সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ৩৪ চরণের এই কবিতাটি পাঠ করলে তাঁর আত্মোন্নয়নমূলক প্রবন্ধের কথা মনে হয়। কবি হিসেবে তখন নতুন ছিলেন বলে তিনি সাহিত্য-পত্রিকার 'কোরক' পাতায় স্থান পেয়েছিলেন। তিনি এই কবিতায় পৃথিবীর কোটি বছরের ইতিহাসে মানুষের একটি বড় অংশ যে অন্ধকারে পড়ে আছে, তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'কোরক' পাতায় নবীন লেখক মোহাম্মদ খেরাজ আলীর 'ভরতপক্ষী ও পেচক' নামে ৩৬ চরণের উপমাধর্মী একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় পাখি ও পেঁচার বৈশিষ্ট্যের

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

২ প্রাগুক্ত

৩ মোহাম্মদ ইয়াসিন, 'আহবান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৬৯

তুলনা দেখানো হয়েছে উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। পাখি বহুদূর আকাশে উড়ে বেড়াতে পছন্দ করে, অপরদিকে পেঁচা অন্ধকারে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কবিতার প্রথম চার লাইন ছিল এরকম :

ভরত কহে, ও ভাই পেচক
দাড়াঁও হেথায় একটি বার
নয়ন ভরে লওহে দেখে
ঊষার আলোক চমৎকার
পেচক কহে, ও ভাই ভরত
অমন আমায় কইবে না
আধার আমার বড়ই প্রিয়
আলোক চোখে সইবে না।[১]

কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই পাখি' (শাহাজাদপুর ১৯ আষাঢ় ১২৯৯-এ লিখিত) কবিতাটির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যেখানে বনের পাখি ও খাঁচার পাখির কথোপকথনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সীমা ও অসীমার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দুই পাখি' কবিতায় লিখেছেন :

বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই
বনেতে যাই খোঁজে মিলে।
খাঁচার পাখি বলে 'বনের পাখি, আয়
খাচায় থাকি নিরিবিলে'।[২]

সাহিত্য-পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় মোহাম্মদ আলীর 'সুখ' নামক ৪৮ চরণের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, সেখানে সুখ নিয়ে মানুষের কাতরতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের মনের সুখ নানান কারণে বিলীন হয়ে যায়, বিশেষ করে যখন সে অন্যের সুখ দেখে তখন নিজেকে অসুখী ভাবতে শুরু করে। কবি বলেছেন, এমন ভাবা মোটেও ঠিক নয়, মানুষের অন্তরে সুখের আবাস। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বা সচ্ছলতা দিয়ে সবসময় সুখ নিরূপণ করা যায় না। তিনি কবিতায় বলেছেন :

আজ যিনি রাজা মহারাজা রূপে
সমাসীন রাজাসনে,
হয়তো বা কাল বিধির বিধানে
ফিরিবে সে বনে বনে।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত
২ মোহাম্মদ খেরাজ আলী, 'ভরতপক্ষী ও পেঁচক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৬৭
৩ মোহাম্মদ আলী, 'সুখ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ. ৬৯

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতাটি ছিল কবি গোলাম মোস্তফার 'বউ কথা কও'। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত ৯৮ চরণের কবিতাটি ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। গাছের ডালে বসে পাখির বৈচিত্র্যময় ডাককে উপজীব্য করে কবিতাটি লিখিত হয়েছে। প্রকৃতি-প্রেম, মানব-প্রেম ও বিরহের চিত্র কবিতাটিতে চমৎকার শব্দচয়নের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কবি গোলাম মোস্তফা। তিনি লিখেছেন :

এমনি নীরব মৌন নিশিতে গাহিতেছে পাখী গান,
ওকি গান ? না, না গাহে কি সে গান ভেঙ্গে গেছে যার প্রাণ ?
ও যে বিরহীর বিরহ কাহিনী ও যে প্রেমিকের ভাষা,
ও যে মালিনীর মান ভাঙ্গিবার বিপুল উদ্যম আশায়।
ও যে বিরহের অবসান পরে মিলনের মহা তৃষা,
পায়ে সেধে সেধে কথা কহাবারি অদম্য আকুল নেশা[১]

*বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় কবি গোলাম মোস্তফার 'প্রথম চিঠি' নামক ৩২চরণের একটি রোমান্টিক কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রিয়তমার হাতে লেখা প্রথম চিঠি পাওয়ার অনুভূতি বর্ণনা করে লিখিত কবিতাটিতে কবিমনের রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটির প্রথম চার চরণ এরূপ:

আজকে আমার শুভ প্রভাত বলতে হবে-হবেই ওগো,
প্রিয়ার হাতের প্রথম চিঠি পাওয়া গেছে আজকে যে গো !
আঁকা বাঁকা লাইনগুলি, অক্ষরগুলিকেউবা হেলা,
চুপ্‌সে গেছে কালির ফোঁটা চিঠির চিকন লেখার বেলা।[২]

কমবয়সী নববধূর (এখনকার বিবেচনায় অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী বলা যায়) লেখা চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি। তাই তার হাতের লেখা পছন্দসই না হতে পারে, তবে এই চিঠিতে আন্তরিকতার ঘাটতি না থাকার জন্য তাকে বরং প্রশংসাই করতে হয়। লেখার লাইনগুলি বাঁকা সোজা যেমনই হোক, দাড়ি-কমা নাইবা থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না বলে কবির অভিমত। তাইতো কবি বলেছেন:

নাইবা থাকুক কমা দাঁড়ি, নাইবা থাকুক শুদ্ধ ভাষা
নাইবা থাকুক নবীন প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর প্রেম পিয়াসা;
আছে ত রে এই চিঠিতে বদ্ধ পড়ে স্নিগ্ধ মধুর
হস্ত পরা কণক-চুড়ের ছোট ছোট ঠুনঠুনি সুর!
আছে ত রে এই চিঠিতে প্রতি শব্দের কোণে কোণে
কোমল হাতের কোমল পরশ লুকিয়ে অতি সংগোপনে[৩]

---

১ গোলাম মোস্তফা, 'বউ কথা কও', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ৯৩
২ গোলাম মোস্তফা, 'প্রথম চিঠি', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ২৭৪
৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫

অতি সাধারণ ও সাবধানী হাতের লেখা এই চিঠিতে'ত্রস্ত আঁখির' চাহনির বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি হঠাৎ ভয়ে থমকে যাওয়ার মতো ব্যাপারও লক্ষ্য করা গেছে বলে কবি মনে করেন। তবে সবকিছুর উপরে চিঠিটির মধ্যে এক নবতর সাহিত্যমূল্যের সন্ধান কবি পেয়ে যান। তাইতো কবি বলেন:

আছে ত রে ইহার মাঝে সাহিত্যের এক নতুন সৃষ্টি,
ভাব নাহিক- তবু যে গো ভাষায় করে সুধা- বৃষ্টি
এ সাহিত্যের ভাবে- ভাষায় হা'র মেনে যায় সকল কবি-
চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, বঙ্কিম- দ্বিজেন- ভারত- রবি!
এর সাহিত্য পড়তে গেলে চোখের নাহি পলক পড়ে,-
তাদের লেখা পড়তে গেলে এমনভাবে কজন পড়ে![১]

তাই কবি বলেছেন, এ চিঠির মধ্যে কী নেই, প্রিয়ার হাতের নতুন চিঠির মধ্যে যা কিছু থাকা প্রয়োজন, সবই এর মধ্যে আছে। কবি শেষ করেছেন এই বলে :

দূরাগত প্রিয়ার হাতের প্রথম লেখা পত্রখানি!
চুমু দিয়ে তোমায় আমি বক্ষ'পরি নিলাম টানি[২]

এই প্রিয়া হতে পারে কবির প্রথম প্রেমিকা, আবার হতে পারে সদ্য বিবাহিতা অথচ আপাতত দূরে অবস্থান করা 'বালিকা-বধূ',যাকে হয়তো এখনো স্বামীর ঘরে তোলা হয়নি। তাই মাঝের সময়ের প্রেম ও বিরহের যে মিশ্র অনুভূতি, তাই ব্যক্ত হয়েছে 'প্রথম চিঠি' নামক মধুর এই কবিতায়।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কবি গোলাম মোস্তফার 'ভূষণ' নামক ২০ পঙ্‌ক্তির একটি প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়। ভূষণ বা গহনা মহিলাদের সৌন্দর্য ও অভিজাত্য বর্ধনে ব্যবহৃত হয়। প্রিয়ার এই ভূষণ কেন পরতে হবে এবং কেনই বা পরা উচিত নয় হবে না, তাই কবিতার মধ্যে সুন্দর শব্দলালিত্যে কবি উচ্চারণ করেছেন। তিনি তাঁর রানিকে ভূষণের মাধ্যমে শোভা বৃদ্ধি করাকে অর্থহীন বলেছেন। কারণ তাঁর প্রিয়া এমনিতেই 'মনোলোভা ও চারুবদনে'র অধিকারী, স্রষ্টা তার প্রিয়াকে সুন্দর করে তৈরি করেছেন, তা জানাতে গিয়ে কবি লেখেন:

যত কোমল, যত মধুর, যত সরস তাহাই দিয়ে,
গড়লো বিধি তোমার তনু নিখুঁৎ ভাবে ওগো প্রিয়ে
ভূষণ পড়ার সার্থকতা
তবে বল রইল কথা?[৩]

কবির দৃষ্টিতে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী নারীকে অলংকার সজ্জিত করলে তা বৃদ্ধি তো হয়ই না বরং তাতে তার স্রষ্টাপ্রদত্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যম্লান হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন:

অঙ্গে যাদের ত্রুটি আছে, ভূষণ শুধু তারাই পরে,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
২ প্রাগুক্ত
৩ গোলাম মোস্তফা, 'ভূষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭ , পৃ. ৫৭

তারাই শুধু ভুষণ পরে সুশ্রী হতে চেষ্টা করে;[১]

তাই স্বাভাবিকভাবে যাদের কোনো সৌন্দর্য নেই, তারা আপন শোভায় এমনিতেই বিকশিত হয়। 'নিজেই যে জন ভূষণ' তাকে আবার ভূষণ দিয়ে মোড়ানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না বলে কবি মনে করেন। তাইতো 'অন্তরের ভূষণ' হয়ে থাকার দিকে প্রিয়তমার চেষ্টার কথা বলেছেন কবি গোলাম মোস্তফা। তিনি পরিশেষে বলেছেন:

ভূষণ নিজে পরার চেয়ে
সুখ যে বেশী ভূষণ হয়ে,
ভূষণ হয়ে শোভা কর আমার দেহ, আমার হিয়ে[২]

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ১৩২৭, জুলাই ১৯২০) কবি গোলাম মোস্তফার পঞ্চাশ চরণের কবিতা 'মরুর মহিমা' প্রকাশিত হয়। পাঁচ চরণের প্রতি স্তবকের মোট দশটি স্তবকে কবিতাটি আরবের অতীতকে অবলম্বন করে লিখিত হয়েছে। কবি তৎকালীন আরবের ভূমিকে শ্যামল-উর্বর হিসেবেকবিতায় তুলে ধরেছেন। আরবের মরুভূমি রুদ্র-তরুহীন বলে স্বীকার করেও তিনি বলেছেন :

অনুর্ব্বর নহ তুমি আমাদের চক্ষে
কত মণি ফলে তব মরুময় বক্ষে
হে আমার মহীয়সী আরবের ধূলিরাশি!- মহাজন-পূত-পাদ-পরশা।[৩]

আরবের ভূমিকে যিনি রূক্ষ, শুষ্ক বলবেন, তাকে কবি 'চির-অন্ধ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কবির বর্ণনায়, আরবের ভূমি ফুল-ফলে, বর্ণ-গন্ধে সুশোভিত, সুন্দর, মনোরম ও উজ্জ্বল হয়ে পৃথিবীর বুকে ধরা দিয়েছে। মহানবীর আগমনে ও তার আদর্শ-আলোকে শামিল হয়েছে তাঁর শত শত অনুসারী। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অন্ধকার ভেদ করে আলোর রেখা। সারা পৃথিবী তার জয়গানে যেমন মুখরিত হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে তাঁর অসংখ্য শিষ্য। কবির ভাষায় :

ঘন-তমসাবৃত চেতনা-চিরবর্জ্জিত, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত বিশ্ব,
তার মাঝে তুমি একা ফুটাইলে আলো-রেখা, খুলে দিলে প্রভাতের দৃশ্য ![৪]

মানুষের জয়গানের মন্ত্র নবী সারাবিশ্বে তাঁর নিজস্ব সুর ও বাণীর মাধ্যমে ছড়িয়েছেন। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি-ভালোবাসা এবং নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকারকে তিনি মান্যতা দিয়েছেন, কবিতায় তাই যথার্থভাবে উল্লেখিত হয়েছে:

এতদিন যে জীবন ছিল মহা ব্যর্থ
তুমি দিলে সে জীবনে অভিনব অর্থ,-
রমণীরে দিলে তুমি পুরুষের অধিকার, করি তার সমশ্রেণীভুক্ত।[৫]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২ প্রাগুক্ত
৩ গোলাম মোস্তফা, 'মরুর মহিমা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ৮১
৪ প্রাগুক্ত
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

শুধু তাই নয়, মহানবীর আহবানে সবার সম্মিলিত যাত্রায় জ্ঞান-গরিমায় বিশ্ব জয় করে যেন নবীন বসন্ত-বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চিন্তার ভিতর অভিনবত্ব এনে দিল নতুন নতুন আবিষ্কার। আরব থেকে সারা বিশ্বে এই শক্তি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যার অবদান সব থেকে বেশি, তিনি মহানবী (সা.)। কবি এই কবিতায় তাই-ই বলতে চেয়েছেন। কবির ভাষায়:

তব ধূলি যেই দেশে পড়িয়াছে- সেই দেশে আসিয়াছে নবীন- বসন্ত!
ধূলি মাঝে লুকাইত আছে কত শক্তি
স্পেন হতে কুমারিকা তার অভিব্যক্তি,
দেশে দেশে নন্দিত-বন্দিত ওগো মরু, চুম্বিত তব পদ-প্রান্ত![১]

তাই কবি বলেছেন, নবীজির তুলনীয় কেউ নেই, শিল্প ও স্বর্গ যেন এই পৃথিবীতে তাঁর গুণে হাজির হয়েছে। তাঁর কারণেই আল্লাহর বাণী ও ধর্মের মূল কথা মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে।তাইতো মানব মিলনের পথিকৃৎ তিনি। তাঁর প্রচেষ্টায় আরব ভূমি পৃথিবীতে আর তাচ্ছিল্যের স্থানে রইলো না। নবীর আগমনে ও চেষ্টায় তার মহিমাও ক্রমশ বেড়েছে। স্রষ্টাও এই ভূমিকে তার করুণা দিয়ে জ্ঞান ও শস্যের অন্যতম উৎস ভূমি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কবি শেষে তাই বলেছেন:

জগতের কাছে তুমি মরু নহ-উৎস
তুমি দেছ জগতেরে নানা-জ্ঞান শস্য[২]

নবীর সময়ে আরবের তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা কবি নিজের দৃষ্টিতে কবিতার ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবিতাটির পাদটীকায় কবি লিখেছেন :

> কবিতাটি পড়িবার সময় আরবের অতীত যুগকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। নতুবা বর্তমানে আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে আরবের এমন কিছু দেখি না যদ্দ্বারা গৌরব করিতে পারি। কবিতাটি পড়িলে মনে হয়,- যেন আরব সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই, চাহিবার নাই; কিন্তু বস্তুত যে তাহা নহে- আরবের আধুনিক অবস্থা তাহার সাক্ষ্য দিবে।-লেখক।[৩]

এই কথার ভিতর দিয়েই কবি নিজেই কবিতাটির একপ্রকার সমালোচনা করেছেন, যেটি আরব অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে একসময় নবীজি এবং তৎপরবর্তী শাসকদের মহিমায় আরবের কল্যাণধর্মী প্রভাব সারাবিশ্বে পড়েছিল, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবিতাটি তৎকালীন সময়ের একটি চিত্রও বটে।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘মহাশ্মশান’খ্যাত কবি কায়কোবাদের ‘বিবেক’ নামক বাইশ চরণের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এখানেও কবি ‘পাখি’র রূপকে তাঁর বিবেকের তাড়না উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। ‘কাল পাখি’ কখন কীভাবে কবির মনে এসে ঠাঁই নিল আর তার মতিভ্রম হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কবিতায় সুমধুর ভাষায় তাই ব্যক্ত করেছেন। কবি লিখেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

কোন বনের সে কাল পাখী,

আমার-মনটা হ'রে নিল।

জানিনে সে কখন এসে

'কুহু-কুহু' ডেকেছিল।...

হাতে নিয়ে ফুলের মালা,

কাছে এসে কোন সে বালা,

আমার দিকে চে'য়ে চে'য়ে

কত ডেকেছিল! ...

আমি অবাক হয়ে দেখতে তারে,

পড়ে গেনু কুপের ধারে,

পাখীটি ঘোর ভয় পেয়ে সে

উড়ে চলে গেল !

জানিনে সে কখন এসে

'কুহু-কুহু' ডেকেছিল"[১]

অশুভ আকর্ষণ বা লোভ মানুষকে অনেক সময় ভুল পথে চালিত করে, তখন বিবেক তাকে এক ধাক্কায় হয়তো সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, এখানে কবি তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় মোহাম্মদ ইয়াসিনের 'সদরেরও সদর আছে' নামে ৯৬ চরণের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতেদরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায়ের বিবরণ ফুটে উঠেছে। জমিদারের পেয়াদা করিমের মতো গরিব ব্যক্তির ঘরে খাজনা আদায়ের জন্য হাজির হয়। করিমেরএক বছরের খাজনা বাকি থাকলেও পেয়াদার বিসেবে তা চার বৎসর হয়ে যায়। ঘরে করিমের উপোস ছেলে-মেয়ে রয়েছে, জীবন বাঁচানোই যার দায়, সে খাজনা দেবে কী করে, একথাই সে পেয়াদাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। এসব কথা শুনে পেয়াদা যা বলে তা কবির ভাষায় :

চল শালা তুই কাছারীতে

শুনব না তোর কোন কথা

দিয়ে থাকিস উশুল আছে

জমিদারের পাকা খাতা।

রোজ দিবে না শালা আমার

তোমার আবার খাতিরটা কি ?[২]

করিম এরপর পেয়াদার পিছন পিছন কাছারিতে যায়। নায়েব এসে করিমকে বলে, তার অনেক খাজনা বাকি আছে, খাজনা না দিতে পারলে তাকে ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। করিম উপায়ান্তর না দেখে সদরে জমিদারের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে গিয়ে সে দেখে :

---

১ কায়কোবাদ, 'বিবেক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১৪৫-১৪৬

২ মোহাম্মদ ইয়াসিন, 'সদরেরও সদর আছে', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ১৫৫

রাজার কাছে হল তলব

গেল করিম বড় আশায়।

দেখল গিয়ে নায়েব হাজির

থাকেন তিনি বড় বাসায়।

বিচার কালে আখিঁ ঠেরে

নায়েব যেন বল্লেন কি.

জমিদারের হল গোস্বা

বল্লেন 'এসব বদমাসী[১]

অবশেষে করিমের নামে মামলা হলো। মামলায় ঘর-বাড়ি সব হারালো করিম, জমিদারের লেঠেল বাহিনী সব দখল করে নিল, করিমও গেল জেলে। জেলজীবনের পর তার বাকি জীবন কান্নাকাটি ও নিঃসঙ্গতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হলো। অবশেষে স্রষ্টার কাছে বিচার চেয়ে করিমের যে আকুতি, তা কবির ভাষায়:

ও গো আমার মুনিব মশায়

সদরেরও সদর আছে

সেই কাছারীর হাকিম যিনি

এর বিচার হবে তাঁরই কাছে।[২]

জমিদার কর্তৃক প্রজাদের খাজনার নামে শোষণের চিত্র কবিতাটির ভিতর ফুটে উঠেছে, তা সমকালীন সমাজের একটি চিত্রও বটে।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস খ্যাত কাজী ইমদাদুল হকের 'আবর্জ্জনা' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি শেখ সাদী'র 'রোদ্যাঁ' অবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে উল্লেখিত হয়। পত্রিকার ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় ১৮টি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে পনেরোটি ছিল 'কোরক' পাতায়। নবীন কবিদের ১৫টি কবিতাসহ চণ্ডীচরণ মিত্র, কেশবলাল বসু, কালিদাস রায় প্রমুখ কবির কবিতা পত্রিকার মূল পাতায় ছাপা হয়। কেশবলাল বসুর 'সম্রাট নাসীর' কবিতা 'পাঠান সম্রাট' নাসীর উদ্দীনের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত বলে কবিতার শিরোনামের নীচে উল্লেখিত হয়। প্রজাদের প্রতি সম্রাট নাসীর ও তাঁর স্ত্রীর সহমর্মিতার বার্তা দিয়ে কবিতাটিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি কবিতা 'যোগ্য উপহার' সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্রাট আকবর কর্তৃক সুর সম্রাট তানসেনকে (১৫০৬-১৫১৯) সংগীতের জন্য প্রদত্ত অবলম্বনে কবিতাটি রচিত হয়েছে। ইতিহাসে কথিত আছে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সংগীতের মাধ্যমে আনন্দদানের জন্য একলক্ষ রৌপ্য মুদ্রার 'বাজুবন্দ' উপহার দেন। তানসেন উপহার শিরোধার্য করে সম্রাটকে সালাম জানান। তারপর সম্রাট তানসেনকে বলেন, সংগীতে বিমুগ্ধ হয়ে এর থেকে অধিক মূল্যে এর জন্য কেউ দিতে পারবে না। তানসেন সম্রাটকে প্রত্যুত্তরে বলেন, তাঁর (সম্রাটের) আশীর্বাদ পেলে তিনি এর

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
২ প্রাগুক্ত

চেয়ে বড় উপহার (তানসেন) পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এতে সম্রাটের অসম্ভব বিরক্তি তানসেনের উপর বর্ষিত হয়, সম্রাট তানসেনকে তাঁর এ কথার জন্য হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে এবং নাকে খত দিতে বলেন। এ কথা শুনে তানসেনও ক্ষিপ্ত হয়ে যা বলেন, তা কবির ভাষায়ঃ

'একটিও করিব না' দর্পভরে তানসেন কহে,
বৃশ্চিকদংশনে শত অপমানে সর্ব্ব অঙ্গ দহে!
বাঁধিলাম বাজুবন্দ বাম হস্তে ডান রলো খালি
সালাম সালাম প্রভু। অসহ্য এ গালি।[১]

এভাবে অনেকদিন চলার পর আবার সম্রাটের জীবনের শেষ দিনগুলিতে সংগীতের আসর বসে। কবির ভাষায় :

রাজারাম তানসেনে সমাদরে বরিল সভায়
দীপক মল্লার কাফি সুগায়ক নিত্য নব গায়।
গুণগ্রাহী মহারাজ জরাগ্রস্থ শেষ ক'টা দিন
সঙ্গীতের সুধারসে প্রেমানন্দে করিছে বিলীন।
ললিত যৌবনমধু ভুঞ্জিতেছে পলিত হৃদয়ে
স্বর্গের মন্দারগন্ধ কণ্ঠ্যানিল আনিতেছে বয়ে।
কভু বৃদ্ধ আত্মহারা দরদর ভাসে আঁখিজলে
বক্ষে ধরে মুগ্ধ চিত্তে বাহু পাশে গায়কের গলে।
গড়াইয়া বাজুবন্দ ভেঙে শত স্বর্ণ অলঙ্কার
পরাইল ডান হাতে দুইলক্ষ মুদ্রামূল্য যার।
কুর্ণিশ করিয়া কহে তানসেন, "ধন্য গোলাম !
আজি হতে ডানহাত তোমাকেই করিবে সালাম।[২]

তারপর থেকে ডানহাত দিয়ে কারো জন্য কপালে স্পর্শ করেননি তানসেন। তানসেন দিল্লিতে সম্রাটের দরবারে সম্রাট আকবরের নিকট উপহার হয়ে সম্রাটকে ডানহাত দিয়ে সালাম প্রদান করেন। এরপর কবি এই কথা কটি বলে কবিতাটি শেষ করেন :

চমকিত সভাজন দুই ভুজে করি দৃষ্টিপাত
সিংহাসন ত্যজি ত্বরা মৃদুহাসি কহে দিল্লীনাথ
'ফিরিয়া এসেছ সখা, এস তবে বক্ষে এস ফিরে,
মিলন হউক পুনঃআলিঙ্গনে নয়নের নীরে।[৩]

এভাবে সম্রাট থেকে উপযুক্ত উপহার পেয়ে তানসেন যেমন তৃপ্ত হন, সম্রাটও তেমনি স্বস্তি পান।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার পর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার কবি কালিদাস রায়ের আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইংরেজ কবি রবার্ট বার্নসের (১৭৫৯-১৭৯৬) কবিতা অবলম্বনে 'শক্তি ভিক্ষা' কবিতাটি লেখেন কবি। স্রষ্টার নিকট থেকে দয়া প্রার্থনা এই কবিতার মূল বিষয়। মানবজীবনে দুঃখ-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণার প্রভাব ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া ঘটা সম্ভব নয়। তাই কবি ভগবানের উদ্দেশে বলেছেন :

তুমি দয়াময় পীড়ন করোনা
নিষ্ঠুর হয়ে, জানি গো তাও
মুছাও আমার আঁখির সলিল
অথবা মরণে মুছায়ে দাও।
যদি মোরে প্রভূ দহিতেই হবে
তোমার বিশ্ব শুভের লাগি
বল দাও তবে দৃঢ় কর প্রাণ
সহিতে সকলি শক্তি মাগি।[১]

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭,অক্টোবর ১৯২০) 'তীর ও সঙ্গীত' নামে চব্বিশ চরণের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে তির ও সংগীতের তুলনা করে উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনা নিয়ে কিছু কথামালা উচ্চারিত হয়েছে। ইংরেজ কবি হেনরি লংফেলো (১৮০৭-২৮৮২) থেকে কবিতাটি লেখা হয়েছে, কবিতার শিরোনামের নিচে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৭ অক্টোবর ১৯২০) চার পঙ্‌ক্তির ক্ষুদ্র একটি কবিতা 'ছোট' প্রকাশিত হয়। আমরা জানি, ক্ষুদ্র বৃহতের সঙ্গে মিশে বড় আকার ধারণ করলে সেটি আর ক্ষুদ্র থাকে না। পরমাণু অণুর থেকে ক্ষুদ্র হলেও কত শক্তিশালী, তা তো আমরা উপলব্ধি করি। ফলে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কবি লিখেছেন:

'অণুঅঙ্গ' কহে কাল, 'আমি পূর্ণ তুমি অংশ,
টিকটিক করি সদা ঘোষ, বৃথা নিজ যশঃ।'
'তোমার বুকের মাঝে তোমার সুষশ ঘোষি,
তোমারেই করি পূর্ণ, তোমারি অঙ্গেতে মিশি।'[২]

পূর্ণ-অপূর্ণের এই খেলা কবিতাটির মূল সুর। 'ছোট' নামের কবিতাটি ছোট হলেও বড় ভাবার্থব্যঞ্জক, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার নবীন লেখকের পাতা 'কোরক'-এ সর্বোচ্চ পনেরো জন কবির পনেরোটি কবিতা ছাপা হয়। এই পনেরো জন কবির মধ্যে আবদুল কাদির (এম আবদুল কাদের নামে লিখিত) ও শাহাদাত হোসেন পরবর্তী কালে সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কবি আবদুল কাদিরের

১ কালিদাস রায়, 'শক্তি-ভিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬৬
২ আবি আবদুল্লাহ, 'ছোট', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭, পৃ. ১৮০

লেখা "আদর্শ রমণী" কবিতাটি (৭৪ চরণের) রাবেয়া খাতুন নামেরতাঁর ভ্রাতৃবধূ (ভাবি)-কে নিয়ে রচিত। বাঙালি সমাজের প্রচলিত আদর্শ মহিলা বলতে যা বোঝায়, সব গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর ভ্রাতৃবধূর চরিত্রে। একজন সুখী বাঙালি গৃহবধূর চিত্রই তার ভেতর পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

কবি শাহাদাৎ হোসেনের 'কুণ্ঠিত' নামে ৩৬ চরণের একটি কবিতা সাহিত্য-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। মাতৃপ্রেম ও দেশপ্রেমের সমন্বিত কথকথা কবিতাটির উপজীব্য বিষয়।

সাহিত্যে 'শকুন্তলা' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের নামটি মনে পড়ে যায়। সেই শকুন্তলা ও কবি কালিদাসকে উপজীব্য করে কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) তাঁর 'শকুন্তলা' কবিতাটি লেখেন। ছাপ্পান্ন চরণের এই কবিতাটি 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৯২১,মাঘ ১৩২৭) প্রকাশিত হয়। 'শকুন্তলা' কবিতাটির বর্ণনাশৈলী, শব্দচয়ণ ও বাক্য বিন্যাস পাঠককে যেন কালিদাসের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আধুনিক পাঠকের কাছে প্রাচীন কবি ও তাঁর সৃষ্টির শৈল্পিক উপস্থাপনায় কবি শাহাদাৎ হোসেন নিঃসন্দেহে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'কোরক' পাতায় একজন মহিলা কবি মনজুরন্নেসা বিবির 'বাসনা' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। স্রষ্টার প্রতি কবির ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ফুলের মতো সুবাসিত জীবন ও সুপথে থেকে জীবন অতিবাহিত করার কামনা ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই কবিতায়। কবি লিখেছেন :

আমি চাহি প্রভু মধুর জীবন, ফুল্ল কুসুম পারা,
ফুলের মত বিলাব সুবাস উল্লাস হইয়া হারা!
পরসুখ তরে প্রসূন যথা নীরবে ফুটিয়ে রয়
তোমা তরে যেন ভক্তি- সুবাস মেখে ফুটে এ হৃদয়!
আমি মাগি বিভু তোমার সকাশে এই ক্ষুদ্র বর আজি,
স্থান যেন নাহি পায় এ হৃদয়ে কলুষ বাসনারাজি!
ভবের ঘোর কোলাহল হতে যেন সদা দূরে রই
তোমারি প্রেম- পসরা যেন গো সতত মাথায় বই।
সুপথে থাকিয়া সুকার্য্য করিয়া তোমার আদেশ পালি
তবে দেওয়া- ধন কাঙালে বিলায়ে হৃদয়ে আলোক জ্বালি
সারাটি জীবন তোমার আদেশ যেন গো পালিতে পারি
দাওহে ভক্তি, হৃদয়ে শকতি, আমি যেগো দীনা নারী।[১]

জীবন চলার পথে কোনো রকম কলুষতা তার মনে যেন স্থান না পায়, একজন সাধারণ নারী হিসেবে সৃষ্টিকর্তার নিকট সেই প্রার্থনা করেছেন কবি।

১ মন্‌জুরন্নেসা বিবি, 'বাসনা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃ. ২৪৪

স্রষ্টার প্রতি নিবেদন করে আরেক কবি কাজী হবিবুর রহমানের 'প্রার্থনা' নামক কবিতা সাহিত্য-পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হয়। স্রষ্টা কবিকে কাঙাল ভিখারি করে রাখলে তার কোন দুঃখ বা অভিযোগ স্রষ্টার প্রতি থাকবে না, তবে তিনি একটি আবেদন রেখেছেন :

একটি ভিক্ষা এ দাসের প্রভু
তোমার চরণতলে,
যে ভাবেই রাখ শক্তি দিও গো
ধৈর্য্য যেন না টলে!
যেমন দিয়াছ বলটি আমার
বোঝাটি তেমন দাও,
অধিক যেটুকু দয়া করে প্রভু
তখনি তুলিয়া নাও।[১]

স্রষ্টার নিকট শক্তি ও ধৈর্য্য কামনা করে যত বোঝাই তাকে দেয়া হোক না, তাই মাথা তুলে নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তবে এমন অতিরিক্ত বোঝা স্রষ্টা যেন না দেন, যা বহন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কবি বলেছেন শেষে :

তাই বলি নাথ চাপায় না বোঝা
এখন অমন করে![২]

সাহিত্য-পত্রিকা প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার 'কোরক' পাতায় প্রথম কবিতাটি ছিল কবি চণ্ডীদাস গুপ্ত লিখিত 'আমার লক্ষ্মী' কবিতা। ৩১ চরণের এই কবিতায় 'আমার অন্তর লক্ষ্মী' দিয়ে শুরু করে কবিতাটির শুরু এবং শেষ করেছেন নিম্নোক্ত তিনটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে :

আমার হৃদয়-আলো
তোমারেই এত ভালবাসি তাই
জগতেরে বাসি ভালো।[৩]

কবিতার মধ্যস্থানে আরও দুবার এই তিনটি পঙ্‌ক্তি লিখিত হয়েছে। কবিতার ছন্দময়তা ও গুরুত্বের বিবেচনায় খুবই সুখপাঠ্য এই কবিতাটি। তিনি নারী হৃদয়ের ভালোবাসা জয় করে পুরো বিশ্বকে জয় করবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়। কবি চণ্ডীদাস গুপ্ত 'লজ্জাবনতা', 'চারুকুন্তলা' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে রমা নামক এই নারীর উদ্দেশে বলছেন :

ওগো চঞ্চলা প্রেয়সী রমা
বিতরিছ সুধা বিতরিছ ক্ষুধা
বারি লাজ মান ভয় ক্ষমা
তুমি শ্বেত শিশিরের
এ মহারুমের তীর্থভূমে
সুরধনী তুমি নারী;[৪]

এই নারী শুধু কবির প্রেয়সীই নন, দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য নারীও বটে। কবির ভাষায় :

---

১ কাজী হবিবর রহমান, 'প্রার্থনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
২ প্রাগুক্ত
৩ চণ্ডীদাস গুপ্ত, 'আমার লক্ষ্মী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৫, পৃষ্ঠা. ২৪১
৪ চণ্ডীদাস গুপ্ত, 'আমার লক্ষ্মী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

জগতের আজি চরণ সেবায় লাগি
প্রাণে প্রাণে তোমা রেখেছি বাঁধিয়া
দেবতার বর মাগি[১]

তাইতো হৃদয় আলোকিত করা নারীর কারণে জগতকেও ভালবাসতে পেরেছেন কবি।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় শেখ ফজলল করিমের 'অন্তিম পিপাসা' নামক ছত্রিশ চরণের একটি করুণ বিয়োগান্তক কবিতা প্রকাশিত হয়। এক অন্ধ ভিক্ষুক ও তার ছোট মেয়েকে কেন্দ্র করে কবিতাটি রচিত। কবিতায় অন্ধ লোকটি তার কন্যাকে নিয়ে জীর্ণ শরীরে একটা লাঠি ভর করে বাইরের রোদে এবং মানুষের দ্বারে ভিক্ষা ও সাহায্যের আশায় সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় তাদের ক্ষুদ্র একটি আবাসস্থলে নিয়মিত ফিরে আসে।

ভিক্ষুককে আশেপাশের এলাকার অনেকের চিনত, একদিন তাকে কেউ পথে আর দেখেনি। জ্বরসহ শরীর খারাপ হওয়ার কারণে তার ঘরেই সে অসুস্থ অবস্থায় ছিল, হয়তো কোন কালব্যাধি তাকে আক্রমণ করেছে। দিনশেষে বৃদ্ধ অন্ধ ভিখারী তার মেয়ের কাছে জানতে চাইল, এখনো দিন আছে, না সন্ধ্যা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া যে তাদের হয়তো সারাদিন। পিপাসার্ত ভিক্ষুক তার মেয়েকে খাবার পানি দেবার জন্য বললো। মেয়েটি দেখলো, কলসিতে জল নেই, তাই তার বাবাকে এখনই বাইরে থেকে জল এনে দেওয়ার কথা জানালা। তারপর 'ক্ষুদ্র ঘটি' নিয়ে জল আনার জন্য বাইরে যায় কিন্তু ঘোলা জল নদীর কূল আছড়িয়ে উঠছিল বন্যার কারণে। তারপরও যতটুকু পারা যায়, এক ঘটি জল নিয়ে দ্রুত ঘরের দিকে ফিরে এলো মেয়েটি। অতঃপর কবির বর্ণনায় :

সাবধানে তুলি এক ঘটি জল বালিকা চলিল ঘরে
হা হা কেটে গেল আর্ত্ত পবন আঁধার নদীর চরে।
দূর মঠ হতে কাসঁরের রোল পশিল তাহারি কানে;
বুঝিবা তেমনি পড়িল আঘাত তাহারো ব্যাকুল প্রাণে![২]

ঘরে ঢুকে মেয়েটি স্নেহ মাখা সুরে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াবার জন্য বাবাকে ডাকা শুরু করলো। বাবাকে বললো, ভালো পানি সে এনেছে, কিন্তু বাবার কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। মেয়েটির ঘরে ঢুকে আগে আলোর ব্যবস্থা করল। এরপর কবি বলছেন :

চকমকি ঢুকি জ্বালিল বালিকা সন্ধ্যা- প্রদীপটিরে
জল হাতে গিয়ে দাড়ালো আবার শয্যার কাছে ধীরে
বাবা ! জল চেয়ে ঘুমায়ে প'লে নাকি-এইযে এনেছি নাও
কহিল বালিকা। হায় ! কেহ আর কহিল না তারে দাও ![৩]

---

১ 'আমার লক্ষ্মী', প্রাগুক্ত
২ শেখ ফজলল করিম, 'অন্তিম পিপাসা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ. ৪৭
৩ প্রাগুক্ত

অন্ধ বৃদ্ধ লোকটি অতীত ব্যথা অতিক্রম করে মরণ সাগর পাড়ে পাড়ি জমিয়েছে। মেয়েটা তা বুঝল না, মেয়েটির স্নেহের জায়গাটুকু এভাবে নিঃশেষিত হবে তখনো সে ভাবতে পারেনি। তারপর যা ঘটলো, কবির ভাষায় :

ছুড়ে ফেলে দিয়ে যতনের জল শুধু 'বাবা বাবা' বলে
ঝাপায়ে পড়িল অবুঝ বালিকা পিতার বক্ষ-তলে
দুই হাতে ধরিল জড়ায়ে-চেতনা হইলো লুপ্ত;
নিভে গেল দীপ-আধার কুটির হল আরো বেশি সুপ্ত[১]

মেয়েটির আশ্রয় এভাবে এক নিমিষেই বিলীন হয়ে গেল , এমন ট্রাজিক বর্ণনার ভিতর দিয়েই কবিতার কবিতাটি শেষ করেছেন।

সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের 'মাঙ্গলিক' শীর্ষক ৪৮ চরণের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার প্রথম পৃষ্ঠার ফুটনোট উল্লেখিত ছিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত। সবার মঙ্গল কামনা করে লিখিত কবিতাটিতে চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও কৃতীদের গুণগান করা হয়েছে। সবুজ শ্যামল কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম আজ মঙ্গল বারতায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, কবিতার শুরু এভাবে করে তারপর কবি বলছেন :

যুগ-যুগান্ত স্নিগ্ধ শান্ত
চট্টল পূত দেশ
কীর্ত্তি ইহার চির অনন্ত -
খ্যাতির নাহি শেষ!
একদা হেথায় কবি আলাওল
তুলিয়া মোহন তান
মুগ্ধ করিল নিখিল বঙ্গ
ভক্ত ভাবুক প্রাণ![২]

আলাউল ছাড়াও আরো অনেক কবি চট্টগ্রামের পল্লী কুটিরে আবির্ভূত হয়েছেন, এ কথা বলেছেন কবি। এছাড়া চট্টগ্রামের অনেক সাধক যুগ যুগ ধরে মানুষকে আলোকিত করে রেখেছেন, লক্ষ্য যুগের শত অবসাদ ভেসে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কবি এই কবিতায় পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের এই মহামিলনে মাতৃভাষা ও তার নবীন সেবকদের বিজয় অর্জিত হবে বলে মনে করেন। তাইতো কবিতায় তিনি বলেন এভাবে :

নবীন পলকে নৃত্য করিয়া
উঠিবে দেশের প্রাণ,
কন্ঠ ভরিয়া সবারি তখন
উঠিবে অযুত গান !

---

১ প্রাগুক্ত
২ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, 'মাঙ্গলিক', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ২৫৩

মাতৃভাষার ভক্ত তোমরা
হেথায় এসেছো যবে,
এস হে, এস হে সাধক সেবক
তোমাদেরো জয় হবে।[১]

সবাই একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের কামনা ব্যক্ত করে কবি কবিতাটি শেষ করেন।

সাহিত্য-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা নয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর নামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়, একটি 'জোড়াবন্যা-কাহিনী' আরেকটি 'প্রভু ও দাস'। 'জোড়াবন্যা-কাহিনী' একটি গ্রাম্য-গাথা। জানা যায়, বাংলা ১২৭৮ সালের সাতক্ষীরা অঞ্চলে পরপর দুইবার বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল, সেই ঘটনা অবলম্বন করে এটি রচিত হয়েছে। এটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় জরিফ, যা গাথাটির ভণিতায় উল্লেখিত হয়েছে। গল্প-গাথাটির উদ্ধারকারী হলেন প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> সাতক্ষীরার গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে লিখিত গাথাটির নীচে প্রায় প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ৭৬ চরণের গাথায় ৭১টি শব্দার্থ ও টীকা সংযোজিত হয়েছে, সেই সঙ্গে কবি জরিফের বিস্তারিত পরিচয় ও তাঁকে নিয়ে প্রচলিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সংকলক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। গাথায় উল্লেখিত হয়েছে দুটি বন্যার সন-তারিখের কথা :

পয়লা তারিখ ভাদ্র মাসে শব্দ হল দেশে দেশে
ভেসে গেছে ঠেঙ্গামারির বিল
পনরই তারিখের মধ্যি ভেসে গেছে ওই চৌহদ্দি
চান্দুড়ে'তে হইল দাখিল।[২]

ঠেঙ্গামারা সাতক্ষীরার উত্তরের একটি প্রসিদ্ধ বিল। চান্দুড়ে বা চান্দুড়িয়া ইচ্ছামতি নদীতীরস্থ দেশীয় বস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ইছামতি নদীকে সাতক্ষীরার আঞ্চলিক ভাষায় 'চান্দুড়ের গাঙ' বলা হয়। অবিশ্রান্ত পূর্ণ প্রবাহে 'ঝাউডাঙ্গা' নামক দেশীয় বস্ত্রের এবং খেজুর গুড়ের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ঝাউডাঙ্গা বন্যায় ভেসে গিয়ে স্বর্ণবতী বা সোনাই নামক অতি ক্ষুদ্র নদীতে তখন এসে পড়ে। সোনাই নদীটি সাতক্ষীরা ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট এলাকার সীমারেখা। এই এলাকার বন্যার ভয়াবহ রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি অতঃপর লিখেছেন :

খালে হ'ল এম্নি টান তৃণ দিলে দুইখান
'কেড়াগাছি ভাসল' একেবারে।[৩]

কবি জরিফ বিভিন্ন গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, গ্রামগুলি বন্যার তোড়ে জলে ভেসে সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। ইনড়ে (ইন্দিরা), মাধবকাটী, ধলবেড়ে নামের গ্রামগুলিতে বন্যার তেমন ক্ষতি হয়নি কিন্তু

---

১ 'মাঙ্গলিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
২ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'জোড়াবন্যা-কাহিনী', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ.৫৩
৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

নারানজোল, হরিশপুর, শিকড়ী, কুশখালি, বৈকারি, বিল গজ্জালি, মিরগিডোঙ্গা, ছোনকা, কুলেডাঙ্গা, বাউকোলা, বাশঁদা, নেবাখালি ইত্যাদি বিভিন্ন নামের একুশটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে সেগুলি বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। তবে পার্শ্ববর্তী আলীপুর গ্রামে বন্যা না হওয়ায় সে গ্রামের লোকজনদের উন্নাসিক ভাব নিয়ে বসে থাকার কারণে হতাশা ব্যক্ত করেছেন কবি। এতৎপ্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

দুষ্ট পানির এম্নি বল মানে না সে লোনাজল

শেষে সবে সার করেছে ভেলা।।

কেউ দেখেনি কোনো কালে সেই জাগাতে উজান চলে

ছয়লাবিতে ছগুণ বৃদ্ধি জল[১]

গ্রাম নদী-নালা ভেসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসলের জমি নষ্ট হওয়া ও পশু -পাখির মৃত্যুতে এক করুণ দশার অবস্থা হয় । বিভিন্ন জাতের ধান ভরা ভাদ্রের জলের তোড়ে ভেসে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

ছোট না, 'বোরো' আমন যত একেবারে নিসত্ত্ব

আউস ধানটা ছিল কারো কারো।

দেখতি দেখতি ডুবল যত পাকা ধান বোরো।[২]

শুধু যে ধান ডুবল তাই নয়, ধানের পরিমাণ থেকে পানির পরিমাণ তিনগুণ বেশি হলো। তারপরও কষ্টেসৃষ্টে ধান যদিও পানির ভিতর থেকে কাটা হলো কিন্তু তা রাখার জায়গা হয়না, কারণ ঘরবাড়ি সব পানিতে ভেসে গিয়েছিল। দিনমজুরদের কাজ হারিয়েছিল, তাদের কাজকর্মও যেন পানির ভিতর ডুবে গিয়েছিল। তবে মহাজনরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। মানবতা দেখিয়েও সামান্যতম ছাড় তারা দিতে রাজি নয় গরীব চাষি ও দিনমজুরদের জন্য। তাই দুর্যোগ মহামারীর মধ্যেও মহাজনদের দৌরাত্ম্য কমে না। এরকম পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই, মহাজনদের কাছে কৃষকরা কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাই কবি বলেছেন, বন্যায় কারো নাভিশ্বাস উঠে, আবার কারো খুশিতে মন ভরে যায়। কবির ভাষায় :

কার হাস কার সর্ব্বনাশ দু'তরফে দু'মাস

ধনে জনে হলাম লাশ কতো কব ভাই

যে ধান ছিলো আটটা, নয়টা সেই ধান হলো সাড়ে পাঁচটা

রোজগারেতে নিষ্ফল কল্লেন সাঁই।[৩]

একেতো বন্যা ,তার উপর ধানের দাম কমে যাওয়ায় কৃষকের খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। খেজুর গাছ চাষিদের রস সংগ্রহের ব্যাপারে একই অবস্থা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই সময় নারকেলের ব্যবসা বেশি চলে। পিঠা খাওয়ার কারণে নারকেলের বিশেষ চাহিদা থাকে। কিন্তু জোড়া বন্যা এসে সবকিছুই কেমন বিলীন করে দিয়েছে। পানির তীব্র স্রোত দূর থেকে দেখার আগেই ঘরবাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমন ভাবে যে, তা রক্ষা সামান্যতম উপায় থাকেনা। তাই কবি কষ্টের সঙ্গে বলেছেন :

---

১ প্রাগুক্ত

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩ প্রাগুক্ত

এবার যদি বাঁচি খত   না লিখিব কনে
আর দ্যাল দিব না ঘরে।
এক বাঁচিনে ঝড়ের দায়   দ্যাল না দিলি পড়ে যায়
দ্যাল না দিলি বন্যের সঙ্গে আড়ি
যদি থাকত গরু কটা   পত্তন করে সুমুখ সনটা
খেটে-খুটে কর্ত্তাম ঘর-বাড়ী।[১]

'দ্যাল' অর্থ দেয়াল বা প্রাচীর দিলে বন্যার সঙ্গে 'আড়ি' (গ্রামজ শব্দ) অর্থাৎ 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' হবে 'সুমুখ সনে' অর্থাৎ আগামী বছরে বলে কবিতায় বোঝানো হয়েছে। তবে কয়েকটা গরু থাকলে কষ্ট করে ঘরবাড়ি আবার তৈরি করতেন, কবি একান্ত আশা নিয়ে তাই বলেছেন। এখানে গাথাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছে।

কবি জরিফের এই গাথাটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়নি, কবির বাসস্থান কোথায় ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সংকলক লেখকের মতে অনেকে বলেন, সাতক্ষীরায় অন্তর্গত চুপড়িয়া গ্রামে তাঁর বাসস্থান ছিল। তবে কবি জরিফ উপরে বর্ণিত সময়ের লোক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৌঢ়াবস্থায় কবি গাথাটি রচনা করেছিলেন বলে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ধারণা। কবির রচিত আরো অনেক গাথা, সংগীত ছিল বলে ওয়াজেদ আলী বলেছেন, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে। তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও তাঁকে নিয়ে প্রচলিত ঘটনা সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

> সাতক্ষীরার জমিদার পরলোকগত গিরিজানাথ রায় চৌধুরীর পিতামহের শহীদ বসিরহাটের অন্তর্গত হাকিমপুরের বিখ্যাত খাঁ-বংশের (মোহাম্মদী পত্রের সম্পাদক স্বনামধন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন) বৈষয়িক বিবাদ সূত্রে বিষম সংঘর্ষ হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ্যের চরম ফলস্বরূপে একটি ছোট-খাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে খাঁ বংশের জয়লাভ ঘটে। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি জরিফ একটি সুদীর্ঘ গাঁথা রচনা করেন। ইহাতে সাতক্ষীরার জমিদার বংশের শোচনীয় পরাজয় কাহিনী বিশেষ রঙ চঙের সহিত বিবৃত হইয়াছিল। ইহার পর একদিন জরিফ কাপড় বিক্রয়ের জন্য (এই বস্ত্র বিক্রয়ের ঘটনা হইতে জানা যাইতেছে যে, কবি মুসলমান তন্তুবায় শেখ শ্রেণীর লোক ছিলেন) সাতক্ষীরায় গমন করিলে জমিদার বাটীতে সংবাদ যায়। ফলে ইনি ধৃত হইয়া কাছারিতে নীত হন। তথায় জমিদার বাবু ইঁহার নিকট স্ববংশের যুদ্ধগাথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবি দেখিলেন, মহাবিপদ উপস্থিত-গাথাটি এখানে আবৃত্তি করিলে মাথাটী লইয়া আর বাটী ফির্তে হইবে না। তখন জরিফ পথশ্রান্তির অজুহাতে পরদিন প্রাতে গাথা আবৃত্তি করিবেন, বলিলেন। জমিদার বাটিতেই তাহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। রাত্রে শুইয়া শুইয়া কবি জমিদার বংশের বীর্য্যবত্তার অশেষ পাত প্রশংসা ও গৌরব কীর্ত্তন পূর্ব্বক উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন অপর একটি সুদীর্ধ গাঁথা রচনা করিয়া প্রাতঃকালে তাহাই আবৃত্তি করিলেন। জমিদার মহাশয় ইঁহার পূর্ব্বরচিত গাথাটির বিষয় লোক প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই নতুন গাথাটি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন গত রাতেই সেটি রচিত হইয়াছে। কবির এই প্রকার অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া জমিদার কবিকে শাস্তির পরিবর্তে যথোপযুক্ত অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। কবি রচিত এই দুইটি গাথাই এক্ষণে বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে।[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর বর্ণিত জরিফের বিস্মৃত ও অনাবিষ্কৃত গাঁথা দুটির স্বাদ থেকে দুর্ভাগ্যবশত রসাগ্রাহী পাঠক বঞ্চিত হলেন।

একই সংখ্যায় 'কোরক' পাতায় 'প্রভু ও দাস' নামে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। ৪৮ চরণের এই কবিতায় আরবদের বীর্যবত্তার বা বিজয়ের কাহিনী ও মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে আরবরা পরাজিত হলেও তারা দমে যাবার পাত্র ছিল না। বিভিন্ন সাম্রাজ্য নানান কালে আরবের নতজানু হয়েছে, তাই বলতে গিয়ে কবি লেখেন :

বশ্যতা এসে করেছে স্বীকার
রোমীয় সেনানায়কগণ –
পরাজয় জানি স্থিরনিশ্চয়,
করেছে আত্ম সমর্পণ।
বৈরুত আসকেলনের ন্যায়
পুর-সমৃদ্ধ নগরীচর
নোয়ায়েছে শির আরবের পদে
নির্ভীক এর হৃদে পশেছে ভয়
জেরুজালেমের রক্ষী সেনারা
কেবলমাত্র যুদ্ধবাজ
স্বীকার করেনি হীন পরাভব
সহেনি এখনো বাধিত লাজ।[১]

রোম, বৈরুত জেরুজালেমের শাসকরা আরবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নয়, যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পর্যায়ে থাকলেও ভূমি রক্ষার জন্য জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত থাকে লেখক তাই বলেছেন। তবে পরবর্তীতে কেমন পরিস্থিতি হয়েছিলো, তার বর্ণনা কবিতার ভাষায় এরকম :

শেষে একদিন শুভ্র-নিশানে
জনৈক দূত আরব সনে
কহিলা আমরা প্রস্তুত আছি
নগরী করিতে সমর্পণ
তোমাদের করে হেথায় যদি
খলিফা করেন আগমন।[২]

তারপর একদিন নীরব শান্ত সকালে অনেক দূর থেকে সবাই দেখল উটের পিঠে কে একজন আসছেন আর একটা বলগা হাত ধরে আছে। আগন্তুক দুজনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

---

১ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'প্রভু ও দাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

ভাবিল সবাই, ‘ওমর ফারুক’

নিশ্চয়ই উনি – সন্দেহ নাই

ঐ যে আসিছে বল্গা ধরিয়া

ক্রীতদাস সেই হবে হে ভাই।[১]

ইতোমধ্যে তাঁরা কাছে আসার পর সবাই সম্ভ্রমে কিছু বলার সাহস পেলো না। তারপর কবির বর্ণনায় :

সদা চঞ্চল গন্ধবহস্ত

রুদ্ধচরণে সভয়ে বহে!

কিন্তু ও কি ও! উষ্ট্র-পৃষ্ঠে

কোথায় খলিফা? এ যে সে দাস!

প্রভু সে আসেন ধরিয়া বলগা,

পরিধানে অতি জীর্ণ বাস।[২]

দাসকে প্রভুর আসনে বসিয়ে মহানুভবতা দেখানো দুরূহ ব্যাপার বলে সবাই একাধারে মুগ্ধ ও আশ্চর্য হলো। কবি কবিতাটি শেষ করেছেন এই বলে :

মহিমার পারে লুটিল ভকতি

বিঘোষিত হ'ল ত্রিদিবমাঝে

রাজগৌরব হেরিলা ধরণী

শান্ত-মধুর আজিকে সাঁজে।[৩]

আকাশ থেকে পৃথিবীকে বৃষ্টি পড়ার মত ভালবাসার বর্ষণ সবাইকে যেন শান্ত করে দিলো, কবি এটি বুঝিয়ে কবিতাটি শেষ করেছেন।

একই সংখ্যায় ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা ‘ফুলের খেলা’ নামক একটি ছোট কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি হলো এই :

বাদল রাতে গোলাপ কলি ফুটতে গিয়ে ফুটল না

দিনের বেলা রাতির মত, তবুও আঁখি মেলল না।

চন্দ্র যখন উঠলো হেসে,

সুধার লহর উঠল ভেসে

কুসুম কলি ফুটতে দ্বিধা,

তখন মোটে করল না

শান্ত রাতি আঁধার বলি মেলতে আঁখি ভুলল না।[৪]

---

১ প্রাগুক্ত
২ প্রাগুক্ত
৩ প্রাগুক্ত
৪ ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা, ‘ফুলের খেলা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

বৃষ্টিমুখর রাতে গোলাপফুলের খুড়তে গিয়ে বিপত্তি ঘটার পর দিনের বেলাও তার ফোটার সৌভাগ্য হলো না। যখন চাঁদ স্পষ্ট হল, তখনই ফুল ফোঁটার আনন্দের বার্তা যেন বয়ে নিয়ে এলো। কুসুম-কলি দ্বিধা কাটিয়ে শান্ত রাতের আধারে অবশেষে গোলাপ তার চোখ মেলে তাকাল। ফুল ফোঁটা নিয়ে এই লুকোচুরি খেলার বর্ণনা কবিতায় খুব আকর্ষণীয় হয়ে ধরা দিয়েছে।

সাহিত্য-পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭ জানুয়ারি ১৯২১) ছয় চরণের ক্ষুদ্র কবিতা "কবিতা ও বণিতা" প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোনামের নীচে লেখা ছিল 'সংস্কৃত হইতে' আর কবির নাম উল্লেখিত হয়েছে শুধু 'শ্রী'।

কবিতার প্রতি প্রেম আর প্রেয়সীর দেয়া ভালোবাসার সাদৃশ্য খুঁজে এনে কবিতাটি লিখেছেন এই কবি। কবিতায় যেমন বিনয়ীভাব থাকতে পারে অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে যেমন অনেক কিছুর সঙ্গে বিনয় প্রকাশ করা যায়, তেমনি সত্যিকারের প্রেয়সীও বিনয়ী বা নম্র হয়ে থাকে। প্রকৃত সমঝদাররা কবিতার পাশে যায়, আবার প্রিয়ার সান্নিধ্যেও নিজ ইচ্ছায় আসে, এ কথাই বলতে চেয়েছেন কবি। কবিতাটি উদ্ধৃত করছি এখানে:

কবিতা ও বণিতা
সদা অতি বিনীতা
নিতি নিজ অভিলাষে
গুণিজন পাশে আসে
সাধিয়া আনিতে চাও নাহি হবে নমিতা;
দিবেনা ক সুখরাশি যত কত ভণিতা।[১]

আলোচ্য কবির ভাবনায় আমরা দেখি, নিজ আগ্রহেগুণিজন কবিতার পাশে যেতে পারে, তেমনি বণিতার আকাঙ্ক্ষায়ও থাকতে পারে। তবে কবিতা হোক কিংবা প্রেয়সী হোক, তাকে তোষণ করে কাছে আনতে গেলে মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠেনা বলে কবি মনে করেন। আর এক্ষেত্রে সুখ বা আনন্দ তো দূরের কথা, বরং উভয়ের ন্যাকামি বা ভণিতার বিচিত্র খেলাই দেখতে হয় বলে কবির বিশ্বাস ।

সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যের লক্ষ্য, পুথি সাহিত্য, লোকসাহিত্য, স্বদেশী ও প্রাচ্যের আধুনিক কবি, কবিতা ও উপন্যাসের আলোচনা, সাহিত্যিক বিতর্ক, আঞ্চলিক পর্যায়ের অনালোচিত কবিদের পরিচিতি ও সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র সাহিত্য-আলোচনার অন্যতম দিক ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ-শহুরে, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারের বাস্তব চিত্র সাহিত্য-পত্রিকার গল্পগুলিতে সম্যকভাবে ফুটে উঠেছিল। মার্জিত-শালীন-অভিজাত চরিত্রের পাশাপাশি অস্পৃশ্য-ঘৃণিত-নিন্দিত চরিত্রের সমাবেশ সাহিত্য-পত্রিকার অনেক গল্পের কাহিনিকে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষের স্ববিরোধিতা, ধর্মের নামে অধর্মের চিত্র সাহিত্য-পত্রিকার অনেক নক্শা ও ক্ষুদ্র গল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। ধর্ম ও চিরাচরিত বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত মানুষের পরিচিতি, মানবিকতার নানামুখী প্রকাশ সাহিত্য-পত্রিকায় অনেক গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়। সর্বোপরি অনেক গল্পের কাহিনি বুননের শৈল্পিক চমৎকারিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে।

---

১ শ্রী, 'কবিতা ও বণিতা', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭, পৃ. ২৮০

সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। চরণান্তিক মিলের ছন্দময় ছোট-বড় পদ্য কবিতার আধিক্য সাহিত্য-পত্রিকায় লক্ষ করা য়ায়। মৌলিক কবিতা ছাড়াও প্রচুর অনূদিত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা প্রকাশ সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, জাতিসত্তা নির্ধারক, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বাণী নির্ভর নানান কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য-পত্রিকা বহুত্ববাদকে ধারণ করেছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার প্রয়াসে প্রবন্ধের পরে সাহিত্য-পত্রিকার কবিতার ভূমিকা ছিল সমধিক।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় ইবরাহীম খাঁর মৌলিক ও বিদেশি গল্প-রূপকথা-উপকথার ছায়া অবলম্বনে সর্বোচ্চসংখ্যক ১০টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের চারটি এবং শৈলবালা ঘোষজায়া, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডা. লুৎফর রহমানের তিনটি করে ছোটগল্প প্রকাশিত হয় সাহিত্য-পত্রিকায়। কাজী আবদুল ওদুদের দুটি ছোটগল্পসহ অনেক খ্যাতিমান ও নবীন গল্পকারের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য-পত্রিকায়।

কবিতার ক্ষেত্রে সাহিত্য-পত্রিকায় চণ্ডীচরণ মিত্রের ১৩টি, গোপেন্দ্রনাথ সরকারের ৬টি, সাজেদা খাতুনের ৪টি কবিতা ছাপা হয়। শৈলবালা ঘোষজায়া, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্তের একাধিক কবিতার পাশাপাশি অনেক নতুন ও প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতা মুদ্রিত হয় সাহিত্য-পত্রিকায়। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দীর্ঘ কবিতা যেমন ছাপা হয়, তেমনি এই কবির অকালপ্রয়াণে তাঁর স্মরণে দুটি স্মৃতিচারণমূলক ও বিয়োগান্তক কবিতা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করেন দুজন বিশিষ্ট কবি। কাজী নজরুল ইসলামের সর্বোচ্চ ১৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য-পত্রিকায়। এভাবে সাহিত্য-পত্রিকা সাহিত্যের সৃজনশীল ও মননশীল দুই শাখাতেই কৃতিত্বের ছাপ রেখেছিল।

চতুর্থ অধ্যায় : চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাষা

উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের শুরুতেও শিক্ষিত ও বাঙালি মুসলমানের অনেকেই বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় পঠন-পাঠনে ছিলেন আগ্রহী। আবার এই সময়ে যাঁরা বাংলা ভাষামাধ্যমে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই সংবাদপত্রের নামকরণ করেছিলেন আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'। 'মুসলমান' শব্দ ছাড়া এর প্রত্যেকটি শব্দই বাংলা ভাষা থেকেই গৃহীত। পত্রিকার নামটি যেমন বাংলা ভাষায় রাখা হয়েছিল, তেমনি এই পত্রিকায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা চালুর পক্ষে মত প্রদানও ছিল জোরালো। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উর্দু, আরবি, ইংরেজি এমনকি সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দির প্রয়োজন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভিন্ন হতে পারে বলে বিশ্বাস করত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। তবে মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে এর অবস্থান ছিল প্রশ্নাতীত। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের বিশেষ ভাষাভিত্তিক দুর্বলতা ছাপিয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিদানের প্রশ্নে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষাগত অবস্থান নিয়ে উপর্যুপরি আলোচনা ও বিতর্ক জমে উঠেছিল। মুসলমানদের জাতীয় ভাষা বাংলা না আরবি এই নিয়ে বিতর্ক ছিল তুঙ্গে। মাতৃভাষা বাংলা মেনে নিয়েও জাতীয় ভাষা বিতর্কে একদল বাংলার পক্ষে মত দেন, অন্যদল বিশ্বের সকল মুসলমান এক জাতি ভেবে আরবি-ফারসির পক্ষে অবস্থান নেন। আবার স্বতন্ত্র একটি দল ছিল, যাঁরা উপর্যুক্ত দুটি মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। একই দৃষ্টিকোণ থেকে আবার অনেকে বাংলা ভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেও ভারতবাসী এবং মুসলমান হিসেবে উর্দু শেখার পক্ষে জোরালো মতামত রাখেন। এরকম পরিস্থিতিতে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* কর্তৃপক্ষ 'জাতি' এবং 'জাতীয় ভাষা' শব্দ দুটির স্বরূপ সন্ধানে সচেষ্ট হয়।

জাতির ভাষা এবং জাতীয় ভাষার প্রশ্নে পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের অভিমত প্রকাশিত হয়। ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা জাতীয় ভাষা এবং ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিশ্বভাষা যে এক নয়, তা এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে বলা হয়। জাতীয় ভাষা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভাষা হতে পারে, তেমনি বিশ্বভাষা একটা ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর ব্যবহার্য ভাষা হতে পারে। মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রশ্নে আরবি ভাষাকেও সে অর্থে ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিশ্বভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবে বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে বাংলা যেমন মাতৃভাষা, তেমনি জাতীয়তার প্রশ্নে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে সাহিত্য-পত্রিকাটি মনে করে, সে ভাষার রূপ যেমনই হোক না কেন। সাহিত্য-পত্রিকায় এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলে। বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, উর্দু, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার শব্দ ব্যবহার নিয়েও পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপিত হয়। ফলে বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে যেসব মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহারে অনেক লেখক কোনো অন্যায় দেখতেন না। সাহিত্য-পত্রিকায় ভাষাবিষয়ক এরকম আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) প্রমুখ লেখকবৃন্দ।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমান শাসকদের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ, বাঙালি মুসলমানের মন ও জীবনাচরণে বাংলা, উর্দু, আরবি ও ইংরেজির অবস্থান যেমন তুলে ধরেন তেমনি ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণে ভাষার সংস্কারও যৌক্তিক বলে মনে করেন। তবে মাতৃভাষার প্রশ্নে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা উর্দুর পক্ষপাতী তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

> কেহ কেহ উর্দ্দুর স্বপ্নে বিভোর হইলেও বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকা উচিত নহে। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা ঠিক যে, বঙ্গীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ সকলেই আরব, ইরান, তুরান বা কাতার হইতে আসিয়া বাংলাদেশ বাস স্থাপন করেন নাই। অতএব বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবি করিবার অধিকার হিন্দু ও মুসলমানের সমভাবেই আছে।[১]

লেখক বলতে চান, কতকগুলি শব্দের প্রচলন দ্বারা যে মুসলমানি প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তা অনুচিত, এবং তা পরিহার করা উচিত। একই বক্তব্য হিন্দু সংস্কারপন্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাবন্ধিক ধর্মবোধে ভাষা-সংস্কার প্রত্যাশীদের বিরোধিতা করে লেখেন :

> মুসলমানেরা চান বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহারা আরবী-পারসী শব্দের বহুল প্রচলন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বুকে একদিনেই এমন দাগ কাটিয়া দিবেন, যেন তাহাতে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। একদল হিন্দু চাহেন, লেখ্যভাষা লেখ্যভাষায়ই থাকিবে, উহাতে কথ্য ভাষার প্রচলন করিয়া উহাকে দোমেটে করা হইবে না। আর একদল উহার দ্বিজত্ব সম্পাদন করিতে চাহেন। বঙ্গভাষার এইরূপ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। বস্তুতঃ দেশের হিন্দু-মুসলমান অল্পায়াসেই যে ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিবে আমাদের এমনতর ভাষাই থাকা দরকার।[২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ আগস্ট ১৯২২ সালে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক সভায় ঘোষণা দেয়, শিক্ষার মাধ্যম তথা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যম হবে দেশি ভাষা 'বাংলা'। তখন এ এই সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক ওঠে। মুসলমান সমাজের একাংশ বিষয়টি নিয়ে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হন। জনৈক মৌলবী সাদিক খাঁ বলেন, বাংলা ভাষার পুস্তকসমূহ 'মোসলেম sentiment বা ভাব প্রবণতার প্রতিকূল।'[৩] সাদিক খাঁ'র বক্তব্যের বিরোধিতা করে সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক আলোচ্য প্রবন্ধের টীকায় বলেন :

> ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকগুলি হইতে কি মুসলমান ছাত্রদিগকে গ্রীক ও রোমকগণের দেবতাখ্যাত ইত্যাদি এবং গ্রীক, ফরাসী ও ল্যাটিন বাক্যের রীতি মুখস্থ করিতে হয় না? তৎসমুদয় কি তাহাদের sentinent-এর খুবই অনুকূল ? মোট কথা, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সব জায়গাতেই গলৎ। ইহার আমূল পরিবর্তন একান্তই বাঞ্ছনীয়; আর বাঙ্গালাদেশে প্রকৃত শিক্ষালোক বিস্তার করাই যদি সেই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতিকে বাঙ্গালা ভাষাতেই উচ্চজ্ঞানের বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত।[৪]

---

১ সৈয়দ এমদাদ আলী, 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ. ৮১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪ প্রাগুক্ত

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান' প্রবন্ধে বলেন :

> বঙ্কিম তাঁহার শেষজীবনে যে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সমগ্র বঙ্গদেশের লেখ্যভাষা এক লক্ষণাক্রান্ত হওয়া উচিত, এই কথা হিন্দুরও বুঝা উচিত, মুসলমানেরও বুঝা উচিত। আমি আশা করি সুধীসমাজ ও সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবেন। একযোগে কতকগুলি আরবী পারসী শব্দের প্রচলন করিয়া আমরা ভাষার দিক দিয়া কখনই লাভবান হইব না। আমরা মনে হয়, বঙ্গভাষার মধ্যে যদি আমরা মুসলমানী ভাব ও মুসলমানী আদর্শ প্রচার করিতে পারি, পরিস্ফুট করিতে পারি, তবেই কেবল আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন। হিন্দুগণ বঙ্গভাষায় আরবী, পারসী শব্দ প্রচলনের বিরোধী। কিন্তু আমরা যদি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে পারি, তাহাতে যে ফল ফলিবে, তাহা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হৃদ্যতা ও সখ্য আবহ বৃদ্ধি করিবে এবং জোর করিয়া আরবী, পারসী শব্দ প্রচলন করিতে গেলে তাহার ফল বিষময় হইবে।[১]

প্রাবন্ধিক আরো বলেন যে, নিজের ভাষায় শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে অপর ভাষা থেকে নতুন নতুন শব্দগ্রহণ অনিবার্য। ইংরেজি ভাষা এরূপেই শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে, যা সম্পাদিত হয়েছে অনেকটা নিভৃতে।

এজন্য যাঁরা জোর করে ভাষায় মুসলমানি শব্দ আমদানি করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য-এরকম – কতগুলি শব্দের প্রচলন দ্বারা যে মুসলমানি প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে, তা অবৈজ্ঞানিক, অতএব পরিহার্য।[২] তাঁর মতে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষাতেই আমরা আমাদের জাতীয়ভাব ও আদর্শ বিকশিত করব। আমরা যদি তা করতে পারি তাহলে হিন্দু-ভ্রাতারা আর কখনোই বলতে পারবে না যে, বঙ্গভাষা কেবল তাঁদেরই পরিচর্যায় পুষ্ট হয়েছে। আর বাঙালি মুসলমান যেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বাজারে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে পারে-এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তো সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেন :

> আজ সমগ্র দেশে কর্ম্মের সাড়ার মধ্যে মুসলমানও বুঝিয়েছেন যে মাতৃভাষাকে আর তাঁহারা অবহেলা করিতে পারেন না। তাই কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। বঙ্গভাষার প্রকৃত সাধক যাঁহারা তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা একটি সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিবেন।[৩]

প্রবন্ধটি ১ বৈশাখ পঠিত হয় এবং এ বছরের বৈশাখ মাসেই 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' যাত্রা শুরু করে। আলোচ্য প্রবন্ধে এমদাদ আলী বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতার জন্য নিম্নোক্ত দুটি কারণ চিহ্নিত করেছেন : এক. অশিক্ষা, এবং দুই. হিন্দু-মুসলমান পরস্পর অনাত্মীয় জ্ঞান করা। তাঁর মতে, বাঙালি মুসলমান যদি সকল দ্বিধা ভুলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত হয়, তাহলে সে উপর্যুক্ত সমস্যা দুটি থেকে মুক্তি পাবে। ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের মিলন সহজতর হবে। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের ভাষ্য :

> বঙ্গ সাহিত্য হইতে দূরে পড়িয়া থাকার ফলে মুসলমানগণ আজও শিক্ষায় অনুন্নত রহিয়াছেন। এই দূরে পড়িয়া থাকার দোষ আর একটা এই দাঁড়াইয়াছে যে হিন্দুগণ মুসলমান হইতে এবং মুসলমানগণ হিন্দু

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৩ প্রাগুক্ত

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া করিয়া, মিলনের পথকে নিকটবর্ত্তী করিবার ক্ষমতা এক বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যেরই আছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষা পরিচর্য্যার জন্য উদ্দীপিত আকাঙ্ক্ষা অবলোকন করিয়া তাই আজ আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা আশির্বাদ করুন, বঙ্গ সাহিত্যের দুই ধারা-হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা, গঙ্গা যমুনার মত মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করুক।[১]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা – সে বিষয়ে কারো সাথে কারো মতবিরোধ নাই। এমন কথা কেউ বলতে পারেন না যে, বাংলাভাষা হিন্দুর নিজস্ব ভাষা, এ ভাষা কখনো মুসলমানের ভাষা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, জগতে কোনো ভাষা কোনো কালে বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিজস্ব খাস সম্পত্তি হয়নি এবং বোধ হয় কোনোকালে হবেও না। কিন্তু যাঁরা এ ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা'র আসনে বসাতে চান তাঁদের বিপক্ষে মতামত দিতে তিনি স্বাতন্ত্র্যবোধে তাড়িত হয়ে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। যাঁরা বাংলা ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' করার পক্ষে মত দেন তাঁদের যুক্তিগুলো হলো :

১. মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার না করাতে দেশের ও সমাজের বিষম ক্ষতি হইতেছে;
২. মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা আমদানি করিবার চেষ্টা কখনো ফলবতী হইবে না;
৩. মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে বরণ করা ব্যতীত কোনো জাতি কখনো উন্নত হইতে পারে না;
৪. যাহাদের মাতৃভাষা এক, জাতীয় ভাষা অন্য, কোনো ভাষাই তাহাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায় হইয়া উঠে না;
৫. গাছ যেমন মাটি হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বড় হয়, জাতি তেমনি জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বড় হয়। এবং
৬. আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার কোনো রস সমাজ-দেহে অভিসিঞ্চিত হইতে না পারায়, বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রবাহ অত্যন্ত মৃদু।[২]

প্রাবন্ধিকের মতে, যদি জাতীয় ভাষা অর্থে কেবলই বাঙালি মুসলমানের 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' (National language) হয় তা হলে 'মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার' অভিন্নতা স্বীকার করতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যদি বিশ্ব মুসলমানের ঐক্যের (Pan-Islamism) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তবে তা ভিন্ন বিষয়। তিনি এতদ্বিষয়ে বলেন :

> জাতীয় ভাষার এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া লওয়া কখনই সঙ্গত বা শুভদায়ক হইবে না। আরবী এবং উর্দ্দুকে বাদ দিয়া বাঙ্গালায় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। মুসলমানের মনে 'নেশন' শব্দ জাগিয়া উঠিলে, সে কখনো আপনাকে বাঙ্গলার অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না, এমনকি মাত্র ভারতের অধিবাসী বলিয়াও মনে করিতে পারে না-সমগ্র বিশ্বের সহিত তখন তার যোগ সাধিত হইয়া যায়। সে যোগ অতি সুন্দর, অতি সত্য ও অতি সনাতন। অতএব ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ বা জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙ্গালী মুসলমান জাতির ভাষা ধরিয়া লইলে মুসলমানের বিশ্বানুভূতিকে হত্যা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবন নামক পদার্থটি স্বপ্নরাজ্য ছাড়াইয়াও দূরে-বহুদূরে চলিয়া যাইবে।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

২ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩৬১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

তাঁর মতে, সমগ্র ভারতের 'জাতীয় ভাষা' এখনো স্থির হয়নি। কিন্তু মুসলমান সমাজ যদি বাধা না দেয় তবে হিন্দি হয়ে যেতে পারে ভারতের জাতীয় ভাষা। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ওয়াজেদ আলীর মতে, বাংলা জাতীয় ভাষা হলে ভালো হতো – তা যদি নাই হয়, তবে হিন্দিকে মেনে নিতে আপত্তি নেই। তিনি মনে করেন, মুসলমানের অবনতির কারণ 'জাতীয় ভাষা' হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না দেবার জন্য নয়, ভাষা-সাহিত্য চর্চা না করার জন্য। তাঁর ভাষায় :

> বাঙ্গালা, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষা-জাতীয় ভাষা নহে। যাঁহারা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষা বলিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের যুক্তিগুলির উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমরা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করি নাই এজন্য নহে, বরং আমরা বাঙ্গালাকে সাধারণভাবে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যালোচনা হইতে বিরত ছিলাম এই জন্য। আরবী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে, উহাকে বিদেশীয় নতুন আমদানী বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।[১]

ওয়াজেদ আলীর মতে, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, অতএব এ ভাষার সাহিত্য আমাদের মাতৃসাহিত্য, জাতীয় সাহিত্য নয়। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের অবদান আছে। কিন্তু তা হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়ায় সেগুলো মুসলমানের 'জাতীয় সাহিত্য' হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি অনুধাবন না করে অনেকেই আমাদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে গ্রহণ করতে চান; সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দিতে চান না। এঁদের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য :

> আমি এমন কথা বলি না যে, প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহ বা সংরক্ষণের কোনো আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাহাকে প্রাচীন যুগের জীবনকঙ্কালের ন্যায় শুধু দেখিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ...প্রাচীন সাহিত্যকে বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে-জাতীয় সাহিত্যের বুনিয়াদ নূতন করিয়া আমাদিগকে গড়িতে হইবে।
>
> মুসলমান সাহিত্যিকের দায়িত্ব... জাতীয় জীবনের উদ্বোধন। ...জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত তাহার নয়ন সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে চমকাইয়া দিতে হইবে...। উহাই আমাদের জীবনমন্ত্র, প্রাণপ্রতিষ্ঠার উহায় সম্মোহনবাণী। মৌলিক সাহিত্য, মৌলিক সাহিত্য করিয়া গোল বাধাইও না-এই মরণের যুগে উহা তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে। আগে জাতীয় জীবনের প্রভাত হোক, তারপর পিককলরব শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইও।[২]

প্রাবন্ধিক মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যসাধনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই এদের উচিত হবে – ভাবাবেগ তাড়িত না হয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান ব্যাপক। তাঁকে অনুসরণ বা প্রতিযোগী ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি (মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী) হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা হলো – তিনি মুসলমান লেখকদের 'মুসলমান বিশ্বসাহিত্য' থেকে অনুপ্রেরণা নিতে বলেছেন। তাঁর ভাষায় :

> আমাদের সমাজে এখন রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মাইকেল ও হেমচন্দ্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। মোসলেমের সাহিত্যিক জীবন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যিক জীবন অনেক আগাইয়া গিয়াছে। ...

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৬

অগ্রে জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সমাজকে পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের সাহিত্য আগাইয়া চলিয়াছে-আমার এইরূপ মনে হয়।

আমাদের মধ্যে কোনো রবীন্দ্রনাথ জন্মিবার এখনো ঢের বাকি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন ভাব ধারণ করিবার মতো হৃদয় এখনো কোনো মুসলমান সাহিত্যিক বা ব্যক্তির হয় নাই।

মুসলমান সাহিত্যই হউক আর হিন্দু সাহিত্যই হউক সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালি সাহিত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানকে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ... ভাষা ভেদ ও দেশ ভেদকে তুচ্ছ করিয়া যে বিরাট মুসলমান বিশ্বসাহিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে তাহারই একটা সমর্থ অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে।[১]

ওয়াজেদ আলীর উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি তৃতীয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে' পঠিত হওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। উক্ত সম্মিলনে পঠিত ও পরে মুদ্রিত এ রচনাটির কিছু বিষয়ে সম্পাদকের দ্বিমত ছিল, যা প্রকাশিত রচনাটির টীকা হিসেবে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও রচনাটি প্রকাশ করে সাহিত্য-পত্রিকা পরমতসহিষ্ণুতার অনন্য নজির স্থাপন করে। এ পর্যায়ে গুরুত্ব বিবেচনায় সম্পাদকের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হলো :

দুঃখের বিষয় লেখকের সহিত আমরা অনেক বিষয়েই একমত হইতে পারিলাম না। প্রথমেই 'জাতি' শব্দ লইয়া একটা খটকা বাধিয়াছে। মূল সংস্কৃতে 'জাতি'র মানে যাহাই থাকুক না কেন, আজকাল আমরা এই শব্দটিকে ইংরেজি ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। তাহা হইলে 'জাতি' অর্থ কোনো বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় নহে, -কোনো এক দেশের লোক, তা' সেখানে যত ধর্ম সম্প্রদায়ই থাকুক না কোন। এই হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের সমগ্র অধিবাসীর জাতীয় ভাষা। বিশ্ব-মোসলেমের মধ্যে বিশ্বজনীন যে ভাব আছে, তাহা এই 'জাতি' হইতে অনেক বড়। তাহাকে আমরা মুসলমানের বিশ্বভ্রাতৃত্ব বলি। তাই আমরা আরবি ভাষাকে আমাদের National Language বলিতে কিছুতেই রাজি নহি। উহা তো চিরদিন আমাদের Universal Language (বিশ্বভাষা) হইয়াই আছে। আরবি ভাষার আলোচনা বাঙালী মুসলমানের মধ্যে খুবই বর্দ্ধিত হউক, ইহা আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার উর্দ্দুকে দাঁড় করাইয়া দিলে ত সহজ উর্দ্দুর ধাক্কায় কঠিন আরবী টিকিতে পারিবে না। কিন্তু একটু কষ্ট করিয়া আরবী শিখিতে পারিলে উর্দ্দুও যে আপনা-আপনি শেখা হইয়া যাইবে, সে কথা কেহ তলাইয়া দেখেন না।

প্রাচীন মুসলমান কবিগণের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকলেই যে বৈষ্ণব সাহিত্যই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, এই কথাটা একেবারেই ভুল। প্রাচীন সাহিত্যে মাথায় তুলি রাখিবার জিনিসও অনেক আছে। একটু অনুসন্ধান করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেই আমাদের মতে ভাল হইত।

লেখক যে প্রণালীতে সাহিত্য চর্চা করিতে বলিতেছেন কেবল সেই প্রণালি অবলম্বন করিলে জীবন নিতান্তই এক ঘেয়ে হইয়া উঠিবে। সমাজে সকল প্রকার সাহিত্যেরই প্রয়োজন আছে।[২]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর অপর রচনা 'দেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দুর স্থান'। অনুবাদ-প্রবন্ধটিতে তিনি উর্দু ভাষানুরাগীদের ভাষাটি সম্পর্কে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে উর্দুর ভক্ত ছিলেন না বা ভাষা-বিতর্কে উর্দুর সমর্থনের উদ্দেশ্যেও প্রবন্ধটি অনুবাদ করেননি। উর্দুপন্থি লেখক আবদুল মজিদের

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সমকালে উর্দু বিরোধীদের নিম্নোক্ত তিনটি অভিযোগ ছিল।

১. উর্দুভাষা অত্যন্ত দীন,
২. সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র এবং
৩. বর্ণমালা নানাদিক দিয়ে অসম্পূর্ণ।

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল মজিদের মত ধারাবাহিকভাবে ও সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

> ১. উর্দ্দু সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সভ্যতার দ্বারা যেমন পরিপুষ্ট হইয়াছে ভারতের অন্য কোনো ভাষা তেমন হয় নাই। সুতরাং উর্দ্দু অপেক্ষা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে এবং সাহিত্য সংগঠনের দিক দিয়া উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ...হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের যুগে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উর্দ্দু ভাষা মুসলমানের আধিপত্যের নহে বরং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চিহ্নস্বরূপ।
>
> ২. সাহিত্যের উন্নতি দুই প্রকারের হয়। ক. মৌলিক সৃষ্টিতে এবং খ. অনুবাদ প্রভৃতিতে। ...জগতের বড় বড় প্রসিদ্ধনামা পুরাতন গ্রন্থগুলোর অনুবাদ উর্দ্দুতে হইয়া গিয়াছে। ... উপন্যাসের দিকে স্কট, ম্যারি, করেলি ... বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গল্প এবং উপন্যাস উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। ... সাধারণ গদ্য সাহিত্যে মেকলে, কারলাইল, স্মাইলস, লুবক প্রভৃতির অনুবাদগুলো উর্দ্দু ভাষীদের নিকট খুব আদৃত হইয়াছে। ... দর্শন ও মনস্তত্ব উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়াছে। ... প্রাচ্যের সম্পদ হইতেও উর্দ্দু সাহিত্য বঞ্চিত হয় নাই। মৌলিক সৃষ্টির দিক দিয়াও উর্দ্দু সাহিত্য দরিদ্র নহে।
>
> ৩. ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় অক্ষরের বিষয়েও উর্দ্দু সংগ্রহশীলতা দেখাইয়াছে। সংগ্রহশীলতার ফলে উর্দ্দু বর্ণমালা স্বরানুকারিতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের সৃষ্ট কোনো বর্ণমালা অদ্যাপি ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর হইয়া ওঠে নাই। ... ইহার বর্ণমালা সমগ্র ইসলাম জগতে প্রচলিত রহিয়াছে। ... তাহাকে (উর্দ্দুকে) তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।[১]

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা হবে উর্দু – এক শ্রেণির লেখকের কারণে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দাবি সমকালে বেশ জনপ্রিয় হয়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান 'বাংলা সাহিত্যে ভাষা-সংস্কার' বিষয়ক উক্ত বিতর্কের অবসানকল্পে এবং বাঙালির সাহিত্যিক মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে মাতৃভাষার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে 'উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। প্রাবন্ধিকের মতে, সাহিত্য যদি কোনো সম্প্রদায় বা জাতিকে উন্নত করতে না পারে, তবে তার কোনো মূল্য নেই। সাহিত্যের উন্নতি যেমন জাতির উন্নতির সঙ্গে বাড়ে, তেমনি সাহিত্যের সার্থকতা আবার জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যে সাহিত্যে তা সম্ভব হয় না, তা মূল্যহীন। তাই তিনি লিখেছেন :

> মায়ের ভাষা ছাড়া কোন ভিন্ন জাতির ভাষাকে যদি আপনার করিয়া লওয়া সম্ভব হইত তবে আমি দেশবাসীকে কহিতাম, তোমরা উর্দ্দু, বাঙ্গলা সব ভুলিয়া আরবীকে মাতৃভাষায় পরিণত করিয়া লও। কিন্তু তাহা যে একবারে অসম্ভব। ... কল্পনা করুন, যদি সমস্ত বিশ্বের মোসলমান বাহির ভাষা আরবী হইত,

১ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'দেশীয় ভাষা সমূহের মধ্যে উর্দ্দুর স্থান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ.১৮-২৩

> তাহা হইলে এসলামের বিরাট দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইত তাহার সম্মুখে কি কেহ দাঁড়াইতে পারিত ? দুঃখের বিষয় এই কল্পনা কখনও কার্যে পরিণত হইবার নয়।[১]

কারণ বাস্তবতা হচ্ছে, সমগ্র আরবের ভাষা আরবি হলেও তাদের সাহিত্যিক অবদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয়নি বা তারা এক রাষ্ট্র হয়েও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ঘোষণা করতে পারেনি। আর বাঙালি মুসলমান তো ভৌগোলিকভাবে আরব বিশ্ব থেকে অনেক দূরে। বাস্তবতা উপলব্ধি করে তিনি অভিমত দেন :

> আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ-অশ্রুর কঠিনভাবে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি-কিন্তু আমার শেষ সম্বল-ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।[২]

বাংলায় বসবাসকারী উর্দুভাষীদের উগ্র ও অসহিষ্ণু আচরণে ব্যথিত হয়ে তিনি বলেন :

> কলিকাতার নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক উর্দ্দু ভাষী-ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি হিংস্র জন্তুর সমান। উর্দ্দু সাহিত্যে যদি এমন কোনো শক্তি না থাকে যাহার স্পর্শে আসিলে মানুষের আত্মবোধ জন্মে, সে তাহার জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, তবে সে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায় ? শুধু নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কথা নহে, উর্দ্দু ভাষী উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও সাধারণতঃ স্নেহ-সহানুভূতি ও কোমল স্বভাবের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। ...ইহারা যদি কিছুমাত্র বাঙ্গালা পড়িতে জানিত তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি বাঙ্গালী মুসলমান ও হিন্দুর চরিত্র ও সাহিত্য শক্তি ইহাদের জীবনে এমন কাজ করিত যে, ইহারা ইহাদের হীন জীবনে লজ্জিত না হইয়া পারিত না। ইহারা ফিরিয়া আসিত।[৩]

ভারতীয় অন্য কোনো ভাষা যেমন হিন্দি ও উর্দুর প্রসঙ্গ না এনেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক্ষেত্রে সরাসরি মাতৃভাষার পক্ষে তাঁর জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেন সাহিত্য-পত্রিকায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে আবেগ-অনুভূতির যে প্রকাশ করা হয়, অন্য কোনো বিদেশি ভাষার মাধ্যমে হতে পারে না বলে তাঁর অভিমত। আমাদের হাসি-কান্না-চিন্তা, স্বপ্ন দেখা যদি বিদেশি ভাষায় সম্ভব না হয়, তাহলে বাঙালি হিসেবে মাতৃভাষা বাংলাই হওয়া উচিত সাহিত্যের ভাষা, এ কথা লেখক স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন। নিজ ভাষার মাধ্যমে জাতির যথার্থ উন্নতি সম্ভব মনে করে লেখক এ-প্রসঙ্গে বলেন :

> কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া কোন ভাষা-পরাণ আকুল করে ? কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান সদা পিয়াসী থাকে ? কোন ভাষা ক্লান্ত আত্মায় শৈশবের সুখস্মৃতি বহিয়া আনিয়া কঠোর সংসারের অপর পারে স্বর্গের দুয়ারে তাহাকে আনিয়া দেয় ? সে কি মাতৃভাষা নয় ? কোন জাতি কেবল বিদেশী ভাষার চর্চ্চায় কখন বড় হইতে পারে নাই। ইউরোপ যখন লাতিন ছাড়িয়া দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে।[৪]

এতদ্বিষয়ে লেখক জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

---

১ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'উর্দ্দু ও বাঙালা সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ. ১৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্র সমাজ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭, পৃ. ১৬৬

একাধিক ভাষায় একই লেখকের সাহিত্যকীর্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মাতৃভাষা ব্যতিরেকে ভিন্ন কোনো ভাষায় যশস্বী হওয়া যতটুকু সম্ভব হয়, তার চেয়ে অধিক সম্ভব মায়ের ভাষায় চর্চা করলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বড় উদাহরণ। বিশেষ প্রয়োজনে অন্য ভাষায় লেখা বা অনুবাদ করার প্রসঙ্গটি এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলে ধরা যায়। তবে ভাষাতত্ত্বের অনেক পরিভাষা অন্য ভাষার সাহায্যে সমাধান ও সহজবোধ্য করা যেতে পারে। ভারতের কয়েকটি ভাষার প্রসঙ্গে এসে লেখক সাহিত্য-পত্রিকায় বলেন :

> ভাষা তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান প্রদেশিক বিভাগের সাহায্যে হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দী, ফারসী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখিবে মূলে 'মুই' এক বচন এবং 'আমি' বহুবচন। প্রাচীন বাঙ্গালায় যে এইরূপ প্রয়োগ ছিল, তাহা চট্টগ্রামের চাকমা বুলি দ্বারা প্রমাণ হয়। চাকমার 'মুই' একবচন ও 'আমি' বহুবচন। বাঙ্গালার 'আমি যাই', চাকমার 'মুই যাং', বাঙ্গালায় 'আমরা যাই', চাকমায় 'আমি যেই'।[১]

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার বিশেষত্ব ও সাদৃশ্য বিষয়েও লেখক কথা বলেন। তৎকালীন সমগ্র বাংলার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কীরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তা সংগ্রহ করতে পারলে জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ সাহায্য হতে পারে বলে লেখক মনে করেন। লেখক এতৎপ্রসঙ্গে ভাষার উচ্চারণ ও বানান বিষয়ে সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন :

> ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশেষত্ব ইহার তালব্য শকায়ত্ব এবং স্বরের সামঞ্জস্য (Harmonic Sequence of vowels) যেমন হিন্দী ইত্যাদি রোটি, কিন্তু বাঙ্গালা রুটি, হিং ইত্যাদি টোপী, বাঙ্গালা টুপি। এই স্বর সামঞ্জস্য ভারতের মধ্যে মুণ্ডারী ভাষায় ও তেলেগু ভাষায় এবং ভারতের বাহিরে ফিনো উগ্রীয় ভাষায় দেখা যায়।[২]

লেখক এই দৃষ্টান্ত প্রদানপূর্বক ছাত্রসমাজের প্রতি ঐ 'নীরস কার্য্যে হস্তক্ষেপ' করার আহবান জানান। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এভাবেই ঘটবে বলে তিনি মনে করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে আরবি সমগ্র মুসলমানের বহুল চর্চিত ভাষা। আবার কোরানের ভাষা হিসেবে কোনো মুসলমানের ধর্মচর্চায় আরবি ভাষা ত্যাগ করার কথা ভাবা যায় না। মুসলমানদের কোরানের ভাষাচর্চা অল্পবিস্তর করতেই হয়, তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে অবহেলা বা বর্জন করে নয়। আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবি ভাষার পাশাপাশি উর্দু ও ফার্সির যুগপৎ ব্যবহার ছিল যেমন পীড়াদায়ক, শিক্ষায় মাতৃভাষা চালুর ক্ষেত্রে তা ছিল আরও বড় অন্তরায়। মাদ্রাসার ছাত্ররা এটা উপলব্ধি করলেও কর্তৃপক্ষ তখন এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। মুজফ্ফর আহমদের মতে :

> দুই বছর পূর্বে কলিকাতা মাদ্রাসার চারিশতের অধিক ছাত্র একত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিল যে মাদ্রাসায় তাহাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বঙ্গভাষা তাহাদিগকে অবশ্য পাঠ্যরূপে পড়ান হউক এবং তাদের শিক্ষার বাহন বা মিডিয়ামটাও করা হউক বাংলা।[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

২ প্রাগুক্ত

৩ মুজফ্ফর আহমদ, 'বঙ্গদেশে মাদ্রাসার শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ২৩৩-২৩৪

মাদ্রাসা থেকে আরবি পাসের সনদ নিয়ে যারা বের হন তারা ভালো আরবি জানেন বলে তিনি মনে করেন না। তবে মাদ্রাসা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই-একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত যে বের হন না, তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম বলে লেখকের অভিমত। আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় শিক্ষার্জনের ফলে এদের অনেকেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> এই রকম ত মাদ্রাসার শিক্ষা। ইহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া না গড়িতে পারিলে আর নিস্তার নাই। বঙ্গদেশের মাদ্রাসায় বঙ্গদেশের লোকের মাতৃভাষা অবশ্য পাঠ্যরূপে পঠিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। মাদ্রাসার শিক্ষা মিডিয়াম উর্দ্দু কিংবা পারসি না হইয়া বাংলাই হওয়া উচিত।[১]

মুজফ্ফর আহমদ আরবি শিক্ষার বিপক্ষে নন। উন্নত প্রণালীতে আরবি সাহিত্য, কোরান-হাদিস শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-অধ্যাপক তৈরি করার কথাও তাই তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমান ভারতের হায়দরাবাদের উসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯১৮) শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় তর্কবিজ্ঞান, সাধারন বিজ্ঞান, ইতিহাস, লজিক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি সব বিষয়েই পুস্তক রচনার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন কিংবা শিক্ষাপ্রদান করার পক্ষে আমাদের যে সুবিধা আছে, সেই সুবিধা হায়দরাবাদ ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে ছিল না।'[২] তিনি আরো বলেন :

> কোরআন ও হাদীস খুব উন্নত ধরনে মূল হইতে পড়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিধান শাস্ত্রের (ফেকহার) কেবলমাত্র মূল সূত্রগুলি পড়ানো উচিত। আরবি ভাষায় উচ্চাধিকার জন্মিলে ছাত্রগণ আপনা হইতেই ফেকহার কিতাব পড়িয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে। এই সমস্ত বাদ দিয়া, শ্রেণী বিভাগানুসারে জগতের প্রসিদ্ধ জাতিসমূহের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, লজিক ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বঙ্গভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাছাড়া মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে বাংলা ভাষায় শিখানো একান্ত দরকার।[৩]

শিক্ষায় দেশীয় ভাষার ব্যবহার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃক্রোড় থেকে যে ভাষাব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত সেই ভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান পর্ব শুরু হওয়া উচিত বলে পত্রিকায় অভিমত প্রদান করা হয়েছে। তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার বাহন হওয়া উচিত কিনা সে প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। 'মুসলমান সমাজের শিক্ষা' প্রবন্ধে আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) লিখেছেন:

> শিক্ষা যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, মাতৃভাষায় প্রদত্ত হইলে তাহা যেমন সহজে ও দৃঢ়ভাবে শিশুর হৃদগত এবং আয়ত্ত হয়, অন্য কোনো ভাষাতেই তাহা হইতে পারে না। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। সুতরাং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা যে অবৈজ্ঞানিক এবং অনুচিত তা বলাই বাহুল্য। বোধ হয় কোন সভ্য দেশেই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় না। এতদিনের পর আমাদের দেশবাসীগণও ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মহীশুর এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল প্রাথমিক নহে, পরন্তু উচ্চশিক্ষাও মাতৃভাষায়

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

> প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও ব্যবস্থা ঐরূপ। মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাষায় শিক্ষাদান যে ফলদায়ক নহে, তাহা সহজেই বোধগম্য। আমার বিবেচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্যকভাবে সমীচীন হইয়াছে।[১]

শিক্ষাবিষয়ে মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পত্রিকায় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। যে কোনো ধর্মের ধর্মীয় পুস্তকাদি মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হলে তার তাৎপর্য আরো গভীরভাবে অনুভূত হয় বলে সাহিত্য-পত্রিকা মনে করে। তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি কেমন তা উপস্থাপিত হয়েছে একটি প্রবন্ধে। প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

> মুসলমানদের নিকট শিক্ষার অর্থ প্রথমতঃ ধর্মশিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ নীতি-শিক্ষা এবং শেষতঃ ব্যবসায়গত বা পার্থিব শিক্ষা। সুতরাং মুসলমান বিদ্যালয়ে গমন করিবার পূর্বে মসজিদে প্রদত্ত (ধর্ম) শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকে। যদি বাংলা ভাষার দীনিয়াত (ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাবলীর) সম্বন্ধে পুস্তকাদি থাকিত, তাহা হইলে সিংহল, জাভা, চীন এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানরা যেমন তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্মশিক্ষা পাইয়া থাকেন, তেমনই বাঙ্গলাভাষী মুসলমানেরাও মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম শিক্ষা পাইতেন। এইরূপ বাংলা পুস্তক রচিত না হওয়া পর্যন্ত উর্দুর চাহিদা থাকিবেই। ইহা ভিন্ন উর্দু ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ ভাষা। সুতরাং যাহার সাহায্যে অন্যান্য স্থানের মুসলমানের সহিত কথাবার্তা চালানো যায়, এমন একটা ভাষা শিক্ষা করিতে বাঙ্গালি মুসলমানদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।[২]

শিক্ষায় দেশীয় ভাষার ব্যবহার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহিত্য-পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃক্রোড় বা একান্ত শৈশবাবস্থা থেকে যে ভাষায় শিশু অভ্যস্ত সেই ভাষায় শিশুদের শিক্ষাদানপর্ব শুরু হওয়া উচিত বলে পত্রিকার অভিমত। তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশের ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অতিসীমিত, সেই ইংরেজি শিক্ষাও পরীক্ষার বাহন হওয়া উচিত কিনা, সে প্রশ্ন তোলা হয়। 'মুসলমান সমাজের শিক্ষা' প্রবন্ধে আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) লেখেন :

> শিক্ষা যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, মাতৃভাষায় প্রদত্ত হইলে তাহা যেমন সহজে ও দৃঢ়ভাবে শিশুর হৃদগত এবং আয়ত্ত হয়, অন্য কোনো ভাষাতেই তাহা হইতে পারে না। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। সুতরাং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা যে অবৈজ্ঞানিক এবং অনুচিত তা বলাই বাহুল্য। বোধ হয় কোন সভ্য দেশেই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় না। এতদিনের পর আমাদের দেশবাসীগণও ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মহীশুর এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল প্রাথমিক নহে, পরন্তু উচ্চশিক্ষাও মাতৃভাষায় প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও ব্যবস্থা ঐরূপ। মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাষায় শিক্ষাদান যে ফলোপধায়ক নহে, তাহা সহজেই বোধগম্য। আমার বিবেচনায়

১ প্রাগুক্ত

২ আবদুল করিম, 'মুসলমান সমাজের শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯ পৃ. ১৯৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্যকভাবে সমীচীন হইয়াছে।[১]

শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করা 'সাহিত্য-পত্রিকা'র অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পত্রিকায় ধর্মীয় শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। যেকোনো ধর্মের ধর্মীয় পুস্তকাদি একটি নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মৌলিক অর্থকে অক্ষুণ্ন রেখে মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হলে তার তাৎপর্য আরো গভীরভাবে অনুভূত হবে বলে সাহিত্য-পত্রিকা মনে করে। তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি কেমন এবং বহির্বিশ্বে কী করা হয় তা তুলে ধরে সাহিত্য-পত্রিকা জানায় :

> মুসলমানদের নিকট শিক্ষার অর্থ প্রথমতঃ ধর্ম্মশিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ নীতি-শিক্ষা এবং শেষতঃ ব্যবসায়গত বা পার্থিব শিক্ষা। সুতরাং মুসলমান বিদ্যালয়ে গমন করিবার পূর্বে মসজিদে প্রদত্ত (ধর্ম্ম) শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকে। যদি বাংলা ভাষার দীনিয়াত (ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাবলীর) সম্বন্ধে পুস্তকাদি থাকিত, তাহা হইলে সিংহল, জাভা, চীন এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানরা যেমন তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া থাকেন, তেমনই বাঙ্গলাভাষী মুসলমানেরাও মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন। এইরূপ বাংলা পুস্তক রচিত না হওয়া পর্যন্ত উর্দ্দুর চাহিদা থাকিবেই। ইহা ভিন্ন উর্দ্দু ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ ভাষা। সুতরাং যাহার সাহায্যে অন্যান্য স্থানের মুসলমানের সহিত কথাবার্ত্তা চালানো যায়, এমন একটা ভাষা শিক্ষা করিতে বাঙ্গালি মুসলমানদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।[২]

পাশাপাশি শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহারের কথা সেকালে যেমন উঠেছিল, একালে স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিটি স্তরে বাংলা ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, ভাষা-বিষয়ে, বিশেষত বাংলা ভাষাচর্চার পক্ষে সমকালে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*র ভূমিকা ছিল যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী। বাংলা ভাষাকে সার্বস্তরিক একটি ভাষা হিসেবে চালু করার জন্য, এবং একইভাবে এই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করার জন্য সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩

উপসংহার

পলাশিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় (১৭৫৭) থেকে শুরু করে সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) পর্যন্ত, অর্থাৎ শতবর্ষব্যাপী বাঙালি মুসলমান শিক্ষাদীক্ষায়-সাহিত্যচর্চায়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তির বিচারে হিন্দুসমাজ থেকে পিছিয়ে পড়ে। বিশ শতকের প্রায় পুরো প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। তখন কলকাতা ছিল সমগ্র বাংলার রাজধানী এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। ফলে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, আলোচনা বা গবেষণা হয়ে ওঠে মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম দিকের রচয়িতাগণ ছিলেন বিদেশি ইংরেজ অথবা ভারতীয় হিন্দু। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত যেহেতু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি কার্যকরভাবে গড়ে ওঠেনি, এবং এ-পর্যায়ে যেহেতু বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানও ছিল সীমিত, সেহেতু সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যচর্চার ইতিহাস এসব ইতিহাসবেত্তার গবেষণায় উঠে আসেনি। এ বিষয়ে সুদীপ্ত কবিরাজ (জন্ম. ১৯৪৫) তাঁর একটি প্রবন্ধে একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন যার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

> উনিশ শতকের শেষের দিকে বা বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা শুরু হয়, তখন সেই উদ্যোগটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাতে সাহিত্যের আধুনিকতার একটি প্রকল্প। আর এই উদ্যোগে সমাজের উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় এই পর্যায়ের সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে ইসলামি উপাদানগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল এই বলে যে, ওসব 'মুসলমানি বাংলা' নামে একটি পৃথক ধারার অন্তর্গত, আর নয়তো ওসব রচনাসমূহে উচ্চমানের সাহিত্যকর্মের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হবার মতো সাহিত্যিক গুণ নেই।[১]

বাস্তবতা হচ্ছে – শিল্পমানবিচারে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকর্ম যে একেবারে অগ্রহণযোগ্য ছিল তা বলা যাবে না। মীর মশাররফ হোসেন এক্ষত্রে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকগণের অবদান বিশ্লেষিত হলে সেই ইতিহাস হতো নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক। বাঙালি মুসলমানদের এই সাহিত্যিক পথযাত্রায় দিশারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি* এবং এই সমিতির মুখপত্র *বঙ্গীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। এই সংগঠন এবং সাহিত্যপত্র বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করে। এ উদ্যোগের পরপরই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে কলকাতা কেন্দ্রিক *সওগাত* (১৯১৮), *মোহাম্মদী* (১৯২৭), *বুলবুল* (১৯৩৩) প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকা; যেগুলোর মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস নির্মাণের পথ নিষ্কণ্টক ও অবারিত হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভেদবুদ্ধিকে আমলে না নিয়ে লেখালেখির প্রায় সব বিষয় প্রকাশ করতে শুরু করে। সাহিত্য-সমিতির নানবিধ সভা-সম্মিলনের আয়োজন ও বক্তাদের

---

১ Sudipta Kaviraj, `The Two Histories of Leterery Culture in Bengal', উদ্ধৃত, আমজাদ হোসেন সম্পাদিত, *জেগে উঠিলাম : বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি স্মারক সুবর্ণলেখ*, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. [বারো]

লিখিত রচনাসমূহ সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে আরো নিকটবর্তী করার প্রচেষ্টা চালায় এই পত্রিকা। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক প্রতিভা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্মের নতুন-পুরাতন লেখকদের সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান দেয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল সমকালের বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয় ও শিল্পমান বিচারের নিরিখে সম্পাদকমণ্ডলী লেখকদের প্রেরিত রচনাগুলোকে সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিবেচনা করতেন। লেখকদের কোনো বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ফুটনোটে তা জানাতে দ্বিধা করতেন না। ক্ষেত্রবিশেষে ঐ বিষয়সম্পর্কিত ভিন্ন আলোচনা বা মতামত একই সংখ্যায় বা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হতো। রাজনীতিসচেতন ছিল পত্রিকাটি, তবে রাজনৈতিক বিবেচনার দিক থেকে কোনো দল বা মতকে সমর্থনের চিত্র দেখা যায়নি সাহিত্য-পত্রিকায়। কোনো পক্ষভুক্ত হওয়ার চেয়ে ইতিহাস ও সাহিত্যের গৌরাবান্বিত ও অনালোচিত অধ্যায়ের প্রাধান্য দেয়াই মূল লক্ষ ছিল পত্রিকাটির। গভীর অনুসন্ধানে দেখা যায়, দেশভাগ বা ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজনকেন্দ্রিক কোনো রচনা বা মন্তব্য সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান পায়নি।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা মুসলিম লেখকদের বাংলা ভাষাচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়, ফলে কলকাতার পর ঢাকা এবং সারা বাংলায় সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের ধারা বেগবান হয়। ঢাকা থেকে শিখা পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতার *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় মুদ্রিত করার প্রধান মাধ্যম। কলকাতা, চট্টগ্রাম ও বসিরহাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে মুসলিম সাহিত্যিকদের সঙ্গে সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) প্রমুখ অমুসলিম সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করতেন।[১] এইভাবে এই সম্মিলনগুলি বাঙালি সাহিত্যিকদের অন্যতম মিলনমঞ্চ হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার* মুদ্রণ সংখ্যা কেবলমাত্র বৃদ্ধিই করতে হয়নি, কোনো কোনো সংখ্যার পুনর্মুদ্রণও করতে হয়েছে। যেকোনো সাহিত্য-পত্রিকার জন্য এটি ছিল শ্লাঘার ব্যাপার। পত্রিকাটি বাঙালি মুসলমানের সমাজ-ইতিহাস অধ্যয়নে ও চেতনাগত বিকাশের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। মুসলমানের আত্মিক ক্রমবিকাশের বিচিত্র সূত্র-সন্ধানের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে পত্রিকার সংখ্যাগুলি।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা নামটি যেমন বাংলা ভাষায় রাখা হয়েছিল, তেমনি এই পত্রিকায় অখণ্ড ভারতের অবিভক্ত বঙ্গের সর্বক্ষেত্রে বাংলা চালুর পক্ষে মত প্রদানও ছিল জোরালো ধরনের। আবার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উর্দু, আরবি, ইংরেজি এমনকি সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দির প্রয়োজন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভিন্ন হতে পারে বলে বিশ্বাস করত *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। তবে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে এর অবস্থান ছিল প্রশ্নাতীত। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের বিশেষ কোনো ভাষাভিত্তিক দুর্বলতা ছাপিয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিদানের প্রশ্নে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী বা বেগম রোকেয়া যে-সব সাহিত্য-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির কার্যনির্বাহের ভাষা ছিল ইংরেজি বা উর্দু। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'ই বাঙালি মুসলমানের সেই প্রথম প্রতিষ্ঠান,

১ *জেগে উঠিলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. [চৌদ্দ-পনের]

যার কাজ চলত বাংলা ভাষায়।[1] সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* খাঁটি বাংলা নামকরণের ক্ষেত্রেও বাংলা, বাঙালি, বাঙালিত্ব প্রাধান্য পেয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের জাগরণের প্রাথমিক পর্যায়ে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* সর্বাধিক যুগান্তকারী সাময়িক পত্র হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, এ কথা নিশ্চিত বলা যায়। সাহিত্য-পত্রিকার পূর্বে বাঙালি মুসলমানের আলোচিত পত্রিকা *নবনূর* (১৯০৩) সাহিত্যমূল্য বিচারে ও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রগতিশীলতার মানদে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* অনেকখানি এগিয়ে ছিল। তাছাড়া সাহিত্য-পত্রিকার মূল সংগঠন সাহিত্য-সমিতির মতো ঐতিহ্যও *নবনূর* পত্রিকার ছিল না। এমনকি একই বছরে অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *মাসিক সওগাত* ও (সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন) এক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল। এ পর্যায়ে সওগাত মাত্র এক বছর চলে। ১৯২৬ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত সওগাত পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যার পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র *শিখা* (১৯২৭) পত্রিকাকেও এ ধারার পত্রিকা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি (৫ম খণ্ড)*, অনু হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৬, পৃ. ১০০

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	:	হাতের মুঠোয় পঞ্চাশ বছরের ভারতী, প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ: সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পারুল বই, কলকাতা, ২০১৭
অসীম রায়	:	ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ, হাবিব আর রহমান সম্পাদিত, রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৫
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডক্টর)	:	ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য (১৮১৫-১৮৯৩), এশিয়ান পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪
অমর দত্ত	:	উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
অন্নদাশঙ্কর রায়	:	রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯
অরুণকুমার বসু	:	নজরুল জীবনী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০
আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন	:	আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২
আবুল আহসান চৌধুরী	:	সাহিত্যের রূপকার : পুনর্বিচারের অবলোকন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪
আনিসুজ্জামান	:	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রতিভাস সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯
	:	মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯০০), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯
আজিজুর রহমান মল্লিক	:	ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২
আবুল ফজল	:	রেখাচিত্র, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫
আসকার ইবনে শাইখ	:	মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০২
আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতি	:	খলিফাদের ইতিহাস (তারিখুল খুলাফা), এম. মনিরুজ্জামান অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০০
আল্লামা শিবলী নোমানী	:	আল মামুন, আখতার ফারুক অনূদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭
আমীনুর রহমান	:	এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩
আবু জাফর শামসুদ্দীন	:	আত্মস্মৃতি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৮৮৯

আবদুল কাদির : মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬

: নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯

আমজাদ হোসেন : জেগে উঠিলাম, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি স্মারক সুবর্ণলেখ, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০১৯

আলমগীর জলিল : শিশু সাহিত্য রচনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮

আজহার উদ্দিন খান : বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০

আশা দাশ : ইসলাম ও মধ্যযুগের ভারত, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভিক্ষু সুমনপাল সম্পাদিত, ছোয়া, কলকাতা, ২০২১

আর. এ. নিকলসন : আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, জয়ন্ত সিংহ, মুহাঃ আবদুল কাইউম, বিদ্যুৎ ব্যানার্জি ও সৌমিত্র সেনগুপ্ত অনূদিত ও সম্পাদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬

ইসরাইল খান : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান: জীবন ও চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

: সাময়িকপত্র ও সমাজ গঠন : বাংলাদেশের পরিস্থিতি, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

: মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১-১৯৪৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

ইমরান হোসেন, সুনীল কান্তি দে : ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি (সম্পা:), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

ইমরান হোসেন : বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

এম. আবদুল কাদের (ডক্টর) : ক্রুসেডের ইতিহাস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

: সুলতান সালাহ্উদ্দীন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

এস. এম. লুৎফর রহমান : ধূমকেতু ও তার সারথি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

ওসমান গণী (ডক্টর) ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, বুকস ওয়ে, কলকাতা, ২০১০

: স্পেনের মূর খেলাফৎ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৫

ওয়াশিংটন আরভিং : আলহামরা, মুয়াযযম হুসায়ন খান ও হাসান ইকবাল অনূদিত, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫

ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

কমল চৌধুরী : চট্টগ্রামের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, দিলীপ মজুমদার (সম্পাদিত), তমোরি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ঢাকা, ১৯৯০

কাজী মোতাহার হোসেন : মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা; বাংলা সাহিত্য সম্পদ, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৬

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় : মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (সম্পাঃ), পুথিপত্র, কলকাতা, ১৯৯৯

খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০

খালেদ মাসুকে রসুল : শেখ আবদুর রহিম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭

ক্ষিতিমোহন সেন : কবীর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৫

গৌতম চট্টোপাধ্যায় : সংহতি লাঙল গণবাণী (সম্পাঃ), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৪

গৌতম নিয়োগী : বাংলায় রাজনীতি, বাঙালির রাজনীতি (১৭৫৭-১৯১১), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২

গৌতম রায় : মুসলিম মানস ও বাঙালি সমাজ, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০২২

গিয়াস শামীম : বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৫

চিত্ত মণ্ডল : মুজফ্ফর আহ্মদের সাহিত্য ও সমাজ-রাজনীতি (সম্পাঃ), নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০

চুং নিং : চীনের ইসলাম ধর্মাবলম্বী দশটি সংখ্যালঘু জাতি, তিয়েন থাই অনূদিত, পেইচিং, চীন, ১৯৮৯

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৩

চিত্ররেখা গুপ্ত : বাঙালি মুসলমান লেখিকা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০২২

তালিম হোসেন : মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র (সম্পাঃ), পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী : বিপ্লবী বাংলা (১৭৫৭-১৯১২), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৭

তারাপদ পাল : ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস (১৭৮০-১৯৪৭), পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১০

তপংকর চক্রবর্তী : বরিশালের সংবাদ ও সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

দীপন চট্টোপাধ্যায় : কল্লোল থেকে কৃত্তিবাস, হুগলি, ভারত, ২০০৬

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৭

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯১

পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ	: বাঙ্গালায় নারী নিগ্রহ, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৪
প্রত্যুষকুমার রীত	: ঠাকুর বাড়ির পত্র-পত্রিকা, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩
প্রশান্ত মন্ডল	: কলকাতার বাঙালি মুসলমান সমাজ (উনিশ শতক), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯
বিপ্লব দাশগুপ্ত	: বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪
বিনয় ঘোষ	: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৫
	: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বি-প্র, ২০০৭
	: বাংলায় বিদ্রোহঃ উনিশ শতকে, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭
বিনয় ঘোষ	: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০১৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	: যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৭
	: সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১০
	: বাংলা সাময়িক পত্র (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৪১০
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	: সামাজিক প্রবন্ধ, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	: সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বি-মু, ২০০১
	: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯
মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী	: দিল্লি-কেন্দ্রিক মুসলিম শাসনের পূর্বে আরব ও ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন ভাষান্তরিত, তালীম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭
মিলন দত্ত	: মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান', আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ, কলকাতা, ২০২২
মুজফ্ফর আহমদ	: আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯), খান ব্রাদ্রার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০১
মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দ্দার	: এয়াকুব আলী চৌধুরীঃ জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২
	: ডাঃ লুৎফর রহমানের সাহিত্য সাধনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪

মুহম্মদ ইনাম-উল-হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ, (সংকলিত ও সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০

: রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা, সমকালের দর্পণে (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী (ডক্টর) : বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪

মুহা. ইসমাইল রাইহান : মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ (নবম খণ্ড), মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০২১

মুহম্মদ রেজা-ই-করিম : আরব জাতির ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮

মীর মশাররফ হোসেন : আমার জীবনী, জেনারেল বুক এজেন্সীজ প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

মলয় বসু : অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল : কৃষকসভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১

মোবাশ্বের আলী : প্লুটার্ক রচিত জীবনীমালা (প্রথম খণ্ড), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১১

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

মুহম্মদ এনামুল হক (ডক্টর) : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : আনোয়ারা, খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

রথীন চক্রবর্তী : মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদপত্রের রূপান্তর, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ১৯৮৯

রাগিব সারজানী (ডক্টর) : ইসলামি ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আবু মুসআব ওসমান অনূদিত, মাকতাবাতুল হাসান, ঢাকা, ২০২০

: আন্দালুসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আবু মুসআব ওসমান অনূদিত, মাকতাবাতুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ, ২০১৮

: ইসলামি ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), আবু মুসআব ওসমান অনূদিত, মাকতাবাতুল হাসান, ঢাকা, ২০২০

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃ-সং, ২০০০

রকিবুল হাসান : বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারা: মীর মশাররফ হোসেন থেকে আকবর হোসেন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১

লায়লা জামান : দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

: সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

লর্ড কিনরস : দি অটোমান সেঞ্চুরিস, দ্য রাইজ এন্ড ফল অব দ্য তার্কিশ এম্পায়ার, জেসি মেরি কুইয়া অনূদিত, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

শামিমা ইসলাম : অনন্যা, ইস্টার্ণ হাউজিং, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, মে ১৯৮৮

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ গল্প, বুদ্ধদেব দাশ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২

শেখ আবদুর রহিম : হযরত মোহাম্মদ (স.) এর জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, প্রথম আবিষ্কার সংস্করণ, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০১৮

শিবনারায়ণ রায় : প্রবন্ধ সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৩

শৈলবালা ঘোষজায়া : শেখ আন্দু, ড. শিরীন আখতার সম্পাদিত, আবিষ্কার সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৫

সন্দীপ দত্ত : বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত (১৮১৮-১৮৯৯), গাঙচিল, কলকাতা, ২০১২

স্বপন বসু : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫

: সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০

: উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৮

স্বপন বসু, অভিজিৎ রায় : দ্বিশতবর্ষে বাংলা সংবাদপত্র ঐতিহ্য ও পরম্পরা (সম্পা:), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ২০২২

স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী : ১৮৫৭-র বিদ্রোহ, সমকালীন বাংলা ও বাঙালি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ২০১১

স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন : দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র (সম্পা:), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫

সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন আব্দুর রহমান : ভারতে মুসলিম শাসকদের সহিষ্ণুতা ও উদারতার ইতিহাস, মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন ভাষান্তরিত, তালীম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৩০৮-১৩২১), বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

সৈয়দ আমীর আলী : দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, ড. রশীদুল আলম অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৯

	:	আরব জাতির ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সারাসিনস্), শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বি-সং, চতুর্থ-পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬
সৈয়দ আবুল মকসুদ	:	বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রম ও বিশ্বাসহীনতা, ডেইলি স্টার বুকস, ঢাকা, ২০১৯
সুরজিৎ বসু (ডক্টর)	:	বাংলায় সাহিত্য আন্দোলনঃ বঙ্গদর্শন-পরিচয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫
সব্যসাচী ভট্টাচার্য	:	বাংলায় সন্ধিক্ষণঃ ইতিহাসের ধারা (১৯২০-১৯৪৭), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লি, ভারত, ২০১৮
সফিউদ্দিন আহমদ	:	সাময়িকপত্রে ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯
সালাহউদ্দীন আহমদ	:	উনিশ শতকে বাংলায় সমাজচিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫), আইসিবি, ঢাকা
সিরাজউদ্দিন সাথী	:	দাস প্রথা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫
সারা তয়ফুর	:	স্বর্গের জ্যোতি, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫
যোগেশচন্দ্র বাগল	:	রাজনারায়ণ বসু, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৭
যতীন্দ্রমোহন সিংহ	:	উড়িষ্যার চিত্র, প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১২
হাবিব রহমান	:	বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪
	:	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩
	:	নির্বাচিত সংকলন : মাসিক জাগরণ পত্রিকা (সম্পাঃ), ঐতিহ্য ঢাকা, ২০০৭
হারুন রশীদ	:	উপনিবেশ চট্টগ্রামঃ ৫০০ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস, পূর্বস্বর, চট্টগ্রাম, ২০২১
হর্ষ দত্ত, স্বপন বসু	:	বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি (সম্পাঃ), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০

অন্যান্য গ্রন্থ

	:	আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি (পঞ্চম খণ্ড), ড. অনু হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
	:	আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড), মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ সম্পাদিত বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪
	:	এয়াকুব আলী গ্রন্থাবলি, খান মুহম্মদ সালেক সম্পাদিত, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৭৪

: এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলি (প্রথম খণ্ড), সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

: কায়কোবাদ রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

: কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড), নূরুল আমিন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

: বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪

: বঙ্কিম রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০১ সংশোধিত দ্বাদশ মূদ্রণ

: বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, তৃ-সং, জুন ২০১১

: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলি, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৩৭০

: শেখ ফজলল করিম রচনাবলি, শামসুন নাহার জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

: সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮

সহায়ক প্রবন্ধ

আবুল আহসান চৌধুরী : হিতকরী, মাসিক উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, শ্রাবণ ১৪২২, বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৪ নবপর্যায়, ৭৩ তম সংখ্যা, মুদ্রণকাল মার্চ ২০১৮

আবদুল কাদের : ইসলাম ও বহুবিবাহ, তবলীগ, ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫

আবদুল গফুর : নারী প্রগতি, গুলিস্তাঁ, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৪২

ইসমাইল হোসেন সিরাজী : সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, আল এসলাম, আষাঢ় ১৩২৩

এম আর আখতার মুকুল : কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ক্রমবিকাশের ধারা (১৭৫৭-১৯০৫), দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫

কাজী ইমদাদুল হক : বহুবিবাহ, নবনূর, ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১২

ধনঞ্জয় ঘোষাল : বাঙালির জাতীয়তাবোধঃ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠানঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, বলাকা (সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা), বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৩৮, অক্টোবর ২০২১

ফজিলতুন্নেছা : মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সওগাত, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭), পৃ.৫২৫

মনজুরুল হক : ইমাম গাজালি ও তাঁর শিক্ষাদর্শন, দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২১

মুহাম্মদ ওমর ফারুক : ইতিহাসের নিরিখে তৈমুরীয় শাসনব্যবস্থার একটি পর্যালোচনা, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ইতিহাস অনুসন্ধান ৩০, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, মাহে নও, ১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৫

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম : শেখ ফজলুল করিম সম্পাদিত বাসনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন : বাঙ্গালী মুসলমানের সমাজ ব্যাধি পথপ্রথা, সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

মৌলবী শেখ গোলাম গওস : ইসলাম ও তালাক, তবলীগ, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : বন্দে মাতরম ও স্বদেশী আন্দোলন, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

স্বপন বসু : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ-এর চিন্তাচেতনার জগৎ, পরিকথা, ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মে, ২০০৮

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা
সূচিপত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫

নিবেদন : [সম্পাদক]
আহবান [কবিতা] : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি.এ
দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
আঁধার যুগের আরব : ফজলুর রহীম চৌধুরী, বি.এ
যক্ষের ধন [গল্প] : তালেবউদ্দীন আহমদ, বি.এ
নামাজ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
T'র ঠকামি : মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন বি.এ
প্রেম-বন্ধন [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
কবি ও বৈজ্ঞানিক [প্রবন্ধ] : গোলাম মোস্তফা
অন্তিম পিপাসা [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম
ভুল [গল্প] : কাজী আবদুল ওদুদ বি.এ
"ফোস্তাত" [প্রবন্ধ] : বিবি সারা তয়ফুর
মুর্শিদী গান : এ. লোহানী
প্রাচীন পুথির বিবরণ : নাগর আলী
[সাধন-মাহাত্ম্য]
স্বর্গের জ্যোতি [গুণালোচনা] : কাজী ইমদাদুল হক, বি.এ,বি,টি
কোরক : এ. হাদী-তুমি ও আমি, মোহাম্মদ খেরাজ আলী-ভরতপক্ষী ও পেচক, এ. লোহানী-স্বপন পুরে, মোহাম্মদ দেলদার রহমান-যাচঞা, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান-মহাসঙ্কল্প, মোহাম্মদ ইয়াসিন-আহবান, মোহাম্মদ আলী-সুখ, এ.এম. আবদুস সামাদ-ব্যয়ের বাহাদুরী(অণুগল্প), উড়ো পাখী-মেঘলা আকাশ (কথিকা)
সমিতি-সংবাদ : বিবরণী, দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সম্মিলন, কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি, পত্রিকা-পরিচালন কমিটি, লাইব্রেরী ও পাঠাগার,বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি কর্মকর্ত্তৃগণ, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকার নিয়মাবলী।

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৫

বঙ্গভাষা ও মুসলমান (বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত) : সৈয়দ এমদাদ আলী
বিদ্যায় মুসলমানদিগের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্য : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

বউ কথা কও [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
অর্থবিজ্ঞানের উপাদান : চণ্ডীদাস গুপ্ত
কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম্ম : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
সবল ও দুর্ব্বল স্বার্থ [প্রবন্ধ] : এক্‌রামুদ্দীন
লক্ষীছাড়া [গল্প] : খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
ইউরোপ যাত্রী
প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন
ময়্‌না : সারা তয়ফুর
সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন ও ক্রুসেড : কাজী ইমদাদুল হক
সংশয় ও বিশ্বাস [কবিতা](আবুল আতাহিয়া) : চণ্ডীচরণ মিত্র
জীবন ও মরণ [কবিতা] (আবুল আতাহিয়া): চণ্ডীচরণ মিত্র
ইমাম-আল-গাজ্জালী : মোজাফ্‌ফর আহমদ
বিবেক [কবিতা] : কায়কোবাদ
আবর্জ্জনা [কবিতা] (বোস্তাঁ অবলম্বনে) : কাজী ইমদাদুল হক
অতীন্দ্রিয় জগৎ : মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
কোরক : দৃশ্য চিত্র (৭টি অণুগল্প)-মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, অসুখী মানব (গল্প)-আল জালালী, সদরেরও সদর আছে (কবিতা)-মোহাম্মদ ইয়াসিন, ভাটিয়ালি গান-নাগর আলী, বাবর ও খানজাদ (ইতিহাস)-আলী বখতেয়ার, পিপীলিকা-বধকাব্য-ফজলুল হক ভূঞা
সমিতি সংবাদ

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৫

যুগ-সন্ধির কবি মালেকুজ্জমান : আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
প্রতীক্ষা [গল্প] (একটি ফরাসি গল্পের ছায়া অবলম্বনে) : সৈয়দ মোকাররম আলী
আঁধার যুগের আরব-সাহিত্য : ফজলুর রহিম চৌধুরী
হজরত মোহাম্মদের প্রতি [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
প্রাচীন প্রেমিক [প্রবন্ধ] : ও. আলি [ওসমান আলি]
স্মৃতি-চিহ্ন [গল্প] : সৈয়দ এমদাদ আলী
ভারতের পল্লী-সেবা : চণ্ডীদাস গুপ্ত
সম্রাট নাসীর [কবিতা] : কেশবলাল বসু
চাঁদ মিঞার খাতা : একরামুদ্দীন
[মেঘের কোলে সৌদামিনী]
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ [সর্ব্বভেদ] : শাহ্ শম্‌শের উদ্দীন আহমদ
সুন্দরী [গল্প] : গোলাম কাসেম
যোগ্য উপহার [কবিতা] : কালিদাস রায় কবিশেখর
ঢাকা-আশরাফপুরের খাঁ বংশ : দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
মুর্শিদী গান (১) (২) (৩) (৪) : (১) রেয়াজউদ্দীন আহমদ, (২) মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, (৩) বশারত আলী, (৪) গোলাম হায়দর চৌধুরী

কোরক	: (১) আমার লক্ষী-চণ্ডীদাস গুপ্ত, (২) আকিঞ্চন-আফাজউদ্দীন আহমদ, (৩) আদর্শ রমণী-এম. আবদুল কাদের, (৪) কুণ্ঠিত-শাহাদত হোসেন, (৫) বিলম্বে-মোহাম্মদ খেরাজ আলী, (৬) মাতৃ-শ্মশানে-মোহাম্মদ ইদ্রিস, (৭) রুদ্ধ করোনা দ্বার-এ. কাসেম, (৮) চোখ গেল-খলিলুর রহমান, (৯) বাসনা-মঞ্জুরনেসা বিবি, (১০) হজরত মোহাম্মদ-মাহমুদুল হক, (১১) দূরে দূরে-মোহাম্মদ আবুল হাশেম, (১২) আমার অকৃতজ্ঞতা-দেওয়ান শাম্‌সউদ্দীন আহমদ, (১৩) প্রার্থনা-কাজী হবিবর রহমান, (১৪) ঈশ্বরের মহিমা-শাহাদৎ আলী খন্দকার, (১৫) পোড়া মন-রেকাতউদ্দীন
সমিতি সংবাদ	

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫

মাঙ্গলিক [কবিতা]	: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
[তৃতীয়] বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন	:
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন	:
সভাপতির অভিভাষণ	: মোহাম্মদ আকরম খাঁ
কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে	
অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী ?	: সৈয়দ এমদাদ আলী
খলিফাদিগের শাসনকালে ডাক-প্রথা	: মোহাম্মদ কে, চাঁদ
মানবতায় হজরত মোহাম্মদ	: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
আল মামুনের দরবারস্থ বিদ্যুৎমণ্ডলী	: আতা-উল-হাকিম
জাতির উত্থান	: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
বীজগণিতে মুসলমান	: ফররোখ আহমদ
গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান	: আবুল খায়র মোহাম্মদ সালামৎউল্লাহ
বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য	: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
শিক্ষা ও কোরআন	: খলিলুর রহমান মোহম্মদ নূরুল ইসলাম
হীন জীবে দয়া	: আহমদ মিয়া
সমিতি সংবাদ	: বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন। তৃতীয় অধিবেশন চট্টগ্রাম। কার্য্য বিবরণী

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬

মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব	: সৈয়দ এমদাদ আলী
চীনে ইসলাম	: আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন
কুড়ান চিঠি [ছোটগল্প]	: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
সাব'আ-মোয়াল্লাকার কবিগণ	: ফজলুর রহীম চৌধুরী
চাঁদ মিঞার খাতা [গল্প] : দ্বিতীয় পর্ব	: একরামুদ্দীন

ক্রুসেডের পরিণাম : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
নূতন বাড়ী [গল্প] : খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
যন্নুরয়েনের শাহাদাৎ : (মিসেস) সারা তয়ফুর
জোড়াবন্যা-কাহিনী : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
"আনোয়ারা" [সমালোচনা] : গোলাম মোস্তফা
শক্তি ভিক্ষা [কবিতা] : কলিদাস রায়
"গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান" [প্রতিবাদ]: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
ভিতর ও বাহির [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
প্রতিদান [গল্প] : আবুল মনসুর আহমদ আলী
পার্সীয়ান মুনশীর দফতর : আবদুল করিম
ফুলের খেলা [কবিতা] : ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা
কোরক : আশা (কবিতা)-মোহাম্মদ আমানত আলী, মাতৃহীন (কবিতা)-শেখ আব্দুল গফুর জালালী, শ্রেষ্ঠ-আশ্রয় (কবিতা)-আবদুল জব্বার, প্রভু ও দাস (কবিতা)-মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, অভিমান (কবিতা)-আজিজুল ইসলাম
সমিতি সংবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৬

প্রেমের সাধনা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
ইব্নে সিনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ
কালু ডাকাত [গল্প] : আবদুল মুমিত চৌধুরী
ন্যায়াদর্শী নৃপতি [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
আরবগণের বিজ্ঞান চর্চ্চা : আবদুল ওয়াহেদ
মিলনের উপায় : আহমদ মিঞা
চীনে ইসলাম [দ্বিতীয় পর্ব] : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন
মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র : সৈয়দ এমদাদ আলী
মুক্তি [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার বঙ্গবাহিনী ; করাচি)
বিন্দু ও সিন্ধু [কবিতা] : বিমলেন্দু মিত্র
জুতা ও আমি : দেওয়ান শামসউদ্দীন আহমদ
নওয়াব আবদুল লতীফ ও মুসলমান শিক্ষা বিস্তার : এম. আবদুল জব্বার
কোরক : পাপিয়া-আফাজউদ্দীন আহমদ, ব্যাপ্তি-এ. হাদী, বিপুল বিজয়-মোহাম্মদ আবুল হাশেম
সমিতি-সংবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬

জাতীয় সঙ্গীত [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান
গল্প সাহিত্য : কাজী আকরম হোসেন
ইসলাম এবং সভ্যতা : আবদুর রহমান
হেনা [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী-করাচি)
পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী : মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ

আলী বখশ [কবিতা} : কেশবলাল বসু
নারীর মূল্য ও ইসলাম : মঈনউদ্দীন হোসায়ন
স্বরূপ [কবিতা] : একলিমুর রেজা
মা [গল্প] : কাজী আবদুল ওদুদ
ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা : খোন্দকার গোলাম আহমদ
প্রাণের গান [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
পার্সীয়ান মুনশীর দফতর [দ্বিতীয় পর্ব] : আবদুল করিম
বঙ্গদেশে মাদরাসার শিক্ষা : মোজাফ্ফর আহমদ
কবি ও বৈজ্ঞানিক : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
সঙ্কলন ১) আরবী ভাষা : মোজাফ্ফর আহমদ
২) আলহামরা : মঈনউদ্দীন হোসায়ন
ভাটিয়াল গান [গান] : মোহাম্মদ নাগর আলী
কোরক : অজ্ঞাত, আলী বখতেয়ার, মোহাম্মদ হোসায়ন
ভারতের পল্লীসেবা : চণ্ডীদাস গুপ্ত
সমালোচনা :
আবে হায়াত [শেখ হবিবর রহমান প্রণীত কাব্য]: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
আরব ইতিহাসে এক পৃষ্ঠা : দ্বৈপায়ন [মোজাফ্ফর আহমদ]
সমিতি সংবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬

ছোট গল্পের ধারা : আবুল হোসায়ন
আকাঙক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম চিঠি [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
ব্যথার দান [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী-করাচি)
ওমর খাইয়াম : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
হাদীস শরীফে মানবসেবা ও বিশ্বপ্রেম : মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম
রুদ্ধব্যথা [গল্প] : আবুল হোসায়ন
সঙ্কলন : ইনায়েৎ খান : মোজাফ্ফর আহমদ
‘বুইয়ব’ এর যুদ্ধ : দ্বৈপায়ন [মোজাফ্ফর আহমদ] উত্তর:
আলোচনা: নারীর মূল্য ও ইসলাম (পত্র) : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ও মোজাফ্ফর আহমদ
সমিতি সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭

সুলতান সুলায়মান : মুয়াররিখ খান সাহেব
যাচঞা [কবিতা] : ওয়ারিস উদ্দীন
প্রিয়ার দেওয়া শরাব [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
ব্যর্থ [গল্প] : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
মানিনী বধুর প্রতি [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
আলোচনা ১) ইসলামে নারীর আত্মা : হামীদুর রহমান
২) ‘নারীর মূল্য এ ইসলাম’ এর জের : মোজাফ্ফর আহমদ

৩) জমানা : অজ্ঞাত
৪) শিক্ষক : অজ্ঞাত
ভূষণ [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
পবিত্র কোরআন [আভাষ] : আবদুল ওয়াসেক
সঙ্কলন :
১) ডাক্তার হোসায়ন : মোজাফ্‌ফর আহমদ
২) জননীদের প্রতি(ছেলেদের হাঁটানো): কাজী নজরুল ইসলাম
৩) পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব : কাজী নজরুল ইসলাম
৪) জীবন বিজ্ঞান (দুঃখ কষ্টের মহত্ব): কাজী নজরুল ইসলাম
৫) সাহিত্যের হিসাব নিকাশ : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
৬) আখের চিনি : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
৭) চিনির গাছ : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
৮) আমরা ঘুমাই কেন : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
৯) জাপানে নারীর অধিকার : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
"মীর পরিবার" (আলোচনা) : খৈয়াম
সমিতি-সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭

মরুর মহিমা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
সুলতান সুলায়মান [দ্বিতীয় পর্ব] : মুয়াররিখ খান সাহেব
অবুঝ ব্যথা [কবিতা] : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মোসলেম নীতিশাস্ত্রভুক্ত ক্ষমাগুণ : মোহাম্মদ কে, চাঁদ
আলমগীরের পত্র : যামিনীকান্ত সোম
নূতন বই [প্রবন্ধ] : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্র-বিচিত্র [সামাজিক ৯টি নকশা] : রেয়াজুদ্দীন আহমদ
গান [সুর-হিন্দুস্থানী-কাজ্‌রী] : কাজী নজরুল ইসলাম
বানত সু'আদ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা [গল্প] : মিসেস আর.এস. হোসেন
ইসলাম প্রচার : গোলাম মোস্তফা
মুসলমান সমাজে কন্যাদায় : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
অতৃপ্ত কামনা [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম
সঙ্কলন ১) চা-পানের অপকারিতা : শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
২) কবিতার কথা : শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
৩) প্রতিভার অকালবিকাশ : শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
৪) চীনে নারীর স্বাতন্ত্র্য : শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
এগার সিন্দুর [প্রবন্ধ] : আফতাবউদ্দিন আহম্মদ
পবিত্র কোরআন [ত্রিংশৎ খণ্ড] : আবদুল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৭

মিলন সঙ্গীত [কবিতা]	: হরিপ্রসাদ মল্লিক
বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ	: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাবরের ব্রতগ্রহণ [একাঙ্কিকা]	: খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
ক্ষুদে পিপড়ের আত্ম-কাহিনী	: আবি আবদুল্লা
ছোট [কবিতা]	: আবি আবদুল্লা
কারে বাসি ভালো [কবিতা]	: আবদুল মজিদ
কথা-সাহিত্য	: শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
তীর ও সঙ্গীত [কবিতা]	: নছরু [এস এন কিউ জুলফিকার আলী]
সার্থক [কবিতা]	: গোপেন্দ্রনাথ সরকার
ভ্রান্তি [গল্প]	: মোহাম্মদ হোসেন
প্রেম [প্রবন্ধ]	: মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরী
ইনসাফ {কবিতা}	: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ময়নামতীর গান [আলোচনা]	: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
রায়-নন্দিনী [সমালোচনা]	: বসন্তকুমার রায়
সঙ্কলন	:
১) বঙ্গে ম্যালেরিয়া	: শ্রীমা [মাখন গঙ্গোপাধ্যায়]
২) ম্যালেরিয়ার প্রতিকার	: গোপালন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩) চায়ের কুল-পরিচয়	: ডা. রমেশ চন্দ্র রায়
৪) শিশু পালন	: মিসেস আর. এস. হোসেন
পবিত্র কোরআন [পূর্ব প্রকাশিতের পর]	: আবদুল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ	

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭

শিরচ্ছেদ [নাট্যিক কবিতা]	: গোলাম মোস্তফা
ইসলাম ও তুর্কী জাতি	: সৈয়দ আকবর আলী
গীতাবাদ্য শ্রবণ করা বিধিসঙ্গত কি নিষিদ্ধ	: মোহাম্মদ কে. চাঁদ
মানব জীবন	: মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরী
ফ্রেড্রিক লিষ্ট ও তৎকালীন জার্ম্মানী	: আবুল হোসেন
সাঁঝের তারা [গল্প]	: কাজী নজরুল ইসলাম
শকুন্তলা [কবিতা]	: শাহাদৎ হোসেন
কবিতা ও বণিতা	: শ্রী
সাহিত্য [প্রবন্ধ]	: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
কুরআন শরীফে যুদ্ধ-নীতি	: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
সংবাদ-পত্র [প্রবন্ধ]	: অজ্ঞাত
অদ্ভুত চা-খোর [গল্প]	: ইমদাদুল হক
বিপ্লব [প্রবন্ধ]	: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
‘ভারতের নারী’ (পুস্তক সমালোচনা)	: মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি ও উর্দ্দু ভাষা	: অমৃতলাল শীল
পান সিগারেট [কৌতুক-কথা]	: “ধীরপন্থী”

এরোপ্লেনের অত্যাচার [কৌতুক-কথা] : “ধীরপন্থী”
সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৮

নববর্ষে [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
চাষার দুক্ষু : মিসেস আর. এস. হোসেন
বিশ্বজনীন প্রেম [প্রবন্ধ] : সুরেশচন্দ্র মিত্র
বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি : শ্রী
উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
দেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দুর স্থান : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
ব্যথিত [গল্প] : মনীন্দ্রকুমার দত্ত
মানুষ হ’তে চাই [কবিতা] : শৈলবালা ঘোষজায়া
ইনডাষ্ট্রিয়ালিজম-যন্ত্রশিল্প প্রবাহ : আবুল হোসেন
পলায়ন [গল্প] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ
পরপারের কামনা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
সংবাদপত্র [প্রবন্ধ] : অজ্ঞাত
আল-ফারুক পূর্বানুরণ (কোরাক-অভিযান) : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরউদ্দীন
বৃদ্ধের বচন [পুস্তক সমালোচনা] : হক দোস্ত
সঙ্কলন: কারাগারে সংবাদপত্র
: ধূমপানের বদ অভ্যাস
সমালোচনা : ‘পথাহারা’ : দ্বৈপায়ন [মোজাফ্‌ফর আহমদ]
পবিত্র কোরআন : (৮৮ অধ্যায়-সমাচ্ছন্নকারী): আবুদল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৮

বিজয়-গান : কাজী নজরুল ইসলাম
বাংলার বলশী : আবুল হোসেন
মক্কা-বৃত্তান্ত : চারুচন্দ্র মিত্র
মুক্তিফল (রূপকথা) : মিসেস আর. এস. হোসেন
মোসলেম নীতিশাস্ত্র (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) : মোহাম্মদ কে. চাঁদ
উচ্চ জীবন (নারী-পুরুষ) : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এইচ, এম, বি
প্রার্থনা (রাবেয়া) [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
লোকসানের সন্ধ্যায় (গল্প) : শৈলবালা ঘোষজায়া
ক্ষুদে বলশেভিক [কৌতুক] : গণ্ডমূর্খ
আল-ফারুক (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরউদ্দীন
ছেলেদের পৃষ্ঠা : মা [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
গোলাবজাদী [তুর্কী উপকথা] : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
সঙ্কলন : ১) বসু-বিজ্ঞান-মন্দির
২) নারীর বিজ্ঞান-চর্চ্চা

পবিত্র কোরআন (৮৫ অধ্যায়-রাশিচক্র) : আবদুল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৮

মরণ-বরণ [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতা : শ্রী
সাহিত্যে বৈচিত্র্য : এম. আনসারী [মোহম্মদ বরকতুল্লাহ]
উচ্চ জীবন (সহর ও পল্লী-জীবন) : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
বিরহে [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার
এণ্ডি শিল্প : মিসেস আর.এস. হোসেন
শেখ আন্দু [সমালোচনা] : সৈয়দ এমদাদ আলী
খান কতক চিঠি [গল্প] : খুকুমণি দেবী
কৃষি বিপ্লবের সূচনা : আবুল হোসেন
ব্যথিতার নিবেদন [কবিতা] : সাজেদা খাতুন
জোহরা [গল্প] : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
"দেশীয় ভাষা সমূহের মধ্যে উর্দ্দুর স্থান" : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
আঁধার-কুড়ি (কবিতা) : সাজেদা খাতুন
ছেলেদের পৃষ্ঠা :
খোকার বুদ্ধি [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
রাণী হেলেনের গল্প : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
সঙ্কলন : জাপানের সংবাদপত্র
পুস্তক-পরিচয় : মতিচুর (প্রথম খণ্ড) : এ. হোসেন
পবিত্র কোরআন [৮১ অধ্যায়-আবরণ] : আবদুল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৮

তপোবল [প্রবন্ধ] : এম. আনসারী [মোহম্মদ বরকতুল্লাহ]
অশুভ-মঙ্গল [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
পথের মেয়ে [প্রবন্ধ] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
মুগ্ধা [কবিতা] : সাজেদা খাতুন
বন্দী-বন্দনা [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে. চাঁদ
নিশীথ-প্রীতম [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
উচ্চ জীবন [জীবনের ব্যবহার] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
বঙ্গের প্রথম রোমান্টিক কাব্য : শশাঙ্কমোহন সেন
ভিখারী [গল্প] : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ইসলাম গৌরব [আরবের আলো] : বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
বাঁচাও বাঁচাও [গান] : শৈলবালা ঘোষজায়া
আয়েসা [গল্প] : শৈলবালা ঘোষজায়া
কৃষকের আর্ত্তনাদ : আবুল হোসেন

অমৃতের পূজারিণী [কবিতা] : সাজেদা খাতুন
আল-ফারুক [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরুদ্দীন
ছেলেদের পৃষ্ঠা :
খোকার গপপ বলা [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
ইরাণ-কাহিনী [শাহ্ জমশেদের গল্প] : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
চিঠি [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
গোলাপ-কুঁড়ি [ছোটগল্প] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার
অতিথি [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
"ভাঙ্গাবুক" (আলোচনা) : জ্ঞানাঙ্কুর উপাধ্যায়
গ্রন্থ পরিচয় "জন্ম-অপরাধী" "মহম্মদ আলী"

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৯

বৈশাখী [কবিতা} : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ : আবদুল্লাহ-আল-আজাদ (কাজী আবদুল ওদুদ)
সাদীর গার্হস্থ্য জীবন : রামপ্রাণ গুপ্ত
পথের আলো (কবিতা) : কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কবি সংবর্দ্ধনা [প্রবন্ধ] : এম. আনসারী [মোহম্মদ বরকতুল্লাহ]
প্রাচ্য মনীষী মজলিস [নাটিকা] : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
আবু বিন আধাম ও স্বর্গের দূত [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
প্রেম ও গীতিকবিতা (Leigh Hunt) : শশাঙ্কমোহন সেন
শিশুর শিক্ষা : গোলাম মোস্তফা
গান্ধী জয় [কবিতা] : শৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক
উচ্চ জীবন [পিতৃ-মাতৃ ভক্তি] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
ডাকাত [গল্প] : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
পদতলে [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার
"পল্লীসমাজের" খানিকটা : সুধীর কুমার সেন
ব্যথিতের নিবেদন [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
ইসলাম গৌরব [সাধারণতন্ত্র যুগের সভ্যতা] : বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
পরিত্যক্ত [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
ছেলেদের পৃষ্ঠা :
হাওয়ার গলায় ফাঁসী : নিশিকান্ত সেন
ইরাণ কাহিনী [পূর্ব্বানুবৃত্তি] : খাজা [ইব্‌রাহীম খাঁ]
গ্রন্থ পরিচয় :
মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) : মিসেস আর. এস. হোসেন
জন্ম অভিশপ্তা (গল্প) : শৈলবালা ঘোষজায়া
সমিতি সংবাদ
শোক সংবাদ (কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত) : সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯

হজরত মোহাম্মদের শক্তিলাভ
ও মানবের অধিকার : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ : গোলাম মোস্তফা
নৌকাপথে : বিরজাসুন্দরী দেবী
ইবনে বতুত্বা এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
প্রেমিক [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
ছাই [গল্প] : খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
কোরআন ও নারী : ডাক্তার লুৎফর রহমান
স্নেহের বাঁধন [কবিতা] : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
ইসলাম গৌরব [ওমাইদ-সভ্যতা] : বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
একখানি সুখের স্মৃতি [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার
যৌবন [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
লর্ড মেকলে : চারুচন্দ্র মিত্র
সত্যেন্দ্র-স্মৃতি [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
দুঃখ ও সুখ [কবিতা] : এ. লোহানী
খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : সুরেশচন্দ্র মিত্র
সাহিত্য [প্রবন্ধ] : জাহেদুল হোসায়েন
ওয়ারেসী সম্পত্তি : যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
ফুল [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
কেরামত শাহ [গল্প] (প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত): ওয়ায়েজ উদ্দীন আহমদ
আবদুল লতীফ : এ. লোহানী
সত্যেন্দ্র-স্মরণে [কবিতা] : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ছেলেদের পৃষ্ঠা :
হক-বিচারী : খাজা [ইবরাহীম খাঁ]

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৯

যাদুঘর [গল্প] : খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
হজরত মোহাম্মদের জীবনে প্রাণের প্রতিধ্বনি : মোহম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
অ-ভূষণা : গোপেন্দ্রনাথ সরকার
খেলাফৎ বিবরণ : চারুচন্দ্র মিত্র
মুসলমান সমাজের শিক্ষা : আবদুল করিম
কৃষকের দুর্দ্দশা : আবুল হোসেন
অশ্রুর নিমন্ত্রণ [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
বিদায় গ্রহণ [গল্প] : শৈলবালা ঘোষজায়া
প্রেমহীন প্রাণ [কবিতা] : ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়
ইসলাম গৌরব [আব্বাসীয় সভ্যতা] : বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত
ভারতে মোসলেম নৌ-শক্তি : গোলাম মোস্তফা
বোগ্‌দাদ নগরীর ধ্বংস-সাধন : মোহাম্মদ সানাউল্লা
সমিতি-সংবাদ : কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

: সভাপতির বক্তব্য

পুস্তক- পরিচয়

অগ্নিবীণা [কাব্যগ্রন্থ]	: কাজী নজরুল ইসলাম:
খেলাঘর [নাটক]	: যামিনীকান্ত সোম
শান্তিধারা [২য় সংস্করণ]	: এয়াকুব আলী চৌধুরী
নূরনবী [২য় সংস্করণ]	: এয়াকুব আলী চৌধুরী
পূর্ণিমার গান [কবিতা]	: চণ্ডীচরণ মিত্র
জাতীয় উৎসবে [কবিতা]	: সরসীবালা বসু

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯

কবিবর নেজামী	: কাজী নওয়াজ খোদা
ন' কার	: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
দয়া [কবিতা] (মালিক মোহাম্মদ জায়সী)	: চণ্ডীচরণ মিত্র
প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ	: দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
অচিন তরুণী [কবিতা]	: বন্দে আলী মিয়া
ক্ষণিকা [গল্প]	: ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
উর্ণনাভ [কবিতা]	: চণ্ডীচরণ মিত্র
ইন্দ্রধনু [কবিতা] (ইংরাজী হইতে)	: কালিদাস রায়
বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা	: সফিয়া খাতুন বি.এ
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [কবিতা] (মৌলানা আকরব)	: চণ্ডীচরণ মিত্র
বঙ্গে আফগান পরিবার	: নওশের আলী খান ইউসফজয়ী
মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমীর দেহত্যাগ	: মোহম্মদ বরকতুল্লাহ
শহীদ [কবিতা]	: মীর ফজলে আলী বি.এ
কৃষকের দুর্দ্দশা [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]	: আবুল হোসেন
তৃপ্তি [কবিতা]	: চণ্ডীচরণ মিত্র
সাহিত্যের কথা	: সুধীরকুমার সেন
আরবী ছন্দের কবিতা	: কাজী নজরুল ইসলাম
দোদুল দুল ['মোতা কারির' ছন্দ]	: কাজী নজরুল ইসলাম
কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব	: বরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তক পরিচয়	
ব্যাথার দান (ছোট গল্প)-কাজী নজরুল ইসলাম	: অজ্ঞাত
উড়ো চিঠি-সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	: অজ্ঞাত
স্বপ্নের ঘোর (উপন্যাস)-আবদুল মালেক চৌধুরী	: অজ্ঞাত
দুনিয়ার সেরা সুন্দরী (তুর্কী উপনাস)	: খাজা [ইবরাহীম খাঁ]

ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০

ওমর খাইয়াম	: কাজী নওয়াজ খোদা
দীওয়ান-ই-হাফিজ (পদ্য)	: কাজী নজরুল ইসলাম
এখওয়ানুস-সাফা	: গোলাম মোস্তফা, বি.এ. বি. টি

কোম্পানীর আমল	: হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
যাদুঘর	: ইবরাহীম খাঁ
জন্মভূমি [কবিতা]	: কাজী কাদের নেওয়াজ
স্বাবলম্বিনী [গল্প]	: মিসেস এম. রহমান
বিশ্বগীতি [কবিতা]	: নূরুর রহমান খান ইউসফজী, বি.এল
অভিমান	: একরাম উদ্দীন
ইসলাম ও নারী	: খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
অভিমান [কবিতা]	: সরসীবালা বসু
আধুনিক শিক্ষা	: সফিয়া খাতুন, বি.এ
হজরত মোহাম্মদ ও শিক্ষা	: খোন্দকার আজমদ্দীন
হাজী শরিয়ৎউল্লা	: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (বিক্রমপুর)
বঙ্গে আফগান পরিবার	: নওশের আলী খান ইউসফজয়ী
স্বপ্নসুন্দরী [কবিতা]	: গোপেন্দ্রনাথ সরকার
মরহুম ডাঃ হবিবর রহমান	: শেখ আবদুর রহিম
কাল বৈশাখী [কবিতা]	: সুকুমার ভাদুড়ী
বসন্ত অবসানে [কবিতা]	: মীর ফজল আলী বি.এ
আনন্দময়ী [কবিতা]	: গোলাম মোস্তফা, বি.এ, বি.টি
মুসলমান সাময়িকী	: এম. আনসারী [মোহম্মদ বরকতুল্লাহ]
হাসির কাজ [কবিতা]	: চণ্ডীচরণ মিত্র
গ্রাহক ও সদস্য	

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩০

মুসলমানের অবনতির কারণ	: রামপ্রাণ গুপ্ত
সোনার শিকল	: খাজা [ইবরাহীম খাঁ]
জাত জালিয়াৎ [কবিতা]	: কাজী নজরুল ইসলাম
চট্টগ্রামে বঙ্গ-সাহিত্য	: আবদুল করিম
বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগ	: সফিয়া খাতুন
হাফেজ [জীবনী]	: কাজী নওয়াজ খোদা
জ্ঞান সাধনায় ইসলাম	: আজম উদ্দীন
ইসলাম [কবিতা]	: কাদের নওয়াজ
মোহাম্মদ মোহসেন [জীবনী]	: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (বিক্রমপুরী)
স্বাবলম্বিনী [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]	: মিসেস এম. রহমান
পাছে তোমারে ভুলি [কবিতা]	: কুমুদররঞ্জন মল্লিক
স্বাস্থ্য রক্ষায় আত্মদায়িত্ব	: জলধর সেন
সাহিত্য পরিচয় : ১) দিল্লীশ্বরী	: ব্রজেন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:
২) লীনার শিক্ষা (উপন্যাস)	: শৈলবালা ঘোষজায়া:
৩) Islam & Christianity	: মোহাম্মদ আমির আলম:
৪) সোনার ভারত (ত্রৈমাসিক পত্র)	: সম্পাদক, মোহাম্মদ জোবেদ আলী
সমিতি-সংবাদ	